প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃতি পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এর পর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

১৫তম পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি, 2016

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী ও অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : ঐচ্ছিক ইতিহাস **সাম্মানিক স্তর**

পাঠক্রম : পর্যায় : EHI 03 : 9-12

		রচনা	সম্পাদনা
পর্যায় 9	একক 33-34	: অধ্যাপিকা মল্লিকা ব্যানার্জী	অধ্যাপক হিমাদ্রি ব্যানার্জী
	একক 35-36	: অধ্যাপিকা ছন্দা চ্যাটার্জী	
পর্যায় 10	একক 37-38	: অধ্যাপক সিদ্ধার্থ গুহ রায়	ঐ
	একক 39-40	: অধ্যাপিকা শুভলক্ষ্মী পাণ্ডে	
পর্যায় 11	একক 41	: অধ্যাপিকা গুঞ্জা সেনগুপ্ত (ব্যানার্জী)	ঐ
	একক 42	: অধ্যাপক অমিয় ঘোষ	অধ্যাপক রাধামাধব সাহা
	একক 43-44	: অধ্যাপক অরবিন্দ সামন্ত	অধ্যাপক হিমাদ্রি ব্যানার্জী
পর্যায় 12	একক 45-46	: অধ্যাপক নিখিলেশ গুহ	অধ্যাপক সুরঞ্জন দাশ
	একক 47-48	: অধ্যাপক গৌতম চন্দ্র রায়	

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) দেবেশ রায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EHI 03

(স্নাতক পাঠক্রম)

পর্যায়
9

একক 33 ❑ মুঘল ভারতে কৃষক বিদ্রোহ **7-24**

একক 34 ❑ মুঘল দরবারে দল ও রাজনীতি **25-42**

একক 35 ❑ অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় **43-65**

একক 36 ❑ অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে ইউরোপীয় বণিককুল **66-79**

পর্যায়
10

একক 37 ❑ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম সোপান—বাংলা **80-95**

একক 38 ❑ বাংলা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো—আদিযুগ **96-113**

একক 39 ❑ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন/কোম্পানির রাজনৈতিক ক্ষমতার বিস্তার—উত্তর ভারত, মহীশূর ও মহারাষ্ট্র **114-132**

একক 40 ❑ ভারতে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের বিস্তার ঃ ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে ডালহৌসী **133-147**

পর্যায়
11

একক 41 ❑ ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিবর্তনশীল ধারা—আর্থিক নিষ্ক্রমণ—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ঃ ব্রিটিশ আধিপত্যের প্রভাব—অবশিল্পায়ন **148-165**

একক 42 ❑ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তন; ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা, রাজস্বনীতি, সর্বোচ্চ রাজস্ব সংগ্রহের কারণ; বাংলায় তিনটি রাজস্ব-সংক্রান্ত গৃহীত বন্দোবস্ত **166-187**

একক 43 ❑ ঔপনিবেশিক অভিঘাত ঃ নতুন প্রশাসনিক কাঠামো ঃ আইন—বিচারব্যবস্থা—দণ্ডবিধি ঃ শিক্ষাব্যবস্থা **188-206**

একক 44 ❑ পাশ্চাত্যকরণ ও ভারতীয় সমাজে তার প্রতিক্রিয়া ঃ তিনটি ভিন্নমুখী উদ্যম ও প্রয়াস ঃ সমন্বয়বাদ, রক্ষণশীল ঐতিহ্যপন্থা ও চরমপন্থী প্রতীচ্যপন্থা **207-215**

পর্যায়
12

একক 45 ❑ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম পর্যায়ের প্রতিরোধ ঃ বিক্ষুব্ধ রাজন্যবর্গ ও সিপাহীদের ভূমিকা **216-224**

একক 46 ❑ কৃষক বিদ্রোহ, গণ-অভ্যুত্থান ও উপজাতিদের মধ্যে অসন্তোষ **225-235**

একক 47 ❑ আঞ্চলিক নেতৃত্বের নগরকেন্দ্রিক রাজনীতি ঃ বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ **236-246**

একক 48 ❑ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ ঃ প্রেক্ষাপট এবং ইতিহাসচর্চার ধারা **247-256**

একক ৩৩ ❐ মুঘল ভারতে কৃষক বিদ্রোহ

গঠন :

৩৩.০ উদ্দেশ্য

৩৩.১ প্রস্তাবনা

৩৩.২ মুঘল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জায়গীরদার, জমিদার, কৃষকদের ত্রিভুজ কাঠামো

৩৩.৩ মুঘল কৃষি-ব্যবস্থার মধ্যে কৃষক বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান

৩৩.৪ প্রাক্-ঔরঙ্গজেবের সময়ে কৃষি-বিদ্রোহ

৩৩.৫ ঔরঙ্গজেবের সময়ে কৃষি-বিদ্রোহ

৩৩.৫.১ কৃষক বিদ্রোহ ও শ্রেণীবিন্যাস

৩৩.৫.২ কৃষক বিদ্রোহে ধর্মের ভূমিকা

৩৩.৫.৩ মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে কৃষক বিদ্রোহের অবদান

৩৩.৬ সারাংশ

৩৩.৭ অনুশীলনী

৩৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩৩.০ উদ্দেশ্য

মুঘল অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। কৃষি ছিল জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের উপজীবিকা। শোষক ও শোষিতের অর্থনৈতিক সম্পর্কের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল কৃষি। সুতরাং আশা করা যায় এই একক পাঠের পর শিক্ষার্থীরা—

- মুঘল যুগের কৃষি-অর্থনীতিতে গ্রামীণ সমাজের অস্তিত্ব ও স্বরূপ নির্ণয় করতে পারবেন।
- বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থান ও অধিকার বিচার করতে সক্ষম হবেন।
- শ্রেণীগুলির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব জানবার পর কৃষক বিদ্রোহের কারণ আলোচনা করতে পারবেন।
- মুঘল ইতিহাসের পটভূমিতে—কৃষক বিদ্রোহের মূল্যায়ন করবার পর প্রচলিত রক্ষণশীল মতবাদগুলিকে সমালোচনা করতে শিখবেন এবং একই সঙ্গে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করতে সক্ষম হবেন।

৩৩.১ প্রস্তাবনা

সপ্তদশ শতকের শেষে এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথমে মুঘল রাজশক্তির স্তম্ভ মুঘল শাসকশ্রেণীর অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও দ্বন্দ্বগুলি বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠল এবং এদের

মিলিত চাপে সাম্রাজ্যের ভিত দুর্বল ও প্রায় অচল হয়ে এসেছিল। ঠিক সেই সময়ই মুঘল রাষ্ট্রকে আর একটি বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা হল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে মুঘল কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে পৌনঃপুনিক কৃষক বিদ্রোহ। কর ব্যবস্থার মাধ্যমে উদ্বৃত্ত কৃষিজাত পণ্যকে আত্মসাৎ করার প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছিল, যে অর্থ কৃষকের কাছ থেকে তারা গ্রহণ করছিলেন তার কোনোকিছুই উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে তারা ফিরিয়ে দেননি; ফলে রাষ্ট্র ও তার ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দাবিকে ভারতীয় সমাজ বিশেষত কৃষিজীবী সমাজ ও তার নেতৃবৃন্দ কোনোদিনই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। মুঘল আমলের প্রথম দিকে এই বিদ্রোহগুলি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি; কিন্তু সপ্তদশ শতকের শেষ এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথমে একদিকে মুঘল সামরিক শক্তির দুর্বলতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বগুলি যেমন প্রকট হয়ে উঠল তেমনি সেই সঙ্গে বাড়ল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে রাজপুরুষদের শাসন। ফলে বিদ্রোহ ব্যাপক রূপ ধারণ করল এবং তাকে সম্পূর্ণভাবে দমন করবার দক্ষতা আর মুঘল রাজশক্তির ছিল না। তলার দিকের নেতৃত্ব অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও মাঝারি জমিদার শ্রেণী নিজেদের অসন্তোষকে চরিতার্থ করবার জন্যে কৃষক শ্রেণীকে ব্যবহার করত। একদিকে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা ও অন্যদিকে জনসমর্থনপুষ্ট আঞ্চলিক শক্তির উত্থান—এই দুই-এর চাপে মুঘল সাম্রাজ্য আর বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। কৃষক বিদ্রোহের ফলে অষ্টাদশ শতকের মুঘল রাষ্ট্রের অবক্ষয় এবং তার ফলে নানা বিপর্যয় বোধহয় কোনো অবাস্তব ঘটনা নয়।

মুঘল যুগে কৃষক বিদ্রোহ নানা ঐতিহাসিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ইরফান হাবিবের তত্ত্ব অনুসারে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার সঙ্কট, অত্যধিক শোষণ এবং তার ফলে জমিদার ও কৃষকদের প্রতিরোধ আন্দোলনই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ। এই ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্বন্ধে বর্তমানে কিছু গবেষক সন্দিহান কারণ তার উপস্থাপনার যুক্তি-বিন্যাস পুরনো ধাঁচের; নতুন তথ্যপুঞ্জের বিশেষ কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, অপরদিকে আন্দ্রে উইংক ও বেইলি ঔপনিবেশিকতার দেশজ ভিত্তি খোঁজ করছেন। আর. পি. রাণার গবেষণায় দেখা যায় যে, কৃষক বিদ্রোহের রকমফের আছে। স্থানীয় দ্বন্দ্ব ও পরিস্থিতি এলাকাভিত্তিক প্রতিরোধ আন্দোলনের চরিত্র নির্ধারণ করেছে। বিদ্রোহের এই বৈচিত্র্য হাবিবের একমাত্রিক ছকে ধরা পড়ে না।

৩৩.২ মুঘল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জায়গীরদার, জমিদার, কৃষকের ত্রিভুজ কাঠামো

মুঘল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জায়গীরদারি প্রথার মাধ্যমে সম্রাট ও তার পারিষদবর্গ নিজেরাই এক বিরাট শোষক শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিলেন। মনসবদারেরা খুব কম সময়ই নগদ অর্থে বেতন পেতেন, অধিকাংশ সময় সরাসরি বেতনের পরিবর্তে সাম্রাজ্যের একটি অংশের রাজস্ব তাদের মধ্যে বণ্টন করা হত, জায়গীরের মধ্যে দুটি ভাগ ছিল "তনখা জায়গীর" ও "ওয়াতন জায়গীর"। বেতনের পরিবর্তে যে জায়গীর দেওয়া হত তাকে বলা হত "তনখা জায়গীর"। যেসব জায়গীরদার তাদের রাজস্বের অংশ নিজের রাজ্য থেকে ভোগ করতেন এবং সেই আয় উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগ করতে পারতেন, তাদের বলা হত "ওয়াতন জায়গীর"। এই জায়গীরদাররা মুঘল আমলের আগে থেকেই ছিলেন এবং আকবরের সময় থেকেই এরা মুঘল শাসনাধীনে ছিলেন। এদের রাজ্যগুলি স্বয়ংশাসিত ছিল। "ওয়াতন জায়গীর" বংশানুক্রমিক ভোগ করা চলত এবং সেখানে

কোনো বদলি ছিল না। এইসব সুবিধার জন্যে পরবর্তীকালে বহু জায়গীরদার তাদের "তনখা জায়গীর"কে "ওয়াতন জায়গীরে" রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করতেন।

জায়গীরদারদের প্রধান সমস্যা ছিল সম্ভাব্য রাজস্বের পরিমাণ (জমা) থেকে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণের (হাসিল) পার্থক্য। এই পার্থক্যের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং শাসক শ্রেণীর অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই ব্যবস্থার বাইরে অন্য কোনোভাবে অর্থ সংগ্রহ তাদের অধিকার ছিল না; এইভাবে জায়গীরদারেরা মুঘল শাসনব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। "আভিজাত্য" এবং "তরবারী" এই দুই নীতির উপর ভিত্তি করে মুঘল সামন্তশ্রেণী গঠিত হত। এই দুই নীতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাই ছিল মুঘল সম্রাটদের কাজ এবং এই ভারসাম্য বিনষ্ট হলেই—সামন্তশ্রেণী একটি রাজনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হত।

কৃষির অতিরিক্ত সম্পদ আহরণে জায়গীরদারির মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতেন। রাজস্বের পাঁচভাগের ৪ (চার) ভাগই জায়গীরদাররা পেতেন। গবেষণায় দেখা গেছে, শাহজাহানের রাজত্বকালে মনসবদারদের শতকরা ৫.৬ ভাগ সমস্ত রাজস্বের শতকরা ৬১.৫ ভাগের অধিকারী ছিলেন। প্রায় ৪৫০ জন লোক গোটা সাম্রাজ্যের পাঁচ ভাগের ৩ (তিন) ভাগ রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ করত। সম্পদের এই প্রচণ্ড কেন্দ্রীকরণ মনসবদারদের মধ্যে দ্বন্দ্বকে তীব্র করছিল। "ডামা" ও "হাসিলের" পার্থক্য হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্র সমস্ত কৃষিসম্পদের এক-চতুর্থাংশ ভোগ করত। সমসাময়িক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে, কৃষি-অর্থনীতিতে রাজস্বের বিপুল চাপ বর্তমান ছিল। কৃষক তার জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা কিছু উৎপন্ন করত, তার সবকিছুই রাষ্ট্র করায়ত্ত করত। আকবরের সময় কৃষকদের প্রকৃতপক্ষে এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে অনেক বেশি রাজস্ব দিতে হত। কারণ শস্য কাটার সময়ে বাজারে বেশি শস্য আমদানির জন্যে বাজারে শস্যের দাম কম থাকত। আওরঙ্গজেবের সময়ে সরাসরিভাবে স্বীকার করাই হল যে রাজস্বের পরিমাণ শস্য উৎপাদনের গড়পড়তা হারের অর্ধেকের কম হবে না। এর সঙ্গে যদি "জিজিয়া" ইত্যাদি আইনসংগত কর এবং জায়গীরদার ও রাজস্ব কর্মচারীদের বে-আইনী অথচ নির্দিষ্ট ধার্যের কথা ভাবা যায়, তাহলে কৃষি-অর্থনীতিতে উদ্বৃত্ত উৎপাদন কীভাবে রাজস্বের মাধ্যমে একটি ক্ষুদ্র সামন্তশ্রেণীর মধ্যে বণ্টিত হত তার ধারণা করা যেতে পারে। সম্রাট সমেত বিভিন্ন জায়গীরদারেরা উদ্বৃত্ত উৎপাদনের এক বিপুল অংশ নিজেরা ভোগ করত এরা একটি পরশ্রমজীবী শ্রেণী মাত্র ছিলেন। এদের অবস্থান থেকে মুঘল কৃষি-অর্থনীতিতে শোষণের তীব্রতা ও চাপ সহজেই অনুমান করা যায়।

জায়গীরদার এবং কৃষকের মধ্যবর্তী শ্রেণী হল জমিদার। এই শ্রেণীটি কৃষকের থেকে স্বতন্ত্র এবং কৃষকদের উপরেই তাদের বিশেষ দাবিগুলি প্রয়োগ করে জমিদার জমি বংশানুক্রমিক স্বত্বে ভোগ করতেন। এবং জমির উৎপন্ন সম্পদে তাদের নিজের বিশেষ অধিকার প্রয়োগ করতেন। জায়গীরদারদের মতো জমিদারদের সম্রাট নিজের ইচ্ছামত স্থানান্তরিত করতে পারতেন না। জমিদারেরা কৃষকের উৎপাদনের একটি অংশের দাবিদার—এই দেয় অংশটি রাজস্ব থেকে পৃথক, জমির উপর জমিদারদের দাবি মুঘল রাষ্ট্রব্যবস্থা স্বীকার করে নিয়েছিল।

অন্যদিকে তারাই ছিল রাষ্ট্রের সঙ্গে কৃষকের যোগাযোগ রক্ষার অন্যতম প্রধান সূত্র। এই যৌথ অধিকার জমিদারকে কৃষক এবং জায়গীরদারের থেকে পৃথক করে তুলেছে। উদ্বৃত্ত সম্পদে জমিদারের ভাগ প্রচলিত রাজস্বের দাবির চেয়ে অনেক কম। কিন্তু জমিদার তার গ্রামের কৃষকের জমির মালিক নয়। জমিদার বিদ্রোহী না হলে তার অঞ্চলে মোটামুটিভাবে স্বায়ত্তশাসনের অধিগার দেওয়া হত। জমিদারকে দেখতে হত তার এলাকায় কোনো অনাবাদী জমি পড়ে আছে কি না, অনাবাদী জমিকে আবাদযোগ্য করে তোলার দায়িত্ব তার। দ্বিতীয়ত, এলাকার আইনশৃঙ্খলার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাকে বহন করতে হত। তৃতীয়ত, স্বায়ত্বশাসনের অধিকার থাকলেও মুঘল জমিদাররা যা খুশি তাই করতে পারতেন না। উদ্বৃত্ত সম্পদ জমিদারদের অধিকার আইন ও প্রথা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ছিল। বৃহৎ জমিদারদের মুঘল সম্রাটরা "মনসব" ও "জায়গীরের" মাধ্যমে মুঘল রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্তর্গত করতে চাইতেন। নিজেদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তারা স্বাধীন ছিলেন। আইনশৃঙ্খলা বজায় রেখে, মুঘল শাসনের কাছে আনুগত্য স্বীকার করলে তাদের "ওয়াতন জায়গীরের" উদ্বৃত্ত সম্পদ ভোগদখলের নিরঙ্কুশ অধিকার ছিল। মধ্যবর্তী শ্রেণীর জমিদারেরা রাজস্ব সংগ্রহে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় রাষ্ট্রকে সাহায্য করত এবং তার ফলে তারা নানারকম সুযোগ-সুবিধা পেত এবং উদ্বৃত্ত সম্পদের একাংশ ভোগ করত। মধ্যবর্তী স্তরের জমিদারদের নিচে থাকত—"মাল গুজারি" জমিদারেরা। এদের মাধ্যমে কৃষকদের উপর রাজস্ব ধার্য হত। নিজেদের স্বত্বের পরিবর্তে রাজস্বের একটা অংশ তারা ভোগ করত। জমিদার শ্রেণী সশস্ত্র ক্ষমতার অধিকারী ছিল। নিজেদের জাতি বন্ধনের মাধ্যমে তারা সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতেন। দ্বিতীয়ত, জমিদারদের বিশিষ্ট ক্ষমতার উৎস স্থানীয় সার্বিক নয়। তৃতীয়ত, জায়গীরদারদের মতো জমিদারেরাও নিশ্চিন্তভাবে একটি শোষক শ্রেণী। উদ্বৃত্ত সম্পদের একাংশ তারা ভোগদখল করতেন; কিন্তু সম্পদের অধিকাংশই আদায় করত রাষ্ট্র। এইজন্যেই জমিদারের সঙ্গে রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংঘর্ষ লেগে থাকত।

কৃষক : মুঘল সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তিভূমি ছিল কৃষক। তাদের অধিকার আর কর্তব্যের সীমা নির্ধারণ করা নিয়ে মুঘল শাসকদের চিন্তার অন্ত ছিল না। জমির উপর কৃষকের ভোগদখল ও অধিকার স্বত্বকে মুঘলরা মেনে নিয়েছিলেন। এই স্বত্বকে হস্তক্ষেপ করবার অধিকার জমিদারদের ছিল না, অপরপক্ষে জমি ছেড়ে চলে যাবার বা জমি হাতবদল করবার অধিকার কৃষকের বিশেষ ছিল না। রাষ্ট্রের সমস্ত কর্ষণযোগ্য জমি যাতে উপযুক্তভাবে চাষ হয় সেদিকে মুঘল শাসকেরা বিশেষ সতর্ক ছিলেন। তাই অনাবাদী জমিকে চাষের আওতায় আনলে অথবা জমিতে সেচের ব্যবস্থা করলে রাষ্ট্রের তরফ থেকে রাজস্বের পরিমাণ কম করা হত। বীজধান, গোরু কেনার জন্য রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের কাছ থেকে ধার পাওয়া মুঘল কৃষকদের অন্যতম অধিকার ছিল। এছাড়া দুর্ভিক্ষের সময় কৃষকের দেয় রাজস্বের থেকে ছাড় দেওয়া হত। কৃষকদের প্রধান কর্তব্য ছিল—(এক) আপন আপন জমিতে চাষ করা; (দুই) সময়মতো ধার্য রাজস্ব পরিশোধ করা (তিন) কোনো অঞ্চলে চুরি, ডাকাতি ইত্যাদির দ্বারা রাষ্ট্রের ক্ষতি হলে স্থানীয় কৃষকদের উপর ক্ষতিপূরণ করবার দায় বর্তাত।

অগণিত কৃষককুলের মধ্যে বিভিন্ন স্তরবিন্যাস ছিল। কৃষকদের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য স্তর হচ্ছে খুদ-কশথ্-রাইয়ৎ' এরা (এক) নিজেদের জমি নিজেরা চাষ করতেন; (দুই) উৎপাদনের উপাদানের মালিকানাও তার নিজের ছিল; (তিন) নিজেদের গ্রামে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন; (চার) নিজের জমি বিক্রি ও হস্তান্তর করবার অধিকার এদের ছিল, যদিও সে অধিকারের প্রয়োগ দুর্লভ; (পাঁচ) ঠিকমত রাজস্ব পরিশোধ

করলে তাকে জমি থেকে বিচ্যুত করা যেত না। একথা খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে "খুদ্-কশথ্" রায়তদের অবস্থা অন্যান্য কৃষকশ্রেণীর চেয়ে ভালো ছিল।

কৃষকদের মধ্যে দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে "পাহি-কশথ্" এরা নিজেদের গ্রাম ছাড়াও অন্য জমিদারের আওতায় অন্য গ্রামে কৃষিকার্যের জন্য নিয়োজিত হত। এদের মধ্যে একদলের উৎপাদনের উপকরণ ছিল না। এদের উপর রাজস্ব ধার্য করা হত উৎপন্ন ফসলের ভাগ হিসাবে। পাহি কৃষকেরা সীমিতভাবে হলেও এক স্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়ে চাষ করতে পারতেন; কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজের শ্রমশক্তি ব্যবহারের বিনিময়ে জমির উপর একজাতীয় অধিকার লাভ করতেন, এই কৃষকেরা সম্পূর্ণভাবে জমির সঙ্গে বাঁধা ছিল না। কিন্তু কৃষি থেকে বাণিজ্য বা অন্য কোনো বৃত্তিতে যাবার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এছাড়াও অনাবাদী জমিকে আবাদী করবার সময় এদের সাহায্য নেওয়া হত। প্রচুর জমি থাকলে পাহি-কশথ "সহজেই নিজেদের খুদ-কশথে" রূপান্তরিত করতে পারতেন। অপরদিকে জমির উপর চাপ বাড়লে পাহিদের অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়তে হত।

তৃতীয় ধরনের কৃষকদের "মুজারিয়ান" বলে উল্লেখ করা হ'ত; জমির উপর ছিল এদের সাময়িক অধিকার অস্থায়ীভাবে কয়েক বছরের জন্য উচ্চতর কৃষকগোষ্ঠীর কাছ থেকে জমি পেত এবং জমির উপর এদের কোনোরূপ "স্বত্ব" জন্মাত না। যদিও কোনো কোনো দলিলে বংশানুক্রমিকভাবে "মুজারিয়ানদের" উল্লেখ আছে। কিন্তু তারা ইচ্ছেমত নিজের কর্ষিত জমিতে কাউকে বসাতে পারত না বা জমিচাষের ভার অন্য কাউকে দিতে পারত না।

চতুর্থ শ্রেণীর কৃষক হচ্ছে ভূমিহীন চাষীরা। নিম্নবর্ণের লোকেরা যেমন চামার, ধানুকী ইত্যাদিরা নিজেদের জীবিকা থেকে সংবৎসরের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারতেন না; তখন মরসুমের সময়ে বিকল্প হিসাবে কৃষির কাজ করতেন এবং দৈনিক ভিত্তিতে কিছু পেতেন, এইসব চাষীদের জমির উপর কোনো স্বত্বই ছিল না, দ্বিতীয়ত, এরাই একমাত্র শ্রেণী—যারা কৃষি ছাড়াও অন্যান্য বৃত্তি থেকে জীবিকা অর্জন করতে পারতেন।

মুঘল আমলে প্রাপ্ত বিভিন্ন দলিল থেকে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের খণ্ডিত ছবি পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ধরনের অধিকারের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব থাকাই খুব স্বাভাবিক। শান্ত নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তে এক দ্বন্দ্ব-বিজড়িত কৃষি সমাজকে অনুভব করা যায়।

৩৩.৩ মুঘল কৃষিব্যবস্থার মধ্যে কৃষক বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান

কৃষকের শ্রমশক্তির উদ্বৃত্তকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে মুঘল শাসক শ্রেণী তাদের বিশাল ঐশ্বর্য গড়ে তুলেছিল। খাজনা পরিশোধের মাধ্যমেই কৃষকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যেত না; খাজনার পরেও কৃষককে "আবওয়াব" বা অতিরিক্ত রাজস্ব পরিশোধ করতে হত। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে অগ্রাহ্য করে "আবওয়াব" আদায় করা হত। কিন্তু সম্রাটের হাতে কোনো উপায় ছিল না যে যার দ্বারা তিনি এগুলিকে বন্ধ করতে পারেন, সময়ের সঙ্গে আবওয়াবের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে কৃষকের কাছে রাষ্ট্রের চাহিদা বাড়তে থাকে এবং কৃষক ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে চাষ করা পরিত্যাগ করে; কারণ চাষ করা আর তার পক্ষে লাভজনক নয়। মুঘল

সম্রাটরা জানতেন যে, রাষ্ট্রের অতিরিক্ত দাবি কৃষকের জীবনযাত্রার মানকে বিপর্যস্ত করে, জমির উৎপাদিকা শক্তি ব্যাহত হয়, এবং এর ফলে ভবিষ্যতে কৃষক বিদ্রোহের সম্ভাবনা থাকে। জাহাঙ্গীর থেকে ঔরঙ্গজেব সমস্ত সম্রাট পুনঃপুনঃ তাদের ফারমানে রাজকর্মচারীদের প্রজাপীড়ন থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে সম্রাটের স্বার্থের সঙ্গে জায়গীরদারের ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। জায়গীরদারদের জমির উপর কোনো স্বত্ব নেই এবং জায়গীর থেকে যেকোনো সময় বদলি করা হতে পারে; এই অবস্থায় দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করার কথা সে কখনোই চিন্তা করে না, বরঞ্চ সাময়িকভাবে যতটা সম্পদ লুণ্ঠন করা সম্ভব তা করার পর এলাকায় চিরস্থায়ী ক্ষত রেখে যায়।

অবাধ্য জায়গীরদারকে শাস্তি দেবার জন্যে মুঘল সম্রাটরা নানা ব্যবস্থা নিতেন। অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত কর্মচারীকে হয় বদলি নয় বরখাস্ত করা হত। কৃষকের সামর্থ্য ও জায়গীরদারের দাবি উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই ছিল সম্রাটের উদ্দেশ্য। কিন্তু মুঘল রাষ্ট্রব্যবস্থায় নানা অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্যে এই ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং কৃষকের অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠেছিল।

অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের প্রবণতা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায়। গ্রামীণ শিল্পীরা ইতিপূর্বে আবওয়াব দেওয়া থেকে ছাড় পেতেন, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশের দশক থেকে তাদেরও আবওয়াবের আওতায় নিয়ে আসা হয়। বাংলাদেশে প্রচলিত ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে মুঘল শাসকেরা মাপজোখ ও উৎপন্ন ফসলের ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণ করতে শুরু করেন। এই ব্যবস্থা বাংলাদেশের কৃষিসমাজের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মুর্শিদকুলির ব্যবস্থা শাসনব্যবস্থার কাঠামোকে সুদৃঢ় করে এবং অন্যদিক থেকে কৃষি সমাজের উপর চাপ বাড়ায় এবং কৃষির উদ্বৃত্তকে রাষ্ট্র আরো নিপুণভাবে আত্মসাৎ করে। এই সময় কৃষি-অর্থনীতিতে এক সঙ্কট দেখা দিয়েছিল এবং রাজস্বের লোকসান পূরণের জন্যে অতিরিক্ত কর ধার্য করা হয় এবং তা আদায়ের চাপ আরও বেশি বাড়ে।

পূর্বেকার ঐতিহাসিকেরা মুঘল যুগের এই সঙ্কটকে রাজনৈতিকভাবে ব্যাখ্যা করতেন এবং সমস্ত দায়িত্ব আওরঙ্গজেব এবং তার অনুদার ধর্মনীতি এবং রাজপুত নীতির উপর চাপিয়ে দিতেন। তারা মনে করতেন যে, রাজনৈতিক সমস্যা অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। দুর্বল অনুদার, স্বার্থপর শাসকশ্রেণী সঙ্কট মোচন করা দূরে থাকুক বৈরীমূলক অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারা সঙ্কটকে আরও তীব্র করে তুলেছিলেন। কিন্তু আধুনিক কালের ঐতিহাসিকরা সঙ্কটের মধ্যে একটা ইতিবাচক দিক খুঁজে পেয়েছেন। প্রথমত, আভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্ব এত তীব্র হয়ে ওঠে যে পুরাতন কায়দায় শাসন করা আর চলে না। এইজন্যেই বোধহয় জায়গীরদারি প্রথা থেকে ইজারাদারি প্রথার জন্ম হয়। দ্বিতীয়ত, কৃষক শ্রেণী ক্রমাগত শোষিত হবার ফলে যখন তারা তাদের শোষণ সম্পর্কে সচেতন হয়, তখন তারা হয় নিচ নেতৃত্বে অথবা মধ্যবর্তী প্রাথমিক জমিদারদের নেতৃত্বে বিদ্রোহে শামিল হয়।

কৃষিকার্যে রত থেকে জমিদারের সম্পদ বৃদ্ধি করা ছাড়াও প্রয়োজনমত কৃষকেরা জমিদারের সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দিত। সুশিক্ষিত মুঘল অশ্বারোহী বাহিনীর কাছে তাদের কোনো গুরুত্ব ছিল না। মুঘল শাসক কর্তৃপক্ষের শত বাধা এবং গোপনীয়তা সত্ত্বেও গ্রামীণ কর্মকারদের কাছে বন্দুক তৈরি করার কৃৎকৌশল পৌঁছে যায়। এর পরেই মুঘল সৈন্যবাহিনী আর অপ্রতিরোধ্য থাকে না। জমিদারদের যুদ্ধ এখন থেকে আত্মরক্ষামূলক

না হয়ে আক্রমণাত্মক যুদ্ধে পরিণত হয়। মারাঠা ও জাঠ বিদ্রোহে কৃষকদের যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী জমিদার।

মুঘল কৃষিব্যবস্থা থেকে উদ্বৃত্ত সামাজিক সম্পদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সম্পদের অসম বণ্টন এবং মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারা অনুৎপাদকভাবে এই সম্পদের ভোগ। যারা তুলনামূলকভাবে বঞ্চিত তাদের একটি স্থায়ী ক্ষোভের অবকাশ সবসময়েই থাকত। জায়গীরদারি সঙ্কট সুপ্ত ক্ষোভ ও আভ্যন্তরীণ সঙ্কটকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়। কৃষিভিত্তিক উৎপাদনের স্থিতাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শাসকগোষ্ঠীর সম্প্রসারণ উৎপাদন ব্যবস্থায় কৃষকদের উপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করল। এই চাপের ফলে কৃষকেরা তাদের ন্যূনতম জীবনযাত্রা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছিল। জায়গীরদারি ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জায়গীরদাররা নানারকম চাপ সৃষ্টি করে রাজস্ব আদায় শুরু করেছিলেন। শুরু হয়েছিল এক অসহনীয় নির্মম অত্যাচার, যেখানে সমস্ত কিছু এমনকি নিজের স্ত্রী, পুত্র বিক্রি করেও তার রেহাই থাকত না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, ফলস্বরূপ কৃষি-উৎপাদনের অধোগতি লক্ষ্য করা যায় এবং জমি থেকে পলাতক কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সমৃদ্ধ জনবসতিপূর্ণ গ্রাম ঘন জঙ্গলে পরিণত হয়।

সপ্তদশ শতকের শেষ ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে রাজস্বের দাবি যে উত্তরোত্তর বেড়েছিল তার একটি কারণ হল ইজারাদারি ব্যবস্থার প্রচলন। জায়গীরদারেরা প্রায়ই তাদের জায়গীর থেকে নির্দিষ্ট রাজস্ব আদায় করতে পারতেন না বলে একটি নির্দিষ্ট বার্ষিক আয়ের পরিবর্তে রাজস্ব আদায় করবার ভার আর একদল লোকের হাতে ছেড়ে দিতেন যাদের বলা হত ইজারাদার। জমির উপর স্থায়ী কোনো স্বার্থ নেই এই ধরনের নানা লোকেরা ইজারাদার হতেন। শুরু হল এক কৃত্রিম প্রতিযোগিতা। এর ফলে "জমা"র পরিমাণ বাড়ল কিন্তু কৃষি উৎপাদন বাড়ল না। ইজারাদাররা লগ্নীকৃত টাকা এবং লাভের আশায় যথেচ্ছভাবে রাজস্ব আদায় শুরু করলেন। কৃষকের রাজস্ব দেবার ক্ষমতা এবং ইজারাদারের দাবি এই দুই-এর ভারসাম্য নষ্ট হল। ফারুকশিয়ারের আমলে 'খালিসা' জমিও ইজারাদারের হাতে চলে গেলে অবস্থা চরমে এসে পৌঁছল। বোঝা গেল যে, এতদিনের মুঘল ব্যবস্থার প্রচলিত শোষণযন্ত্রের ভারসাম্য চিরতরে বিনষ্ট হতে চলেছে। সমসাময়িক গ্রন্থ **রিসালা-ই-জিরায়তে** স্পষ্ট করে বলা হল যে, "রাজস্ব সংগ্রহে কঠোরতার জন্যে রায়তরা পালাল, পরগনা জনশূন্য হল এবং জমিদার ধ্বংস হল।"

জায়গীরদারদের দাবি সম্পূর্ণ মিটিয়ে দেবার পর জমিদারদের নিজের দাবিতে টান পড়তে থাকে, তখন তারা অনেক ক্ষেত্রেই কৃষকদের অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে মুঘল শক্তিকে বাধা দিতে শুরু করলেন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্বলতার জন্যে মুঘল রাজশক্তি জমিদারদের বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমন করতে পারেনি। জমিদারদের বিদ্রোহকে দলভারী করত কৃষকসমাজ, কারণ বর্ণ ও গোষ্ঠীর দিক দিয়ে দেখলে জমিদার তাদের অনেক কাছের লোক।

শোষণ ও অত্যাচার কৃষকদের বিদ্রোহের পথে ঠেলে দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। প্রতিরোধের প্রথম অবস্থা ছিল চাষবাস ত্যাগ করে অন্য জায়গায় চলে যাওয়া, ব্যাপকভাবে স্থানান্তরে যাওয়া কৃষকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার প্রাথমিক অস্ত্র।

সশস্ত্র বিদ্রোহ কৃষকদের দ্বিতীয় ও শেষ পর্যায়ের অস্ত্র ছিল। মুঘল কর্তৃপক্ষ গ্রামগুলিকে দুভাগে ভাগ করতেন (ক) রাগতি বা শাসত এবং (খ) মেওয়াসি বা বিদ্রোহী। **আইন-ই-আকবরী**তে বিভিন্ন জায়গায় কৃষকদের প্রতিবাদী মনোভাবের কথা বলা হয়েছে। এর থেকে মনে হয় কৃষি ও কৃষক বিদ্রোহ মুঘল আমলের শুরু থেকেই বর্তমান। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল থেকে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল। অষ্টাদশ শতকে শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধি ওয়ালিউল্লা লিখলেন—"কৃষক, বণিক ও কারিগরের উপর প্রচণ্ড কর চাপানো হচ্ছে এবং অত্যাচার করা হচ্ছে। ফলে যারা ভীরু তারা পালাচ্ছে আর যারা শক্তিশালী তারা বিদ্রোহ করেছে। একমাত্র করভার কমালেই দেশে শান্তি ফিরে পাওয়া যাবে।"

জাট, রকালি, মারাঠা ও শিখ বিদ্রোহের প্রধান শক্তি ছিল অত্যাচারিত কৃষক সম্প্রদায়।

৩৩.৪ প্রাক্-ঔরঙ্গজেবের সময়ে কৃষি-বিদ্রোহ

মুঘল সাম্রাজ্যবাদের বিস্তৃতি ভারতীয় কৃষিজীবী সমাজকে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত হেনেছিল। সাম্রাজ্য যতই অগ্রসর হচ্ছিল তত কৃষিজীবী সমাজের উপর রাজস্বের দাবি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে প্রজা-বিদ্রোহের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। যদিও বিদ্রোহের কারণকে তিনি অতিসরলীকৃত করেছেন। তাঁর মতে, হিন্দুস্তানের ঘন বনজঙ্গল প্রজাদের বিদ্রোহে প্ররোচিত করে থাকে।

আকবরের সময় মুঘল সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষের চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। ফলে প্রজা-বিদ্রোহের ঘটনাও বাড়তে থাকে। সাম্প্রতিক গবেষণায় আকবরের সময়কালে প্রায় ১০৮টি প্রজাবিদ্রোহের ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায়; তবে এদের মধ্যে বিশুদ্ধ কৃষক বিদ্রোহ এবং রাজনৈতিক প্রতিরোধ উভয় ঘটনা মিলেমিশে রয়েছে। ১৫৭২ ও ১৫৭৭ সালে আগ্রার কৃষকরা হাঙ্গামা করে। ১৫৬২ সালে আগ্রার কাছে সাকেৎ গ্রামের কৃষকরা রাজশক্তিকে অস্বীকার করে। আকবর নিজে এই বিদ্রোহীদের দমন করেন। অবিরত বিদ্রোহপরায়ণ এই কৃষককুলকে দমন করার জন্যে আগ্রায় দুর্গ নির্মাণ করতে হয়। কাশ্মীরে মুঘল অধিকারের অনতিবিলম্বকাল পরেই জনবিক্ষোভ দেখা যায়। মুঘল শাসকদের রাজস্ব বৃদ্ধির দাবি কাশ্মীরের জনগণের প্রচণ্ড অসুবিধার সৃষ্টি করে। আকবরের কাশ্মীরে উপস্থিতির সময় এই বিক্ষোভ ফেটে পড়ে। অবশেষে বিক্ষুব্ধ কাশ্মীরবাসীর দাবির সঙ্গে রাজকীয় দাবির কিছু আপস করে নিতে হয়। এই বিদ্রোহে একাধারে রাজস্বের হারের তীব্রতা এবং অন্যদিকে সীমান্ত অঞ্চলের রাজাকে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অঙ্গীভূত করার সমস্যা—দুটোই কাজ করছিল।

জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনী "তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরী"তে বিভিন্ন প্রসঙ্গে কৃষক বিদ্রোহের কথা আলোচনা করেছেন। ১৬১০ সনে আগ্রায়, ১৬২২ সনে থাট্টায়, ১৬১১ সনে কনৌজ ও কালপিতে কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছিল। ১৬১০ সনে কুতুব খান নামে দরবেশের পোশাকধারী এক ব্যক্তি পাটনা শহরের নিচুতলার লোক নিয়ে বিদ্রোহ করে। প্রত্যেকটি বিদ্রোহকে মুঘল সামরিক শক্তি নির্মমভাবে দমন করে। যেহেতু বিদ্রোহীরা রাজশক্তিকে কোন আঘাত করতে পারেনি; জাহাঙ্গীর এইসব বিদ্রোহকে কোন গুরুত্ব দেননি; প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছেন মাত্র কিন্তু মনে হয় এইসব বিদ্রোহ নিত্যকার ব্যাপার ছিল।

জাহাঙ্গীরের আমলে কোন এক সেনানায়কের প্রতিবেদনে কৃষক বিদ্রোহের প্রতি মুঘল রাজশক্তির প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট অনুভব করা যায়। বিদ্রোহ, বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ ও তার মোকাবিলায় মুঘল সৈন্যের ব্যবহার

এই চিঠিতে বিশদভাবে লেখা রয়েছে। জাহাঙ্গীর তার আত্মজীবনীতে অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। অত্যন্ত সহজভাবে বিদ্রোহীদের হত্যা করা, তাদের স্ত্রী-পুত্রদের দাসে পরিণত করা, বিজয়ী সৈন্যদের লুঠের মাল ভাগ করে নেওয়া ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে। এই সময়ে মুঘলরা গোটা পূর্বভারত জুড়ে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করছিল এবং সমগ্র কুচবিহার ও আসাম সীমান্ত জুড়ে তাদের নানারকম কৃষক বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে পাইক সর্দার সনাতনের নেতৃত্বে খুন্তাঘাট বিদ্রোহ এবং হাতিখেদা আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই দুই বিদ্রোহই দমন করেছিল মীর্জা নাথানের নেতৃত্বে এক বিশাল মুঘলবাহিনী। কৃষকরাই ছিল এই বিদ্রোহগুলির নেতা। আবার জমিদারদের বিদ্রোহেরও বহু নিদর্শন পাওয়া যাবে। ১৬১৮ সালে শোভাস কুলি নামে এক রাজপুরুষ বিদ্রোহ করে এবং তাকে সাহায্য করেছিল কৃষকরা। ১৬২০ সনে কিসওয়াব অঞ্চলে জমিদার ও কৃষকদের আর একটি বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। "পেশাকশী" জমিদারদের বিদ্রোহের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল শাহজাহানের আমলে বুন্দেলাদের বিদ্রোহ। আবার উপজাতীয় এবং প্রতিবাদীয় ধর্মীয় আন্দোলনের দৃষ্টান্তও খুঁজে পাওয়া যায়। আকবরের আমলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফ্রিদি, ইউসুফজাই প্রভৃতি পাঠান উপজাতিদের মধ্যে "রোশনিয়া" আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যায়। প্রাক্-ঔরঙ্গজেবের সময়ে এই সমস্ত বিদ্রোহগুলির কথা স্মরণ রাখলে একটি ব্যাপার সম্যকভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, তা হল অষ্টাদশ শতকের কৃষক আন্দোলন পূর্ব যুগের ঐতিহ্য অনুসারে পরিচালিত হয়েছিল, শুধুমাত্র পরিস্থিতির পরিবর্তনে এর তীব্রতা এবং ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সাম্প্রতিক গবেষণা অনুসারে, প্রাক্-ঔরঙ্গজেব আমলের প্রতিরোধ আন্দোলনগুলির কয়েকটি সুস্পষ্ট রূপ ছিল, যেমন বিশুদ্ধ কৃষক বিদ্রোহ, বিশুদ্ধ সামন্ত বিদ্রোহ এবং উপজাতিদের বিদ্রোহ—এসবের মধ্যে প্রতিবাদী আন্দোলন এবং সামাজিক মর্যাদার প্রশ্ন নানাভাবে জড়িত ছিল। এই সমস্ত রূপই অওরঙ্গজেবের ও তৎপরবর্তী যুগের প্রতিরোধ আন্দোলনগুলির মধ্যে আমরা দেখতে পাই।

৩৩.৫ ঔরঙ্গজেবের সময়ে কৃষক বিদ্রোহ

ঔরঙ্গজেবের সময়ে ব্যাপকভাবে কৃষক বিদ্রোহ দেখা যায় এবং এরা অনেক ক্ষেত্রে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ডেকে এনেছিল। আগে প্রথিতযশা ঐতিহাসিকেরা ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতির প্রতিক্রিয়ার উত্তরে "হিন্দুদের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া" বলে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকেরা এই মন্তব্যকে অস্বীকার করেছেন কারণ তাঁদের মতে, সমসাময়িক তথ্য বিদ্রোহের কারণ হিসাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিক্ষোভের দিকে নির্দেশ করে—ধর্মীয় দিকে নয়। বিদ্রোহের চরিত্র এবং শাসকদলের আচরণ বাস্তব পরিস্থিতি ও প্রশাসনিক প্রয়োজন নির্ধারিত করেছে, সাম্প্রদায়িকতা নয়।

ঔরঙ্গজেব প্রথম কয়েক বছর শান্তিতে থাকলেও কিছুদিনের মধ্যেই তাকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়। আঞ্চলিকভাবে বিচ্ছিন্ন হলেও মুঘল কেন্দ্রীয় শক্তিকে অস্বীকার করবার প্রবণতা এই সমস্ত বিদ্রোহগুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বিদ্রোহের সংখ্যা এবং ব্যাপ্তি প্রসারিত হ'লে মুঘল রাষ্ট্রের পক্ষে তা দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি করে। এই বিদ্রোহগুলি প্রারম্ভিক সাফল্য মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তির গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং তার অন্তঃসারশূন্যতা ফুটে ওঠে। ফলে সাম্রাজ্যের বনিয়াদ দুর্বল হয়ে পড়ে।

বিদ্রোহগুলি দমন করতে গিয়ে ঔরঙ্গজেব কোনো নতুনত্ব দেখাতে পারেননি। প্রচলিত পথে বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে তাকে রাষ্ট্রের সম্পদের বিনাশ ঘটাতে হয়েছিল কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হয়নি। তার উত্তরসূরীদের আমলে সমস্যার তীব্রতা আরও বেড়েছে ক্রমশ তা সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করেছে।

ঔরঙ্গজেবের সময় কৃষক ও নিম্নবিত্ত কৃষক ও নিম্নবিত্ত লোকেদের যেসব বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তার মধ্যে প্রথম উল্লেখ করা যেতে পারে ১৬৮০-৮৫ সালে গুজরাটের "মাতিয়া" নামক এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ। গুজরাট অঞ্চলে খাদ্যসঙ্কট মূল্যবৃদ্ধির সমস্যাকে যথাযথভাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সমাধান করতে পারেননি। রৌপ্যমুদ্রার অভাব ঘটলে কৃষকের পক্ষে নগদে খাজনা দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে—তা আদায়ের জন্যে অত্যাচার শুরু হয়। অর্থাৎ এই সময় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কারিগর এবং কৃষক—কারো অবস্থাই ভালো ছিল না এবং তারা অন্যায়ের প্রতিকারের আশায় ধর্মীয় নেতৃত্বের অধীনে সমবেত হয় এবং বিক্ষোভটি সরাসরি মুঘল রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। এছাড়াও গুজরাটের কোলি কৃষক সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ ঔরঙ্গজেবের আমলে শুরু হলেও পরবর্তী সম্রাট জাহানদার শাহের আমলে অব্যাহত থাকে। গুজরাট অঞ্চলের আদিম বাসিন্দা হিসাবে জমির উপর তাদের স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত অধিকার তারা হারিয়েছিল। বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে হৃত অধিকার ফিরে পাবার প্রচেষ্টা দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, মুঘল শাসক অর্থাৎ আমিন ও ফৌজদারের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই একথা ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষকে তারা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিল। তৃতীয়ত, এর সঙ্গে জড়িত ছিল সম্প্রদায় হিসাবে বর্ণব্যবস্থায় একটি সম্মানজনক স্থান পাবার চেষ্টা। উত্তর ভারতে (বর্তমান আমেথি অঞ্চলে) কুর্মি কৃষক বিদ্রোহ হয় আনুমানিক ১৬৭০-৮০ সনের মধ্যে। ধর্মীয় পটভূমিতে এই বিদ্রোহ শুরু হলেও জমিদারেরাই ছিল এই আক্রমণের লক্ষ্য। এই বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য ছিল এর অসাম্প্রদায়িক চরিত্র বিদ্রোহীরা প্রতিবেশী মুসলমানদের বিদ্রোহে শামিল হবার আহ্বান জানায়; অপরদিকে মুঘল রাষ্ট্রশক্তি বিধর্মী জমিদারদের পক্ষ নিয়ে স্বধর্মাবলম্বী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যেতে কোন ভাবনাচিন্তা করেননি।

মুঘল আমলে আর একটি বৃহৎ কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছিল সৎনামী সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে। ১৬৭২ সনে "সৎনামী" বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল ছোট ব্যবসায়ী আর গ্রামীণ কারিগরের দল। এই বিদ্রোহ ও পূর্বোক্ত কৃষি-বিদ্রোহগুলির মত ধর্মীয় পটভূমিতে আবৃত ছিল। কিন্তু বিদ্রোহের কারণ ছিল পার্থিব। মুঘল শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধেই প্রাথমিকভাবে এই বিদ্রোহ শুরু হয়। এই বিদ্রোহের তীব্রতা এবং বিদ্রোহীদের বীরত্বের কথা সমসাময়িক বিবরণে লেখা আছে। রাজকীয় সৈন্যরা সৎনামীদের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিল ফলে বিদ্রোহ দ্রুত প্রসারিত হয়। রাজধানীর সন্নিকটে এই বিদ্রোহ দমন করতে ফৌজদার/শিকদাররা ব্যর্থ হলে স্বয়ং ঔরঙ্গজেবকে এই বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হতে হয়।

উপরিউক্ত বিদ্রোহগুলিতে জমিদারদের ভূমিকা স্পষ্ট নয়। এটা সত্য যে, জমিদারেরা ক্ষুদ্র চাষী কারিগরের সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারেনি। কিন্তু সম্মিলিতভাবে কৃষক ও জমিদারদের নেতৃত্বে "জাঠ" বিদ্রোহ গড়ে ওঠে। যমুনা ও আগ্রার মধ্যবর্তী এই "জাঠ" কৃষকদের মুঘল সরকারি ঐতিহাসিকদের বিবরণে "চিরবিদ্রোহী" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সপ্তদশ শতকের বিভিন্ন সময় যেমন ১৬২৩, ১৬৩৪ এবং ১৬৪৫ সনে এরা পুনঃপুনঃ বিদ্রোহ করে। যদিও এইসব বিদ্রোহ অচিরেই দমন করা হয়।

জাঠরা ছিল মুলত একটি কৃষিজীবী শ্রেণী এবং এদের নেতৃবৃন্দ ছিলেন আঞ্চলিক জমিদার। জাতিগত ঐক্য এই দুটি শ্রেণীর মধ্যে একটি সংহতি এনেছিল। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে অর্থাৎ মুঘল শাসকদের অন্যান্য কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ শুরু হয়। ১৬৮৬-৮৮ সনে রাজারাম জাঠ সিনসিনওয়ার কৌমকে নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন এবং কৃষকেরা মুঘল ফৌজদার ও জায়গীরদারদের খাজনা দিতে অস্বীকার করেন। রাজারাম নিহত হলেও চূড়ামনের নেতৃত্বে বিদ্রোহ চলতে থাকে। মূলত জমিদারদের আন্দোলন হলেও কৃষক শ্রেণী ও অন্যান্য নিচু জাতি এই আন্দোলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বর্ণসংহতি, পুরনো গোষ্ঠীকে অবদমিত করে নতুন গোষ্ঠীর উত্থান, আঞ্চলিক কৃষক বিক্ষোভ ইত্যাদি একসঙ্গে একাকার হয়ে জাঠ বিদ্রোহকে একটি জটিল চরিত্র দান করেছে। প্রথমবারের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিতে স্বয়ং সম্রাটকে অগ্রসর হতে হয়েছিল। ১৬৮৬ সালে জাঠেরা দ্বিতীয়বার বিদ্রোহ করলে বচ্ছুয়া নেতা বিষেণ সিং এদের বিরুদ্ধে কিছুটা সফলতা লাভ করেন। তা সত্ত্বেও জাঠ বিদ্রোহকে সম্পূর্ণভাবে দমন করা যায়নি। জাঠ নেতৃত্বের দ্বারা গঠিত ভরতপুর রাজ্যকে পরবর্তীকালে মুঘল রাষ্ট্রশক্তি স্বীকার করে নেয়।

কৃষক ও জমিদারের সম্মিলিত বিদ্রোহের অপর একটি দৃষ্টান্ত হল বাংলাদেশের মেদিনীপুর জেলার শোভা সিংহ-এর বিদ্রোহ। বাগ্‌দি প্রজাদের আনুগত্যের উপর ভিত্তি করে শোভা সিংহ বর্ণব্যবস্থার ওপরে ওঠার চেষ্টা করেছিলেন। কৃষিব্যবস্থাজনিত সংকটের দিনে মধ্যবর্তী স্তরের রাজস্ব সংগ্রহকারী জমিদার বর্ধমানের কৃষ্ণরামের সঙ্গে আঞ্চলিক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জমিদার শোভারামের বিরোধ ঘটে। তার দলে যোগ দেয় বাগ্‌দি কৃষকেরা; মুঘল রাষ্ট্রের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যাদের অনেক বক্তব্য ছিল। পরে পাঠানরাও তার দলে যোগ দেয়। অর্থ সংগ্রহের জন্যে লুঠতরাজ করাকে আন্দোলনকারীরা একটা উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু এর ফলে তারা সমাজের অন্যান্য স্তরের সমর্থন হারিয়ে ফেলেন। উৎসের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হয়। জমিদার ও কৃষকের যৌথ আন্দোলন প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করা সত্ত্বেও ব্যর্থ হল।

উপজাতীয় আন্দোলনের একটি দৃষ্টান্ত হল "ঘটক" নামক আফগান উপজাতির বিদ্রোহ। ১৬৭০ থেকে ১৬৮০ সাল অবধি এরা সক্রিয়ভাবে মুঘল রাজশক্তিকে প্রতিরোধ করেছিল। উদ্বৃত্ত সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে উপজাতি ও মুঘল রাষ্ট্রশক্তির বিরোধ এই আফগান আন্দোলনের অন্যতম একটি কারণ। এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল উপজাতির সম্মানের প্রশ্ন এবং সেই সম্মান রক্ষা করার জন্যে একত্রে লড়াই করবার আবেগময় ইচ্ছা।

সপ্তদশ শতকের শেষ এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে মুঘল সাম্রাজ্য ও মুঘল শাসকশ্রেণীর পক্ষে যেটি সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা হল মারাঠাদের উত্থান। এই ঘটনাটিকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ বলে বিবেচনা করা হয়। শিবাজী প্রথম জীবনে জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। মোরে ওয়াতনদারকে কৌশলে হত্যা করে শিবাজী তার জমিদারি দখল করেছিলেন। শিবাজীর অভ্যুত্থানের সঙ্গে জাতে ওঠা এবং স্থানীয় নতুন জমিদারের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন জড়িত। শিবাজীর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পুরাতন ক্ষমতাশালী ভূমিজ শক্তিকে খর্ব করে নিজের লোকদের প্রতিষ্ঠিত করে ক্ষমতার ভিত্তি তৈরি করা। বিজাপুর সরকার তাকে দমন করতে ব্যর্থ হলে মুঘল রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে তার সংঘাত বাধে, কারণ সাম্রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে এবং পশ্চিম উপকূলের সঙ্গে উত্তর ভারতের

বাণিজ্যপথের ওপর এক নতুন রাজ্য ছিল মুঘল রাষ্ট্রের পরিপন্থী। শিবাজীকে দমন করার জন্য মুঘল সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হল। মুঘল সামরিক মর্যাদা ভয়ঙ্করভাবে ক্ষুণ্ণ হল যখন শায়েস্তা খাঁর মতো সেনাপতিকে পিছু হঠতে হল এবং সমৃদ্ধ সুরাট বন্দর ও শহর লুণ্ঠিত হ'ল। ১৬৬৫ সালে জয়সিংহের সাফল্য মুঘল মর্যাদাকে কিছুটা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হল। ১৬৬৬ সনে মুঘল কারাগার থেকে শিবাজীর পলায়নে মারাঠা সমস্যা সমাধানের সব পথ বন্ধ হয়ে গেল।

সমসাময়িক লেখক ভীমসেনকে অনুকরণ করে অধ্যাপক ইরফান হাবিব মহারাষ্ট্রে মুঘল সৈন্যের পরাজয়ের কারণকে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছেন। ভীমসেনের মতে, দাক্ষিণাত্যের কৃষককুল শিবাজীর উত্থানের বহু পূর্ব থেকেই জমিদার ও জায়গীরদারদের দ্বারা শোষিত হচ্ছিলেন। মুঘল রাষ্ট্রীয় শক্তির ভূমির উপর দাবি যত বেড়ে যাচ্ছিল, ক্ষুদ্র কৃষক এবং অন্যান্যরা আর কোনো পথ না পেয়ে মারাঠাদের দলে যোগ দিচ্ছিলেন। ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেব যখন দ্বিতীয়বারের জন্য দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হয়ে এসেছিলেন, মুঘল শাসকদের অত্যাচারে সমস্ত দক্ষিণ দেশ শ্মশানের আকার ধারণ করেছিল। ১৬৫৮-তে রাজা হবার পূর্বেই দাক্ষিণাত্যের কৃষকেরা শিবাজীকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

মুজাফ্ফর আলমের মতে, মারাঠা আন্দোলনের সাফল্যের পেছনে ছোট-বড় বিভিন্ন শ্রেণীর জমিদারদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মারাঠারা মুঘল শক্তিকে অস্বীকার করার ফলে জমিদার শ্রেণীর একাংশের মধ্যে মুঘল সরকার সম্বন্ধে আর ভীতি থাকে না। দাক্ষিণাত্যের জমিদারেরাও এই সুযোগে মারাঠাদের পক্ষে যোগ দিলেন। কিন্তু মারাঠা শক্তি যখন এইসব জমিদারদের উপর কর্তৃত্ব করতে শুরু করলেন, তারা তখন মুঘল-মারাঠা দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করে নিজেদের ক্ষমতার ভিত গড়ে তোলবার চেষ্টা করেন।

ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে এলে মধ্যবর্তী জমিদারেরা লাভের আশায় মুঘলদের দিকে এল আবার প্রাথমিক স্তরের জমিদারেরা মধ্যবর্তী জমিদারদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে আশঙ্কিত হয়ে মারাঠাদের প্রতি তাদের পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে। বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে উভয় স্তরের জমিদারদের ব্যাপকভাবে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। মুঘলরা ব্যাপক সমর্থন পায় এবং মারাঠারা প্রায় সর্বত্র পরাজিত হয় কিন্তু বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে জায়গীরদারি সঙ্কট চরম পর্যায়ে পৌঁছয়। সকলকে সন্তুষ্ট করা মুঘল রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে আর সম্ভবপর ছিল না। মুঘল শাসনকর্তারা সঙ্কট মোকাবিলা করার জন্যে নতুন করে কর বসাতে শুরু করলেন ফলে উভয় স্তরের জমিদারেরা মুঘলদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং পেশোয়াদের নেতৃত্বে মারাঠাশক্তির পুনরুত্থান হয়। জুলফিকার খান শাহুকে সমর্থন করলে এবং তাকে বৈধ মারাঠারাজা বলে স্বীকার করে নিলে, বহু মারাঠা নেতা সাতারার নেতৃত্বে আবার নতুন করে সংঘবদ্ধ হলেন। ফলে বাহাদুর শাহের রাজত্বকালের চতুর্থ বছরে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে আবার মারাঠারা শক্তিশালী হয়ে উঠল। মুঘল-মারাঠা দ্বন্দ্বে আইন-শৃঙ্খলা পতনের ফলে জমিদার কৃষকেরা রাষ্ট্রশক্তির উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন। অন্যদিকে মারাঠা চৌথ, মুঘলদের ভূমিরাজস্বের দাবি উভয়ের চাপ দিন দিন বাড়ছিল। জমিদাররা অনন্যোপায় হয়ে বিদ্রোহের পথ ধরলেন। তাদের অসন্তোষের পূর্ণ সুযোগ নিলেন মারাঠারা। দাক্ষিণাত্যে 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' আদায় করার অনুমতি পেলে এই নতুন শক্তি মুঘল শাসনযন্ত্রের সঙ্গে একত্রিত হয়ে যায়।

পেশোয়াদের সময় মারাঠা শক্তির চরিত্র পরিবর্তিত হচ্ছিল। তখন মহারাষ্ট্র একদল বংশানুক্রমিক জায়গীরদারের যৌথ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। মুঘল শক্তি একে দমন করতে না পেরে এর সঙ্গে আপস করে নেয়। অষ্টাদশ শতকের প্রবল অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখে নিপীড়িত কৃষকশ্রেণী বিভিন্ন সময়ে মারাঠা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল; কিন্তু মারাঠাশক্তি কোনো সময়েই দরিদ্র কৃষকদের প্রতিনিধিত্ব করত না। রাজস্ব আদায়ে মারাঠা রাষ্ট্রক্ষমতার নির্দয়তার মুঘলদের চেয়ে কিছু কম ছিল না। শিবাজীও তার অভিযানে কৃষকদের রেহাই দেননি। স্বয়ং আওরঙ্গজেব মারাঠা কৃষকদের মুঘলদের বিরুদ্ধে মারাঠা দস্যুদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় এসেছিল বলে মনে করতেন।

শিখদের আন্দোলন শুরু হয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠাকামী সম্প্রদায়ের নেতার মুঘল কেন্দ্রীয় শক্তির কাছ থেকে অতিরিক্ত কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় করবার জন্যে পরবর্তী পর্যায়ে এটি সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপ নেয় এবং এতে যোগ দেয় কৃষক শ্রেণী। শিখ বিদ্রোগের অন্তর্গত কৃষক আন্দোলনে নানারকম স্তর বিভাজন দেখা যায়। পরে এখান থেকে বেরিয়ে আসে সামন্ততান্ত্রিক সর্দারদের নেতৃত্বে পরিচালিত মিস্‌লগুলি। এই আবর্তনের ফলে পাঞ্জাব থেকে মুঘল নিয়ন্ত্রণ ও আফগান শক্তি সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হয়।

শিখধর্মের শান্তরূপ থেকে প্রতিরোধ আন্দোলনে যাবার একটি ঐতিহাসিক পর্যায় আছে। শিখধর্মের প্রথম সমর্থক ছিল ক্ষত্রীরা। এরা মূলত ব্যবসায়ী। শেষ পর্যায়ে সমর্থক ছিল জাঠরা। এরা সবাই কৃষক। কৃষিব্যবস্থার সঙ্কটের সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপর চাপ বাড়ল এবং তারা সবাই প্রতিকারের আশায় অস্ত্র হাতে নিল।

বিভিন্ন পর্যায়ে শিখ আন্দোলন বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। প্রথম পর্যায়ে আমরা দেখি, ব্যবসায়ী ক্ষত্রীদের পৃষ্ঠপোষকতায় তেগবাহাদুর গুরুপদে নির্বাতি হচ্ছেন। তার আমলের প্রথম দিকে আওরঙ্গজেব শিখদের আভ্যন্তরীণ ব্যপারে কোনো হস্তক্ষেপ করতেন না বরং তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহানুভূতি প্রদর্শন করছেন। কিন্তু শিখধর্মের সংগঠন ব্যবস্থাকে পরিচালিত করবার জন্যে ভক্তদের কাছ থেকে নিয়মিত কর গ্রহণ করা হতে থাকে এবং পরে তা বাধ্যতামূলক ব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে যায়। এই ব্যবস্থা সার্বভৌম সম্রাট হিসাবে আওরঙ্গজেব মেনে নিতে পারেননি। এই কারণেই তেগবাহাদুরের বিরুদ্ধে তিনি সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে গুরুগোবিন্দ এদের একটি সামরিক সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত করেন। কতকগুলি আনুষ্ঠানিক চিহ্ন ধারণ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে শিখরা সশস্ত্র প্রতিরোধকে তাদের ধর্মের অঙ্গ করে নিল।

প্রথম থেকেই খালসার সমর্থ ছিল জাঠ-কৃষক সম্প্রদায়। গুরুপদের অবসান এবং খালসার হাতে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণের ফলে জাঠ কৃষকদের সমতার দাবি স্বীকৃত হল। অন্যদিকে ক্ষত্রীদের ক্ষমতার অবসান ঘটল। ক্ষত্রী ও ব্রাহ্মণ শিষ্যদের সঙ্গে জাঠ কৃষকদের অন্তর্বিরোধের একটি ক্ষেত্র তৈরি হল। আনুমানিক ১৬৯২ সাল পর্যন্ত গুরুগোবিন্দ মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি। কিন্তু গুরুগোবিন্দ পার্বত্য প্রদেশের আনন্দপুরের চারিধারে প্রায় ১০০ মাইল বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে নিজের ও তার অনুগামীদের জন্যে স্বতন্ত্র এলাকা স্থাপনে ইচ্ছুক ছিলেন। পার্বত্য রাজারা উদ্বৃত্ত সামাজিক সম্পদের নতুন ভাগীদারকে

পছন্দ করেননি। তারা মুঘল কর্তৃপক্ষের সাহায্য প্রার্থনা করে। মুঘল সৈন্যের হস্তক্ষেপে গুরু আনন্দপুর থেকে বিতাড়িত হলেন। এরপরে গুরুগোবিন্দ তার বক্তব্যকে সমর্থন করে আওরঙ্গজেবকে চিঠি লেখেন। আওরঙ্গজেব তার উত্তরে গুরুগোবিন্দকে তার আর্জিসহ দেখা করতে বলেন। দক্ষিণ ভারতে যাওয়ার পথে গুরুগোবিন্দ আততায়ীর হাতে নিহত হন। সম্রাট বাহাদুর শাহ এর পরে গুরুগোবিন্দের দাবিসকল মেনে নেন।

চতুর্থ পর্যায়ে বান্দার সময়ে শিখ আন্দোলনের পটভূমি জাঠ কৃষক অধ্যুষিত দোয়াব অঞ্চলে শুরু হয় গোটা পাঞ্জাব জুড়ে কৃষিব্যবস্থার উপরে চাপ পড়ে এবং রাজস্বের হার বাড়ে। নিপীড়িত কৃষকেরা দলে দলে শিখধর্মের আশ্রয় নেয়। রাজস্বের দাবি অতিরিক্ত বাড়লে পাঞ্জাবের জমিদারেরাও সশস্ত্র প্রতিরোধের আশ্রয় নেয়। ছোট ছোট মালগুজারী জমিদারেরা বান্দার পক্ষে ছিলেন। তিনি নিজস্ব করব্যবস্থার মাধ্যমে মুদ্রা-ব্যবস্থা গড়ে তোলেন এবং সর্বদাই পাল্টা রাষ্ট্র-সংগঠন গড়ে তোলার ইঙ্গিত দিতেন। মুঘল রাজস্ব-ব্যবস্থার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও জমিদারেরা লাভের আশায় বান্দার দলে যোগ দেয়।

কিন্তু জাঠ জমিদার এবং ক্ষত্রী ব্যবসায়ীরা শিখ হওয়া সত্ত্বেও বান্দার আন্দোলনকে নানা কারণে সমর্থন করতে পারেনি। শিখ আন্দোলনের ফলে রাজনৈতিক স্তিতাবস্থা ব্যাহত হচ্ছিল যা ব্যবসায়ীদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার জন্যে কাপড়ের ব্যবসায়ী ও তাঁতীরা শিখদের বিরুদ্ধে মুঘলদের পক্ষে যোগ দেয়। মুঘল শাসকেরাও ক্ষত্রী ও শিখদের বিরোধিতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। কিন্তু শিখদের জনসমর্থন ছিল খুব বেশি ফলে মুঘল রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

মুঘল-শিখ সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হয়। বাহাদুর শাহ ও পরে ফারুকশিয়ারের আমলে সামনাদ খাঁ জাকারিয়া খানের প্রচেষ্টায় এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। ১৭১৫ সালে বান্দাকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। ১৭৫০-এর দশকে আহমদ শাহ আবদালির পাঞ্জাব অভিযান এবং মারাঠা প্রতিরোধের সময় পাঞ্জাবে আবার শিখ শক্তির পুনরভ্যুত্থান ঘটে। এটাকে বলা যায় মিস্‌লদের যুগ। কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব নষ্ট হয়ে যায়। আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের আধিপত্য সৃষ্টি হয় এর ফলে সমগ্র পাঞ্জাব থেকে মুছে যায় মুঘল রাষ্ট্রক্ষমতা ও আফগান শক্তি।

৩৩.৫.১ কৃষক বিদ্রোহ ও শ্রেণীবিন্যাস

বিদ্রোহে বিভিন্ন শ্রেণীর অংশগ্রহণের উপর কৃষক বিদ্রোহের তীব্রতা ও গতিমুখ নির্ভর করে। কিন্তু উপযুক্ত তথ্যের অভাবে বিদ্রোহের শ্রেণীবিশ্লেষণ সম্ভব নয়। জাঠ ও মারাঠা আন্দোলনে নেতৃত্ব ছিল জমিদার শ্রেণীর হাতে। এরা ছিল সুবিধাভোগী শ্রেণী। জঙ্গী আন্দোলনের মধ্যে কৃষক ও শ্রমজীবী জনগণের সমাবেশ দেখা যায়। বান্দার নেতৃত্বে শিখ সমাজের আন্দোলনে কৃষিসমাজের একেবারে নিম্নবর্গের লোকদের দেখা দেয়। ফলে এই আন্দোলনে জঙ্গী মনোভাব অনেক বেশি। এই আন্দোলনের নায়কদের মুঘল রাষ্ট্রের অংশীদার করা হয়নি বরং তাদের নির্মমভাবে দমন করা হয়েছে। দাসি/কুর্মি/বান্দার নেতৃত্বে আন্দোলনকারীরা একই সঙ্গে রাষ্ট্র-বিরোধিতার সঙ্গে জমিদার শ্রেণীরও বিরোধিতা করেছে।

জমিদার শ্রেণীর লড়াই (এক) ক্ষমতা বিস্তারের জন্য; (দুই) অধিকার পাওয়ার জন্যে। ফলে এই লড়াই অনেক বেশি আগ্রাসী এবং জোরদার। ইরফান হাবিব মনে করেন যে, মুঘল যুগের কৃষক বিদ্রোহে কৃষকের শ্রেণীচেতনার প্রকাশ পাওয়া যায়। জমিদারের স্বার্থচেতনার দ্বারা শ্রেণীচেতনা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু কোন

কোন সময় যেমন সৎনামী বিদ্রোহে শ্রেণীচেতনার প্রাথমিক উন্মেষ দেখা যায়। সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস যেখানে অগ্রসর হয়েছে সেখানেই বিদ্রোহ ও বিক্ষোভে শ্রেণীদ্বন্দ্ব সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। গ্রামীণ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে তারা নানারকমভাবে প্রতিবাদ করেছেন।

৩৩.৫.২ কৃষক বিদ্রোহে ধর্মের ভূমিকা

মধ্যযুগের পরিপেক্ষিতে ধর্মের গুরুত্ব সীমাহীন। ধর্মের দুটি রূপ ছিল, একটি সরকারি ধর্মমত, যা সমাজ ব্যবস্থাকে প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে ধরে রাখে অপরটি প্রতিবাদী ধর্মমত—সুফী ও ভক্তিবাদ-বিশিষ্ট ধর্মমতকে এর মধ্যে ধরা যায়। ধর্মের বাতাবরণের মধ্যেই এইসব বিদ্রোহ ঘটেছিল বলে মনে করা হয়। শিখদের আন্দোলন ও সৎনামীদের বিদ্রোহকে যুক্তিগ্রাহ্য করার জন্যে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছিল। ধর্মগুলি বর্ণব্যবস্থার বিরুদ্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করে। বর্ণব্যবস্থার প্রভাব শিথিল হলে নিম্নবর্ণের লোকদের প্রাধান্য তুলনামূলকভাবে এখানে একটা পর্যায়ে স্থায়ী হয়। ধর্মের নানা ধরনের ভূমিকা কৃষকসমাজে থাকে—ধর্মসংহতিও আসতে পারে; বিভেদও সৃষ্টি করতে পারে। জমিদারশ্রেণী ও কৃষকদের মধ্যে সংহতি আনতে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। আবার সৎনামীরা বিদ্বেষবশত যখন মসজিদ ধ্বংস করে তখন হিন্দু ও মুসলিম কৃষককুলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।

অপরদিকে সরকারি ধর্মমত প্রসঙ্গে বলা যায় যে, পুরাতন কালের পাঠ্যপুস্তকে ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় মতবাদের প্রতিক্রিয়া হিসাবে কৃষক বিদ্রোহগুলিকে দেখান হয়েছে। কৃষক বিদ্রোহগুলির পিছনে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ কাজ করেছে, সম্রাটের ব্যক্তিগত মতবাদ নয়। বরঞ্চ সারা ভারত জুড়ে বহু হিন্দু ধর্মমন্দির ঔরঙ্গজেবের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে। দ্বিতীয়ত, ঔরঙ্গজেব তার ব্যক্তিগত ধর্মমতকে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের কাজে লাগাননি। তৃতীয়ত, ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ দিকে হিন্দুদের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতির কঠোরতা কমে আসছিল; পরবর্তী সম্রাট বাহাদুর শাহের আমলে সেগুলি একেবারে নাকচ হয়ে যায়। কিন্তু কৃষক আন্দোলনের তীব্রতাকে তা কমাতে পারেনি বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৩৩.৫.৩ মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে কৃষক বিদ্রোহের অবদান

সপ্তদশ শতকের শেষে এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথমে মুঘল রাজশক্তির ধারক ও বাহক মুঘল শাসকশ্রেণীর অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও দ্বন্দ্বগুলি যখন বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠল ও সাম্রাজ্যের ক্ষমতার বনিয়াদকে দুর্বল করেছিল, ঠিক সেই সময়ে মুঘল রাষ্ট্রকে আরেকটি বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা হল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে মুঘল কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে পৌনঃপুনিক বিদ্রোহ। মুঘল রাষ্ট্র কোনোদিনই জনসমর্থনের উপর নির্ভর করত না এবং মুঘল রাষ্ট্রের অতিরিক্ত অর্থনৈতিক দাবিকে কৃষিজীবী সমাজ এবং তার নেতৃত্ব কোনোদিনই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। সমস্ত মুঘল আমল জুড়ে বিক্ষিপ্ত ও ইতস্তত বিদ্রোহ দেখা যায়। দুর্ভেদ্য, অপরাজেয় মুঘল অশ্বারোহী বাহিনীর ভয়ে এইসব বিদ্রোহ কখনই চরম রূপ ধারণ করেনি। কিন্তু সপ্তদশ শতকের শেষে এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথমে রাজপুরুষদের শোষণের মাত্রা বাড়লে কৃষক বিদ্রোহের সংখ্যা ও ব্যাপ্তি বাড়তে থাকে। তখন এইসব বিদ্রোহকে পূর্বের মতো প্রতিহত করার ক্ষমতা মুঘল সামরিক বাহিনীর ছিল না। একদিকে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা ও অন্যদিকে

জনসমর্থনপুষ্ট আঞ্চলিক শক্তির উত্থান—এই দুই-এর চাপে পড়ে মুঘল সাম্রাজ্য আর বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি।

অর্থনৈতিক দিক থেকে মুঘল সাম্রাজ্য একটি সমঝোতার উপর দাঁড়িয়েছিল। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সংস্থান কৃষকের হাতে রেখে বাড়তি উৎপাদনের অধিকাংশ রাষ্ট্র আদায় করত। সামান্য কিছু অংশ জমিদারেরা নিতেন। সপ্তদশ শতকের শেষে এই বোঝাপড়ার অবসান ঘটে। সাম্রাজ্য রক্ষার ব্যয় বেড়ে গেলে কৃষকদের শোষণ ও ইজারাদারি ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে রাজস্বের দাবি কৃষকের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দাবিকে অস্বীকার করে। এরই ফলে হয় কৃষক বিদ্রোহ—যা সাম্রাজ্যের বনিয়াদকে দুর্বল করে তোলে। মুঘল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জমিদার ও কৃষকের যৌথ বিদ্রোহ ক্রমে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিদ্রোহগুলির প্রাথমিক সাফল্য সাম্রাজ্যের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে তার ভিত্তিমূলকে কাঁপিয়ে দেয়। ঔরঙ্গজেব নিজে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও এই সমস্যার সমাধান করতে পারে নি। তার উত্তরসূরীদের আমলে সমস্যার তীব্রতা বেড়েছে এবং ক্রমশ তা সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথকে প্রশস্ত করেছে, ফলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির অনুপ্রবেশ আরো সহজ হয়েছে।

মুঘল যুগে কৃষি-বিদ্রোহ, প্রাথমিক জমিদারদের বিদ্রোহ, জায়গীরদারদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ভারতের অন্যতম বৃহৎ সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। কিন্তু সাম্রাজ্যের অন্তিম দশায় কোনো নতুন সাম্রাজ্যের সূচনা করেনি বিত্তহীন কৃষকেরা নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে উৎপাদিকা শক্তিগুলির কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি—ফলে নতুন কোনো সমাজব্যবস্থার জন্ম হয়নি। নবগঠিত সামন্ত রাজ্যগুলিতে শোষণের রূপ পূর্বের মতোই থেকে যায়। সামন্তপ্রভুদের অধীনে হয়তো প্রথমে কিছুটা রাজস্বের চাপ বাড়ে কিন্তু কিছুকাল পরেই কৃষকের অবস্থা দুঃখকষ্টে জর্জরিত হয়ে পড়ে।

৩৩.৬ সারাংশ

মুঘল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জায়গীরদারেরা একটি সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল। উৎপন্ন ফসলের অধিকাংশ করায়ত্ত করে কৃষকের জন্য ন্যূনতম মাত্রায় ফসল রাখা হত এবং এই উদ্বৃত্ত সম্পদের অধিকাংশই একটি মুষ্টিমেয় শ্রেণী ভোগ করতেন। নিয়মিত কর আদায় করা ছাড়াও তারা আরও বেআইনী করও আদায় করতেন; এর ফলে কৃষিজীবী সমাজকে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে বসবাস করতে হত। কৃষকের রাজস্বের উপর অপর দাবিদার ছিলেন জমিদার, মনসবদারি ব্যবস্থার অন্তর্গত করে মুঘল রাষ্ট্র প্রাক্-মুঘল যুগের এই ভূস্বামী সম্প্রদায়ের অবস্থানকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। জমিদারদের মধ্যে ছোট-বড়, মাঝারি নানারকম স্তরবিন্যাস দেখা যায়। তারা প্রত্যেকেই পরশ্রমজীবী শোষক শ্রেণী। কৃষক ছিলেন মুঘল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ। উপযুক্তভাবে জমি ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্র কৃষকদের নানারকম সাহায্য করতেন আবার রাষ্ট্রের দেয় রাজস্ব ঠিক সময়ে পরিশোধ না করলে কৃষককে নানারকমভাবে পর্যদস্ত করা হত। কৃষক সমাজের মধ্যেও নানারকম অবস্থানগত পার্থক্য দেখা যায়। উপরের দিকে ধনী কৃষক এবং তলার দিকে অগণিত ভূমিহীন খেতমজুর—উভয়ের দ্বন্দ্বে মুঘল কৃষিব্যবস্থা সমস্যাকীর্ণ ছিল।

নিয়মিত ও অনিয়মিত রাজস্বের পরিমাণ কালক্রমে এত বেশি হয়ে গেল যে, চাষ করা-ক্রমে অলাভজনক হয়ে দাঁড়ায়। অতিরিক্ত রাজস্বের চাপ মুঘল কৃষি ব্যবস্থায় সঙ্কট ডেকে আনে। সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের

জন্য ইজারাদারি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। পরে এটি আরও শোষণমূলক ব্যবস্থা বলে প্রমাণিত হয়। শোষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে কৃষকেরা নিরুপায় হয়ে অস্ত্র ধরতে বাধ্য হয়। এই ব্যাপারে কৃষকের সহযোগী ছিল জমিদারেরা, কারণ কৃষিব্যবস্থার সঙ্কটের ফলে তারাও আগের মত উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করতে পারে না।

মুঘল আমলের কৃষি-বিদ্রোহকে দুভাগে ভাগ করা যায়—(এক) প্রাক্-ঔরঙ্গজেব আমলের কৃষি-বিদ্রোহ; (দুই) ঔরঙ্গজেবের আমলে কৃষি-বিদ্রোহ। পূর্ব যুগের তুলনায় ঔরঙ্গজেবের আমলে কৃষি-বিদ্রোহের সংখ্যা ও ব্যাপ্তি ছিল অনেক বেশি। পরিণামে এরাই মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ডেকে আনে। এই সমস্ত বিদ্রোহের মধ্যে কোন কোনটি ছিল বিশুদ্ধ কৃষক আন্দোলন। এগুলি ধর্ম, ঐতিহ্য, সামাজিক প্রথার পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে এবং কৃষক সমাজের স্তরবিন্যাস ছিল বিভিন্ন; কিন্তু মারাঠা ও শিখ বিদ্রোহ রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ও কৃষক আন্দোলন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে এবং পরিণামে এগুলি জটিল চরিত্র ধারণ করেছে।

৩৩.৭ অনুশীলনী

১। **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :**

(ক) মুঘল আমলের কৃষি-বিদ্রোহের কারণগুলিকে বিশ্লেষণ করুন।

(খ) মুঘল যুগের কৃষক বিদ্রোহের আধুনিক ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাকে আপনি কীভাবে উপস্থিত করবেন?

(গ) ঔরঙ্গজেবের আমলের কৃষক বিদ্রোহের বিবরণ দিন।

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :**

(ক) মুঘল যুগের কৃষিসমাজের বিভিন্ন বিভাজনকে আলোচনা করুন।

(খ) উপজাতি আন্দোলনগুলির মধ্যে ধর্মের ভূমিকা কী?

(গ) মারাঠা আন্দোলন কি মূলত কৃষক আন্দোলন?

৩। **অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :**

(ক) জায়গীরদারদের কেন পরজীবী শোষক শ্রেণী বলব?

(খ) ইজারাদারি ব্যবস্থার কেন প্রবর্তন করা হয়েছিল?

(গ) জাঠ কৃষক আন্দোলনের সফলতার কারণ কী?

৪। **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (সঠিক উত্তরে (✓) চিহ্ন দিন) :**

(ক) জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীর নাম—

(১) তুজুক-ই-জাহাঙ্গীর

(২) তারিখ-ই-জাহাঙ্গীর

(৩) জাহাঙ্গীর-নামা

(খ) সৎনামী কৃষকদের বিদ্রোহ দমন করতে—

(১) ঔরঙ্গজেব কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেননি।

(২) সেনাপতিদের উপর দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

(৩) ঔরঙ্গজেব নিজে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

(গ) "চৌথ" ও "সরদেশমুখী" নামক দুটি কর—

(১) মুঘল জায়গীরদাররা আদায় করতেন।

(২) স্থানীয় শাসকেরা "আবওয়াব" হিসাবে গ্রহণ করতেন।

(৩) মারাঠা শাসকেরা শাসন-বহির্ভূত অঞ্চল থেকে আদায় করতেন।

৩৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

1. Habib, Irfan : *The Agrarian System of Mughal India.*
2. Roychoudhury Tapan and Habib, Ifran (ed) : *The Cambridge History of India,* Vol. 1.
3. ভদ্র গৌতম : *মুঘল যুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ।*
4. বন্দ্যোপাধ্যায় শেখর : *অষ্টাদশ শতকের মুঘল সঙ্কট ও আধুনিক ইতিহাস চিন্তা।*

একক ৩৪ ❐ মুঘল দরবারে দল ও রাজনীতি

গঠন :

৩৪.০ উদ্দেশ্য

৩৪.১ প্রস্তাবনা

৩৪.২ মুঘল সমাজব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শ্রেণীগুলির আলোচনা

৩৪.২.১ জমিদার শ্রেণী

৩৪.২.২ জায়গীরদার এবং অন্যান্য স্বত্বাধিকারী

৩৪.৩ অভিজাত শ্রেণীর বিন্যাস, গঠন এবং চরিত্র

৩৪.৪ অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল অভিজাত শ্রেণীর সামনে সঙ্কট

৩৪.৪.১ রাজনৈতিক সমস্যা

৩৪.৪.২ জায়গীরদারী ব্যবস্থার সঙ্কট

৩৪.৪.৩ অদূরদর্শী মুঘল অভিজাতদের আত্মক্ষয়ী সংগ্রাম

৩৪.৫ সারাংশ

৩৪.৬ অনুশীলনী

৩৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩৪.০ উদ্দেশ্য

তুর্ক-আফগান এবং মুঘল এই দুটি রাজনৈতিক শক্তিকে নিয়ে ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ইতিহাস রচিত হয়েছে। একদা শৌর্যে, বীর্যে, পরাক্রমে অতুলনীয় মুঘলশক্তি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই আত্মক্ষয়ী সংগ্রামে তার জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলে। ফলে বিদেশী ইংরেজ শক্তির ভারতে ক্ষমতা দখলের পথ প্রশস্ত হয়।

এই একক পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন—

- অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল রাষ্ট্রশক্তির সামনে উদ্ভূত সমস্যা।
- উক্ত সমস্যা সমাধানে মুঘল রাষ্ট্রশক্তির ব্যর্থতা।
- সর্বনাশা আত্মকলহে মত্ত মুঘল অভিজাতবর্গ কিভাবে সাম্রাজ্যের পতন ডেকে আনে।

৩৪.১ প্রস্তাবনা

সুদীর্ঘকাল মুঘল শাসনে মুঘল অভিজাতবর্গ প্রায় একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের গঠন ও বিন্যাসে, প্রশাসনে, সমাজ ও অর্থনীতিতে সর্বত্র মুঘল অভিজাতবর্গের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

অভিজাতবর্গের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনও শুরু হয়। সুতরাং অভিজাতবর্গের সমস্যা অনুধাবন করতে না পারলে মুঘল সাম্রাজ্যের সমস্যা ও সঙ্কট সর্বোপরি তার চূড়ান্ত অবক্ষয় সম্বন্ধে কোনো ধারণা করা সম্ভব নয়! বাস্তবিকপক্ষে, সমস্ত মুঘল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব অভিজাতবর্গের সুষ্ঠু কাজকর্মের উপর নির্ভর করত। অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে অভিজাতবর্গ রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব রক্ষায় তাদের উপযুক্ত ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। তারই ফলস্বরূপ দেখা দেয় অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে উত্তর ভারতে মারাঠাদের অগ্রগতি, নাদির শাহের আক্রমণ (১৭৩৯), উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফগান সমস্যা। রাষ্ট্রীয় সঙ্কটের সময় দল ও গোষ্ঠীর উর্দ্ধে উঠে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করবার পরিবর্তে তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্রতার বসবর্তী হয়ে মুঘল অভিজাতবর্গ সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

নাদির শাহের ভারত আক্রমণের পর মুঘল অভিজাতবর্গ আর কোনো স্বাধীন ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়নি। নাদির শাহের ভারত আক্রমণ থেকে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ অবধি (১৭৬১) সাম্রাজ্যকে বাঁচাবার নতুন কোনো প্রশ্ন অভিজাতবর্গের সামনে উপস্থিত হয়নি। অভিজাতবর্গেরাই মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ডেকে আনেন আবার সাম্রাজ্যের পতনের প্রক্রিয়া শুরু হলে তার চাপে পড়ে অভিজাতবর্গের পতন ত্বরান্বিত হয়। মুঘল শাসন-ব্যবস্থার মতো কেন্দ্রাতিগ শাসনব্যবস্থায় সম্রাটের ব্যক্তিগত সাফল্য ও ব্যর্থতার উপর অভিজাতবর্গের অংশের উপর পূর্বের মতন প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। সম্রাটের অবর্তমানে উজীররাও ব্যর্থ হন। এইভাবে ব্যক্তিগত ব্যর্থতা এবং সাম্রাজ্যের পতনের প্রক্রিয়া একে অপরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সাম্রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধির জন্যে নয়; নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্যে অভিজাতবর্গ নিজেদের সমস্ত শক্তিকে ব্যয় করেছিলেন। তাই সাম্রাজ্যের দুর্দিনে শক্ত হাতে হাল ধরতে পারেননি; উপরন্তু নিজেরাই তার পতনকে ত্বরান্বিত করেছিলেন।

৩৪.২ মুঘল শাসনব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শ্রেণীগুলি সম্বন্ধে আলোচনা

মুঘল সমাজব্যবস্থা কয়েকটি স্তরবিন্যাসে বিভক্ত ছিল। উপরতলায় ছিলেন শাসকশ্রেণী, যারা সংখ্যায় অল্প কিন্তু ক্ষমতায় অত্যন্ত শক্তিশালী, তলার দিকে ছিলেন কৃষককুল, কারিগর ও হস্তশিল্পী সম্প্রদায় এবং অন্যান্যরা। সমাজব্যবস্থা চূড়ান্ত অসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অভিজাতদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার পাশে জনগণের অধিকাংশ কায়ক্লেশে জীবনধারণ করতেন, প্রায় সব বিদেশী পর্যটক দরিদ্র জনতার বসনের স্বল্পতার কথা উল্লেখ করেছেন। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ছাড়া অন্যান্য সময় খাদ্যের কষ্ট বোধ হয় অত তীব্র ছিল না কিন্তু এই দরিদ্র জনতার মধ্যে বিশেষ করে কৃষককুলে একধরনের বৈষম্য ছিল; ভূমিহীন কৃষক সম্প্রদায়ের করুণ অবস্থার কথা দেশী ও বিদেশী সব লেখকেরাই বর্ণনা করেছেন। কাজ না থাকলে এরা রোজগারের আশায় শহরে গিয়ে ভিড় জমাতেন এবং খুবই সাধারণ মানের কাজ করে জীবন কাটাতেন। প্রজা বিদ্রোহের সময় এই সম্প্রদায়ের লোকদের ব্যবহারকরা হত অথবা এরাও বোধহয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দিতেন। উপযুক্ত

তথ্যের অভাবে যদিও কোনো নির্দিষ্ট মত দেওয়া কঠিন কিন্তু মুঘল কৃষিব্যবস্থার সঙ্কট এদের স্পর্শ করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অভিজাতশ্রেণী এবং জমিদারদের নিয়ে মধ্যযুগের ভারতে শাসকশ্রেণী গঠিত ছিল। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই মুঘল শাসকশ্রেণী ছিল সুবিধাভোগী সম্প্রদায়। বিভিন্ন জাতির লোক নিয়ে অভিজাতশ্রেণী গঠিত হত। মুঘলদের পিতৃভূমি তুরান এবং প্রতিবেশী তাজিকিস্তান, ইরান থেকে বহু অভিজাত মুঘল শাসকশ্রেণীকে স্ফীত করেছিলেন। পরবর্তীকালে আফগান এবং ভারতীয় মুসলিমরা দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে অভিজাত পদে উন্নীত হয়েছিলেন। আকবরের সময় থেকে হিন্দুরাও নিয়মিতভাবে অভিজাতদের দল বৃদ্ধি করতে থাকেন। জাহাঙ্গীর, শাহজাহান মারাঠাদের অভিজাতবর্গে অন্তর্ভুক্ত করেন। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয়ের পর দক্ষিণী মুসলমানরা অভিজাত গোষ্ঠীতে নতুন সদস্য হিসাবে যোগদান করেন।

বিলাসবহুল জীবনযাপন অভিজাতবর্গের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান, অলঙ্কার সমস্ত কিছুতেই ঐশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সঞ্চয়ের কোনো প্রবণতা ছিল না। ব্যবসা বা অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় না। বিলাসী ঋণগ্রস্ত অভিজাতবর্গ পরবর্তীকালে রাষ্ট্রের বোঝাস্বরূপে পরিণত হন। এছাড়াও অভিজাতদের সংখ্যা বৃদ্ধি বিভিন্ন শ্রেণী, গোষ্ঠী ও ব্যক্তির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, সাধারণ কোনো কর্মসূচীর অনুপস্থিতি, জায়গীরদারি ব্যবস্থার ব্যর্থতা—সবকিছু একত্রিত হয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অভিজাতবর্গকে এক গভীর সঙ্কটের সামনে নিয়ে আসে।

ব্যবসায়ী, বৃত্তিভোগী শ্রেণী যেমন হাকিম, বৈদ্য, কাজী, মোল্লা এবং মাঝারি গোছের সরকারি ইত্যাদি গোষ্ঠীকে নিয়ে মুঘল ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠিত ছিল। এরা ছিলেন সংখ্যালঘু; রাজনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল এবং রাজপুরুষদের উপর নির্ভরশীল। অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক সঙ্কটে এই শ্রেণী কোনো অগ্রগতির পথ দেখাতে পারেননি; অথবা রাষ্ট্র, সরকার বা সম্রাটকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারেননি।

৩৪.২.১ জমিদার শ্রেণী

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে মুঘল ভারতে দুটি শক্তিশালী ভূস্বামী সম্প্রদায় লক্ষ্য করা যায়। পারসিক উৎসে তাদের সবসময় জমিদার বলে উল্লেখ করা হয়েছে; অপরটি হল রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত "জায়গীরদার সম্প্রদায়"। উভয় সম্প্রদায়ই কৃষকের উৎপাদনের উদ্বৃত্ত সম্পদেও ভাগ বসাতেন। যদিও এই উদ্বৃত্ত সম্পদ সংগ্রহ করার মধ্যে পদ্ধতিগত পার্থক্য দেখা যায়।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই জমিদারেরা জমি ভোগদখল করে আসছিলেন। তুর্কী শাসকেরা জমিদারের অবস্থাকে পরিবর্তন না করে তাদের সঙ্গে এক ধরনের বোঝাপড়া করে নিয়েছিলেন। জমিদারেরাও বিনিময়ে তুর্কী শাসকদের আনুগত্য স্বীকার করেন। মুঘলদেরও মেনে নিতে হয়েছিল যে জমিদারেরা রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি অংশ; দেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। এর ফলে বৃহৎ জমিদারেরা সামন্ত প্রভু হিসাবে রাষ্ট্রকে সামরিক তথা অন্যান্য রকমের সাহায্য দিতে রাজি হয়।

এই বোঝাপড়ার পরিবেশ বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয় না কারণ প্রায়শই জমিদার শ্রেণী শাসকের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে খাজনা বাকি ফেলে রাখা, এবং রাষ্ট্রের জমি অধিকার করা, ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত শুল্ক আদায় করে জনগণের দুঃখের কারণ হতেন। কৃষকেরা অত্যাচারিত হওয়া সত্ত্বেও জমিদারদের উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল না। একমাত্র যখন সামরিক শাসকেরা জমিদারদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন তখনই দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসত এবং স্থিতাবস্থা বজায় থাকত। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলি জমিদারদের স্বার্থে আঘাত করলেই জমিদারেরা বিক্ষুব্ধ হতেন। নানারকম প্রক্রিয়ায় নিজেদের ক্ষুদ্র আঞ্চলিক স্বার্থকে বজায় রাখার জন্যে শাসকশক্তির রাজনৈতিক সংহতিকরণের প্রক্রিয়াকে অস্বীকার করতেন। যখনই সুযোগ পেতেন তখনই রাষ্ট্রশক্তিকে বাধা দিতেন। জমিদার ও শাসক শক্তির এই প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব সমগ্র মধ্যযুগের ভারতে লক্ষ্য করা যায়।

জমিদারেরা মাঝে মাঝে অবাধ্য হয়ে উঠতেন। কারণ ভাড়াটিয়া সৈন্যবাহিনীর ব্যবহার জমিদারদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। মুঘল রাজ্যের সর্বত্র এই ধরনের জমিদারদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং জমি অথবা জমির উদ্বৃত্ত সম্পদের জন্যে লড়াই মুঘল ভারত সমেত সমগ্র মধ্যযুগের ভারতের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক। এই সমস্যা থেকেই অপরাপর সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। জমিদারদের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে মুঘল শাসকশক্তি নানারকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন : যেমন (ক) বৃহৎ জমিদারিকে ভেঙে ক্ষুদ্র জমিদারিতে পরিণত করা অথবা ভিন্ন গোষ্ঠীর নেতাকে অপর একটি এলাকার জমিদারীর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করা; (খ) আনুগত্যহীন বিক্ষুব্ধ জমিদারদের উচ্ছেদকরণ; (গ) প্রাদেশিক ও জেলা স্তরে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের হাতকে শক্ত করা; (ঘ) এসব ব্যবস্থা সত্ত্বেও আকবর জমিদারদের রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করার জন্যে মনসবদারী ব্যবস্থা গ্রহণ করবার সুযোগ তাদের সামনে খুলে দিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও জমিদারদের রাষ্ট্র সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয়নি। শ্রেণী হিসাবে প্রায়ই তারা মুঘল রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরোধিতা করতেন। মুঘল রাষ্ট্রব্যবস্থা যত প্রসারিত হয়েছে জমিদার শ্রেণী তত বেশি করে নিজেদের সুসংহত করে রাষ্ট্রের বিরোধিতা করেছেন। জমিদার শ্রেণীর সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে না পারার ফলে ভবিষ্যতে মুঘল শাসকগোষ্ঠী জমিদারদের প্রতি সঠিক নীতি নির্ধারণে ব্যর্থ হয়।

রাষ্ট্রীয় সংহতির পরিবর্তে আঞ্চলিকতার মনোভাব গড়ে তোলা এবং তাকে শক্তিশালী করার পিছনে জমিদার শ্রেণীর ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। সমগ্র দেশব্যাপী তাদের বিস্তৃতি থাকার জন্যে কোনো কেন্দ্রীয় শক্তির পক্ষে তাদের উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাবে তার অধিকাংশ সময় রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সহযোগিতার পরিবর্তে বৈরিতার মনোভাব অবলম্বন করতেন। এদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নীতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন ছিল। সম্রাটের দক্ষতা, সামরিক শাসকদের উদ্যোগ, দক্ষতা এবং জনগণের অধিকাংশের সক্রিয়া সমর্থনের উপর এইসব নীতি প্রণয়ন করা সম্ভব ছিল।

সুতরাং জমিদার শ্রেণী ছিল রাষ্ট্রের পক্ষে এক বিরাট সমস্যাস্বরূপ। মুঘল রাষ্ট্রব্যবস্থা এদের মিত্রতা আদায় করতে পারেনি কেননা প্রায় সমস্ত জমিদার জাতি (caste) বা গোষ্ঠী (clan)-কে কেন্দ্র করে গড়ে

উঠেছিল। এরা অনেকেই ছিলেন প্রভাবশালী জাতির অন্তর্গত বা নিজেরাই ছিলেন গোষ্ঠীপতি—অনেকেরই নিজস্ব সৈন্যসামন্ত ও দুর্গ ছিল। স্থানীয়ভাবে ক্ষমতা ভোগ করতেন বলেই এদের মধ্যে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা বোধ গড়ে উঠেছিল; কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসন বলবৎ করা বা ভূমিরাজস্ব আদায় করার সময় মুঘল শাসকদের এদের উপর নির্ভর করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। জমিদার শ্রেণীর আনুগত্যের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে অধ্যাপক রিচার্ডস এবং অধ্যাপক মুজাফ্ফর আলমকে এক দীর্ঘ বিতর্কে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়।

৩৪.২.২ জায়গীরদার এবং অন্যান্য স্বত্বাধিকারীরা

তুর্ক-আফগান শাসকদের সময় ইক্তাদার নামে নতুন এক ভূস্বামী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় এবং ইক্তাদারি ব্যবস্থা মুঘল যুগে আরও বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে জায়গীরদারি ব্যবস্থায় রূপ নেয়। প্রশাসন পরিচালনা এবং ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের জন্য তুর্কী শাসকেরা দেশকে কয়েকটি ইক্তাতে ভাগ করেন। ইক্তার প্রধানকে ইক্তাদার বলা হত। নিজস্ব খরচ বাদ দিয়ে আদায়ীকৃত ভূমিরাজস্বের সবটুকুই রাষ্ট্রকে পরিশোধ করতে হত। জায়গীরদাররা পরবর্তীকালে প্রায় একই কাজ করতেন। তবে সাময়িক নেতা হিসাবে সম্রাটের প্রয়োজনে তাকে নির্দিষ্ট সংখ্যায় সৈন্য সরবরাহ করতে হত।

জায়গীরদারদের ক্ষমতা ও অবস্থান সম্পূর্ণভাবে সম্রাটের ইচ্ছার উপর নির্ভর করত। বংশগৌরব ও মর্যাদা জায়গীরদারি পাবার পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় উপাদান ছিল। কিন্তু জমিদারদের মত তাদের জমির উপর কোন উত্তরাধিকারসূত্রে অধিকার বর্তাত না। অনেক সময়ই তাদের এক জায়গীর থেকে অন্য জায়গীরে স্থানান্তরিত হতে হত। রাষ্ট্র বা সম্রাটকে তারা যে সেবা করতেন তার বিনিময়ে তারা নগদ টাকার পরিবর্তে জমির আয় ভোগ করতেন। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে পিতার জায়গীরদারি পুত্রকে অর্পণ করা হত এবং ক্ষেত্রবিশেষে জায়গীরদারদের নগদ টাকায় বেতন দেওয়া হত। কিন্তু এসবই ছিল নিয়মের ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়।

সুতরাং সরকারি আমলা হিসাবে জায়গীরদারদের জমির ব্যাপারে নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা বা অধিকার ছিল না। সম্রাটের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হওয়ার জন্যে তারা স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র গড়ে তুলতে সাহায্য করতেন এবং কৃষির বিস্তার ও উন্নয়নে উৎসাহ দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পন্ন করতেন, সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে অনাবাদী জমিকে আবাদযোগ্য করা হত, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় জায়গীরদারদের তত্ত্বাবধানে কৃষকদের সরকার থেকে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হত। কৃষি ও কৃষকের উন্নতির সঙ্গে তাদের নিজেদের আর্থিক সমৃদ্ধি জড়িত একথা অধিকাংশ জায়গীরদার মনে করতেন।

জমিদারের মতো জায়গীরদারেরা জমিকে সম্পদের একমাত্র উৎস বলে মনে করতেন। তারা সবসময় জায়গীরদারীকে স্থায়ী ভূ-সম্পত্তিতে পরিণত করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালাতেন। দুর্বল সম্রাটদের বশীভূত করে তারা নিজে উদ্দেশ্য পূরণ করতেন। জায়গীরদারি ব্যবস্থার মধ্যে স্বতঃবিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। দেশব্যাপী তাদের উপস্থিতি রাষ্ট্রীয় ঐক্যকে সম্ভব করেছে আবার অন্যদিকে স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে রাষ্ট্রীয় ঐক্যকে দুর্বল করেছেন।

সম্রাটের নিচেই আর্থিক ও সামরিক দিক দিয়ে জায়গীরদার ও জমিদারদের বর্ণনা করা যায়। সমসাময়িক সমাজে অন্য কোনো শক্তি তাদের সমকক্ষ ছিল না। ঋণগ্রস্ত, রাজনৈতিক চেতনাহীন কৃষককুল সংখ্যায় বেশি হলেও ক্ষমতাভোগী শ্রেণী হিসাবে ছিল একেবারেই গুরুত্বহীন। এশিয় উৎপাদন প্রথার বিশিষ্টতার জন্যে বণিক সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না। তাছাড়া অভিজাত শ্রেণীই ছিলেন বণিকদের প্রধান ক্রেতা। এর ফলে তারা অভিজাতদের কৃপার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। দেশের সম্পদ উৎপাদনে ভূমি-রাজস্বের তুলনায় বাণিজ্য ও শিল্প উৎপাদনের স্থান ছিল কম গুরুত্বপূর্ণ। এই অবস্থায় জায়গীরদারদের বিকল্প কোনো রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণ করা তাদের পক্ষে ছিল স্বপ্নাতীত।

জমিদার ও জায়গীরদার ছাড়াও মধ্যযুগের ভারতে আরও কয়েকটি শ্রেণী দেখা যায়, যারা কৃষকের উদ্বৃত্ত সম্পদ আত্মসাৎ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। পুরুষানুক্রমে এইসব গ্রামীণ কর্তৃপক্ষেরা কৃষকের অতিরিক্ত সম্পদ আহরণ করতেন। তাদের কৃষক ও জমিদারের মধ্যবর্তী শ্রেণী হিসাবে গণ্য করা যায়। জনতার ঠিক ওপরের স্তরে এদের অবস্থান থাকায় হিন্দু ও ইসলামীয় সংস্কৃতি বিনিময়ে এদের ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

৩৪.৩ অভিজাত শ্রেণীর বিন্যাস, গঠন ও চরিত্র

মুঘল সম্রাট আকবরের সময় থেকেই অভিজাত শ্রেণী একটি সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করে। সুলতানি আমলে ভূস্বামী সম্প্রদায়কে অভিজাত বলে গণ্য করা হত না এবং হিন্দুরা রাজনৈতিক ক্ষমতার কোনো অংশীদার ছিল না। হুমায়ুন প্রথমে তার সভাসদদের তিনটি স্তরে বিভক্ত করেন। এই তিনটি স্তরকে আবার বারোটিতে বিভাজন করা হয়। হুমায়ুনের রাজত্বকালের স্বল্পতার জন্যে এই বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা সম্ভব হয়নি।

সরকারি কর্মচারীদের সুসংগঠিত করার জন্যে আকবর প্রথম মনসবদারি প্রথাকে ঢেলে সাজাতেন। সরকারি কর্মচারীদের প্রায় সকলেই ছিলেন সামরিক দায়িত্বসম্পন্ন। প্রত্যেকেই ছিলেন সেনাবাহিনীর অন্তর্গত প্রত্যেকের জন্যে সম্রাট দুটি করে সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দিতেন। তাদের একটিকে বলা হত "জাত", অপরটিকে বলা হত "সওয়ার"। এই সংখ্যা দুটি সামরিক সংগঠনে সরকারি কর্মচারীদের অবস্থান সূচিত করত। মনসবদারি প্রথার সর্বনিম্ন মান ছিল ১০ (দশ) এবং সর্বোচ্চ ছিল ৫০০০ (পাঁচ হাজার)। "জাত" পদ ছিল প্রত্যেক মনসবদারের ব্যক্তিগত মর্যাদার সূচক আর সওয়ার পদ দ্বারা বোঝা যেত তিনি কতজন সৈন্য রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। যারা মনে করেন মনসবদারি প্রথা আকবরের পূর্বেই প্রচলিত ছিল, তাঁদের মতে সামরিক বিভাগকে শক্তিশালী করার জন্যে রাজত্বের একাদশ বছরে (১৫৬৫-৬৬) আকবর এই ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করেন। এব্যাপারে তাকে প্রচলিত কায়েমী শক্তির সঙ্গে একটি বোঝাপড়ায় আসতে হয়েছিল "সওয়ার" পদ চালু করে এবং তার উপর জোর দিয়ে প্রত্যেক রাজকর্মচারীর সামরিক দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। জায়গীর থেকে উপার্জন অনুযায়ী সৈন্যসামন্ত রক্ষণাবেক্ষণ করা বাধ্যতামূলক হল। এরপর রাজত্বের অষ্টাদশ বছরে (১৫৭৩-৭৪) মনসবদারি প্রথা প্রচলন করা হল। একটিমাত্র সংখ্যাসূচক পদ ধার্য করা হত যা নির্ধারণ করে দিতো সেই রাজকর্মচারী

কতসংখ্যক ঘোড়া এবং ঘোড়াসওয়ার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। যেহেতু বস্তবে খুব কমসংখ্যক কর্মচারীই এই দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হতেন, তাই তাঁর রাজত্বের চল্লিশতম বছরে (১৫৯৫-৯৬) আকবর তার মনসবদারদের তিনটি ভাগে বিভক্ত করলেন। বিভাজনের ভিত্তি ছিল পদ অনুযায়ী কে কত সংখ্যক সওয়ার রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। এর ফলে সামরিক বিভাগে "সওয়ার" পদটি একটি নতুন মাত্রা লাভ করে এবং ১৫৯৭ সাল থেকে "সওয়ার" ও "জাত" মনসবদারি প্রথার ভিত্তিস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

এই দুটি পদ স্থির করে দিত কোন কোন মনসবদারেরা সরকারের কাছ থেকে কী পরিমাণ অর্থ দাবি করবেন। "জাত" পদ নির্দিষ্ট করত তার ব্যক্তিগত বেতন, "সওয়ার" পদ সূচিত করত সামরিক দায়িত্ব অর্থাৎ ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কত অর্থ তাদের সরকার থেকে দেওয়া হবে। বেতনদানের পদ্ধতি অভিজাত শ্রেণীর চরিত্রকে পরিবর্তন করে দেয় অর্থাৎ অভিজাত শ্রেণী রাজার আমলায় পরিণত হয়। প্রত্যেক সওয়ার পিছু কত অর্থ পাওয়া যাবে তা নিয়ে মোরল্যান্ডের বক্তব্যে পরবর্তীকালে ইরফান হাবির সংশয় প্রকাশ করেছেন। একটি জটিল হিসাব-নিকাশ পদ্ধতির ভিতর দিয়ে এই দাম নির্ধারিত করা হত। তবে এখানে একটি বৈষম্য ছিল। বহিরাগত অভিজাতেরা বেশি দাম পেতেন এবং ভারতীয় অভিজাতেরা অনেক কম অর্থ পেতেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে সৈন্যাধ্যক্ষরা তাদের ঘোড়া এবং ঘোড়াসওয়ার সৈন্যদের পর্যবেক্ষণের জন্য হাজির করতেন বকসির কাছে। তখন আবার নতুন করে ঘোড়া এবং ঘোড়াসওয়ারদের সৈন্যদের দাম নির্ধারিত হত। রাজত্বকালের চল্লিশ বছরে আকবর এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করেন। ১৬০৫ সালে এক ঘোড়ার সওয়ারদের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়। এই পদের দাম ছিল কম এবং পরিবর্তনযোগ্য। এই হিসেব অনুযায়ী যারা পাওনা আদায় করতেন তারা কেউ পদ অনুযায়ী সৈন্যসামন্ত রাখতেন না এবং তা আশাও করা হত না।

মনসবদারদের মধ্যে যারা নগদ টাকায় বেতন পেতেন তাদের বলা হত মনসবদার-ই-নগদি আর বাকিদের জন্য ধার্য করা হত নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি বা জায়গীর জমি থেকে আদায়িকৃত রাজস্ব বা "জমা"-র পরিমাণ। মনসবদারদের নির্দিষ্ট বেতন ও সৈন্য রক্ষণাক্ষণের সমান এই জমির উপর তার কোনো অধিকার থাকত না। সম্রাটের ইচ্ছানুযায়ী তাদের এক জায়গীর থেকে অন্য জায়গীরে স্থানান্তরিত হতে হত। এগুলিকে বলা হত "তনখা জায়গীর"। এছাড়াও ছিল "ওয়াতন জায়গীর"। যেগুলি ছিল বংশানুক্রমিক এবং সেখানে কোন বদলির ব্যবস্থা ছিল না। স্বয়ংশাসিত এই জায়গীরগুরির ভূমিরাজস্ব রাজ্য বা জমিদার নির্ধারিত করতেন। "ওয়াতন জায়গীরের" বহুবিধ সুবিধার জন্যে মুঘল রাজত্বের শেষ দিকে বহু মনসবদার তাদের "তনখা-জায়গীর"কে "ওয়াতন জায়গীরে" পরিবর্তিত করতে সচেষ্ট হন।

মনসবদার পদের নিয়োগকর্তা ছিলেন সম্রাট স্বয়ং এবং তিনিই তাদের বদলি ও পদচ্যুতির আদেশ দিতেন। এর ফলে মনসবদারেরা রাষ্ট্র, সম্রাট বা কোনো আদর্শের প্রতি নয় ব্যক্তিগতভাবে একমাত্র সম্রাটের প্রতি অনুগত থাকতেন। যেহেতু প্রত্যেক মনসবদার ছিলেন সামরিক বিভাগের কর্মচারী, তাই সম্রাটের ব্যক্তিগত গুণাবলী এবং সামরিক সাফল্যের উপর সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটত। সম্রাট ও মনসবদারদের

মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা হল পৃষ্ঠপোষক ও পোষ্যের সম্পর্ক। সম্রাটই ছিলেন তাদের ব্যক্তিগত অস্তিত্বের হেতু। আকবর তার ব্যক্তিগত গুণাবলী এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্যের দ্বারা শাসকশ্রেণীর অকুণ্ঠ আনুগত্য লাভ করেছিলেন; শাহজাহানের ব্যর্থতা সেই আনুগত্যের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। তাই আওরঙ্গজেব সিংহাসন অধিকার করেই রাজ্য বিস্তারের নীতিতে এগিয়ে যান। ১৬৬০ সালে শায়েস্তা খাঁর নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রে যুদ্ধ শুরু হয়, ১৬৬১ সালে পালামৌ অধিকৃত হল এবং মীরজুমলা কুচবিহার অধিকার করেন। ১৬৬২ সালে মীরজুমলা আসাম অধিকার করেন। ১৬৬৩ সালে গুজরাটের একাংশ অধিকৃত হল। ১৬৫৫ সালে জয়সিং শিবাজীর সাথে পুরন্দরের চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তিকে মুঘল-মারাঠা সম্পর্কের দ্যোতক বলে মনে করা হয়। ১৬৬৫ সালে বিজাপুরের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করা হয়। ১৬৬৬ সালে শায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম অধিকার করেন। এই সমস্ত অভিযানের পিছনে একটা চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় তা হল অভিজাতদের কাছে নিজেকে পূর্ববর্তী সম্রাট শাহজাহানের চেয়ে যোগ্য প্রমাণিত করা। কিন্তু পরবর্তীকালে দক্ষিণ ভারত অভিযানের অসাফল্য তাঁকে অভিজাতদের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করে। কিন্তু অনুৎপাদক এইসব যুদ্ধের ফলে ব্যয়ভার ক্রমশ বাড়তে থাকে সেই অনুযায়ী রাষ্ট্রের সম্পদ বৃদ্ধি হয় না। আয় ও ব্যয়ের এই ব্যবধান ক্রমশ এক অর্থনৈতিক অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। সম্রাট ও অভিজাতদের মধ্যে যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল তা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা সম্ভব হয় না এবং এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শাসকশ্রেণীর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলিকে প্রকট ও প্রকাশ্য করে তোলে।

মুঘল অভিজাতবর্গের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাকে ভালভাবে বুঝতে হলে অভিজাত শ্রেণীর স্তরবিন্যাস সম্পর্কে আরও কিছু জানা প্রয়োজন। অভিজাত নির্বাচন করার সময় 'কর্ম' নয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বংশগৌরবকেই মর্যাদা দেওয়া হত; তবে বিদ্যাবত্তা ও সামরিক কৃতিত্বকে অবহেলা করা হত না। মনসবদারের পুত্র এবং বংশধরেরা মনসবদারি পদের জন্য সবচেয়ে বেশি দাবিদার ছিলেন, এদের বলা হত "খানাজাদ"। তবে এরা ছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী অভিজাতবর্গের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রয়োজনে মুঘলরা নিয়মিত মিত্র অনুসন্ধান করেছেন। যখনই কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যোগ্যতার সাথে মুঘলদের ক্ষমতাকে প্রতিস্পর্ধা করেছেন, তখনই তাকে তাদের বশীভূত করার জন্যে মনসবদারি প্রথার আকর্ষণকে সামনে রেখে তাদের দাবিকে স্তিমিত করা হয়েছে। এর ফলে মুঘল শাসকশ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন জাতি ও শক্তির সমাবেশ ঘটেছে। কোন কোন সময় অভিজাতদের অন্তর্দ্বন্দ্ব বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে মুঘল শাসকেরা নিজেরাই এই স্বাতন্ত্র্যকে উৎসাহ দিয়েছেন। এক দলের বিরুদ্ধে আর এক দলকে কাজে লাগানোর জন্যে নানারকম চিন্তাভাবনা করেছেন। এইভাবে সমগ্র শাসকশ্রেণীর মধ্যে একটি শক্তির ভারসাম্য বজায় রেখে নিজেদের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণকে অটুট রাখাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। রাজপুতদের সঙ্গে আকবরের মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপনকে শক্তির ভারসাম্য তৈরি করার প্রচেষ্টা হিসাবে গণ্য করতে হবে। এছাড়াও মুসলমান এবং অ-মুসলমানকে নিয়ে একটি মিশ্র অভিজাতশ্রেণী গড়ে তোলাও আর একটি উদ্দেশ্য বলে গণ্য করা যেতে পারে।

"খানাজাদ" ভিন্ন অন্যান্য যারা মনসবদার নিযুক্ত হতেন তাদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় জমিদার এবং দেশীয় রাজন্যবর্গ। দেশজ ভূমিকেন্দ্রিক এই শক্তিকে মুঘলদের উপেক্ষা করার ক্ষমতা ছিল না। আকবর জমিদার শ্রেণীর

মনোভাব পরিবর্তন করতে চাইলেন তাদের মনসবদার পদে নিয়োগ করে, তাদের নিজস্ব ভূসম্পত্তিকে "ওয়াতন জায়গীর" হিসাবে গণ্য করা হত। নরুল হাসান জমিদার শ্রেণীর মধ্যে তিনটি স্তরের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। সবার উপরে ছিল শক্তিশালী স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী স্থানীয় রাজারা, এদের তলায় ছিলেন এক ধরনের মধ্যবর্তী জমিদার, একেবারে নিচের তলায় ছিলেন ক্ষুদ্র জমিদারেরা, যারা একাধারে সম্পন্ন কৃষক অপরদিকে জমিদার। প্রথম শ্রেণীর জমিদারদের মনসবদারের পদে উন্নীত করা হত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর জমিদারদেরও ক্ষমতা স্বীকার করে নিয়ে তাদেরকে একটি সহযোগী শ্রেণীহিসাবে পরিণত করা হত। এত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও সাম্রাজ্যের দিকে বিভিন্ন প্রান্তে এরা ছিলেন একটি শক্তিশালী বিরোধী সম্প্রদায়।

মুঘল সম্রাটরা ছিলনে গুণগ্রাহী এবং ব্যক্তিগত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে নীতি নির্ধারণ করতে পারতেন বলেই বহিরাগত অভিজাতশ্রেণী যথা পারসিক, চাঘতাই, উজবেক, সামরিক নেতৃবৃন্দের কাছে ভারতবর্ষ চিরকাল এক আকর্ষণীয় স্থান রূপে পরিগণিত হত। মুঘল যুগে এরা দলে দলে ভারতে প্রবেশ করেছেন এবং উচ্চ সামরিক পদ লাভ করেছেন। এদের সুযোগ্য নেতৃত্বে মুঘল স্থলবাহিনী অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে পরিণত হয়। মোরল্যান্ডের হিসেবমতো শাহজাহানের রাজত্বকাল অবধি এদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকে, পরে ঔরঙ্গজেবের সময় থেকে এদের গুরুত্ব হ্রাস পায়। এর কারণ হিসাবে আতাহার আলি মধ্য এশিয়ায় রাজনৈতিক অবক্ষয়ের কথা বলেছেন। পিয়ারসন মনে করেন, মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে ভারতবর্ষের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছিল। আকবর বিদেশী শাসকদের ভারতীয়করণের কিছু চেষ্টা করেছিলেন। তার পরেই এই চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়। বিদেশীদের ভারতীয়করণ কোনো পরিকল্পিত ঐতিহাসিক নীতি ধরে হয়নি, হয়েছে সামাজিক বির্তনের হাত ধরে।

সুতরাং বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীকে শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করার ফলে মনসবদারদের মধ্যে ধর্ম, আঞ্চলিকতা, জাতি ইত্যাদির ভিত্তিতে উপদল গড়ে উঠেছিল। ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা যায় অন্তর্দ্বন্দ্ব যার সমাধান পরবর্তী কোনো সম্রাটই করতে পারেননি। তুরানি, ইরানি, আফগান, শেখজাদা বা ভারতীয় মুসলমানদের বিপরীতে ছিলেন রাজপুত, মারাঠা ও অন্যান্য হিন্দুদের দল। তুরানি, ইরানী ইত্যাদি পশ্চিম জাতীয় অভিজাতদের বিরুদ্ধে দল হিসাবে ছিল আফগানদের দলটি। দক্ষিণ দেশীয় মনসবদারদের বিরুদ্ধে ছিলেন উত্তর ভারতীয় মনসবদারেরা। মধ্য এশিয়ার তুর্কিভাষী অঞ্চল থেকে আগত তুরানীরা এবং ইরাক/ইরান থেকে আগত ইরানীরা একর দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন। আবার তুরানীরা সুন্নী এবং ইরানীরা শিয়া ধর্মাবলম্বী হওয়ার জন্যে ধর্মীয় দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করা যায় না।

ভারত ও আফগানিস্তান প্রতিবেশী দেশ হওার জন্যে এবং অতীতের ঐতিহাসিক পটভূমি অনেকটা এক হওয়ার জন্যে আফগান ওমরাহদের বোধহয় বিদেশী বলা যাবে না। বাবরের ভারত আক্রমণের সময় এরা ভারতে প্রবেশ করেন এবং মুঘল শাসন দৃঢ়বদ্ধ করার কাজে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু আফগানদের সাম্রাজ্য তৈরির প্রচেষ্টা মুঘলদের চোখে সন্দেহভাজন করে তোলে। শাহজাহানের সময় খান-ইজাহান-লোদীর বিদ্রোহ মুঘল-আফগান সম্পর্ককে সঙ্কটের মধ্যে নিয়ে আসে। আওরঙ্গজেব তার রাজত্বের প্রথম দিকে আফগান মনসবদারদের সন্দেহের চোখে দেখলেও তার রাজত্বের শেষ দিকে আফগান মনসবদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বিজাপুর রাজ্য জয় করবার পর এই রাজ্যে চাকুরিরত আফগান মুঘল মনসবদারের পদ লাভ

করে। অভিজাততন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে আশ্রয় নিলেও আফগানরা স্থানীয় শক্তির সঙ্গে মৈত্রী করে প্রায়শ সম্রাট বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিতেন। কিন্তু দিল্লির দরবারে আফগানরা নিজেদের একটি দল হিসাবে উপস্থিত করতে পারেননি। আফগান শক্তির উপজাতীয় চেতননার জন্যে মুঘল শক্তির আভ্যন্তরীণ সংহতি অনেকাংশে দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

ভারতীয় মুসলমান বা শেখজাদারা ছিলেন কোন না কোন বিশেষ উপজাতির অন্তর্ভুক্ত যেমন চারহার, সঈদ। আকবরের সময় এরা ছিলেন স্থানীয়ভাবে বিশেষ শক্তিশালী। পরে ঔরঙ্গজেবের সময়ে এদের গুরুত্ব ও সংখ্যা হ্রাস পায়। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ দিকে বহু কাশ্মীরী মুসলমান মনসবদার পদে নিযুক্ত হন এবং শেষ অবধি কাজ করেন। আফগানদের মতো রাজপুতরাও উপজাতীয় গোষ্ঠীগত চেতনা ছাড়তে পারতেন না; কিন্তু শাসক হিসাবে জনগণের উপর নেতৃত্ব এবং হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে এদের অবস্থানগত সুবিধাকে আকবর উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তার রাজত্বে রাজপুতরা বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেব কিছুটা সংকীর্ণ নীতি অবলম্বন করলেও রাজপুতদের সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করতে পারেননি।

সাম্রাজ্য দক্ষিণে প্রবেশ করলে যোদ্ধা জাতি হিসাবে মারাঠারা মুঘল সামরিক শক্তিতে যোগদান করে। মুঘল রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে মারাঠাদের জায়গা করে দিতে ঔরঙ্গজেবের খুবই অসুবিধা হয়েছিল। এই সমস্যা যথাযথ সমাধান না করার ফলে পরবর্তীকালে মারাঠা নেতা শিবাজীকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক স্বাধীনতার আন্দোলন গড়ে ওঠে। মারাঠা ও দক্ষিণী মনসবদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার ফলে মুঘল শাসকশ্রেণীর গঠনে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। হিন্দু-বিরোধিতা সত্ত্বেও ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে হিন্দু মনসবদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। রাজপুতরা পৃথক গোষ্ঠী হিসাবে দুর্বল হতে থাকে। আফগান মনসবদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর চারহার সঈদ, তুরানি ও ইরানী দলের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন "খানজাদ" বা বনেদী বংশের ওমরাহরা।

মুঘল দরবারে দল ও রাজনীতি বৃদ্ধি পাবার ফলে বিভিন্ন বর্গীয় শক্তির সমাবেশ ঘটে। এরা বিভিন্ন দিক থেকে পৃথক ছিলেন। শিয়া ইরানী দলের সুন্নী তুরানি দলের মতপার্থক্য ছিল কিন্তু অভিজাত হিন্দু ও মুসলমান দলের সম্পর্ক মোটের উপর ভালই ছিল বলা চলে যদিও হিন্দুরা নিজেদের বর্ণের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সজাগ ছিলেন। পৃথক ঐতিহ্য, পৃথক ধর্ম, পৃথক ভাষা সত্ত্বেও মুঘল অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন একটি আভ্যন্তরীণ ঐক্য ছিল, যার ফলে তারা ঔরঙ্গজেবের রাজত্ব অবধি একটি শক্তি হিসাবে কাজ করতে পেরেছিল। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর এদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাগুলি ক্রমশ পরিস্ফুট হতে থাকে।

৩৪.৪ অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল অভিজাত শ্রেণীর সামনে সঙ্কট

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্যের দ্রুত অবক্ষয় শুরু হয়। উপদলীয় কলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব মুঘল রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। শক্তিশালী প্রাদেশিক শাসকরা কেন্দ্রীয় সরকারের নামমাত্র কর্তৃত্ব

স্বীকার করে কার্যতস্বাধীন হয়ে পড়ে। মারাঠা বাহিনী দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অতিক্রম করে উত্তর ভারতের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। নাদির শাহ মুঘল সম্রাটকে বন্দী করে ১৭৩৯ সালে প্রকাশ্যে বিনা বাধায় দিল্লি লুণ্ঠন করে। সারা পৃথিবীর সামনে মুঘল সামরিক বাহিনীর অন্তঃসারশূন্যতা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মুঘল সামরিক বাহিনীর দুর্বলতা আলোচনা করতে গেলে কোন ব্যক্তিকে দোষারোপ করার চেয়ে সাময়িক অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তিগুলিকে অনুধাবন করা প্রয়োজন। এটা সত্য যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় হস্তশিল্পের বিপুল চাহিদা ছিল। ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কৃষিজাত দ্রব্য যেমন নীল, ইত্যাদির উৎপাদন বাড়িয়ে যাওয়ার দরকার ছিল। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও তা অর্থনৈতিক চাহিদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। জমির ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন এড়াবার জন্যে নতুন উৎপাদন পদ্ধতির কথা ভাবা হয়নি। দ্বিতীয়ত, অত্যধিক ভূমিরাজস্বের চাপে কৃষকের হাতে খাওয়া-পরা বাদ দিয়ে ভূমির উন্নতি করার মতো কোনো উদ্বৃত্ত থাকত না। তৃতীয়ত, সমাজব্যবস্থার মধ্যে কোনো গতিশীলতা ছিল না। ক্রমবর্ধমান উৎপাদন যেসব এলাকায় হয়েছিল সেখানেও কৃষক ও মাঝারি জমিদারেরা এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারেননি। সময় এগিয়ে যাবার সঙ্গে রাষ্ট্রের চাহিদা বাড়তে থাকে এবং একসময় তা পূরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৬০৫ সালে জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহণের সময় মনসবদারদের সংখ্যা ছিল ১১,৪৫৬; এই সংখ্যা ১৬৩৭ সালে আট (৮,০০০) হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষভাগে সংখ্যাটা গিয়ে পৌঁছয় ১১,৪৫৬। অভিজাতদের সংখ্যা প্রায় পাঁচগুণ বেড়েছে কিন্তু রাষ্ট্রের সম্পদ সেই অনুযায়ী বাড়েনি। উপরন্তু সম্রাটদের বিলাসবহুল জীবন ও বিলাসিতাকে অভিজাতরা অনুকরণ করতে থাকেন, ফলস্বরূপ রাষ্ট্রের সঞ্চিত সম্পদের বিনাশ ঘটতে থাকে।

৩৪.৪.১ রাজনৈতিক সমস্যা

মুঘল রাষ্ট্রনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অভ্যুত্থান এই যুগের অন্যতম রাজনৈতিক সমস্যা, বহু ক্ষেত্রে সশস্ত্র বিদ্রোহ এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে সম্রাটকে স্বয়ং বিদ্রোহ দমন করতে যেতে হয়। যেমন জাঠ বিদ্রোহ, জাঠ কৃষকেরা ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে একবার প্রাথমিক পর্যায়ে, পরে ১৬৮৬ সালে দ্বিতীয় অভ্যুত্থান ঘটে। দ্বিতীয় বিদ্রোহটি ছিল অনেক ব্যাপক ও মারাত্মক। রাজপুত নেতা বিষাণ সিং ১৬৯১ সালে এই বিদ্রোহ দমন করেন। জাঠরা কোনো রাষ্ট্র গঠন করতে পারেনি। আঞ্চলিক ভিত্তিতে পৃথক রাষ্ট্রের চাহিদা পরবর্তীকালের রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল।

জাঠদের মতই সৎনামী সম্প্রদায়রা ১৬৭২ সালে মুঘল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ বেছে নেয়। বিদ্রোহের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে স্থানীয়ভাবে এই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয়নি। সম্রাট স্বয়ং রাজপুত সমরনায়ক এবং জমিদারদের সাহায্যে এই বিদ্রোহকে দমন করেন।

১৬৭৫ সালে গুরু তেগবাহাদুরের প্রাণদণ্ডকে কেন্দ্র করে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে শিখদের রাজনৈতিক বিরোধ শুরু হয়। মুঘল-শিখ বিদ্রোহের দুটি সম্ভাব্য কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে। (এক) মুঘল রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র গড়বার আহ্বান করে শিখ গুরু মুঘল রাষ্ট্রশক্তির সার্বভৌমিকতাকে বিপন্ন করে তুলেছিলেন। (দুই) মুসলমান ফকির হাকিম আদমের সহযোগিতায় পাঞ্জাব প্রদেশে মুঘল রাষ্ট্রশক্তিকে অগ্রাহ্য করেছিলেন। গুরুগোবিন্দ সিং পরবর্তীকালে শিখধর্মীয় সংগঠনকে একটি জাতীয়তাবাদী সামরিক চরিত্র দান করেন। মুঘল-শিখ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব পরবর্তী মুঘল ইতিহাসের নিয়মিত বৈশিষ্ট্য হয়ে পড়ে।

যদিও এই আঞ্চলিক বিদ্রোহগুলি মুঘল সামরিক সংগঠনের বিশেষ কোনো ক্ষতি করতে পারেনি; কিন্তু মুঘল সেনাবাহিনী যে অপরাজেয় এবং অপ্রতিরোধ্য নয় এই বিশ্বাস তারা ভেঙে দিয়েছিল এবং অপরদিকে এইসব বিদ্রোহ ঔরঙ্গজেবের মনে হিন্দুদের প্রতি অবিশ্বাসের মনোভাবকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল এছাড়াও হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিঘ্ন ঘটিয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

জাঠ ও শিখ বিদ্রোহের চেয়েও বেশি মারাত্মক ছিল ১৬৭৯ সালে রাজপুত নেতা যশোবন্ত সিং-এর মৃত্যুর পর মুঘল-রাজপুত রাজনৈতিক লড়াই। যশোবন্ত সিং অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সম্রাট উত্তরাধিকারী স্থির করার জন্যে ব্যস্ত হন। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য জায়গীরদারের মতোই যশোবন্ত সিং-এর কাছে রাষ্ট্রের অনেক পাওনা ছিল। সেই টাকা আদায় করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কার্যত মুঘলরা মারওয়ারে সাম্রাজ্যবাদী বিজেতা শক্তির মতো ব্যবহার করতে শুরু করে। মারওয়ার দেশ এবং দেশবাসীকে বিরোধী ব্যক্তিতে পরিণত করে, অজিত সিং-এর ন্যায্য দাবি উপেক্ষা করে মুঘল সৈন্যরা মারওয়ার আক্রমণ করে এবং পরাজিত করে। এই পর্যায়ে মেবারের রানা রাজ সিং অজিত সিং-এর পক্ষে যোগ দিয়ে মুঘল রাজপুত দ্বন্দ্বকে নতুন পর্যায়ে নিয়ে যায়। আঞ্চলিক বিদ্রোহ এখন প্রায় একটি জাতীয় বিদ্রোহের রূপ নেয়। ১৬৯৮ সালে রাজপুত নেতা অজিত সিং-এর অধিকার স্বীকার করে নিলে বিরোধের মীমাংসা হয় বটে কিন্তু ১৭০৭ সাল অবধি রাজপুত সমস্যার কোনো পূর্ণাঙ্গ সমাধান হয়নি।

রাঠোর বিদ্রোহের পরও ছোট ছোট রাজপুত নেতারা ঔরঙ্গজেবের পক্ষে ছিলেন এবং (দুই) মুঘল সামরিক শক্তি তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিদ্রোহের গুরুত্বকে অন্যত্র খুঁজতে হবে। দেশের প্রধান সামরিক শক্তিগুলিকে নিয়ে মুঘলরা মিত্র অভিজাত শ্রেণী গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। এখন থেকে সে প্রচেষ্টায় বাধা পড়তে শুরু করল। বিচ্ছিন্নবাদী স্বতন্ত্র শক্তিগুলিকে প্রতিরোধ করার পরিবর্তে তাদের শক্তি বৃদ্ধি হল। দ্বিতীয়ত, রাজপুতদের অনুপস্থিতির ফলে ভবিষ্যতে মারাঠাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা কঠিন হয়ে পড়ল; তৃতীয়ত, রাষ্ট্রের সঙ্কটকালে রাষ্ট্রের সম্পদের বিনাশ মুঘল রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে এক গভীরতর সঙ্কটের দিকে পরিচালিত করল।

সপ্তদশ শতকের শেষ এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে মুঘল সাম্রাজ্য ও মুঘল শাসকশ্রেণীর পক্ষে যেটি সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তা হল মারাঠাদের উত্থান। সম্রাট শাহজাহানের সময়ই শাহজী ভোঁসলে প্রথমে পুনার আশেপাশে এবং পরে বালামোরে এক আধা স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলেন। শিবাজীরও প্রারম্ভিক লক্ষ্য ছিল পুনায় পিতার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করা, নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, জাতব্যবস্থার

ঊর্ধ্বে ওঠা। বিজাপুর সরকার তাকে দমন করতে ব্যর্থ হলে মুঘল শক্তির সঙ্গে তার রাজনৈতিক সংঘাত বাধে। সম্প্রতি বিজিত আহমদনগরের সীমান্তে শিবাজীর স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব মুঘল সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার পক্ষে ছিল বিপজ্জনক। দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্যের দক্ষিণপ্রান্ত এবং পশ্চিম উপকূলের সঙ্গে উত্তর ভারতের বাণিজ্যপথের উপর এক নতুন রাজ্য ছিল মুঘল-বাণিজ্যিক স্বার্থের পরিপন্থী। তৃতীয়ত, মুঘল অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে মুঘলদের পক্ষে দক্ষিণী রাষ্ট্রগুলির ক্ষতি না করে শিবাজীর দাবি মেনে নেওয়া ছিল অসম্ভব। চতুর্থত, ঔরঙ্গজেব ব্যক্তিগতভাবে শিবাজীকে অপছন্দ ও অবিশ্বাস করতেন। পঞ্চমত, শিবাজীকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখে তার পিছনে জাতীয় জনজাগরণের শক্তিকে অবহেলা করে ঔরঙ্গজেব রাজনৈতিক সুবিবেচনার পরিচয় দেননি।

শিবাজীকে দমন করার প্রাথমিক ব্যর্থতাসমূহ মুঘল সাম্রাজ্যের মর্যাদাকে বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ করল। ১৬৬৫ সালে রাজপুত নেতা জয় সিং-এর সাফল্য এবং পুরন্দরের চুক্তি এই মর্যাদাকে কিছুটা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

১৬৭৫ সালে দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়কে কেন্দ্র করে মুঘল মারাঠা কলহ একটি নতুন দিকে মোড় নেয়—(এক) "চৌথ" ও "সরদেশমুখী"র দাবি মুঘল সার্বভৌমিকতার ধারণার প্রতিপন্থী; (দুই) যেভাবে শিবাজী দাক্ষিণাত্যে এই কর আদায় করতেন তা দেশের বাণিজ্য ও শিল্পের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল; (তিন) শিবাজীর ব্যবস্থা শিল্পসমৃদ্ধ পশ্চিম উপকূলকে জনবহুল ও সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র উত্তর ভারতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। এই পর্যায়ে তিনি শিবাজী পুত্র শম্ভুজীকে দেশদ্রোহিতার অপরাধে প্রাণদণ্ড দেন; কিন্তু শম্ভুজীর পুত্র শাহুর প্রতি আশ্চর্যজনক উদার নীতি অবলম্বন করেন। ১৬৮৯ সাল থেকে ১৬৯৮ সাল অবধি ঔরঙ্গজেবের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মারাঠা রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র "জিঞ্জি" অধিকার করা। তার ধারণা ছিল এই যে "জিঞ্জি" অধিকার করতে পারলে মারাঠারা স্বেচ্ছায় মুঘল অধীনতা মেনে নেবে। ব্যক্তিগতভাবে মারাঠা নেতাদের দমন করা হয়তো সম্রাটের পক্ষে কঠিন ছিল না এবং ১৬৯৮ সাল অবধি পরিস্থিতিকে মুঘলদের পক্ষ থেকে খুব বেশি প্রতিকূল বলা যাবে না। কিন্তু ঔরঙ্গজেব মারাঠা গণশক্তিকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারেননি। মারাঠা গণজাগরণের ফলে মুঘল সামরিক শক্তিকে বিপর্যয়ের সামনে পড়তে হয়। শ্রেষ্ঠ মুঘল সেনাপতিদের উপস্থিতিও অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারল না। এই অবস্থায় আলাপ-আলোচনা শুরু করা ছাড়া অন্য কোন পথ রইল না। ১৭০০ সালে ঔরঙ্গজেব তারাবাঈ-এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ১৭০৩ সালে মারাঠা নেতা ধনা যাদবের নেতৃত্বে আলাপ-আলোচনা নূতন করে শুরু হল। ১৭০৬ সালে জুলফিকার আলির নেতৃত্বে অপর একটি আলোচনা কার্যকরী হল না। মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থান সর্বভারতীয় মুঘল সাম্রাজ্য প্রসারের পথে ছিল মস্ত বড় প্রতিবন্ধক। প্রথমত, মারাঠা-রাজপুত অভিজাত শ্রেণীর অনুপস্থিতি—মুঘল রাষ্ট্রের অভিজাতদের কাঠামোতে পরিবর্তন নিয়ে আসে। দ্বিতীয়ত, প্রচলিত রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে সমস্ত মারাঠা সর্দারদের দাবি মেনে নেওয়া ছিল অসম্ভব।

সুতরাং এই সমস্ত রাজনৈতিক বিপর্যয় জায়গীরদারি ব্যবস্থা, যা ছিল মুঘল অভিজাতদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র তাতে আঘাত নিয়ে আসল। রাজনৈতিক বিপর্যয় জায়গীরদারি ব্যবস্থায় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে এক বিরাট সঙ্কটের সূচনা করেছিল।

৩৪.৪.২ জায়গীরদারি ব্যবস্থার সঙ্কট

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে মুঘল শাসক সম্প্রদায়কে যে দুরূহ অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সাধারণভাবে তাকে বলা হয় জায়গীরদারি সমস্যা। প্রশাসনের ব্যয়, ক্রমবর্ধমান যুদ্ধের খরচ মেটান এবং শাসকশ্রেণীর বিলাসবহুল জীবনযাত্রার খরচ যোগানোর মতো উদ্বৃত্ত সম্পদ রাষ্ট্রের হাতে ছিল না। মুদ্রার মূল্যহ্রাস একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা রূপে দেখা দেয়, যার ফলে ভারতকেও পশ্চিমী দেশগুলির মত মূল্যবৃদ্ধিজনিত সমস্যার সামনে পড়তে হয়। সেই সঙ্গে শাসকশ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয় ও প্রত্যাশাও বেড়ে যায়। অধ্যাপক আতাহার আলি দেখিয়েছেন যে, সপ্তদশ শতক থেকেই বিলাসসামগ্রীর দাম বাড়তে থাকে। ফলে বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত মুঘল রাজপুরুষদের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যায়। ব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই অবস্থায় আয় বাড়ানোর প্রয়োজন ছিল, কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। কৃষি উৎপাদন এবং কৃষিজ পণ্যের মূল্য বাড়লেই তবেই ভারতীয়দের আয় বাড়বার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু শাসক-গোষ্ঠীর প্রয়োজন যে হারে বেড়েছিল অর্থনীতির নিয়ম অনুসারে উৎপাদন সে হারে বাড়েনি। কৃষির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল, অন্যদিকে পণ্যসামগ্রীর মূল্য প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়াল। এর ফলে "জমা" নির্ধারিত রাজস্বের বৃদ্ধির পরিমাণ হয়ে দাঁড়াল প্রায় প্রান্তিক এবং প্রায়ই "হাসিলের" (আদায়ীকৃত রাজস্ব) পরিমাণ "জমা"র চেয়ে অনেক কম হত। এই অবস্থায় জায়গীরদারদের মধ্যে বন্টনযোগ্য উৎকৃষ্ট জায়গীরের (যেখানে রাজস্ব পূর্ণমাত্রায় আদায় হয়) পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। অন্যদিকে মনসবদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার ফলে অসংখ্য মনসবদারদের মধ্যে প্রতিয়োগিতা শুরু হয়ে যায়। এই দ্বন্দ্ব আরো তীব্র করেছিল জায়গীরের অসম বণ্টন ও মুষ্টিমেয় মনসবদারদের হাতে সম্পদের ভারসাম্যহীম কেন্দ্রকরণ।

সম্রাট শাহজাহানের সময়েই "জমা' এবং "হাসিল" -এর মধ্যে পার্থক্য জায়গীরদারি সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। অনেক সময়েই মনসবদারেরা যে জায়গীর পেতেন তার "জমা" কাগজে-কলমে তাদের আয়ের সমান হলেও সমগ্র বৎসরের আদায়ীকৃত রাজস্ব তার অর্ধেক এমনকি দাক্ষিণাত্যের এক-চতুর্থাংশ বেশি হত না। অন্যদিকে "আইন-ই-আকবরীর" সময় থেকে শাহজাহানের রাজত্বকালের দশম বর্ষের (১৬৩৭) -এর মধ্যে মনসবদারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। অধ্যাপক হাবিবের হিসাব অনুযায়ী ১৬০৫ থেকে ১৬২১ সালের মধ্যে "জাত" মনসবের সত্যিকারের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে; "সওয়ার" মনসবের সংখ্যা ঠিক কবে বৃদ্ধি পেয়েছিল তার হিসেব করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। মনসব পদের সংখ্যা বৃদ্ধি স্বভাবতই কোষাগারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ইতিপূর্বে জাহাঙ্গির ও শাহজাহান বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজের সমস্যাকে যুগোপযোগী করবার চেষ্টা করেছিলেন। শাহজাহান আর্থিক দায়িত্ব কমানোর সঙ্গে সঙ্গে সামরিক দায়িত্বও কিছু কমিয়ে আনেন। ফলে অধ্যাপক হাবিবের মতে, মনসবদারদের খুব বেশি ক্ষতি হয়নি, এছাড়া দাক্ষিণাত্য বাদ দিয়ে সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ থেকে মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আয় বাড়ছিল, কিন্তু শাহজাহানের রাজত্বের প্রথম দুই দশকে "জমা" ও "হাসিলের " মধ্যে পার্থক্য উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছিল। অবস্থার অন্নতিকল্পে শাহজাহানকে কতকগুলি সংস্কারমূলক ব্যবস্থা নিতে হয়।

শাহজাহানের সংস্কার স্থায়ীভাবে সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। ব্যয় সংকোচ করে, নতুন কর ধার্য করে, কৃষির সম্প্রসারণের দিকে নির্দেশ দিয়েও ঔরঙ্গজেব অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারেননি। দাক্ষিণাত্য যুদ্ধের ফলে বহুসংখ্যক সামরিক নেতাকে মুঘল শাসনযন্ত্রের প্রতি অনুগত করবার জন্যে মনসবদারের পদ দিতে হয়েছিল। এর ফলে জমির অনুপাতে "মনসবদারের সংখ্যা" অনেক বেড়ে যায়। দাক্ষিণাত্য যুদ্ধ ও মারাঠা আক্রমণের ফলে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে সমভাবেই শাসনব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছিল। ফলে অধিকাংশ স্থান থেকেই জায়গীরদারেরা তাদের প্রাপ্য আয় আদায় করতে পারতেন না; আয়কে সুনিশ্চিত করবার জন্যে অধিকাংশ জায়গীরদারেরা উত্তর ভারতে "জায়গীর" চাইতেন। আবার ভাল জায়গায় "জায়গীর" পেলেও মনসবদারদের নিশ্চিত হওয়ার কোন অবকাশ থাকত না কারণ বদলির আশঙ্কা সবসময়ই থাকত। বদলি হবার পর "জায়গীর"-দারদের "জায়গীর" হীন অবস্থায় অনেকদিন প্রায় চার/পাঁচ বছর কাটাতে হত। দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য জয় করে এই সমস্যার সমাধান করার দাবি ওঠে। কিন্তু তাতেও সমাধান করা যেত না, কারণ দাক্ষিণাত্য ছিল বরাবরই ঘাটতি এলাকা।

ঔরঙ্গজেব বিজাপুর, গোলকুণ্ডা জয় করবার পরেও সমস্যা একইরকম থেকে গেল কারণ তিনি নববিজিত অঞ্চলে মুঘল শাসনব্যবস্থাকে সংগঠিত করে অধিকৃত অঞ্চলের ভূসম্পত্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারেননি। উৎকৃষ্ট জমিকে "খালিসা" জমিতে পরিণত করে অনুৎকৃষ্ট জমিতে তিনি মনসবদারদের মধ্যে বিতরণ করেন। এইসব অঞ্চল থেকে রাজস্ব আদায় করা ভয়ঙ্কর কঠিন কাজ ছিল। জে. এফ. রিচার্ডসন তাই মন্তব্য করেছেন, "জায়গীর সমস্যা আসলে কৃত্রিম। এর প্রধান কারণ সম্পদের ঘাটতি নয়, ঔরঙ্গজেবে ভ্রান্ত নীতি।"

ঔরঙ্গজেব বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার অতিরিক্ত সম্পদ কৃষির উন্নতির কাজে না লাগিয়ে যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের কাজে লাগিয়েছিলেন। এর ফলে ব্যয়ভারের তুলনায় সম্পদের ঘাটতি বাড়ে। "খালিসা" ও "জায়গীর" উভয় প্রকার জমি থেকেই "হাসিলের" পরিমাণ জমার থেকে কমে আসছিল। জায়গীর সমস্যার মূল চরিত্র প্রধানত সামাজিক। শুধুমাত্র সরকারি নীতির পরিবর্তন করে বা কৃষির সম্প্রসারণ করে এই সমস্যার সমাধান করা যেত না। নতুন কারিগরীবিদ্যা প্রয়োগ করে শিল্পের উন্নতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করতে পারলে সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল। এর জন্যে দরকার ছিল। এর জন্যে দরকার ছিল সামাজিক পরিবর্তন এবং তার ছিল কোনো একজন সম্রাটের সাধ্যের বাইরে।

৩৪.৪.৩ অদূরদর্শী মুঘল অভিজাতদের আত্মক্ষয়ী সংগ্রাম

মুঘল শাসকশ্রেণী ও মুঘল অভিজাতদের উপর জায়গীরদারি সমস্যার প্রতিক্রিয়া ছিল সুদূরপ্রসারী। উপার্জন কমে যাওয়ায় বেশিরভাগ মনসবদার তাদের "সওয়ার" পদ অনুযায়ী উচিত সংখ্যক সৈন্য রক্ষণাবেক্ষণ করতেন না। মনসবদারি ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে থাকে। জাহাঙ্গীরের সময়ে "সওয়ার" ও "জাত" এই শব্দ দুটি অর্থহীন সংখ্যায় পরিণত হয়েছিল। শাহজাহান সংক্রান্ত করে কিছুটা পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন; মনসবদারদের সামরিক দায়িত্ব বেঁধে দিয়েছিলেন। কিন্তু মৌলিক কোনো পরিবর্তন তিনি আনেননি। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষদিকে মনসবারদের আয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেতে থাকে। তখন মনসবদারেরা তাদের দায়িত্ব চূড়ান্তভাবে অবহেলা করতে থাকেন এবং সম্রাটের অনুপস্থিতিতে তাদের বাধ্য করানোর মতো কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা ছিল না।

এই অবস্থার ক্রমশ অবনতি ঘটতে থাকে। সম্রাট মুহম্মদ শাহের আমলে কয়েকজন উচ্চপদাধিকারী ছাড়া কেউ তাদের দায়িত্ব পালন করতেন না।

জায়গীরের অভাব, উৎকৃষ্ট জায়গীরের জন্য রেষারেষি মুঘল শাসকশ্রেণীর অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসল। সাম্রাজ্যের স্বার্থ ভুলে গিয়ে তারা নিজেদের স্বার্থ নিয়ে লড়াই করতে লাগলেন। দক্ষিণী মনসবদারদের পক্ষপাত দেখানোর জন্যে "খানাজাদ" মনসবদারেরা রুষ্ট হলেন এবং হৃত মর্যাদা ফিরে পাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বাড়তে লাগল। উৎকোচের দ্বারা বশীভূত করে ভালো জায়গীর পাবার প্রচেষ্টা শাসকশ্রেণীর উচ্চস্তরে দুর্নীতি নিয়ে এল।

মুঘল যুগের শেষ দিকে অভিজাতশ্রেণী তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ইরানি দলের নেতা ছিলেন আসাদ খাঁ এবং তার পুত্র জুলফিকার খাঁ, তুরানি দলের নেতা ছিলেন গাজি-উদ্দীন-খান ফিরোজ এবং পুত্র ছিল কুলিচ খান এবং হিন্দুস্তানী দলের সদস্য ছিলেন সঈদ ভ্রাতৃদ্বয়—খান-ই-দউরান এবং হিন্দু নেতারা পারিবারিক সম্পর্ক, ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব এবং স্বার্থবোধ থেকে দলগুলি গড়ে উঠেছিল। ইরানি নেতা জুলফিকার খানের সমর্থক ছিলেন আফগান নেতা দাউদ-খান-পান্নি এবং হিন্দু নেতা রাও রামসিংহ ও দলপত রাও বুন্দেলা। ফারুকশিয়ারে সময় সঈদ ভ্রাতৃদ্বয় ক্ষমতায় এলে তারা তুরানি নেতাদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। ১৭২৪ সালে নিজাম-উল-মূলক নিজের স্বার্থরক্ষার জন্যে মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি করতে দ্বিধাবোধ করেননি।

কিন্তু অভিজাতশ্রেণীর দলাদলি কখনই অহিংস সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ নেয়নি। তারা রাজসভায় সর্বদা ক্ষমতা দখলের জন্য ষড়যন্ত্র করছিলেন। এই অবস্থায় উজীবরা যদিস্রাটের অকুণ্ঠ সমর্থন পেতেন তাহলে হয়তো তারা সাম্রাজ্যকে বাঁচানোর জন্যে কিছু গঠনমূলক নীতি গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু পরবর্তীকালের দুর্বলচেতা সংকীর্ণমনা সম্রাটরা নিজেদের সিংহাসন বাঁচানোর জন্যে দলাদলি বন্ধ করবার পরিবর্তে তার ভারসাম্যকে বজায় রেখে নিজেরা টিকে থাকার চেষ্টা করতেন। যোগ্য সম্রাট ও উজীরের অভাবে সাম্রাজ্য দুর্বল হল; প্রায় খণ্ডিত হবার আশঙ্কা দেখা দিল। অনেকে সম্রাটের নিকট নামমাত্র আনুগত্যের পরিবর্তে স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন। শুরু হল দলত্যাগ ও বিভাজন। অষ্টাদশ শতকে মুঘল শাসকবর্গ নতুন নীতি অনুসরণ করে সাম্রাজ্যকে পুনরুজ্জীবিত ও শক্তিশালী করে তোলার পরিবর্তে নিজেরাই তার অবলুপ্তির প্রধান সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

৩৪.৫ সারাংশ

মুঘল রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে অভিজাতবর্গের গুরুত্ব অনুধাবন করতে না পারলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের প্রক্রিয়াকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যাবে না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল সাম্রাজ্যের সমস্ত রাজনৈতিক সঙ্কটের পিছনে অভিজাতবর্গের দুর্বল রাজনৈতিক ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

মুঘল সমাজব্যবস্থা চূড়ান্ত অসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অভিজাতশ্রেণী ও জমিদারদের নিয়ে মুঘল শাসকশ্রেণী গঠিত ছিল। এদের মধ্যে অনেক বিদেশীদের দেখতে পাওয়া যায় যদিও পরবর্তীকালে তারা ভারতীয়

ভাবধারা আয়ত্ত করেছিলেন। এরা ছিলেন সুবিধাভোগী শ্রেণী। অপরদিকে সুযোগ-সুবিধাহীন অসংখ্য কৃষককুল এবং জনতার অন্যান্য অংশ নিয়ে শাসিত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। এদের উভয়ের মাঝে সংখ্যালঘু ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল বণিক শ্রেণীর অবস্থান ছিল।

ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভারতে জমিদারী প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল। তুর্ক-আফগান শাসকদের সময় থেকেই জমিদারদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সেই চেষ্টা ছিল সাময়িক, ফলে জমিদারেরা আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে রাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও কলহের মধ্য দিয়ে টিকে থাকেন। জায়গীরদারেরা ভূস্বামী হলেও তারা ছিলেন মুঘল বাদশাহের কর্মচারী। রাষ্ট্রকে সেবা করবার পরিবর্তে তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি ভোগ করতেন; জমির উপর তাদের অধিকার ছিল সীমিত, ফলে অধিকাংশ সময়েই তারা জমির উন্নতিতে আগ্রহ দেখাতেন না। বণিককুল তাদের অস্তিত্বের জন্যে সম্রাট ও জায়গীরদারের উপর নির্ভর করতেন। প্রায়শ তাদের কোনো স্বাধীন ভূমিকা ছিল না, জমিদার ও জায়গীরদারের তলায় পুরুষানুক্রমে অধিকারভোগী কয়েক শ্রেণীর ক্ষুদ্র ভূস্বামী সম্প্রদায় লক্ষ্য করা যায়।

জায়গীরের মালিককে মনসবদার বলা হত। এরা ছিলেন মুঘল সামরিক সংগঠনের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ। "সওয়ার" ও "জাত" অনুযায়ী মনসবদারদের নানা ভাগে ভাগ করা যায়। সরকার বা রাষ্ট্রের প্রতি নয়, নিয়োগকর্তা হিসাবে জায়গীরদারদের সমস্ত আনুগত্য ছিল সম্রাটের প্রতি। শক্তিশালী সম্রাটের আমলে স্থিতাবস্থা দেখা যায় কিন্তু ঔরঙ্গজেবের পরে দুর্বল সম্রাটদের সময় সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা প্রকট হয়ে পড়ে। ঔরঙ্গজেবের পরবর্তীকালে মুঘল সামরিক বাহিনীকে বোঝবার জন্যে সমসাময়িক অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তিগুলিকে অনুশীলন করা দরকার। মনসবদারদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়তে থাকে এবং অতিরিক্ত সম্পদ উৎপাদন করা প্রচলিত কৃষিব্যবস্থার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

কৃষি ও কৃষকের উপর অত্যধিক চাপ পড়ায় মুঘল রাজত্বের শেষের দিকে ব্যাপক কৃষি-বিদ্রোহ দেখা যায়। হিন্দু জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ মুঘল সরকারের সামনে জটিল সমস্যার উপস্থিত করে; বিশেষ করে মারাঠা বিদ্রোহকে দমন করার ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় সুনিশ্চিত হয়। এই অবস্থায় দেখা যায় "জায়গীরদারি সঙ্কট"। সমস্ত মনসবদারেরা উপযুক্ত পরিমাণে জায়গীর পাচ্ছিলেন না। আবার যারা জায়গীর পেয়েছিলেন তারা সেখান থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারছিলেন না। ঔরঙ্গজেব বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য জয় করে জায়গীরদারি সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার ভ্রান্ত নীতির জন্যে প্রার্থিত ফল লাভ করা যায়নি।

জায়গীরদারি সঙ্কট থেকে উদ্ভূত হয় মুঘল দরবারে "দল" ও রাজনীতি। তিনটি উপদলে বিভক্ত মুঘল অভিজাতরা সর্বদা আত্মকলহে মত্ত থেকে সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে। পক্ষান্তরে দুর্বল রাষ্ট্রব্যবস্থা তাদের সংরক্ষণ করতে পারে না। পরিণামে তাদেরও অবসান ঘটে।

৩৪.৬ অনুশীলনী

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

১। মুঘল সাম্রাজ্যের স্তরবিন্যাসে জমিদারদের অবস্থান আলোচনা করুন।

২। মুঘল-মারাঠা সম্পর্কের উপর সমালোচনামূলক নিবন্ধ পেশ করুন।

৩। জায়গীরদারি ব্যবস্থার সঙ্কট কীভাবে সৃষ্টি হল এবং এর কোনো স্থায়ী সমাধান পাওয়া গেল না কেন?

৪। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :**

(ক) মুঘল অভিজাতদের বিভিন্ন দল বিভাজন বর্ণনা করুন।

(খ) মুঘল রাষ্ট্রব্যবস্থায় বণিক সমাজের দুর্বল ভূমিকার কারণ কী?

(গ) ঔরঙ্গজেবের রাজপুত নীতি কতটা ভ্রান্ত ছিল?

৩৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

1. Habib, Irfan : *The Agrarian System of Mughal India.*
2. Chandra Satis : *Party Politics in the Mughal Court.*
3. Habib, Irfan (ed) : *The Mediavel India,* Vol. 1.
4. Raychaudhury Tapan & Habib, Irfan (ed) : *The Cambridge History of India,* Vol. 1.
5. বন্দ্যোপাধ্যায় শেখর : *অষ্টাদশ শতকের মুঘল সঙ্কট ও আধুনিক ইতিহাস চিন্তা।*

একক ৩৫ ❐ অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়

গঠন :

৩৫.০ উদ্দেশ্য

৩৫.১ প্রস্তাবনা

৩৫.২ আঞ্চলিক রাজ্যসমূহের আবির্ভাব

৩৫.৩ আঞ্চলিক রাজ্যসমূহ : বাংলা

৩৫.৪ আঞ্চলিক রাজ্যসমূহ : অযোধ্যা

৩৫.৫ আঞ্চলিক রাজ্যসমূহ : হায়দরাবাদ

৩৫.৬ অনুশীলনী

৩৫.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- ভারতের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতকের গুরুত্ব কতখানি।
- মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের ফলে বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তিগুলির উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল।
- ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত কিভাবে ঘটেছিল।

৩৫.১ প্রস্তাবনা

১৭০৭ সালে দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধরত অবস্থায় মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু থেকে ১৭৫৭ সালে বাংলার বুকে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জয়লাভ পর্যন্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর এই পঞ্চাশ বছরকে ভারতের ইতিহাসে একটি কালিমালিপ্ত অন্ধকারময় যুগ বলেই চিহ্নিত করা হয়ে আসছিল। ইউরোপীয় ঐতিহাসিক উইলিয়াম আরভিন (William Irvine) তাঁর Later Mughals গ্রন্থে ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিদ্রোহ বিধ্বস্ত মুঘল সাম্রাজ্যের শীর্ষস্থানে আসীন একের পর এক শাসন-বিমুখ বিলাস-বিহ্বল, স্বার্থান্বেষী, পারস্পরিক বিভেদ জর্জরিত মুঘল অভিজাত সম্প্রদায়ের বিধ্বংসী ষড়যন্ত্রের শিকার অকর্মণ্য মুঘল বাদশাহের অপটুতার ফলে সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত অবক্ষয় এবং অবশেষে ধ্বংসের কাহিনী বিবৃত করেন। আচার্য যদুনাথও এই তত্ত্ব মেনে নেন যে, ভারতের গরিমাসূর্য মুঘল সাম্রাজ্যে অস্তমিত হয়ে পুনরাভির্ভূত হয় ইংরেজের জয়সূর্য হয়ে। মুঘল শাসনের পরেই ইংরেজ শাসন সম্পূর্ণ নূতন একটি যুগের সূচনা করে বলে তাঁরা মনে করেন। কী সাম্রাজ্যবাদী, কী জাতীয়তাবাদী সব ঐতিহাসিকই এই একটি বিষয়ে একমত যে, ইংরেজ রাজত্ব পূর্ববর্তী

যুগের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাম্রাজ্যবাদীরা ভাবেন যে ইংরেজ শাসন ভারতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। অন্ধ কুসংস্কার এবং স্থবিরতা থেকে মুক্ত করে ইংরেজ রাজত্ব ভারতীয় ইতিহাসে এক আধুনিক, গঠনমূলক সভ্যতার সূচনা করে। সাম্রাজ্যবাদের ঘোর বিরোধী হয়েও কার্ল মার্কসও ভারতের সামন্ততান্ত্রিক অতীত মুছে ফেলে দেশের সামগ্রিক আধুনিকীকরণের জন্যে ইংরেজ শাসনের অপরিহার্য ভূমিকার কথা অস্বীকার করতে পারেননি। জাতীয়তাবাদীরা আবার ইংরেজ শাসনকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁদের ব্যাখ্যায় ইংরেজ শাসন ভারতের অর্থসম্পদ লুণ্ঠন করে, ভারতের বাণিজ্য এবং পুঁজি ধ্বংস করে, ভারতের সামরিক শক্তিকে সাম্রাজ্য গঠনের কাজে নিয়োগ করে এবং ভারতীয় শ্রমিককে বিদেশী পুঁজির অধীন করে ভারতের স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ করেছে। সাম্রাজ্যবাদী এবং জাতীয়তাবাদীরা এই যে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের মধ্যে বিরাট ব্যবধানের কথা বলেছেন আধুনিক ঐতিহাসিকরা আর সে তত্ত্ব মেনে নিতে পারছেন না। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক এরিক স্টোকস্ (Eric Stokes) এবং তাঁর সুযোগ্য ছাত্রগণ মুঘল শাসনের পতনের সময় থেকে ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনাকাল পর্যন্ত সময়টা নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে এই সময়েও ভারতের শাসনতান্ত্রিক, বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিবর্তনের ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল। তাই মুঘল শাসন থেকে ঔপনিবেশিক শাসন একটা আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং বাদশাহী শাসনের শিথিলতার সুযোগে যে আঞ্চলিক শক্তিগুলি আত্মপ্রকাশ করেছিল সেই আঞ্চলিক আর্থ-রাজনৈতিক বিবর্তনের ধারাই ঔপনিবেশিক শাসনের পরিকাঠামো গঠনে অনুসৃত হয়েছিল।

৩৫.২ আঞ্চলিক রাজ্যসমূহের আবির্ভাব

মুঘল শাসনের শেষের দিকে দিল্লি-আগ্রা অঞ্চলে রাজনৈতিক বিপর্যয়ের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ারূপে দেখা দেয় অর্থনৈতিক শ্লথতা। জাঠ, শিখ, মারাঠা—সব আঞ্চলিক শক্তিগুলির শক্তিগুলির মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ। ফারুখাবাদে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে বঙ্গাস পাঠানরা। রোহিলখণ্ডে স্বাধীনতা ঘোষণা করে রোহিলা আফগানরা। মুঘল প্রাদেশিক শাসকগণও এই সুযোগে নিজ নিজ প্রদেশে বংশানুক্রমিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করেন। বাদশাহী শাসনের পক্ষে এগুলি সমস্যা সৃষ্টি করলেও দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে এই ঘটনাগুলি যেকোনো আকস্মিক বিপর্যয়ের সূচনা করে তা নয়। বরং অঞ্চলিক শাসক, সরকারি কর্মচারী, সামরিক পদাধিকারী, বণিক ও মহাজনদের নিয়ে ক্ষয়িষ্ণু মুঘল সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে গড়ে ওঠে ছোট ছোট অনেকগুলি শহর। শহরাঞ্চলের ধনী সম্প্রদায়ের বিলাসী জীবনের চাহিদা মেটাতে নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে গড়ে ওঠে বিভিন্ন মূল্যবান খাদ্য ও দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন কেন্দ্র। শহরের বণিক ও মহাজনদের কাছে অগ্রিম অর্থ নিয়ে গ্রামের সাহুকার ও মহাজন সেই অর্থ লগ্নি করেন নরের ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে। গ্রামের চাষী ও কারিগরদের কখনও প্রলুব্ধ করা হয় অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দিয়ে কখনও তাদের অভাব-অনটনের সুযোগে ঋণজালে তাদের আবদ্ধ করে, কখনও বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে। বণিকদের মারফত গ্রামীণ পণ্য এভাবে নগদ রাজস্বে রূপান্তরিত হয়ে নতুন যুগের সামরিক আয়োজন ও বিলাসবহুল জীবনযাত্রার

ব্যায়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থর যোগান সুনিশ্চিত করে। সামরিক প্রয়োজন যতই বাড়তে থাকে, বিশেষ করে আগ্নেয়াস্ত্র এবং বিদেশী ঘোড়ার ব্যবহার যত বৃদ্ধি পায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও ততই অপরিহার্য হয়ে উঠতে তাকে। দেশের রাজনীতিতেও এর ফলে বণিক ও মহাজনগণের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। বণিক ও মহাজনগণ এই সময় থেকে তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহার করে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব নিতে শুরু করেন এবং শাসনতান্ত্রিক শ্লথতার সুযোগে উদ্বৃত্ত রাজস্ব ব্যক্তিগত পুঁজিতে রূপান্তরিত করে এই পুঁজি পুনরায় বাণিজ্যে নিয়োগিত করার চেষ্টা করতে থাকেন। ভারতের সামাজিক রীতিনীতি এবং অর্থনৈতিক আইনকানুন এই সময়ে ছিল ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধির ঘোরতর বিরোধী। সম্পত্তি ছিল সবসময়েই সমষ্টিগত বা সার্বজনীন। উচ্চশ্রেণীর কিছু মানুষ অনেক সময় দেবত্র বা ইনাম হিসেবে কিছু সম্পদ সমষ্টির নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখতেন এবং এর থেকে পুঁজি সৃষ্টি করে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োগ করতেন। রাষ্ট্র যদি কোনো ব্যক্তিকে বিশেষ অধিকার দিত তাহলে সেটা হত কোনো সামরিক দায়িত্ব পালনের শর্তসাপেক্ষে। তাই রাজস্ব সংগ্রহকারী, মহাজন বা বণিকগণ স্থানীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি করলেও দেশের আইনে এর কোনো সমর্থন ছিল না এবং স্থানীয় শাসকও সুযোগ পেলেই তাঁদের এ ধরনের সম্পদ বৃদ্ধিতে বাধা দিতেন।

এই সময়কার ইউরোপীয় বণিকদের উপকূলবর্তী অঞ্চলে যে ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল সেও ছিল এই নগদ রাজস্বের চাহিদা এবং আগ্নেয়াস্ত্রের চাহিদার ফল। স্পেনীয় আমেরিকায় প্রচুর রৌপ্য আবিষ্কৃত হবার পর ইউরোপীয় বণিকদের মাধ্যমে এই রৌপ্য ভারতে আসতে শুরু করে। মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে সর্বব্যাপী বিদ্রোহ দমনের সামরিক প্রস্তুতির জন্য এই সময়ে বিপুল রাজস্ব সংগ্রহের প্রয়োজন ছিল। ইউরোপীয়দের সঙ্গে বাণিজ্যের মাধ্যমে এই নগদ রাজস্ব সংগ্রহের উপায় হিসেবে প্রচুর রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া সম্ভব হয়। ইউরোপীয়দের সঙ্গে বাণিজ্যের মাধ্যমে এই নগদ রাজস্ব সংগ্রহের উপায় হিসেবে প্রচুর রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া সম্ভব হয়। স্বভাবতই কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক শাসকগণের কাছে ইউরোপীয়গণ নানারকম সুযোগ-সুবিধা পেতে থাকেন। তাঁদের একদিকে যেমন শুল্কের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয় অন্যদিকে তেমন তাঁদের ব্যবসায়িক নিরাপত্তার জন্য দুর্গ নির্মাণেরও অনুমতি দেওয়া হয়। ইউরোপীয় বণিকগণের সঙ্গে ভারতীয় বণিক ও মহাজনগণের ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্বন্ধ ছিল। ইউরোপীয় বণিকগণ প্রায়ই ব্যক্তিগত ব্যবসার জন্য ভারতীয় পুঁজির উপর নির্ভর করতেন। কোম্পানীর পণ্য সংগ্রহের জন্যও ভারতীয় দালাল ও পাইকারগণের সাহায্য ছাড়া তাঁদের চলত না। এভাবে ভারতীয় মহাজন ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সঙ্গে ইউরোপীয় বণিককুলের একটা স্বার্থের সাযুজ্য ও নির্ভরতা গড়ে ওঠে। আঞ্চলিক শাসকের কোপ থেকে ব্যক্তিগত সম্পদ রক্ষার তাগিদে ভারতীয় বণিক ও মহাজন সমাজ ইউরোপীয়গণের আশ্রয় ভিক্ষা করেন। পারস্পরিক আত্মরক্ষার তাগিদে ভারতীয় ও ইউরোপীয় বণিককুল মিলিত আঘাত হানেন স্থানীয় শাসকের শক্তি। এভাবেই ঘটে ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়াপত্তন। মুঘল শাসনব্যবস্থা, মুঘল অর্থনৈতিক পরিকাঠামো, মুঘল জমিদার, আমলা আর মহাজনকে নিয়েই স্থাপিত হয় ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত্তি। পরবর্তীকালে বিদেশী শক্তি ভারতীয় পুঁজির কণ্ঠরোধ করে ভারতীয় কারিগর ও কৃষককে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের শিকারে পরিণত করলেও ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণের এই পরিকাঠামো গড়ে উঠেছিল মুঘল শাসনের ভগ্নাবশেষকে অবলম্বন করেই। ঔপনিবেশিক শাসন সে অর্থে রাজনৈতিক বা

শাসনতান্ত্রিক আকস্মিকতার সূচনা করে না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মুঘল কেন্দ্রীয় শাসন থেকে সরে আসা আঞ্চলিক শাসন কেন্দ্রগুলি মুঘল ও ঔপনিবেশিক যুগের মধ্যে এক সেতুবন্ধনবিশেষ।

৩৫.৩ আঞ্চলিক রাজ্যসমূহ : বাংলা

আঞ্চলিক শাসনের বিবর্তনের প্রথম সফল নিদর্শন ছিল মুঘল কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে বহুদূরে অবস্থিত বাংলা প্রদেশ। সম্রাট ঔরঙ্গজেব যখন মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যস্ততায় দাক্ষিণাত্যেই দরবার বসাতে থাকেন সেই সময় উত্তর ভারতে জাঠ, শিখ, সৎনামী, বুন্দেলা, রাজপুত প্রভৃতি গোষ্ঠীর জমিদাররা প্রায়ই বিদ্রোহ করা শুরু করেন এবং এর ফলে মুঘল রাজকোষে নিয়মিত রাজস্ব জমা পড়াও বিঘ্নিত হতে থাকে। সম্রাটের ব্যস্ততার সুযোগে দিল্লিতে অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে ইরানী, তুরানী, হিন্দুস্তানী প্রভৃতি বিভিন্ন গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। আমীর-ওমরাহের এই গোষ্ঠীগুলি নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হওয়ায় বিদ্রোহী জমিদারদের দমন করার কাজেও তাঁরা যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন না। এই পরিস্থিতিতে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিতে ঔরঙ্গজেব তাঁর এক সুযোগ্য কর্মচারীকে ১৭০০ সালে বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। মহম্মদ হাদি বা করতলব খান নামক এই কর্মচারী (পরবর্তীকালে যিনি মুর্শিদকুলি খান নামে খ্যাত হন) ইতিপূর্বেই দাক্ষিণাত্যের রাজস্ব আদায়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর দক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে বাদশাহ তাঁকে সম্পদসমৃদ্ধ প্রদেশ বাংলার রাজস্ব আদায়ের কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠান।

এই সময়ে বাংলার সুবাদার ছিলেন ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-আল-দিন বা আজিম-উস-সান। বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকারের যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য আজিম-উস-সান তাঁর পিতা শাহজাদা মুয়াজ্জমের প্রয়োজনের কথা ভেবে বাংলার রাজস্ব নিয়মিত সম্রাটকে পাঠাচ্ছিলেন না। সুবাদারের নিয়ন্ত্রণ থেকে বাংলার রাজস্ব উদ্ধার করে সম্রাটকে নিয়মিত দাক্ষিণাত্যের দরবারে সেই রাজস্ব প্রেরণ করার জন্যেই মুর্শিদকুলি বাংলায় আসেন।

মুর্শিদকুলিকে বিপদে ফেলার জন্য সুবাদার আজিম-উস-সান একদিন রাজধানী ঢাকার রাজপথে আকস্মিকভাবে নগদি সৈন্যগণকে বকেয়া বেতনের দাবিতে মুর্শিদকুলিকে বিব্রত করতে পাঠান। তাঁর আশা ছিল যে সেই বাদবিতণ্ডার ফলে মুর্শিদকুলি সৈন্যদলের অস্ত্রাঘাতে প্রাণ হারাবেন। কিন্তু মুর্শিদকুলি সুকৌশলে এই চক্রান্ত এড়িয়ে প্রাণ বাঁচান। কিন্তু এর পরে তিনি বুঝতে পারেন যে ঢাকা শহরে তিনি নিরাপদ নন। অতএব তিনি দিওয়ানি ঢাকা থেকে সরিয়ে ভাগীরথীর কুলে মাকসুসাবাদ শহরে স্থানান্তরিত করেন। পরবর্তীকালে এই শহরের নাম তাঁর নিজের নাম অনুসারে হয় মুর্শিদাবাদ। সুবাদারের কোপ থেকে বাঁচার জন্য এই পন্থা উদ্ভাবন করলেও এই কাজের উপলক্ষ ছিল স্বয়ং ভাগীরথীর মোহনায় উপস্থিত থেকে ইউরোপীয় বণিকগণের কার্যকলাপের উপর নজর রাখা।

এইভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে সুবাদারের বিরোধিতার মোকাবিলা করার পর তিনি বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থা পুনর্গঠনে মনোযোগী হন। তাঁর প্রথম পদক্ষেপ হয় সরকারি কাজ বাবদ প্রাপ্ত জায়গীরগুলি উর্বর বাংলার

বুক থেকে অপেক্ষাকৃত অনুর্বর উড়িষ্যায় সরিয়ে দিয়ে জায়গীরদারের আয় সঙ্কোচন এবং **খালসা** বা রাষ্ট্রীয় জমির আয় বৃদ্ধি।

তাঁর পরবর্তী লক্ষ্য হয় বাংলার প্রতি গ্রামে গ্রামে প্রতিটি কৃষকের চাষ করা জমির পরিমাণ এবং তার আয় নিরূপণ করা এবং সেই অনুসারে রাজস্ব দাবি করা। ১৫৮২ সালে টোডরমল বাংলার রাজস্বের যে পরিমাপ করেন তা ছিল অনেকটাই অনুমানভিত্তিক। পরবর্তীকালে ১৬৫৮ সালে শাহসুজা পুনরায় একটি নতুন বন্দোবস্ত করেন। ১৫৮২-র পরবর্তীকালে যে সকল জমিতে নতুন করে আবাদ হয় শাহসুজা তাঁর বন্দোবস্তে সে সবগুলিই অন্তর্ভুক্ত করেন। দেওয়ানি অধিগ্রহণের পরে এইসব রাজস্ব ব্যবস্থার উপর আস্থা না রেখে মুর্শিদকুলি দলে দলে **আমিন, কারকুন** এবং **মুৎসুদ্দিকে** পাঠান প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি রায়তের জমি জরিপ করে সেই সকল জমির উর্বরতা ইত্যাদির পরিমাপ করে একটি যথাসম্ভব বাস্তবানুগ **জমা** (রাজস্বের হার) নির্ধারণ করতে। এইসব কাজের সময় জমিদাররা যাতে বাধা না দিতে পারেন সেজন্য জমিদারদের দেওয়ানের সভায় আহ্বান করা হয় এবং কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই আবদ্ধ করে রাখা হয়। এইভাবে জমি জরিপ করে যে নতুন রাজস্ব নির্ধারণ করা হয় জমিদারকে সেই রাজস্বের জন্য চুক্তিবদ্ধ হবার আহ্বান জানানো হয়। জমিদার কোনো কারণে এই রাজস্ব দিতে অস্বীকার করলে অপর ব্যক্তির কাছে জামিন নিয়ে তাকে জমি **ইজারা** দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থাকে সেইজন্য অনেক সময় মাল জামিনি ব্যবস্থা বলেও উল্লেখ করা হয়।

দেওয়ানের কর্মচারীরা সরাসরি রায়তের উৎপন্ন ফসলের মূল্য নিরূপণ করে রাজস্ব নির্ধারণ করে প্রয়োজনে জমিদারকে বাদ দিয়ে অপর ব্যক্তিকেও **ইজারা** দিয়ে এই রাজস্ব সংগ্রহ করায় আচার্য যদুনাথ এই ব্যবস্থাকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে দাক্ষিণাত্যে টমাস মানরো কর্তৃক প্রচলিত **রায়তওয়ারী** ব্যবস্থার অনুরূপ বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে আবদুল করিমের গবেষণায় জানা গেছে যে, মুর্শিদকুলির কর্মচারীগণ শুধু **মাঝকুরি** বা ছোট জমিদারের কাছে **ইহতিমান** বা বড় জমিদার কী খাজনা লাভ করতেন শুধু সেই সকল দলিলই পরীক্ষা করেছিলেন। ফলে মুর্শিদকুলির বন্দোবস্ত সম্বন্ধে **রায়তওয়ারি** বিশেষণটি প্রয়োগ করা হয়তো ঠিক নয়।

নির্ধারিত রাজস্ব নির্ধারিত দিনে আদায় করা সম্বন্ধে মুর্শিদকুলি খুবই সতর্ক ছিলেন। বৈশাখের প্রথম দিন বা পুণ্যাহের মধ্যে খাজনা মিটিয়ে না দিলে তিনি জমিদারদের শারীরিক নিগ্রহ করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। প্রায়ই জমিদাররা জমিবিক্রয় করে খাজনা মেটাতে বাধ্য হতেন। এই কারণেও আচার্য যদুনাথ মনে করেছিলেন যে, মুর্শিদকুলির ব্যবস্থায় জমিদারিপ্রথা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু আবদুল করিম দেখিয়েছেন যে, মুর্শিদকুলি ছোট জমিদারদের যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য মনে করতেন না বলেই তাঁদের জমি হস্তান্তরিত হওয়াতে বিচলিত ছিলেন না। হয়তো তিনি মনে করেছিলেন যে অসংখ্য ছোট জমিদারের হাতে জমি না থেকে কয়েকটি সম্পদশালী বড় জমিদারের হাতে জমি গেলে রাজস্ব আদায়ের অনিশ্চয়তা থেকে অনেকটা মুক্তি পাওয়া যাবে। অসংখ্য ছোট ছোট জমিদারকে নিয়ন্ত্রণ করতে অসংখ্য কর্মচারী প্রয়োজন, কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকটি বড় জমিদারের সঙ্গে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্পর্ক গড়ে তুললে তাঁরা নিজেদের সম্ভ্রম রক্ষার্থে নিয়মিত রাজস্ব প্রদান করবেন।

এছাড়া তাঁদের পক্ষে বড় মহাজনের কাছে ঋণ পাওয়াও সহজ তাই তাঁদের পক্ষে নিয়মিত রাজস্ব প্রদান অপেক্ষাকৃত কম দুরূহ। মুর্শিদকুলির আমলে কিছু ছোট জমিদারের জমি চলে গেলেও এই সময়ে বেশ কয়েকটি বড় জমিদারের বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়। নদীয়া রাজের আয়তন বৃদ্ধি পেতে থাকে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে। বর্ধমান রাজের আয়তন বৃদ্ধি পায় শতাব্দীর শেষে। রাজশাহী ও দিনাজপুরের বাড়-বাড়ন্ত ঠিক একেবারে মুর্শিদকুলির শাসনের শুরুতে। এ সময়কার শতকরা ৬০ ভাগ রাজস্বের উৎস ছিল বর্ধমান ও রাজশাহী-রাজ। বিহারে শাহাবাদ, তিরহুত ও টিকারির জমিদারগণও বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। কাজেই মুর্শিদকুলির বন্দোবস্তের ফলে জমিদারি প্রথা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন বলা যায় না।

দিওয়ানির আয় বাড়াবার জন্য মুর্শিদকুলি আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি সমস্ত জায়গীরদারের **জায়গীর** বাংলার উর্বর জমি থেকে সরিয়ে অনুর্বর উড়িষ্যায় স্থানান্তরিত করেন। ফলে খালসা বা সরকারের অধিকৃত জমির আয় বিশেষ বৃদ্ধি পায়।

এইসব নানারকম কৌশলের দ্বারা মুর্শিদকুলি বাংলা প্রদেশের আয় প্রভূতভাবে বৃদ্ধি করেন এবং নিয়মিত এই অর্থ সিক্কা টাকা বা রৌপ্যমুদ্রায় বাদশাহের কাছে দাক্ষিণাত্যে পাঠাতে থাকেন। এর ফলে সম্রাট মুর্শিদকুলিকে নানাভাবে সমর্থন ও সহায়তা করতে থাকেন। মুর্শিদকুলির পক্ষেও বাদশাহের পৌত্র আজিম উস-সানের বিরোধিতা সত্ত্বেও সফলভাবে দিওয়ানির দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়। ১৭০০ সালে তিনি যখন বাংলা ও উড়িষ্যায় দিওয়ান হয়ে যোগ দিতে আসেন তখন মাকসুসাবাদ, সিলেট, মেদিনীপুর, বর্ধমান এবং কটকের **ফৌজদারিও** ছিল তাঁর দখলে। ১৭০৩ সালে তিনি উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৭০৪ সালে তাঁকে বিহারের **দেওয়ানিরও** ভার দেওয়া হয়।

১৭০৭ সালে আজিম-উস-শানের উত্তরাধিকার যুদ্ধে জয়লাভ করে বাহাদুর শাহ নাম নিয়ে বাদশাহ হলে আজিম-উস-সান মুর্শিদকুলিকে ১৭০৮ সালে দাক্ষিণাত্যের **দেওয়ান** নিযুক্ত করে বাংলা থেকে সরিয়ে দেন। তাঁর পরবর্তী **দেওয়ান** দিয়া-আল-দিন খান **নগদি** সৈন্যদের হাতে প্রাণ হারালে আবার ১৭১০ সালে মুর্শিদকুলিকে বাংলার দিওয়ান পদে ফিরিয়ে আনা হয়।

১৭১২ সালে সম্রাট বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর পুনরায় উত্তরাধিকারের যুদ্ধ শুরু হয় এবং এই যুদ্ধের শেষে সম্রাট হন জাহান্দার শাহ। আজিম উদ্দিনের পুত্র ফারুখশিয়র এই সময় বাংলার রাজস্বের সাহায্যে সিংহাসন দখল করা মনস্থ করেন। কিন্তু মুর্শিদকুলি তাঁকে বাংলার রাজস্ব দিতে অস্বীকার করেন। পরে ১৭১৩ সালে ফারুকশিয়র সম্রাট হলে তিনি মুর্শিদকুলিকেই বাংলার দিওয়ান এবং উড়িষ্যার সুবাদার পদে বহাল রাখেন। ফারুকশিয়রের শিশুপুত্র এবং পরে আরেক ওমরাহ মীর জুমলা নামেমাত্র বাংলার সুবাদার হন এবং মুর্শিদকুলি এই সময় **নায়েব সুবাদার** হিসেবে সবরকম ক্ষমতা উপভোগ করতে থাকেন। ১৭১৫-১৬ সালে মীর জুমলা বাংলার রাজস্ব দিল্লিতে না পাঠিয়ে স্বয়ং আত্মসাৎ করলে ফারুকশিয়র মুর্শিদকুলিকে বাংলার **সুবাদার** পদে নিয়োগ করেন। এই নিয়োগ নিশ্চিতরূপে ১৭১৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দেওয়া ফরমান জারি করার আগেই হয়েছিল কারণ ফরমানটি ছিল জাফর খান বা মুর্শিদকুলির উদ্দেশ্যে লিখিত।

নিয়মিত দিল্লিতে রাজস্ব প্রেরণের ফলেই মুর্শিদকুলি সম্রাটের বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠতে পেরেছিলেন এবং বাংলার **দিওয়ান** পদ থেকে ক্রমে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা—তিনটি প্রদেশের সুবাদার হয়ে ওঠেন। তিনি

ঔরঙ্গজেবের এতটাই আস্থাভাজন ছিলেন যে, ঔরঙ্গজেব তাঁকে তাঁর সহকারি (নায়েব) নিযুক্ত করার সুযোগ দেন। ১৭১৩ সালে তিনি **নায়েবহ সুবাদার** পদে উন্নীত হলে আক্রম খানকে নায়েব দেওয়ান নিযুক্ত করেন। স্বয়ং সুবাদার হবার পর তিনি আক্রম খানকে দেওয়ান পদে উন্নীত করেন। আক্রম খাঁ মারা গেলে সৈয়দ রাদি খাঁ এবং তারপর পৌত্র সরফরাজ খান **দেওয়ান** নিযুক্ত হন। বালেশ্বর ও ভূষণার ফৌজদারও ছিলেন তাঁর আত্মীয়। মাকসুসাবাদ, সিলেট, মেদিনীপুর, বর্ধমান এবং কটকের ফৌজদারি তিনি স্বয়ং হস্তগত করেন।

মুর্শিদকুলির প্রতিপত্তির উৎস ছিল তাঁর রাজস্ব আদায়ে সাফল্য এবং নিয়মিত সেই রাজস্ব দিল্লিতে প্রেরণ করা। নির্ধারিত মানের সিক্কা বা রৌপ্যমুদ্রায় রূপান্তরিত করেই তিনি রাজস্ব দিল্লিতে পাঠাতেন। জগৎশেঠ পরিবারের সহায়তার ফলেই তিনি এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পেরেছিলেন। ইউরোপীয় কোম্পানীগুলিকে প্রচুর অর্থ ঋণ দিয়ে এই পরিবার প্রচুর সম্পদের অধিকারী হন। বড় জমিদারদের খাজনা নিয়মিত প্রদান করার দায়িত্ব নিয়েও জগৎশেঠ বাংলার জমি থেকে উদ্ভুত আয়ের এক অংশের নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি বাংলার **দেওয়ান, সুবাদার** এমনকি মোগল বাদশাহকেও ঋণপ্রদান করেন। এই কারণেই সম্রাট মহম্মদ শাহ তাঁকে ১৭২৩ সালে জগৎশেঠ খেতাব প্রদান করেন।

জগৎশেঠ এইভাবে মুঘল দরবারেও যথেষ্ট প্রভাব অর্জন করেন। ১৭২৭ সালে মুর্শিদকুলির মৃত্যুর পর তাঁর মনোনীত উত্তরাধিকারী পৌত্র সরফরাজ খানের পরিবর্তে জামাতা সুজাউদ্দিন জগৎশেঠের সহায়তাতেই মুঘল বাদশাহের কাছে থেকে বাংলার সুবাদারির জন্য ফরমান লাভ করেন। আবার বিহারের **নায়েব সুবাদার** আলিবর্দি খান ১৭৩৯ সালে সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর জগৎশেঠের সহায়তাতেই সরফরাজ খানকে অপসারণ করে বাংলার নবাবিতে তাঁর দাবি প্রতিষ্ঠিত করেন।

আলিবর্দি খান বাদশাহের ফরমানের জন্য দিল্লিতে প্রচুর অর্থ প্রেরণ করলেও অধস্তন কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি দিল্লির মতামতের অপেক্ষা না রেখে নিজেই পাটনা, কটক ও ঢাকার জন্য নায়েব নিয়োগ করেন। এইসব পদে তিনি সাধারণত নিকট আত্মীয়দেরই নিযুক্ত করতেন এবং তাঁদের শাসনের কাজে সাহায্য করার জন্য থাকতেন হিন্দু দেওয়ানরা।

১৭৪০ সাল নাগাদ বিহার-বাংলা-উড়িষ্যা এই তিনটি প্রদেশ মিলে একটি স্বতন্ত্র নবাবী গঠিত হয়। বিহারে থাকার সময় আলিবর্দি একটি নিজস্ব পাঠান ফৌজ গঠন করেন। তিনি বাংলায় এই ফৌজ নিয়ে আসেন। এই সময় থেকেই উত্তর ভারতীয় সিপাহী ও অশ্বারোহীদের নিয়ে একটি স্থায়ী সেনাবাহিনী গড়ে ওঠে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাংলার রাজস্ব দিল্লিতে পাঠানোর রেওয়াজও কমতে থাকে। মুর্শিদকুলির আমলেই বাংলাতে মুঘল কর্মচারীদের জায়গীর এবং সিপাহীদের ভরণপোষণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাংলার এক চতুর্থাংশ রাজস্ব হিসেবে বরাদ্দ ছিল, কিন্তু তা ছিল শাসন ব্যয় এবং নবাবের ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহের জন্য। বিহার এবং উড়িষ্যায় যেসব জায়গীর ছিল সেগুলি শেষপর্যন্ত সম্রাটের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে ওঠে। ১৭৪২

থেকে ১৭৫১ মারাঠা আক্রমণের সময় দিল্লিতে রাজস্ব প্রেরণ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। এভাবে বাংলা ক্রমশ দিল্লির নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি স্বাধীন আঞ্চলিক রাজ্যে রূপান্তরিত হয়।

৩৫.৪ আঞ্চলিক রাজ্যসমূহ : অযোধ্যা

আগ্রার প্রদেশের প্রান্তে এলাহাবাদ **সুবা** পর্যন্ত আধুনিক উত্তরপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছিল মুঘলদের অযোধ্যা (Awadh) **সুবার** অন্তর্গত। এর উত্তরে ছিল নেপালী তরাই-এর ঘন জঙ্গাল। এই অঞ্চলে বিভিন্ন রাজপুত গোষ্ঠীর জমিদারদের বসবাস। বৈশ, কানপুরিয়া, বিষেণ, বাচগোটি প্রভৃতি বিভিন্ন রাজপুত গোষ্ঠীর জমিদারের নিয়ন্ত্রণে ছিল এখানকার জমিজমার দখল। রাজপুত এবং ব্রাহ্মণ জমিদাররা অধিকাংশ সময় মুঘল শাসকের সঙ্গে এবং নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে মত্ত থাকতেন। চাষবাসের কাজ ছিল ভর, পাসি, কুর্মি প্রভৃতি নিম্নজাতীয় সম্প্রদায়ের হাতে। মুঘল রাজস্ব আদায়কারীর সঙ্গে রাজস্ব প্রদান নিয়ে মতান্তর হলে তৎক্ষণাৎ এই জমিদাররা তাঁদের কৃষকবাহিনীকে নিয়ে গভীর বনে গিয়ে আশ্রয় নিতেন এবং প্রয়োজনে বৎসরাধিকাল জঙ্গালেই বসবাস করে কখনও লুঠতরাজ কখনো বা বনের মধ্যেই চাষবাস করে জীবিকানির্বাহ করতেন। যতদিন না মুঘল শাসক তাঁদের চাহিদামতো রাজস্বের হার মেনে না নিতেন ততদিন এই অবস্থাই চলত। তাই আঞ্চলিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় শাসন কার্যকরী করতে গিয়ে সুবাদারের হাতে জমিদার ও কৃষকের সম্মিলিত প্রতিরোধের সম্মুখীন হবার উপযুক্ত অপরিমিত ক্ষমতা তুলে দিতে হত। অযোধ্যার সুবাদার স্থানীয় জমিদার গোষ্ঠীগুলিকে স্বীয় নিয়ন্ত্রণে সুসংবদ্ধ করতে সমর্থ বলেই নবাবি শাসন সুদৃঢ় হয়। সুবাদারের পদটি এইভাবে বংশানুক্রমিক হয়ে ওঠে এবং প্রদেশগুলি সুবাদারের স্বদেশ বা **সুবা-ই-মুলকি** এবং **দার-উল-মুল্ক** নামে পরিচিত হতে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সুবাগুলি সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতীকবাহী হয়ে চলে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রাদেশিক শাসকের পক্ষে মুঘল কেন্দ্রকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি। ক্ষমতাশালী নতুন সুবাদারগণ মুঘল দরবারে কোনো-না-কোনো দলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেই চলতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশেষ পরিস্থিতিতে যেখানে অনেক ভাগ্যান্বেষীর নিরন্তর সংগ্রাম চলেছিল সেখানে কোনো বিশেষ অধিকারের স্বীকৃতি পেতে সর্বদা কোনো উচ্চতর শক্তির প্রয়োজন ছিল। মুঘলদের চাইতে স্বীকৃতি দেবার যোগ্যতর কোনো শক্তির তখনও উদ্ভব হয়নি। সুতরাং কেন্দ্রীয় শক্তি সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে পড়লেও স্বীকৃতির প্রতীকরূপে মুঘলদের প্রয়োজন থেকেই গিয়েছিল।

মুঘল শাসননীতির সুপ্রাচীন রীতি অনুসারে **সুবাদারের** ক্ষমতা ছিল সীমিত। **দিওয়ান** এবং **বক্সি** নিয়ন্ত্রণ করতেন **জায়গির, খালসা** এবং **দাগ** ও **অসিহা** অর্থাৎ ঘোড়া ও ঘোড়াসওয়ারের সঠিক সংখ্যা নির্ণয়। **দিওয়ান** এবং **বক্সি** আবার দায়িত্ববদ্ধ ছিলেন কেন্দ্রে **দিওয়ান-ই-আলা** বা উজীর এবং **মীর বক্সির** কাছে। **ফৌজদার, ওয়াকাইনিগর, আইসল, দিওয়ান** এঁরা কেউই সুবাদারের অধীন ছিলেন না এবং প্রাদেশিক স্তরে এঁদের উপস্থিতির ফলে সুবাদারের ক্ষমতা হয়ে পড়ে সীমিত। কিন্তু সম্রাট বাহাদুর শাহ প্রাদেশিক শাসকের হাতে সামরিক,

শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক অধিকার তুলে দিয়েছিলেন কারণ তিনি এইসব ব্যক্তিকে রাজধানী থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এর ফলে কেন্দ্রীয় দলাদলি প্রাদেশিক স্তরেও ছড়িয়ে পড়ে।

১৭০৭ সালের নভেম্বর মাসে অযোধ্যার শাসক হন চিন-কিলিক-খান। এই প্রদেশের বেশ কয়েকটি ফৌজদারি এবং তার সঙ্গে এলাহাবাদের নিকটস্থ জৌনপুরের ফৌজদারিও তিনি হস্তগত করেছিলেন। তাঁর ৭০০০ জাত /৭০০০ সওয়ার মর্যাদার মনসবের দাবি মঞ্জুর না হওয়ায় ১৭০৮ সালের ২৫শে জানুয়ারী তিনি প্রতিবাদস্বরূপ সুবাদারি ত্যাগ করেন। উজির মুনিম খান কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি পুনরায় ফৌজদারিগুলি সমেত ৭০০০/৭০০০ মনসবদার হয়ে অযোধ্যায় সুবাদারিতে প্রত্যাবর্তন করেন। জৌনপুরের ফৌজদার নিযুক্ত হন তাঁরই পিতৃব্য কিলিচ-মহম্মদ-খান। মুঘল রাজদরবারে তাঁর বিশেষ-প্রভাব-প্রতিপত্তির ফলে চিন-কিলিচ-খান এই সম্মান লাভ করেন। কিন্তু সবকিছু সত্ত্বেও এর কিছুদিনের মধ্যেই চিন-কিলিচ-খানের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী জুলফিকার খানের একজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ভরাইচের ফৌজদার নিযুক্ত হন এবং এই পদের জন্য চিন-কিলিচ-খান বাদশাহের কাছে যে নাম সুপারিশ করেন তা প্রত্যাখ্যাত হয়। রাজপুতগণের সঙ্গে বোঝাপড়া করা নিয়ে বাদশাহের সঙ্গে মতান্তর হলে তাঁকে লক্ষ্ণৌ এবং খয়রাবাদের ফৌজদারীও **দিওয়ানকে** দিয়ে দিতে হয়। এই **দিওয়ানও** ছিলেন জুলফিকার খানের ঘনিষ্ঠ এবং চিন-কিলিচ-খানকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে তিনি সহায়তা করতেন। চিন-কিলিচ খান যেসব সুযোগ-সুবিধা পেতেন তা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়নি তাই তাঁর উত্তরসূরীরা কেউই তাঁর সমান সুযোগ পাননি।

চিন-কিলিচ-খান ইস্তফা দিতে তাঁর ভাই মহম্মদ আমিন খানকে কিছুদিন সুবাদার নিয়োগ করা হয়। এরপর মীর মুশারফ নামে একজন মহিলাবাদের আফগান সুবাদার পদ লাভ করেন। পরবর্তী সুবাদার কিলিচ মহম্মদ খান এবং সরবুলান্দ খান একসঙ্গে অনেকগুলি ফৌজদারির নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন। এইভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সুবাদারের ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তবে দরবারি রাজনীতির গতি থেকে প্রাদেশিক রাজনীতিকে স্বতন্ত্র করে দেখলে চলবে না। এই দুটি স্তরের ঘটনাবলী ছিল পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

সরবুলান্দ খানের পর সুবাদার হন ছবেলরাম। এঁরা দুজনেই ছিলেন ফারুকশিয়রের ঘনিষ্ঠ এবং এই কারণে এঁদের নানা অতিরিক্ত ক্ষমতাও ছিল। সরলবুলান্দ খান ছিলেন অযোধ্যার শেখজাদাদের ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর পক্ষে এই শেখজাদাদের সাহায্যে জমিদার বিদ্রোহ দমন করা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। কিন্তু মদদ-ই-মাসভোগী শেখজাদাদের অনেকরকম সুবিধা দিয়েও সরবুলান্দ খান সাফল্যলাভ করতে পারেননি।

ছবেলরামের সঙ্গে ভরাইচের ফৌজদার হয়ে এসেছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র গিরধর বাহাদুর। ছবেলরাম বাদশাহের লোক হওয়ায় উজীব ছিলেন তাঁর পরম শত্রু। উজীরের উদ্দেশ্য ছিল ছবেলরামকে দরবার থেকে দূরে রাখা। তাই ছবেলরামকে প্রাদেশিক স্তরে ব্যস্ত রাখার জন্য তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। ছবেলরামের আরেক আত্মীয় আনন্দরাম ব্রহ্মাকে দেওয়া হয় প্রাদেশিক দেওয়ান পদ। এইভাবে সুবাদারের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়তে থাকে।

ছবেলরাম জমিদার দমনের জন্য একাধিক অভিযান চালান। প্রদেশে শাসনের স্থায়িত্ব আনার জন্য তিনি আরো কয়েকটি ফৌজদারী নিজের অধীনে আনেন। অযোধ্যার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এলাহাবাদ সুবারও দায়িত্ব চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁকে ১৭১৫ সালে এলাহাবাদে স্থানান্তরিত করা হয়।

ছবেলরামের পরে সুবাদার হন মুজাফ্ফর আলি খান এবং জাগীর এলাকার ভূমিরাজস্ব ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব আদায় নিয়ে দেওয়ানের সঙ্গে তাঁর প্রবল বিরোধ বাধে। দিওয়ানের নিয়ন্ত্রণে লক্ষ্ণৌ-এর ফৌজদারি থাকায় দিওয়ান সেখানকার কোতোয়াল নিয়াগ করেন, কিন্তু সুবাদার তাতে বাধা দেন। এ নিয়েও বিরোধ বাধে।

এ সময়ে উজীর ছিলেন সৈয়দ আবদুল্লাহ খান। তিনি এই বিরোধ উভয়পক্ষেরই দাবি নাকচ করে কেন্দ্রীয় দেওয়ানকে লক্ষ্ণৌর কোতোয়াল নিয়োগের দায়িত্ব দেন। এর পরের সুবাদার সাহাবাদের আফগান আজিজ খান চাঘতার সময়ে **দেওয়ানকে নায়েব সুবাদার** পদে উন্নীত করে সুবাদারের শক্তি খর্ব করার একটা চেষ্টা চলে। সৈয়দভ্রাতৃদ্বয় এরপর কিছুদিন সুবাদার পদে নিজের লোক বসাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষকালে এলাহাবারে **সুবাদার** ছবেলরাম এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র গিরধর বাহাদুর বিদ্রোহ করে অযোধ্যার সুবাদারি আদায় করেন এবং সেই সঙ্গে **দেওয়ানি** ও প্রদেশের সব ফৌজদারিগুলি তাঁদের করায়ত্ত হয়। এভাবেই অযোধ্যায় নতুন সুবাদারির সূচনা হয়।

অযোধ্যায় **খালিসা** জমি বাড়াবার কোনো চেষ্টা হয়নি। **খালিসা** থেকে আদায়ীকৃত খাজনা ছিল সমগ্র প্রদেশের শতকরা মাত্র তিন ভাগ। **সুবাদার** বরং **খালিসা** জমির পরিমাণ কমাতেই আগ্রহী ছিলেন কারণ **খালিসা** জমি শাসনের ভার ছিল **করোরি** বা **শেখজাদাদের** হাতে। এই **শেখজাদারা সুবাদার** ও **ফৌজদারাদের** সর্বদা অগ্রাহ্য করতেন। বৈশ্বারা জেলার **ফৌজদার** রদ আন্দাজ খান **করোরিগণ** দ্বারা স্থানীয় শাসন দুরূহ করে তোলার কথা বারবার উল্লেখ করেছেন।

মুঘল **সুবাদারগণের** অযোধ্যা শাসনের একটি প্রধান অন্তরায় ছিল শেখানকার উপর্যুপরি জমিদার বিদ্রোহ। এই জমিদারেরা ছিলেন অধিকাংশই রাজপুত, কয়েকজন মুসলমান যার মধ্যে আফগানরাও ছিলেন, কয়েকজন ব্রাহ্মণ আর কয়েকজন অন্য জাতিভুক্ত। বৈশ্বারার জমিদাররা, পরগনা সর্দপুর, লহরপুর, সাণ্ডির গৌররা এবং ইব্রাহিমাবাদের কানপুরিয়ারা ছিলেন মুঘল শাসনের পক্ষে বিশেষ বিপজ্জনক। মুঘল সৈন্য আক্রমণকালে জমিদাররা জঙ্গলে চলে যেতেন এবং কৃষকেরা সম্পূর্ণ এঁদের বশীভূত ছিলেন। অনেক সময় জমিদাররা তাঁদের কর্তৃত্বের সুযোগে ছোট চাষীর (reza ri'aya) কাছে এবং রাজস্ব আদায়কারীদের কাছে অতিরিক্ত কর আদায় করতেন। বড় জমিদারদের দ্বারা ছোট জমিদারদের অত্যাচারিত হওয়ার ঘটনাও অশ্রুতপূর্ব ছিল না। খেরি ও লহরপুরের গৌর জমিদার খয়রাবাদের সব জমিদারদের রাজস্ব আত্মসাৎ করেন। ১৭২১ সালে গিরধর বাহাদুর যখন গৌর জমিদারদের দমন করতে অগ্রসর হন তখন বহু ছোট জমিদার তাঁর বাহিনীতে যোগ দেন।

খয়রাবাদ আর লক্ষ্ণৌ সরকারের অন্তর্গত বৈশ্বারা অঞ্চলে বৈশ এবং অন্যান্য জমিদারদের বিদ্রোহ আশঙ্কাজনক রূপ ধারণ করে। বৈশ রাজপুতগণ এই অঞ্চলের বারোটি গ্রামের অধিবাসী ছিল। ক্রমে ক্রমে তারা সম্পূর্ণ এলাকাটিই দখল করতে শুরু করে। এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বসতিও গড়ে ওঠে—যেমন

আজগাঁ, মুর্তাজানগর, হুসেন নগর, গফর নগর, দোণ্ডিয়া খেরা, জগৎপুর এবং শকরপুর। হুসেন নগরে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে একবার আফগানরা খৈরাবাদ-লক্ষ্ণৌ থেকে ফারুকাবাদ বিঠুরে যাবার রাস্তা আক্রমণও করে। এছাড়া পূর্বে বারাণসী থেকে পশ্চিমে বেরিলি, মোরাদাবাদ সম্বলে যাবার রাস্তাও ছিল। এছাড়া সাই নদীর ওপর ১৭৪০-এর দশকে একটি সেতুও নির্মাণ করা হয়। খৈরাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দলমৌকে যুক্ত করে গঙ্গার অপরপারে খাজুয়া এবং বিন্দকি পর্যন্ত রাস্তা ছিল। এই রাস্তা যেসব অঞ্চল দিয়ে এগিয়েছিল সেইসব অঞ্চলের দখল নিয়েও বৈশ এবং কানপুরিয়ারা সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এই অঞ্চলের কৃষি উৎপাদন এত উন্নতমানের ছিল যে এখানে অনেক নতুন **কসবা** (শহর) গড়ে ওঠে। এই সময়ে এখানকার রাজস্বও শতকরা ৮৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এর কিছুটা হয়তো ছিল রৌপ্য আমদানির ফলে মূল্যবৃদ্ধির জন্য। তবে উৎপাদনও নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সম্পদ বৃদ্ধির ফলে দজদজমিদারগণ কেল্লা বা দুর্গ গড়তে থাকেন এবং আত্মীয়স্বজন ও ভাড়াটে সৈন্যের বাহিনী গঠন শুরু করেন। এসব ক্ষেত্রে স্বীয় গোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট জমিদারগণই দীর্ঘদিন ধরে মোগলদের বিরোধিতা করতে পারতেন। অনেক সময় একটি প্রধান গোষ্ঠীর জমিদাররা একটি বিশেষ এলাকা নিজেদের অধীনে আনতে গিয়ে শুধু যে মুঘলদেরই বিরুদ্ধতা করতেন তা নয়, অন্যান্য ছোট ছোট গোষ্ঠীর জমিদারদেরও দমন করে তাঁরা এলাকা সম্পূর্ণ নিজ গোষ্ঠীর আয়ত্তে আনতেন। মুঘলরা অনেক সময় বাইরে থেকে অন্য গোষ্ঠীর জমিদারগণকে বসতির জন্য আহ্বান করে কোন একটি বিশেষ গোষ্ঠীর আধিপত্য দমনের চেষ্টা করতেন।

অনেক সময় মুঘলদের এক-একটি শাসনতান্ত্রিক ভাগে এক-একটি বিশেষ গোষ্ঠীর প্রাধান্য দেখা যেত। কিন্তু মুদ্রার প্রচলন এবং জমি-জমার বিক্রয় শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে এই একটি পরগনায় মাত্র একটি জমিদার গোষ্ঠীর বসবাস বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ভরাইচ, হুসামপুর এবং মল্লানওয়ানে নতুন জমিদারি ক্রয় করেই এখানকার জমিদাররা প্রতিষ্ঠালাভ করেন। সম্ভবত রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই রায়কোয়ার, বিশেষ এবং বৈশ জমিদারদের শক্ত ঘাঁটিতে এইসব নতুন জমিদারদের আনা হয়। উজাও পরগনায় বৈশদের শক্ত ঘাঁটিতে আনা হয় সৈয়দ জমিদারদের। এই পরগনায় সৈয়দদের কিছু আত্মীয়রা ছিলেন এবং এককালে এই অঞ্চলে তাঁদের বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। রদ আন্দাজ খান এই অঞ্চলে তাঁদের পরিচিতি এবং তাঁদের আনুগত্যের জন্য তাদের এখানে প্রতিষ্ঠা করেন। হরহা পরগনায় বৈশ অধ্যুষিত অঞ্চলে গেহলট এবং চান্দেলরাও ঔরঙ্গজেবের কাছে জমিদারি পেয়েছিলেন। মুঘল শাসকের প্রতিনিধিরা নিজেদের আভ্যন্তরীণ বিবাদেই এত বিব্রত ছিলেন যে এভাবে বিদ্রোহী এলাকায় বহিরাগত জমিদারদের প্রতিষ্ঠা করার কাজে তাঁরা বিশেষ সাফল্যলাভ করতে পারেননি। বরং এ প্রচেষ্টা স্থানীয় কৃষকশ্রেণীকে আরো বেশি করে বিদ্রোহী জমিদারদের সঙ্গে যোগ দিতে প্রণোদিত করে।

এই জমিদার বিদ্রোহের ফলে জায়গীরদারদের পক্ষে তাঁদের প্রাপ্য আদায় ক্রমশ দুরূহ হয়ে পড়ে। এর ফলে কয়েকটি নতুন প্রথার উদ্ভব হয়। একটি হল **জাগীর-ই-সহল-ই-ওয়াতান** বা জায়গীরদারের নিজস্ব এলাকার নিকটবর্তী স্থানে প্রাপ্ত **জায়গীর।** এই **জায়গীরের** অন্তত কিছু অংশ হত **জায়গীরদারের** নিজের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। ফারুকশিয়ারের আমল থেকেই এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেতে থাকে। ক্রমাগত জমিদার বিদ্রোহের

পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিবর্তন করা হয়। মনে করা হয় যে, স্থানীয় কোনো শক্তিশালী জমিদারগোষ্ঠীর সদস্য হলে জায়গীরদারের পক্ষে তাঁর বিরাদরির অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে বিদ্রোহী জমিদারদের দমন করা এবং নিজের প্রাপ্য আদায় করা অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক হবে। যতদিন মুঘল শাসন শক্তিশালী ছিল ততদিন **ফৌজদার,** সংবাদ লেখক, **চৌধুরী** ও **কানুনগোদের** দ্বারা জায়গীরদাররা নিয়ন্ত্রিত হতেন। কিন্তু মুঘল শাসন দুর্বল হয়ে যাবার ফলে **জায়গীরদারদের** উপর থেকে এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় এবং **জায়গীরদার** চাষীদের শোষণ করতে থাকে। এর ফলে চাষীরাও বিদ্রোহী **জমিদারদের** পক্ষ নেয়। এ অবস্থায় জমিদারদের জায়গীরদারি দিলে চাষীরাও অত্যাচার এবং শোষণ থেকে কিছুটা রেহাই পেত এবং **জায়গীরদারও** স্থানীয় প্রভাবের সাহায্যে বিদ্রোহী জমিদারদের দমন করতে পারতেন।

ওয়াতন জায়গীর দেবার সঙ্গে সঙ্গে **জায়গীরদারদের** স্থানান্তরিত করার প্রথাও প্রায় লুপ্ত হয় এবং **জায়গীরদাররা** প্রায় চিরস্থায়ীভাবে **জায়গীর** উপভোগ করতে থাকেন। সাধারণ জায়গীরের ক্ষেত্রেও ক্রমে এই প্রথা স্বীকৃত হতে থাকে।

অযোধ্যায় নবাবী শাসনের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় সাদাৎ খানকে। সৈয়দ ভ্রাতা হুসেন আলি খানকে হত্যা করে তিনি বাদশাহ মহম্মদ শাহের কৃতজ্ঞতাভাজন হন এবং ১৭২২ সালে অযোধ্যার কানপুরিয়া রাজা তিলোইরাজকে দমন করার জন্য এবং এই প্রদেশের রাজস্ব প্রচুর বৃদ্ধি করার জন্য তাঁকে বুরহান-উল-মুল্ক উপাধিতে ভূষিত করা হয়। রাজধানীর দলাদলিতে কিছু কোণঠাসা হয়ে পড়ায় তিনি অযোধ্যার প্রতি মনোযোগী হন। ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা সফদরজংকে তিনি **নায়েব সুবাদার** নিয়োগ করেন এবং বিদ্রোহী জমিদার দমনে অগ্রসর হন। তিনি তিলোকচাঁদি বৈশ, গোণ্ডার বিশেন, বলরামপুরের জনওয়ারদের বিরুদ্ধে ফৌজ পাঠান। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি চন্দেলা রাজপুত হিন্দু সিংকে দমন করেন। এর ফলে অযোধ্যার সীমানা পশ্চিমে কনৌজ শহর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এরপর তিনি দমন করেন গজিপুর ও অসোহর-এর জমিদার ভগবান সিং খিচরকে। এই জমিদার অনেকগুলি মুঘল সেনাপতিকে বধ করেন এবং দীর্ঘদিন ধরে মুঘলদের বিরোধিতা করে চলছিলেন। এই উপলক্ষে সাদাত খান কোরা জাহানাবাদের **ফৌজদারি** আদায় করেন এবং এলাহাবাদের একাংশ দখল করার সুযোগ পান। ইজারার মাধ্যমে তিনি বেনারস, জৌনপুর, গাজিপুর চুনারগড়ের বিশাল সরকারগুলি হস্তগত করেন। এর ফলে তাঁর কর্তৃত্ব মুঘলদের অযোধ্যা **সুবার** বাইরেও বিস্তৃত হয়।

নতুন অধিকৃত এলাকায় সাদাৎ খান নিয়মমাফিক শাসনব্যবস্থা বহাল করেন। এ সময়কার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল অযোধ্যায় মুঘল দেওয়ানের পদের অবলুপ্তি। সাদাৎ খান এই পদে নিযুক্ত করে তাঁর অনুগত পাঞ্জাবী ক্ষত্রি আত্মারামকে। এই সময় থেকেই **দেওয়ানি** মুঘলদের তত্ত্বাবধান থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে। যেহেতু সমসাময়িক বিবরণে মুঘল রাজকোষের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ বা কোনো রাজস্ব প্রদান কথা জানা যায় না। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এই সময় থেকে কেন্দ্রীয় কোষাগারে অর্থপ্রদান বা বাদশাহের দিওয়ানের কাছে রাজস্ব আদায়ের নিয়মিত সংবাদ প্রেরণ ১৭২০-র দশকের মাঝামাঝি বন্ধ হয়ে যায়।

১৭৩৭ সালে সাদাৎ খান দিল্লি এবং দোয়াবের উপরিভাগ থেকে মারাঠা আক্রমণকারীগণকে বিতাড়িত করেন। কারণ তিনি জানতেন যে, এর পরেই মারাঠাগণ গঙ্গার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে আক্রমণ শুরু করবে। দিল্লির দরবারে মারাঠা আক্রমণের কথা বলে তিনি আগ্রা, মালব, গুজরাট, বিহার এবং আজমীরের সুবাদারি দাবি করেন। দিল্লি রাজি না হওয়ায় সাদাৎ খান অযোধ্যায় ফিরে আসেন।

উত্তর-পশ্চিম থেকে আক্রান্ত হয়ে বাদশাহ সাহায্য চাইলে সাদাৎ খান ৩০,০০০ অশ্বারোহী এবং বন্দুক নিয়ে কর্ণালে মুঘল শিবিরে এসে উপস্থিত হন। মুঘল সৈন্যের শতকরা ৪০ ভাগ ছিল তাঁরই সেনানী। আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হয়ে তিনি পারস্যদেশীয় সৈন্যদের হাতে বন্দী হন। বাদশাহ, নিজাম ও সাদাৎ খান যখন পারসীয়দের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছিলেন তখন সংবাদে জানা যায় যে নিজাম মীর বক্সি পদলাভ করেছেন। ক্ষিপ্ত হয়ে সাদাৎ খান নাদির শাহকে আরো অনেক বেশি মুক্তিমূল্য দাবি করার পরামর্শ দেন এবং নিজের সেনাদলসহ পারসীয় শিবিরে যোগদান করেন।

সাদাৎ খান ভেবেছিলেন যে, নাদির শাহের সঙ্গে যোগ দিলে দিল্লি দখল শান্তিপূর্ণভাবে হবে এবং তিনি চলে গেলে দিল্লি দরবারে প্রয়োজনমতো পরিবর্তন ঘটানো যাবে। কিন্তু নাদির শাহ যেভাবে আর্থিক দাবি বাড়াতে থাকেন তাতে সাদাৎ খানের পক্ষে বিষপান করে মৃত্যুবরণ করা ছাড়া কোনো বিকল্প থাকে না।

মৃত্যুর সময়ে সাদাৎ খান অযোধ্যাকে একটি সাধারণ সুবাদারির পর্যায়ভুক্ত করে যাননি। অযোধ্যা এই সময়ে একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক শক্তির রূপ নেয় এবং স্বায়ত্তশাসনের পথে পা বাড়ায়। তিনি কোনো সময় মুঘল রাজকোষে রাজস্ব প্রেরণ বন্ধ করেন তার সঠিক সময় না জানা গেলেও জানা যায় যে মহম্মদ শাহ রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য তাঁকে সম্মানিত করেন। অবশ্য এর পরে তাঁর বিপুল সামরিক ব্যয় এবং মৃত্যুর পর ফেলে যাওয়া ঐশ্বর্য দেখে মনে হয় যে তিনি তাঁর আর্থিক দায়িত্ব কমিয়ে দিয়েছিলেন। তবে সাদাৎ খান তাঁর প্রদেশকে মুঘল সাম্রাজ্যের অঙ্গ বলেই ভাবতেন। তিনি কোনো রাজধানী নির্মাণ করেননি এবং অযোধ্যার পশ্চিমে তাঁর সেনাশিবিরের সংলগ্ন এলাকায় কতকগুলি ইতস্তত বিক্ষুব্ধ সৌধে ছিল তাঁর আবাস। ১৭৩০ সাল পর্যন্ত তিনি অযোধ্যাকে স্থায়ী আবাস বলেও ভাবেননি। অযোধ্যায় তিনি যেতেন বাদশাহের আদেশ পালনে, কিন্তু মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন মুঘল দরবারি রাজনীতিরই এক শরিক।

দিল্লি ছেড়ে চলে যাবার আগে এক বিপুল পরিমাণ পেশকাশের বিনিময়ে নাদির শাহ বাদশাহ মহম্মদ শাহের দ্বারা সফদর জঙের সুবাদার পদে নিয়োগ অনুমোদন করিয়ে যান। সফদর জং (যুদ্ধে সিংহের মতো) এই খেতাবটিও তিনি একই সঙ্গে লাভ করেন।

সাদাৎ খানের মতো করেই সাম্রাজ্যের স্বার্থের অজুহাতে তিনি গাঙ্গেয় উপত্যকায় স্বীয় শক্তি বিস্তারে সচেষ্ট হন। বাংলাদেশের প্রাদেশিক শাসক আলিবর্দি খানকে মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পন্থের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার অজুহাতে তিনি মহম্মদ শাহের কাছে রোহতাস ও চুনার দুর্গ দাবি করেন। শেষপর্যন্ত বাংলায় তাঁকে যেতেও হয়নি এবং পাটনার ওমরাহরা তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ জানালে আলিবর্দি বাদশাহের কাছে সফদর জং-এর সাহায্য প্রত্যাহারের জন্য আর্জি জানান।

এই সময়ে উজীর কামারউদ্দিন খান তেমন শক্ত লোক ছিলেন না। ১৭৪৩ সালে নিজামও দাক্ষিণাত্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এই সময়ে সফদর জং **মীর অতীশ** এবং কাশ্মীরের **সুবাদার** নিযুক্ত হন।

সাম্রাজ্যের নামে নিজের ক্ষমতাবৃদ্ধির সবচেয়ে বেশি সুযোগ আসে সফদর জঙের কাছে ১৭৪৮ সালে সম্রাট মহম্মদ শাহ এবং নিজাম-উল-মুল্ক উভয়ের মৃত্যুর পর দুর্বলতম বাদশাহ মহম্মদ শাহের আমলে। এই সময়ে সফদর জং উজীর পদ লাভ করে। এই সময়ে তিনি এলাহাবাদের সুবাদারিও হস্তগত করেন এবং অযোধ্যার পার্শ্ববর্তী এই প্রদেশে নিজের ক্ষমতা বিস্তার করেন। বাদশাহ আহমদ শাহ তাঁর পুত্রকে সুজাউদ্দৌলাহ খেতাব দেন এবং মুঘল বন্দুকধারী সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণও তাঁর হাতে তুলে দেন।

উজীর পদের পুরোপুরি সুবিধা পাবার পথে সফদর জঙের বহু প্রতিবন্ধক ছিল। দরবারে আরো নানা প্রতিদ্বন্দ্বীকে এড়িয়ে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও তিনি সম্রাটের আনুকূল্যে ফারুখাবাদের বঙ্গাস পাঠান নবাবকে পর্যুদস্ত করেন এবং তেত্রিশটি পরগনা নিজের দখলে আনেন। এই কাজটি খুব সহজে হয়নি। ১৭৫০ সালে এর জন্যে সফদর জংকে বঙ্গাস নবাবের কাছে পরাজয় স্বীকার পর্যন্ত করতে হয় এবং এলাহাবাদ দুর্গ দুমাস যাবৎ অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। পাঠানরা অযোধ্যার অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শহর দখল ও লুঠতরাজ করে। অবশেষে লক্ষ্ণৌর শেখজাদারা তাদের বিতাড়িত করেন এবং সফদর জঙের প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশ করেন। সফদর জং বিপদের মোকাবিলা করতে মারাঠা সেনাপতি মালহার রাও হোলকার, জয়াপপা সিন্ধে এবং জাঠ রাজা সুরজমলের শরণাপন্ন হন। শেষপর্যন্ত পাঠান এবং তাঁদের রোহিলা সহযোগীগণকে কুমায়ুন পর্বত পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করে যাওয়া হয়, তাঁদের কাছে বিপুল জরিমানা দাবি করা হয় এবং ফারুখাবাদের অর্ধেক তাঁরা মারাঠাদের হাতে সমর্পন করতে বাধ্য হন।

মারাঠাদের দিল্লির কাছাকাছি গ্রামগুলি লুঠতরাজ করার সুযোগ দিয়ে তিনি বাদশাহের কাছে আরো সুবিধা আদায় করেন। ১৭৬২ সালে আহমদ শাহ আবদালীর আক্রমণের সময় দৃশ্যত তিনি ছাড়া এই আক্রমণ প্রতিহত করার কেউ ছিলেন না। পাঠান আক্রমণে ক্ষয়ক্ষতি বাবদ তিনি ১৭৪৯ থেকে ১৭৫২ পর্যন্ত অযোধ্যা ও এলাহাবাদের রাজস্ব প্রদান স্থগিত রাখার অনুমতি লাভ করেন। এই দুই সুবার সমস্ত **জায়গীর** বাদশাহ উজীরকে অর্পণ করেন। এটাওয়া এবং কেয়ার সমস্ত খাস জমিও সফদর জঙের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আসে।

সফদর জং ক্রমশ অধীর হয়ে পড়ছিলেন এবং সম্রাটের উপর জাভেদ খানের প্রভাব তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে ওঠার জাভেদ খানকে তিনি হত্যা করেন। এতে সম্রাট শঙ্কিত হয়ে হারেমে আশ্রয় নেন এবং রাজমাতা উধম বাই-এর পরামর্শে তাঁর অপর দুই শত্রু প্রাক্তন উজীরের পুত্র ইন্তিজামুদ্দৌলা এবং ইমাদউল মুল্ক দরবারের তরফে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেন। এই চাপের মুখে পড়ে সফদর জংকে উজীর পদ ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করতে হয়।

মুঘলদের শক্তি বহুদিন যাবৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল। এই অন্তর্কলহকে তাই শক্তি দখলের লড়াই করা ভুল। প্রকৃতপক্ষে এই ছিল মুঘলদের নামের মহিমাকে ব্যক্তিগত স্বার্থে কাজে লাগানোর অধিকার দখলের লড়াই।

এই নামের মহিমা আরো শতাব্দীকাল স্থায়ী হয়। সফদর জঙের এর থেকে যতটা লাভবান হবার ছিল তা সম্পূর্ণ হয়েছিল। তাঁর আঞ্চলিক রাজনৈতিক শক্তি পরগাছার মতো মৃতপ্রায় সাম্রাজ্যের উপর ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শেষপর্যন্ত ১৭৫৩ সালে সন্ধির দ্বারা সফদর জংকে আহমদ শাহ আযোধ্যা ও এলাহাবাদের সুবাদার রূপে পুনরায় স্বীকৃতি দেন। সফদর জঙের শক্তির উৎসই ছিল এই প্রদেশগুলি। ১৭৫৩-র পর থেকে কার্যত এই প্রদেশগুলি মুঘল সাম্রাজ্য থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব নির্বাহ করতে থাকে।

৩৫.৫ আঞ্চলিক রাজ্যসমূহ : হায়দরাবাদ

দাক্ষিণাত্য মালভূমির মুঘল শাসিত অংশের নাম ছিল হায়দরাবাদ। মুঘল দুর্বলতা এবং দিল্লিতে অবিরত ষড়যন্ত্রের ফলে এই অঞ্চলে ক্রমাগত শাসকের পরিবর্তন হত। মারাঠাদের অভ্যুত্থানের ফলে দাক্ষিণাত্যে আরো অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। এখ্বনকার রাজস্বের নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য মুঘল-মারাঠা দ্বন্দ্ব চলছিল। এই সুযোগে মুঘল **সুবাদার** নিজাম-উল-মুল্ক প্রথম আসফজা নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন। আঞ্চলিক স্তরে স্বশাসিত রাজ্যগঠনের সবরকম প্রক্রিয়াগুলিই ক্রমে ক্রমে হায়দরাবাদে আত্মপ্রকাশ করে। সুবাদারের উপর মুঘল শাসনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়। **সুবাদার** স্বয়ং উত্তরাধিকারী নির্বাচনের মাধ্যমে সুবাদারিকে একটি বংশানুক্রমিক অধিকারে পরিণত করেন। আঞ্চলিক রাজস্ব কেন্দ্রীয় রাজকোষে পাঠানো বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। কূটনৈতিক ও সামরিক ব্যাপারে প্রাদেশিক স্তরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া শুরু হয়। কেন্দ্রীয় রাজধানীর পরিবর্তে প্রাদেশিক শাসক প্রাদেশিক রাজধানীতেই বসবাস করতে থাকেন। এবং প্রাদেশিক শাসকের নামাঙ্কিত মুদ্রা ও তার নামে মসজিদে জুম্মাবারের প্রার্থনাও প্রচলিত হয়।

নিজাম **সুবাদার** নিযুক্ত হন ১৭১৩ সালে। ১৭২৪ সালে অপর আরেকজন তাঁর পরিবর্তে **সুবাদার** নিযুক্ত হলে নিজাম তাঁকে পরাস্ত করেন। এই তারিখ থেকেই হায়দরাবাদ দিল্লির অধীনতামুক্ত হয় বলে মনে করা হয়। অনেকে আবার হায়দরাবাদ স্বাধীন হয়েছে ১৭৪০ থেকে বলে মনে করেন, কারণ এই সময় নিজাম শেষবারের মতো উত্তর ভারত থেকে দাক্ষিণাত্যে ফিরে আসেন। বাদশাহের অনুরোধে বহুবার উত্তর ভারতে গেলেও নিজাম সর্বদাই তাঁরগ অনুপস্থিতিতে তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের উপর শাসনের দায়িত্ব ন্যস্ত করে যেতেন। তিনি প্রায়ই বাদশাহের অনুমতি ব্যতীতই দাক্ষিণাত্যে ফিরতেন এবং প্রতিবারই মুঘল এবং মারাঠা কর্মচারীদের সরিয়ে তিনি যেভাবে সাফল্যের সঙ্গে ক্ষমতা অধিগ্রহণ করেছেন তাতে বাদশাহ তাকে **সুবাদার** হিসেবে মেলে নিতে বাধ্য হয়েছেন। ক্রমে নিজামের মুঘলদের প্রতি আনুগত্য হয়ে ওঠে নামমাত্র এবং তিনি যুদ্ধ ঘোষণা, সন্ধি করা, খেতাব দেওয়া বা **মনসবদার** নিয়োগ সব ক্ষেত্রেই স্বীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকেন।

নিজাম এবং তাঁর উত্তরসূরীদের আমলে মুঘলদের প্রতি আনুগত্যসূচক রীতি-নীতি একে একে বর্জিত হতে থাকে। দিল্লি থেকে ফিরেই নিজাম তাঁর অনুগত রাজকর্মচারীদের নতুন করে তাঁদের পদে বহাল করেন। বাদশাহী **মনসবদার** থেকে স্বতন্ত্র করে নিজামের নাম অনুসারে এঁরা পরিচিত হন **আসফিয়া** (Asafia) **মনসবদার**

বলে। ভূমিরাজস্বের হিসাব পরীক্ষা এবং ভূমিস্বত্ব দানের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুরোনো আমলের **বাদশাহী দেওয়ান** পদটিও ক্রমে লুপ্ত হয়। ১৭৮০ সাল নাগাদ মুঘল **ফরমান, খিলাৎ** বা মুঘল সালতামামী প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু হায়দরাবাদের ক্ষমতার উৎস ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের গরিমা। বাদশাহের নামেই মসজিদে খুতবা পড়া হত। সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত মুঘলদের নামেই হত মুদ্রাঙ্কন। নতুন কেউ ক্ষমতায় এলে সর্বদাই মুঘল ফরমানের দ্বারা সেই ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করা হত। কাজেই কোনো অর্থেই মুঘল সাম্রাজ্যের অধীন না হয়েও হায়দরাবাদ মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক অটুট রেখেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হায়দরাবাদের প্রকৃত ইতিহাসের সূচনা হয়। এই সময়ে নিজাম এবং তাঁর প্রধান অমাত্যগণ প্রাচীন মুঘল রাজধানী ঔরঙ্গাবাদ ছেড়ে হায়দরাবাদ শহরে চলে যান এবং রাজসভা ও স্থায়ী শাসনব্যবস্থার পত্তন করেন। ১৭৬২ থেকে ১৮০৩ পর্যন্ত নিজাম আলিখানের দীর্ঘ রাজত্বকালে এইসকল ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। এর আগে নিজামকে দীর্ঘদিন অবিরত সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল। কখনও সংগ্রাম ছিল পশ্চিমে মারাঠাদের সঙ্গে, কখনও দক্ষিণে কর্ণাটকের নবাবির দাবিদার এবং তাদের ইংরেজ বা ফরাসী মিত্রগণের সঙ্গে এবং কখনও কুদ্দাপা, কুর্ণুল, বাসাবর্ণ-বাঁকাপটের পাঠান নবাব বা ডিজিয়ানা গ্রামের রাজার সঙ্গে। অবশেষে ১৭৬০-এর শেষ বছরগুলিতে হায়দরাবাদের সীমারেখাগুলিতে মোটামুটি স্থায়িত্ব আসে। উপকূলবর্তী এলাকাগুলি পায় প্রথমে ফরাসী এবং পরে ইংরেজরা। কর্ণাটকের নবাব দাক্ষিণাত্যের সুবাদারের আধিপত্য অস্বীকার করেন। সৈনিক হায়দার আলি তাঁর প্রভু মহীশূরের নৃপতির স্থান গ্রহণ করেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল যে, মারাঠাদের সঙ্গে সংগ্রামে মাঝে মাঝে বিরতি থাকে এবং দীর্ঘদিন শান্তিও চলে। হায়দরাবাদের অভ্যন্তরে নিজামের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সংগ্রাম শেষ হয় ১৭৬০-এর দশকে নিজাম আলি খানের কর্তৃত্বভার গ্রহণের পর। তাঁর দীর্ঘ শাসনকালে হায়দরাবাদে এমন কতকগুলো রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে যাকে 'হায়দরাবাদী প্রথা' বলা চলে।

এই হায়দরাবাদী প্রথার একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক ছিল এক ধরনের 'দাতা-গ্রহীতা' (patron-client) সম্পর্কের উদ্ভব। অর্থাৎ অভিজাত বা শাসক শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা সকলেই রাজসভায় তাঁদের এক একজন প্রতিনিধি বা মুখপাত্র নিয়োগ করতেন, যাঁরা তাঁদের নিয়োগকারীর স্বার্থরক্ষা করে চলতেন। শাসক বা অভিজাত ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ও এই ব্যবস্থার মাধ্যমে হায়দরাবাদী রাজনীতিতে অংশ নিতেন।

হায়দরাবাদের রাজনীতিতে একসময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সামরিক বা কূটনৈতিক সাফল্য। কিন্তু যখন হায়দরাবাদ ক্ষমতার মূল কেন্দ্র হয়ে উঠল তখন অভিজাতরা হয়ে পড়লেন ভূসম্পদনির্ভর। সবচেয়ে বেশি ভূসম্পদের অধিকারী ছিলেন নিজাম স্বয়ং এবং এর দ্বারা তিনি তাঁর সামরিক, শাসনতান্ত্রিক ও গার্হস্থ্যের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতেন। অভিজাতরা তাঁদের সংস্থা (establishment)-গুলি গড়ে তুলতেন নিজামের অনুকরণে। তাঁরাও নগদ অর্থ এবং শাসন সংক্রান্ত পদ বিতরণ করতে সমর্থ ছিলেন। অভিজাতরা তাঁদের পদমর্যাদা অনুসারে তাঁদের বশংবদদের নিজামের শাসনতন্ত্রে বিশেষ পদ দিতে পারতেন। আত্মীয়, কারিগর, কর্মচারী, কবি এবং ধার্মিক ব্যক্তি ইত্যাদি নানা ধরনের বশংবদ লোকের জন্য কর্মসংস্থানই ছিল অভিজাত

পদমর্যাদার একটা বিশেষ দ্যোতক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আপাতদৃষ্টিতে অভিজাতগণের অপচয়বহুল বিলাসীজীবন রাজনৈতিক শক্তির একটা অঙ্গ ছিল।

অনুগৃহীত ব্যক্তিদের পক্ষেও নিজেদের অবস্থা বজায় রাখা এবং অধিকতর উন্নতি সাধনের জন্য এই 'দাতা-গ্রহীতা' ব্যবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক ছিল। দক্ষ কর্মচারীগণ প্রায়ই অধিকতর উন্নতি সাধনের জন্য একজন পৃষ্ঠপোষককে ছেড়ে অন্য পৃষ্ঠপোষকের শরণাপন্ন হতেন। মারাঠা এবং উত্তর ভারতীয়গণের মধ্যে এই প্রবণতা অধিকতর পরিলক্ষিত হত। নিজামের অধীনে কর্মরত থাকাকালীন অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্তিকরণ অনেক সময়েই নির্ভর করত কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতার উপর। সাধারণ কাজের জন্যও পৃষ্ঠপোষক প্রয়োজন হত। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতেই পৃষ্ঠপোষকা অর্জিত হত, জাতি বা আত্মীয়তার দ্বারা নয়। এই কারণেই বেশি সুযোগের আশায় পৃষ্ঠপোষক পরিবর্তন সম্ভব হত।

তদানীন্তন আদবকায়দা অনুসারে নিজামের সঙ্গে অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ কেউই ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করতেন না। পরিবর্তে তাঁরা পাঠাতেন তাঁদের উকিল বা অন্তর্বর্তী ব্যক্তিকে। এই অন্তর্বর্তী ব্যক্তির মাধ্যমেই তাঁরা নিজাম এবং অন্যান্য অভিজাতগণের সঙ্গে তাঁদের বৈষয়িক লেনদেন সম্পাদন করতেন। উকিলদের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে অভিজাতগণ নিজামকে উপঢৌকন পাঠাতেন এবং নিজেদের মধ্যেও প্রীতিজ্ঞাপক উপহার বিনিময় করতেন। উকিলের কূটনৈতিক দক্ষতার ফলে অনেক সময়ে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকগণের বিশেষ উন্নতি সম্ভব হত। পৃষ্ঠপোষকের সংস্থায় কর্মসংস্থানের দ্বারা অনেক উকিল তাঁর উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণের পৃষ্ঠপোষকত্ব অর্জন করতেন।

মারাঠাগণ এবং আর্কটের নবাবেরও হায়দরাবাদের সভায় উকিল ছিল। এই উকিলরা একদিকে তাঁদের প্রভুদের স্বার্থরক্ষা করতেন। অপরদিকে তাঁদের নিজস্ব অশন-ব্যসনও ছিল বিপুল এবং হায়দরাবাদে তাঁদের প্রভুদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁরাও বহুসংখ্যক ব্যক্তির নিয়োগ করতেন এবং মানমর্যাদায় তাঁরা নিজামী অভিজাতদের চাইতে কোনো অংশেই কম ছিলেন না। নিজাম কখনও কখনও এঁদের **জায়গীর** দিতেন এবং এঁরা সদলবলে স্বীয় পৃষ্ঠপোষকগণকে ত্যাগ করে নিজামের অনুগত প্রজায় রূপান্তরিত হতেন। এককালে মুঘল উকিল ছিলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পেশোয়া, তাঁর সেনাপতি সিন্ধিয়া ও হোলকার এবং আর্কটের নবাবের উকিলগণ হয়ে ওঠেন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে অবশ্য সবচেয়ে প্রভাবশালী উকিল ছিলেন ব্রিটিশ আবাসিক প্রতিনিধি (Resident), যাঁর কাজ ছিল মুঘল-ব্রিটিশ উভয়েরই স্বার্থ রক্ষা।

নিজামের এলাকায় বেশকিছু প্রায় স্বাধীন করদ নৃপতি ছিলেন, যাঁরা বার্ষিক রাজস্বের পরিবর্তে নিজ এলাকা শাসনের অধিকারী ছিলেন। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন সাত-আটটি **সংস্থান** বা হিন্দু রাজপরিবার। এঁরাও নিজস্ব দরবার এবং অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিমণ্ডলী পরিবৃত ছিলেন এবং শক্তি-সামর্থ্যে এঁরা অন্যান্য অভিজাতবর্গের সঙ্গে তুলনীয় হলেও অন্যান্য অভিজাতগণের সঙ্গে এঁদের কোনো যোগাযোগ ছিল না এবং হায়দরাবাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এঁদের গুরুত্ব ছিল নগণ্য। অধিকাংশ সংস্থানই অবস্থিত ছিল তেলিঙ্গানা অঞ্চলে; একমাত্র শোলাপুরই ছিল মারাঠাওয়াড়াতে। এই রাজারা সামরিক দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁদের স্বত্ত্ব

লাভ করেছিলেন পূর্বতন দক্ষিণী শক্তিগুলির কাছে, যথা—বাহমনী সুলতানগণ, বিজয়নগররাজ, পেশোয়া অথবা মুঘল। নিজাম শুধু তাঁর পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

হায়দরাবাদের রাজনীতিতে মহাজন এবং সমরনায়কদের বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। স্থানীয় শাসকদের মতো এঁদের কোনো পদ ছিল না, কিন্তু এঁরা খুবই প্রয়োজনীয় সামরিক এবং অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করতেন। তেলেগুভাষী কোমতিগণ ব্যতীত হায়দরাবাদের আর সব মহাজন সম্প্রদায় ছিলেন বহিরাগত। দীর্ঘদিন যাবৎ এঁরা দাক্ষিণাত্যে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন। মারওয়ারী, আগরওয়াল, জৈন এবং গোস্বামীরা পশ্চিম ও উত্তর ভারত থেকে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে হায়দরাবাদে আসেন। অনেকেই আসেন শাল বা রত্ন ব্যবসায়ীরূপে, কিন্তু পরে মহাজনী কারবার শুরু করেন। এক এক জাতির লোক শহরের এক এক অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করেন এবং তাঁদের নিজ নিজ জাতির জীবনযাত্রা অনুসরণ করতে থাকেন। নিজাম, তাঁর পরিবার এবং অন্যান্য অভিজাতবর্গের সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের ব্যবসায়িক লেনদেন চলত। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় হায়দরাবাদের আর্থিক সমস্যা জর্জরিত দিনগুলিতে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সম্পদ হয়ে ওঠে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হায়দরাবাদের রাজনীতিতে সমর অধিনায়ক এবং তাঁদের সেনানীর যোগ ছিল অপ্রত্যক্ষ। মুঘল সৈন্যবাহিনীর মতোই হায়দরাবাদেও কোনো কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল না। প্রধান প্রধান অভিজাতগণ নিজামের জন্য সেনাবাহিনী পালন করতেন এবং এই সেনাবাহিনীর জন্য নিজামের কোষাগার থেকে তাঁরা নগদ অর্থ পেতেন। আফগান, আরব, শিখ ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় সেনাবাহিনীর নেতৃস্থানে থাকতেন সেই জাতিরই কোনো সমরনায়ক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই হায়দরাবাদে ভাড়াটিয়া সৈনিকদের আগমন ঘটতে থাকে।

কয়েকটি সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন ভাগ্যান্বেষী ইউরোপীয় সমর অধিনায়কগণ। এই সেনাবাহিনী গঠিত হত দক্ষিণী হিন্দু যোদ্ধা জাতিদের নিয়ে। ইউরোপীয় রীতিতে শিক্ষিত বলে এই সেনাবাহিনীকে বলা হয় 'লাইনওয়ালা'। কর্ণাটকের যুদ্ধে ইউরোপীয়দের অংশগ্রহণের পর থেকেই সেনাবাহিনীকে ইউরোপীয় অধিনায়কের অধীনে শিক্ষিত করার প্রয়াস শুরু হয়। এইসব সমরাধিনায়কগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন ফরাসী ভাগ্যান্বেষী মশিঁয় রেমন্ড। এছাড়া বেশকিছু আইরিশ এবং পর্তুগীজ সেনাপতিও হায়দরাবাদের সেনাবাহিনীতে ছিলেন।

সামরিক অধিনায়কগণ বাস করতেন নগরের প্রান্তে সৈন্যশিবিরে এবং অভিজাতবর্গের সঙ্গে অনেকাংশে মর্যাদায় তুলনীয় হলেও তাঁদের জীবনযাত্রা ছিল কিছু স্বতন্ত্র। রাজনীতিতে এঁদেরও যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তবে সামরিক অধিনায়ক বা মহাজনরা তাঁদের প্রভাব কার্যকরী করতে পারতেন শুধু তাঁদের পরিষেবাগুলি প্রত্যাহারের মাধ্যমে।

দক্ষিণ ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সূচনা ঘটে এবং সামরিক শক্তির তুলনায় শাসনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন বৃদ্ধি পায়। নিজাম হায়দরাবাদে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে ক্রমশ হায়দরাবাদের শাসনব্যবস্থা মুঘল শাসনব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে। মুঘল

শাসনব্যবস্থার ধারাগুলি অনুসরণ করলেও প্রথমে কিছু কিছু নতুন রীতিনীতির উদ্ভব হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ ছিল এখানকার কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক দলিল রক্ষণাবেক্ষণ এবং ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থায়।

নিজাম তাঁর অধীনে একজন হিন্দু বা মুসলমান **দেওয়ান** নিয়োগ করতেন এবং এই **দেওয়ানই** শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ, **তালুকদার** নিয়োগ, রাজস্ব সংগ্রহ এবং আর্থিক অনুদান বিতরণ এগুলি সবই ছিল তাঁর দায়িত্ব। এই ক্ষমতাগুলিকে ব্যবহার করে পরবর্তীকালে অনেক **দেওয়ানই** প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হন।

দেওয়ানের পরেই সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী ছিলেন নথিপত্রের ভার যাঁদের হাতে ছিল সেই দুই বংশাক্রমিক **দফতরদার।** যাবতীয় অর্থনৈতিক ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ ছিল এঁদেরই হাতে। ১৭৬০ সালে পূর্বে তেলিঙ্গানা ও পশ্চিমে মারাঠাওয়াড়া দুটি স্বতন্ত্র অঞ্চলের জন্য এই পদ দুটি সৃষ্টি করা হয়েছিল। **দেওয়ানের** কাছে দায়বদ্ধ হলেও এঁরা স্বাধীনভাবে আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখতেন। **জায়গীর, ইনাম** এবং **মনসব** এঁরাই প্রদান করতেন। রাজস্ব বন্দোবস্ত, রাজস্ব সংগ্রহ এবং তার জন্য **ইজারাদার** নিয়োগ সবই ছিল এঁদের দায়িত্ব। দুটি হিন্দু অভিজাত পরিবার এই কাজের দায়িত্বে ছিলেন এবং যাবতীয় দলিল তাঁদের দখলে থাকায় শাসনতন্ত্রে দেওয়ানের ক্ষমতা বেশকিছুটা হ্রাস পেয়েছিল বলা যেতে পারে।

যে স্বাধীন **ইজারাদারদের** হাতে রাজস্ব সংগ্রহ এবং তার নির্দিষ্ট অংশ রাজকোষে জমা দেবার ভার ছিল তাঁদের বলা হত **তালুকদার।** রাজস্বের একাংশ ছিল তালুকদারের প্রাপ্য এবং এর বাইরে তাঁরা যা কিছু সংগ্রহ করতে পারতেন তাও থাকত তাঁদের দখলে। **তালুকদাররা** তাঁদের স্বতন্ত্র হিসাব সংরক্ষণ করতেন। সরকারের সঙ্গে তাঁদের সংযোগ ঘটত **দফতরদারদের** মাধ্যমে। **দফতরদারই তালুকদারদের** নিয়োগ করতেন এবং তাঁদের এলাকাভুক্ত জমি ও সৈন্য বাবদ প্রাপ্য রাজস্বের হিসেব রাখতেন। মুঘল সাম্রাজ্যেও **ইজারাদারের** মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ প্রথা একেবারে অনুপস্থিত না হলেও অবাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু হায়দরাবাদে সরাসরি রাজস্ব সংগ্রহের কোনো চেষ্টাই দেখা যায় না। কেন্দ্রীয় হিসাব সংরক্ষণ ও গ্রামের হিসাব-নিকাশের মধ্যে কোনো সংযোগ ছিল না। **তালুকদার** এবং তাঁর নিচের স্তরে **দেশমুখ, দেশপাণ্ডে** ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগীদের উপর কোনো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল না। গ্রামগুলির উপর ছিলেন **দেশমুখ, দেশপাণ্ডেগণ** এবং তাঁরাই গ্রামপর্যায়ের পদাধিকারীদের তরফে **তালুকদারদের** সঙ্গে বোঝাপড়া করতেন।

হায়দরাবাদেও **জায়গীর** ছিল, কিন্তু মুঘল **জায়গীরদারি** প্রথা এখানে কিছু ভিন্ন আকার ধারণ করে। এখানকার **জায়গীর** ক্রমেই বংশানুক্রমিক হয়ে উঠছিল, **মনসবদারদের** সংখ্যা যথেচ্ছ বৃদ্ধি করা হচ্ছিল এবং তাঁদের বেতনের জন্য **জায়গীরের** পরিমাণ বৃদ্ধি করা হচ্ছিল। নিজাম বংশানুক্রমিক **জায়গীর** ভোগদখল অনুমোদন করতেন বলে বহু **জায়গীরদার** মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করে নিজামের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। মুঘলরা দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ জয়ের জন্য যেভাবে দক্ষিণী **মনসবদারদের** যথেচ্ছ জায়গীর প্রদান এবং হস্তান্তর করছিলেন তাতে **জায়গীরদারই** তাঁদের ক্ষমতা ও সম্পদ সুরক্ষিত করতে এই বিকল্প বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই ঘটনা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী অন্যান্য ঘটনার অন্যতম ছিল নিঃসন্দেহে।

মনসবদারি প্রথাও হায়দরাবাদে কিছু পরিবর্তিত হয়। মুঘল প্রথায় যেমন সামরিক, অসামরিক নির্বিশেষে সব কর্মচারীকেই **জাত** ও **সওয়ার** দুরকম মর্যাদা দেওয়া হত, হায়দরাবাদে সেভাবে অসামরিক কর্মচারীদের কোনো **সওয়ার** মর্যাদা থাকত না। নিম্নস্তরের **মনসবদারের** ক্ষেত্রে **জাত** মনসব ছিল কোনো একটি বিশেষ এবং সচরাচর বংশানুক্রমিক দায়িত্বের জন্য দেয় নির্দিষ্ট বেতনের বিকল্প। নিম্নস্তরে উন্নতির অর্থ ছিল বেশি কাজ এবং তার জন্য বেশি অর্থ, কিন্তু এর জন্য **মনসব**-এর মান বৃদ্ধি হয়। উচ্চস্তরে **মনসব** উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া গেলেও কার **'জাত'** কত হবে তা অনেক সময় পদাধিকারীর পদ বা বেতনের উপর নির্ভর না করে তাঁর ব্যক্তিগত মানমর্যাদার উপর নির্ভর করত।

মুঘল শাসনব্যবস্থার সঙ্গে নিজামী ব্যবস্থার বড় তফাত ছিল এই যে, নিজামী শাসনব্যবস্থায় **'মনসব'** ছিল বিশেষ কোনো সম্মানের দ্যোতক বা কোনো সামরিক কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ। কিন্তু সাধারণ শাসনতান্ত্রিক পদের সঙ্গে এর কোনো অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ছিল না। অতএব অভিজাতবর্গের পদমর্যাদাও **'মনসব'** পদের উপর নির্ভর করত না। হায়দরাবাদের শ্রেষ্ঠ দশটি **উমরা-ই-আজ্জম** পরিবারের 'মনসব' ছিল খুব স্বল্প মর্যাদার। শুধু **জায়গীরের** পরিমাণ দিয়েও অভিজাতদের প্রাধান্যের পরিমাপ করা দুষ্কর।

অধিকাংশ **জায়গীর** এবং পদই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ছিল বলে হায়দরাবাদে প্রচুর সংখ্যক বংশানুক্রমিক অভিজাত ছিলেন। সংখ্যায় এঁরা প্রচুর হওয়ার ফলে এঁদের মধ্যেকার পার্থক্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সবসময়েই দেখা যেত অভিজাতদের একটা ছোট অংশের হাতে প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা রয়েছে। দুটি বিষয়ের উপর এই প্রাধান্য নির্ভর করত প্রথমত, সমসাময়িক শাসনতান্ত্রিক বা সামরিক দায়িত্ব পালন এবং দ্বিতীয়ত, নিজামের সঙ্গে অভিজাত ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পর্ক। দ্বিতীয়টি নির্ভর করত সভার আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ এবং নিজামের কাছে পাওয়া ব্যক্তিগত স্বীকৃতির উপর। এসব ক্ষেত্রে মনসব-এর গুরুত্ব ছিল।

হায়দরাবাদের অভিজাত সম্প্রদায়ের সকলেই কোনো-না-কোনো সময়ে মুঘল, মারাঠা বা দক্ষিণী সুলতানদের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অনেকে সাধারণ পরিবারজাতও ছিলেন। প্রথম নিজামের উচ্চ মনসবদাররা প্রায় সকলেই ছিলেন সমরাধিনায়ক। দু-একজন রাজপুত বা মারাঠা ব্যতীত এঁরা সকলেই ছিলেন মুসলমান। রাজপুত বা মুসলমান অভিজাতরা ছিলেন মুঘল আমলের **মনসবদার** এবং তাঁদের প্রায়ই উত্তর ভারতে **জায়গীর** থাকত। মারাঠা ওমরাহগণ পূর্বতন দাক্ষিণাত্যের শাসকগণ বা পেশোয়ার সঙ্গে পারিবারিক সূত্রে যুক্ত ছিলেন কিন্তু পরে এ অঞ্চলে নিজামের শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁরা নিজামের পক্ষ অবলম্বন করেন। এরকম একজন ছিলেন বিজাপুরী সুলতানের প্রাক্তন মারাঠা সেনাধ্যক্ষ রাজা রাও রাম্ভা নিম্বালকর। মুঘলদের কাছে সাতহাজারী **মনসবের** প্রস্তাব পেয়ে তিনি পেশোয়ার পক্ষ ত্যাগ করেন এবং পরবর্তীকালে সমপদমর্যাদায় নিজামের বশ্যতা স্বীকার করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে হায়দরাবাদের বিখ্যাত আরব শিয়া পরিবারের **দেওয়ান** সালার জং-ও

এইরকম একসময় বিজাপুরের কর্মচারী ছিলেন এবং পরে প্রথমে মুঘল পক্ষে যোগ দেন এবং সেখান থেকে আসেন নিজামের অধীনে।

সমস্থানের শাসকগণও ছিলেন বড় মনসবদার। যুদ্ধজয়ের পরে হায়দরাবাদে স্থিতাবস্থা এলে হায়দরাবাদের সভায় অবস্থান এবং সভার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অংশগ্রহণ আভিজাত্যের একটা বিশেষ চিহ্ন হয়ে ওঠে। দাক্ষিণাত্যের স্থানীয় শাসকগণ এবং যেসব সামরিক অধিনায়কগণ গ্রামীণ এলাকায় ভূস্বামীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাঁরা হায়দরাবাদের নাগরিক জীবনের কার্যকলাপে আর অংশ নিতেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সাধারণ শাসনবিভাগীয় পদ থেকে উচ্চপদে আরূঢ় অভিজাত পদমর্যাদালব্ধ ব্যক্তিগণ প্রথম যুগের অভিজাতদের স্থান গ্রহণ করেন। হায়দরাবাদে আগত উত্তর ভারতীয় এবং মারাঠা হিন্দুগণ শাসনবিভাগীয় পদগুলি একে একে অধিকার করেন এবং অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে ওঠেন।

হায়দরাবাদের দুটি **দফতরদার** বা হিসাবরক্ষক পরিবারের ইতিহাস লক্ষ্য করলেই এই ঘটনার ধারাটি লক্ষ্য করা যায়। **দফতর-ই-দিওয়ানীর** মহারাষ্ট্রীয় চিতপাবন ব্রাহ্মণ পূর্বপুরুষ ছিলেন একজন পাটোয়ারি। একজন ক্ষমতাশালী **দেওয়ানের** পৃষ্ঠপোষকতার ফলে ইনি কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতিলাভ করেন। **দফতর-ই-মাল** এর প্রতিষ্ঠাতা এক উত্তর ভারতীয় কায়স্থ দাক্ষিণাত্যে আসেন নিজামের ব্যক্তিগত করণিকরূপে। শাসনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন যত বাড়তে থাকে, এইসব হিন্দু শাসকরাও রাজস্ব এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে ওঠেন এবং কালক্রমে অভিজাতরূপে স্বীকৃতিলাভ করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলমান অভিজাতগণের মধ্যে অনেকজন শিয়াও ছিলেন। মুঘল দরবারি রাজনীতিতে নিজাম-উল-মুল্ক ও তাঁর পিতা তুরানী বা তুর্কী সুন্নি দলের নেতারূপে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে অনেক মুসলমান অভিজাত পরিবার ছিল ভারতীয় সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত। এই পৈপা (Paipah) পরিবার নিজামের জন্য একটি বিশাল সামরিক বাহিনী তৈরি রেখেছিল। শিয়াদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার দুটি কারণ ছিল প্রথমত, বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা, দাক্ষিণাত্যের এই দুই পূর্বতন সুলতানের আমলে শিয়াদেরই প্রতিপত্তি ছিল বেশি। এইসব শিয়া পরিবার পরবর্তীকালে হায়দরাবাদে কাজ নেন। দ্বিতীয়ত, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে হায়দরাবাদে পর পর বেশ কয়েকজন **শিয়া দেওয়ান** পদ লাভ করায় মহীশূর, মাদ্রাজ এবং অযোধ্যা ইত্যাদি যেসব অঞ্চলে ইংরেজরা ক্ষমতায় আসছিল সেসব জায়গা থেকেও শিয়ারা হায়দরাবাদে চলে আসতে থাকে।

কোনো একটি বিশেষ প্রক্রিয়া, যথা দায়িত্বপূর্ণ পদ, উচ্চ **মনসব** কিংবা **জায়গীর** বা নানাপ্রকার খেতাব অর্জনই যে আভিজাত্যের মাপকাঠি ছিল তা নয়। দেখা যায় যে, হিন্দুরা সচরাচর শাসনতান্ত্রিক পদে থাকতেন এবং তাঁদের মনসব নিম্নমানের হলেও জায়গীরের পরিমাণ হত বৃহৎ; মুসলমানরা সাধারণত সামরিক পদে থাকতেন এবং পরে বৃহৎ জায়গীর লাভ করতেন। তবে সর্বত্র এই চিত্র এক ছিল না। তবে এটা নিশ্চিত যে, এই অভিজাত সম্প্রদায় নিজমের সঙ্গে আগত মুঘল অভিজাত সম্প্রদায় নয়, এ এক নতুনভাবে গঠিত নতুন অভিজাত সম্প্রদায়, যাঁরা গড়ে তোলেন এক নতুন রাজনৈতিক সমাজ।

৩৫.৬ অনুশীলনী

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

১। ভারতে অষ্টাদশ শতাব্দী কি শুধুই মুঘলদের পতনের যুগ নাকি এ যুগের কোনো স্বতন্ত্র তাৎপর্য ছিল?

২। অষ্টাদশ শতাব্দী কি মুঘল শাসন এবং ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে সেতুবন্ধস্বরূপ?

৩। বাংলা প্রদেশে দেওয়ান কীভাবে শক্তি বৃদ্ধি করে একটি স্বতন্ত্র প্রাদেশিক শাসনের গোড়াপত্তন করেন তা লিখুন।

৪। অযোধ্যার সুবাদার কীভাবে মুঘল প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণমুক্ত হন? এ প্রদেশের কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য সুবাদারের স্বাধীনতার পক্ষে সহায়ক হয়?

৫। হায়দরাবাদে একটি নতুন ধরনের রাজনৈতিক সমাজ সৃষ্টি হয় কীরূপে? মুঘল শাসনব্যবস্থার সঙ্গে এই শাসনের কী কী পার্থক্য ছিল?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। মুর্শিদকুলির রাজস্বব্যবস্থা বাংলার জমিদারি প্রথাকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

২। মুর্শিদকুলির রাজস্বব্যবস্থাকে রায়তওয়ারি বলা উচিত কী?

৩। অযোধ্যার জমিদারদের সম্পদ ও শক্তির উৎস কী ছিল?

৪। জমিদার বিদ্রোহ দমনের জন্য অযোধ্যায় কী কী প্রচেষ্টা চালানো হয়?

৫। ওয়াতন জায়গীর কী? অযোধ্যায় এই প্রকার জায়গীর প্রদানের কী উদ্দেশ্য ছিল?

৬। হায়দরাবাদে নিজামের আমলে মনসবদারি প্রথায় কী কী পরিবর্তন ঘটে?

৭। হায়দরাবাদের অভিজাতদের সামাজিক পশ্চাৎভূমি কী ছিল?

সংক্ষিপ্ত টীকা :

১। জগৎ শেঠ।

২। মুর্শিদকুলির আমলের প্রধান প্রধান জমিদার বংশ।

৩। মুর্শিদকুলির বাংলা থেকে **জায়গীর** স্থানান্তরকরণ।

৪। হায়দরাবাদের **দফতরদার**।

৫। হায়দরাবাদের রাজদরবারে উকিলগণের ভূমিকা।

৬। হায়দরাবাদের মহাজনগোষ্ঠী।

৭। হায়দরাবাদের সামরিক গোষ্ঠী।

৮। সাদাৎ খান ও নাদির শাহ।

৩৫.৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. B. Calkins Philip : *'The Formation of a Regionally Oriented Ruling Group in Bengal'*, **Journal of Asian Studies,** Vol. XXIX, No. 4, August 1970, pp. 799-806.
2. Karim Abdul : *Murshid Quli Khan and his Times,* Dacca, 1963.
3. Sarkar J. N. (ed) : *History of Bengal,* Vol. II, Dacca (1972, Second Impression).
4. Barnett B. Richard : *North India between Empires, Awadh, the Mughals and the British* 1720-1801.
5. Alam Muzaffar : *The Crisis of Empire in Mughal North India, Awadh and the Punjab* 1707-1748 (Delhi, 1986).
6. Leonard Karen : *'The Hyderabad Political System and its Participants'*, **Journal of Asian Studies,** 30, No. 2. May, 1971.
7. Stein Burton : *'Eighteenth Century : Another View'* Studies in History, 5, 1 (1989).

একক ৩৬ ❐ অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে ভারতে ইউরোপীয় বণিককুল

গঠন :

৩৬.০ উদ্দেশ্য

৩৬.১ প্রস্তাবনা

৩৬.২ ইউরোপীয় বণিক : পর্তুগিজ

৩৬.৩ ইউরোপীয় বণিক : ওলন্দাজ

৩৬.৪ ইউরোপীয় বণিক : ইংরেজ

৩৬.৫ ইউরোপীয় বণিক : ফরাসি

৩৬.৬ ইউরোপীয় বণিককুল ও ভারতীয় অর্থনীতি

৩৬.৭ ইউরোপীয় বাণিজ্যরীতি ও তার প্রতিক্রিয়া

৩৬.৮ অনুশীলনী

৩৬.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৩৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে ইউরোপীয় বণিকরা কিভাবে ভারতের অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার করেছিল।
- ইউরোপীয় বাণিজ্যরীতি কীরূপ ছিল এবং তার প্রতিক্রিয়ার ধরন কিরকম ছিল।

৩৬.১ প্রস্তাবনা

১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে কালিকট বন্দরে ভাস্কো-দা-গামার আগমন ভারতের বাণিজ্যিক জগতে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ইউরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন বাণিজ্যকেন্দ্রে বহুদিন থেকেই ভারতীয় পণ্য ছিল বিশেষ সমাদৃত। এই পণ্যসম্ভার বিদেশের বাজারে পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে ভারতীয় বণিকদের যে ভূমিকা ছিল অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্তর গবেষণায় তা আজ সকলেরই সুবিদিত। ভারতীয় বন্দরে ইউরোপীয় বণিকদের যাতায়াত শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ভারতীয় বণিকদের এই ভূমিকা সঙ্কুচিত হতে শুরু করে। শেষপর্যন্ত ইউরোপীয় বাণিজ্য ভারত মহাসাগরে ভারতীয়দের হাতে যে বাণিজ্য ছিল তার অনেকটা গ্রাস করেছিল।

৩৬.২ ইউরোপীয় বণিক : পর্তুগিজ

মালাবার উপকূলের বন্দর কালিকটে জাহাজ নিয়ে যখন পর্তুগিজরা আসেন তখন তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। তাঁরা একদিকে যেমন চেয়েছিলেন এই নতুন দেশের অধিবাসীদের মধ্যে খ্রিস্টধর্মাবলম্বিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে তেমনই তাঁরা এদেশ থেকে বাণিজ্যের মাধ্যমে সুগন্ধি মশলা সংগ্রহ করতেও এসেছিলেন। খ্রিস্টধর্মপ্রধান পোপের কাছে সাম্রাজ্যের তালিকা পাঠাতে গিয়ে পর্তুগিজ রাজা ম্যানুয়েল ইথিওপিয়া, আরব ও পারস্যের সঙ্গে ভারতের নাম যুক্ত করে বিশেষ গর্বিত হন। কালিকটের অধিপতি জামোরিনকে পর্তুগীজ নৌবহরের অধ্যক্ষ পেড্রো আলভারেজ ক্যাবরাল ১৫০০ সালে জানান যে, তাঁর প্রতি রাজার নির্দেশ হল একজন একনিষ্ঠ খ্রিস্টধর্মাবলম্বির স্বাভাবিক নৈতিক দায়িত্ব পালনের কর্মসূচীর অংশ হিসেবে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।

এইভাবে ধর্মের জিগির তুলে প্রথম থেকেই পর্তুগিজরা ভারতের পশ্চিম উপকূল থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত যাতায়াতকারী মুসলমান জাহাজগুলিকে আক্রমণ করে এই অঞ্চলের সমস্ত মশলার ব্যবসা আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করে। ভারতীয়দের চেয়ে বেশি শক্তিশালী জাহাজের সাহায্যে তারা একাজ করতে পারত। কিন্তু জাহাজ ও নাবিকদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দরে ঘাঁটি স্থাপন করা প্রয়োজন ছিল। জামোরিনের কাছে সাহায্য না পেয়ে পর্তুগিজরা ১৫০২ সালে কালিকট বন্দরে হামলা চালায়। জামোরিনের প্রতিযোগী কোচিনের রাজা ১৫০৩ সালে তাদের নিজেদের এলাকায় একটি দুর্গ নির্মাণের অনুমতি দেন। কিন্তু পর্তুগিজ সাম্রাজ্যের প্রকৃত গোড়াপত্তন হয় ১৫১০ সালে বিজাপুরের সুলতানের কাছ থেকে গোয়া দ্বীপ দখল করার সময় থেকে। এই বিজয়ী পর্তুগিজ বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আলফনসো ডি আলবুকার্ক। ইতিপূর্বে ১৫০৯ সালে ইজিপ্টের মামলুক সুলতান দিউ দখল করার জন্য যে নৌবাহিনী পান, পর্তুগিজরা সেটি ধ্বংস করে দেয়। ১৫১১ সালে পর্তুগিজরা সুদূরপ্রাচ্যের সমুদ্রপথের প্রধান ঘাঁটি মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জ দখল করে। এরপর পারস্য খাঁড়িতে (Gulf) ওরমুজ বন্দর দখলের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের পরিকল্পনা প্রায় সফল হয়ে ওঠে এরপর করমণ্ডল উপকূলের সাও তোমে, বাংলার হুগলি ও চট্টগ্রাম, চীনদেশে পার্ল নদীর মুখে (estuary) ম্যাকাও এবং সিংহলের কলম্বো ইত্যাদি অনেকগুলি সুরক্ষিত বাণিজ্যিক উপনিবেশ ক্রমে ক্রমে পর্তুগিজদের দখলে আসে। ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক ইতিহাসে এভাবে বলপ্রয়োগে মাধ্যমে বাণিজ্যিক কর্তৃত্ব স্থাপন এই প্রথম। এক সুদূর দেশ থেকে দম ম্যানুয়েল যেভাবে ভারতে তাঁর Estado da India বা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করতে থাকেন এবং গোলমরিচ ও মশলা ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার স্থাপনের চেষ্টা করেন তাও ভারতের ইতিহাসে নজিরবিহীন। অবশ্য শেষপর্যন্ত পর্তুগিজদের লোহিত সাগরের পথে ভূমধ্যসাগরে ভারতীয় মশলা ব্যবসার গতি সঞ্চালিত করার অভিলাষ অপূর্ণই থেকে যায়। বরং স্থলপথেই তুরস্কের ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরগুলিতে ভারতের হাল্কা অথচ দামি জিনিস পৌঁছত বেশি।

পর্তুগিজরা তাদের অধিকৃত বন্দরে চালু করে কার্তাজ (Cartaze) প্রথা অনুসারে এশিয় বণিকদের তাদের জাহাজের জন্য গোয়ার শাসকের কাছে অনুমতি ক্রয় করতে হত। অন্যথায় তাদের পণ্য বাজেয়াপ্ত হত। এই

নিয়ম মেনে নিয়েই বিজাপুরের সুলতান দাভল থেকে মোখা পর্যন্ত এবং পরে মক্কা, ওরমুজ এবং লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের অন্যান্য বন্দরে জাহাজ পাঠাতে পারতেন। মুঘল সম্রাট পর্যন্ত সুরাট থেকে মোখা বন্দরে জাহাজ পাঠাবার জন্য ছাড়পত্র ক্রয় করতে হত। পর্তুগিজদের এই তদারকির ফলে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে গোয়াস্থিত পর্তুগিজ রাজকর্মচারী বা বণিকদের সহায়তা ভিন্ন অর্থাৎ প্রকারান্তরে তাদের সঙ্গে মুনাফা বণ্টনের চুক্তি না করলে ভারতীয় জাহাজগুলির পক্ষে পূর্ব আফ্রিকা, মশলা দ্বীপপুঞ্জ, চীন অথবা জাপানে যাওয়া দুরূহ হয়ে পড়ে।

পর্তুগিজরা যে শুধু অন্য বণিকদের পণ্য লুঠ করে বা তাদের মুনাফায় ভাগ বসিয়েই সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল তা নয়। এশিয়া মহাদেশে গোয়ার নিজস্ব ব্যবসাও ছিল যথেষ্ট বিস্তৃত। কিন্তু কর্মচারীদের অবিশ্বস্ততা এবং শাসনের শিথিলতার ফলে পর্তুগিজরা ভারতের সমুদ্রবাণিজ্যকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। ইউরোপের সঙ্গে ব্যবসার ক্ষেত্রেও তাদের এই একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ভূমধ্যসাগরের মশলা ব্যবসা দখল করা বা লোহিত সাগর পথে এ ব্যবসার গতিরুদ্ধ করা কোনোটাই তারা পারেনি। গোলমরিচের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রেও তাদের কোনো একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ছিল না। প্রতিযোগিতার মোকাবিলা করতে গিয়ে তাদের প্রায়ই কম দামে গোলমরিচ বিক্রি করতে হত এবং তুরস্কের অন্য ব্যবসায়ীদের সমান দাম নিতে হত। এবং এই দাম নির্ভর করত অন্যান্য ব্যবসায়ীদের পরিবহন এবং নিরাপদ ভ্রমণ ব্যয়ের উপর।

৩৬.৩ ইউরোপীয় বণিক : ওলন্দাজ

সপ্তদশ শতকে পর্তুগিজদের একচেটিয়া মশলা ব্যবসার প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিল নেদারল্যান্ডদের ইউনাইটেড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। প্রথম থেকেই এই সংস্থা সুগন্ধি মশলা এবং গোলমরিচের ব্যবসা বলপূর্বক দখল এবং রক্ষা করার সঙ্কল্প নিয়েছিল। কিন্তু এই কাজে ওলন্দাজদের প্রধান প্রতিযোগী ছিল ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই ওলন্দাজ এবং ইংরেজ বণিকগণ ভারতীয় উপকূলের সন্ধানে সমুদ্রযাত্রা শুরু করেন। পর্তুগাল ও স্পেনের নৌশক্তি হ্রাস পাবার ফলে ওলন্দাজ ও ইংরেজদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ১৬০০ সালে মশলা এবং গোলমরিচের লাভজনক ব্যবসায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে গঠিত হয় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এর কিছুদিনের মধ্যেই ১৬০০ সালে মশলা এবং গোলমরিচের লাভজনক ব্যবসায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে গঠিত হয় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এর কিছুদিনের মধ্যেই ১৬০২ সালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ওলন্দাজ বাণিজ্য সংস্থাগুলি একত্রিত হয়ে ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়।

উত্তর ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের ভারতীয় বাণিজ্যের প্রতি আগ্রহের কতকগুলি জটিল কারণ ছিল। প্রথমদিকে ইংরেজ এবং ওলন্দাজদের লক্ষ্য ছিল পর্তুগিজদের সবচেয়ে দুর্বল ঘাঁটি মশলা দ্বীপ এবং ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের দিকে। ওলন্দাজ নৌবহর অচিরেই আবিষ্কার করে যে, পর্তুগিজদের ভারী এবং শ্লথগতি জাহাজগুলি আক্রমণ করা তাদের পক্ষে আদৌ দুরূহ নয়। এর ফলে তারা অচিরেই সাবধানতা ত্যাগ করে এক আগ্রাসী নীতি

গ্রহণ করে। পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপপুঞ্জের বাজারে অর্থের ব্যবহার প্রায় ছিল না বললেই চলে। কিন্তু ভারতীয় তাঁতবস্ত্রের বিনিময়ে এই দ্বীপের উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করার অবাধ সুযোগ ছিল। সেজন্যে পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপপুঞ্জের মরিচ ও মশলা ব্যবসায়ে অংশগ্রহণের জন্য ভারতের পূর্ব উপকূলের বস্ত্র ব্যবসায় অংশগ্রহণ ছিল অপরিহার্য।

করমণ্ডল উপকূল এবং পশ্চিম ভারতে গুজরাতের সমতলভূমিতে নানাধরনের নকশার সুতীবস্ত্র বয়ন হত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের বাজারে এই সকল বস্ত্রের জন্য বিশেষ বিশেষ রকমের বাজার ছিল। এসব অঞ্চলের অধিকাংশ তাঁতীগ্রামের সমৃদ্ধিই বিদেশী বাজারের উপর নির্ভরশীল ছিল। এইসব বিদেশী বাজারের মধ্যে প্রধান ছিল ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং মশলা দ্বীপগুলি। এসব দ্বীপের উদ্বৃত্ত উৎপাদনের বিনিময়ে রপ্তানি হত ভারতীয় বস্ত্র। ভারতে মরিচ এবং মশলার চাহিদার দরুন এই ব্যবসা উভয় দিককার বণিককুলের পক্ষে বিশেষ লাভজনক ছিল। সপ্তদশ শতকের প্রথম দশকে এইভাবেই ভারতে ওলন্দাজ ও ইংরেজদের বাণিজ্য বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আন্তঃএশীয় বাণিজ্যের স্বার্থেই মসুলিপতম এবং সুরাটের মতো প্রসিদ্ধ বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলিতে তাদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু ভারতের পক্ষে তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল ইউরোপের বাজারে ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা সৃষ্টি। পর্তুগিজদের চেয়ে ইংরেজ এবং ওলন্দাজরা ইউরোপের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য অধিকতর সচেষ্ট ছিল। নৌ-অধ্যক্ষ কর্নেলিস ম্যাটেলিয়েকের ১৬০৫ সালের এক নথিতে জানা যায় যে, ওলন্দাজদের চেষ্টা ছিল লবঙ্গ, ছোট এলাচ ও বড় এলাচ ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার অর্জন এবং বস্ত্র ব্যবসায়ের জন্য করমণ্ডলের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন। কিছুদিনের মধ্যেই গুজরাটের প্রতিও তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ১৬০৫ সালে ওলন্দাজ কুঠিয়াল ভ্যান সোল্ডট মসুলিপতম বন্দরে আসেন। এর কিছুদিন পরেই তিনি গোলকুণ্ডার রাজার কাছে মসুলিপতমে কুঠি স্থাপন এবং স্বল্প হারে শুল্ক প্রদানের জন্য একটি ফরমান লাভে সফল হন। এইভাবে কৃষ্ণা ও গোদাবরীর ব-দ্বীপে ওলন্দাজদের প্রথম কুঠিগুলি স্থাপিত হয়। এই অঞ্চল ছিল বান্টাম, অচিন, মালাক্কা এমনকি সুদূর ম্যানিলায় রপ্তানিকৃত বিপুল পরিমাণ হাল্কা রেশমবস্ত্র বয়ন ও রঞ্জনের জন্য প্রসিদ্ধ। কর্ণাটকের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে পরিচিতি বৃদ্ধি পাবার পর ওলন্দাজরা বুঝলেন যে, আরো দক্ষিণে আরো বস্ত্র বয়ন হয় এবং গোলকুণ্ডার শাসকের এলাকায় যে দামে বস্ত্র ক্রয় করা হয় তার চাইতে বিজয়নগরের দয়ালু শাসকের অধীনস্থ এলাকায় অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যে সূক্ষ্মতর রেশমবস্ত্র ক্রয় করা সম্ভব। পুলিকটে তৈরি বস্ত্রের মশলাদ্বীপে বিশেষ চাহিদা ছিল। এইসব চিন্তা করেই ওলন্দাজ কুঠিয়ালরা প্রথমে জিঞ্জির নায়কের এলাকাতে নেগাপতমে বাণিজ্যিক সুবিধালাভের চেষ্টা করেছিলেন। এরপরে তাঁরা পুলিকটের প্রতিও আগ্রহী হয়ে ওঠে ওলন্দাজ বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। ১৬৯০ সালে নেগাপতমকে ওলন্দাজদের প্রধান কার্যালয় রূপে ঘোষণা না করা পর্যন্ত পুলিকটই ওলন্দাজ বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র থাকে।

উত্তরে সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করতে ওলন্দাজদের অনেক বেশি সময় লেগেছিল। শুধু যে ওলন্দাজদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যে গুজরাটি বস্ত্রর গুরুত্ব কম ছিল তাই নয় মুঘল দরবারে পর্তুগিজ প্রভাব এড়িয়ে অন্য কোনো ইউরোপীয় বাণিজ্য সংস্থার পক্ষে নিয়মিত এবং বিস্তৃত বাণিজ্যিক সম্পর্ক রক্ষা করা দুরূহও ছিল। ১৬০৭ সালে সুরাটে ভ্যান দেনসেন মৃত্যুমুখে পতিত হবার পরে ওলন্দাজদের পশ্চিম

উপকূলে উপস্থিতির প্রচেষ্টা সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। এরপর ১৬১৭ পর্যন্ত গুজরাটে কোনো স্থায়ী ওলন্দাজ কুঠি খোলা সম্ভব হয়নি। প্রধান প্রধান পর্তুগিজ ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করে বাণিজ্যের পথ নিষ্কণ্টক করতে তাদের অনেক সময় লেগেছিল ঠিকই, কিন্তু অক্লান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ওলন্দাজরা এ সঙ্কল্প রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়।

ওলন্দাজরা প্রথমে পর্তুগিজ জাহাজগুলিকে একে একে আক্রমণ করতে শুরু করে। পরে স্থলপথেও তাদের আক্রমণ করা হয়। কুঠি স্থাপনের অব্যবহিত পরেই ওলন্দাজ কোম্পানি জলপথে গোয়া ও মালাক্কা অবরোধ করতে সক্ষম হয়। মশলা দ্বীপে আম্বোয়না দখল হয় ১৬০৫-এ এবং পর্তুগিজরা ফিলিপাইনস্ থেকে স্পেনীয় সৈন্য নিয়ে এলেও বারবার ওলন্দাজদের কাছে পরাজিত হবার ফলে তাদের ক্ষমতা হ্রাস পায়। তা সত্ত্বেও ১৬৩৩ সালেও ওলন্দাজ কোম্পানির পক্ষে ক্ষতিকারক হচ্ছিল। ইন্দোনেশীয় ভূখণ্ডে পর্তুগিজদের করমণ্ডল ও সুরাটের কাপড় তখনও প্রচুর পরিমাণ বিক্রয় ও ব্যবহার হত। এই ব্যবসা বন্ধ করার উপায় ছিল গোয়া এবং মালাক্কা দখল এবং করমণ্ডল উপকূলে পাহারাদারি। ওলন্দাজদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল সিংহলের এলাচ ব্যবসা অধিকার এবং মালাবারে পর্তুগিজ গোলমরিচের আড়তগুলি ধ্বংস করে দেওয়া। ১৬৩৬ থেকে পরপর দশবছর প্রত্যেক ব্যবসার মরসুমে গোয়া অবরোধ করা হয়। ১৬৪১ সালে প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও মালাক্কার পতন ঘটে। বিজয়নীতি চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করে কলম্বো এবং কোচিন বিজয়ের পর। ইংরেজ কুঠিয়ালদের লোখায় জানা যায় যে, ওলন্দাজরা ইন্দোনেশিয়ার মতো মালাবার উপকূলেও পরাস্ত স্থানীয় শাসকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় যে ওলন্দাজদের প্রতিনিধি ব্যতীত দেশের কোনো স্থানে কোনো ব্যক্তিকে ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার দেওয়া হবে না।

৩৬.৪ ইউরোপীয় বণিক : ইংরেজ

প্রথমদিকে ওলন্দাজ কোম্পানির তুলনায় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল অনেক ছোট আয়তনের। সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগে এর বাণিজ্যিক পরিকল্পনার সঙ্গে ওলন্দাজদের বাণিজ্য প্রণালীর কোনো মিল ছিল না। ইংরেজদের প্রথম সমুদ্রযাত্রার লক্ষ্য যদিও ছিল ইন্দোনেশিয়ার গোলমরিচ বন্দরগুলি এবং মশলাদ্বীপপুঞ্জ কিন্তু অবিলম্বেই তারা দুটি সমস্যার সম্মুখীন হয়। প্রথমত, সামরিক ও নৌশক্তিতে অধিকতর শক্তিশালী ওলন্দাজরা কোনো প্রতিপক্ষকেই এই ব্যবসায় অংশগ্রহণ করতে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। দ্বিতীয়ত, শুধু ইংল্যান্ডের বাজারে এই পণ্য বিক্রয় করলে যথেষ্ট মুনাফা হবার সম্ভাবনা ছিল না। ওলন্দাজ ও পর্তুগিজ আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যথেষ্ট বৃহৎ নৌবহর পাঠাবার প্রয়োজন ছিল। অথচ ইংল্যান্ডে যা গোলমরিচ প্রয়োজন ছিল তা এইসব জাহাজের যে-কোনো একটিতে করেই আনা যেত। এর ফলে ১৬০৩ সালে ইংল্যান্ডের বাজারে গোলমরিচের জোগান অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় কারণ ভারতে পাঠানো নৌবহর ফিরতি পথে জাহাজ ভরে শুধুই গোলমরিচ এনেছিল। ফিরতি নৌবহরে লাভজনক কোনো দ্রব্য আহরণের উদ্দেশ্যই

ইংরেজ কোম্পানি ভারতীয় বন্দরগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কে লিপ্ত হয় এবং গুজরাট, করমণ্ডল ও পরিশেষে বাংলায় কয়েকটি বাণিজ্যকেন্দ্রের পত্তন হয়।

সুরাট এবং লোহিত সাগরের বাণিজ্য সম্ভাবনা পর্যালোচনা করার প্রথম পরিকল্পনা হয় ১৬০৭ সালে লন্ডনে ক্যাপ্টেন কিলিং ও উইলিয়াম হকিন্সের নেতৃত্বে। এর বছর দুই পরে হকিন্স সুরাটে উপস্থিত হন এবং বেশ কিছুদিন সম্রাট জাহাঙ্গীরের সভায় কাটিয়েও যান। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথমদিকে ইংরেজদের মুঘল বন্দরে বাণিজ্য করার চেষ্টা বিশেষ সাফল্যলাভ করেনি। দশমবারের সমুদ্রযাত্রার পর ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে টমাস বেন্ট মুঘলদের কাছে একটি রাজকীয় অনুমতিপত্র লাভ করেন। এর পর থেকে তাদের মুঘল রাজকর্মচারীদের হাতে লাঞ্ছনা থেকে অন্তত রেহাই মেলে। তবে সমুদ্রপথে পর্তুগিজ হামলা চলতেই থাকে।

সুরাটে বাণিজ্য করতে গিয়ে ইংরেজরা পর্তুগিজদের কাছে প্রবল বাধা পান। পর্তুগিজ নৌবহরের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে প্রয়োজন ছিল আরো শক্তিশালী নৌবহর আর মুঘল রাজদরবারে জেসুইট পুরোহিতদের রাজনৈতিক প্রভাব খর্ব করার জন্য প্রয়োজন ছিল ইংরেজদের তরফে একজন দক্ষ কূটনৈতিক প্রতিনিধি। পর্তুগিজদের সুরাটে কিছুটা প্রতিরোধ করতে পারার পরই ইংল্যান্ডে সরাসরি ভারতীয় পণ্যবাহী দু-একটি জাহাজ পাঠানো হয়। এছাড়া পূর্বভারতীয় বাজারে জাভার বান্টামে উৎপন্ন দ্রব্য আমদানি করে শতকরা ৩০০ ভাগ লাভ করাও সম্ভব হয়েছিল। সুরাটে কুঠির উদ্দেশ্য ছিল ইংল্যান্ডের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্য। এছাড়া আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশ নেবার জন্যে ১৬১০ সালে করমণ্ডল উপকূলে প্রতিষ্ঠিত হয় মসুলিপতম কুঠি। মাদ্রাজের অভ্যুত্থানের পরেও এই কুঠির গুরুত্ব কমেনি।

বছর দশেক ভারতে ব্যবসা করতে করতে ইংরেজ কোম্পানি ভারত মহাসাগরে বাণিজ্যের ধারা এবং এখানকার বাণিজ্যিক জগতে ভারতের গুরুত্বের সঠিক মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়। এর ফলে তারা ক্রমশ তাদের বাণিজ্যের পরিধি বিস্তারে যত্নবান হয়। স্যার টমাস রো ১৬১৫ সালে মুঘল দরবারে রাজা প্রথম জেমস-এর দূত নিযুক্ত হন এবং ভারতে আভ্যন্তরীণ ব্যবসা পরিচালনার জন্য অসংখ্য ইংরেজ কুঠি স্থাপিত হয়। এছাড়া পারস্যের সঙ্গেও কোম্পানির বাণিজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা হয়। লোহিত সাগর এবং পারস্যের খাঁড়িতে বাণিজ্য তখনও নানা রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত ছিল এবং ১৬২২ সালে যৌথ ইঙ্গ-পারসীয় ফৌজের দ্বারা একদা দুর্ভেদ্য ওরমুজ বন্দর দখল না করা পর্যন্ত পর্তুগিজ আক্রমণের আশঙ্কা সম্পূর্ণ দূর হয়নি। ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার মুঘল ফৌজ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে পূর্ব ভারতের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হুগলি থেকে পর্তুগিজদের বহিষ্কার করে। উপমহাদেশের খাদ্যভাণ্ডার বলে সমধিক প্রসিদ্ধ এবং পরবর্তীকালে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রধান বস্ত্র বয়ন কেন্দ্র এই অঞ্চলে এই সময় থেকেই ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানিগুলির বাণিজ্য বিস্তারের সুযোগ ঘটে।

সমগ্র সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে উত্তর ইউরোপীয় বাণিজ্যসংস্থাগুলির ব্যবসায়িক সংগঠনে একটিই ধারা লক্ষ্য করা যেত। তবে প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কোনো একটি বৃহৎ ভারতীয় বন্দর সংলগ্ন এলাকায় একটি ঘাঁটি স্থাপন এবং এই ঘাঁটির অধীনে দেশের অভ্যন্তরে রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে ছোট ছোট কয়েকটি বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা। প্রধান ঘাঁটিগুলি একে অপরের অধীন ছিল না কিন্তু তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ

কার্যনির্বাহী সম্পর্ক রক্ষিত হত। জাভাতে একটি মজবুত ঘাঁটি থাকায় ওলন্দাজরা ভারতীয় উপমহাদেশের কুঠিগুলি সম্বন্ধে যেমন নিশ্চিত থাকতে পেরেছিল ইংরেজরা তা পারেনি। স্থানীয় শাসকের রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য তারা ১৫৩৯ সালে দখল করে মাদ্রাজ, ১৬৬৫ সালে বোম্বাই এবং ১৬৯৬-৯৭ সালে শুরু করে কলকাতায় দুর্গ নির্মাণ। ১৬৮৭-৮৯ সালে স্যার জোশিয়া চাইল্ডের শাসনাধীনে ইংরেজ কোম্পানি মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

৩৬.৫ ইউরোপীয় বণিক : ফরাসি

অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ভারতে ফরাসি বাণিজ্য এক উল্লেখযোগ্য মান অর্জন করে। ১৬৬৪ সালে কোলবার্ট Compagnic des Indes Orientales (প্রাচ্য দেশীয় বাণিজ্য সংস্থা) গঠন করে প্রথম ভারতীয় বাণিজ্যে অংশগ্রহণের সূচনা করেন। সুরাটে তাঁরা একটি কুঠি স্থাপন করেন এবং একজন ওলন্দাজ কুঠিয়ালকে (ফ্রাঁসোয়া কারোঁ) ভারতে ফরাসি বাণিজ্য সংগঠনের ভার দেন। এই সময়ে ভারতে ফরাসিদের প্রধান সমস্যা ছিল দেশীয় শাসকদের কাছে বাণিজ্যিক সুবিধা আদায় এবং ভারতে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির প্রতিবন্ধকতা। ১৬৬৬ সালে মুঘল দরবারে কোলবার্ট প্রেরিত প্রতিনিধি ওলন্দাজদের সশস্ত্রভাবে প্রতিরোধ করার অনুরোধ করেন। চার বছর পরে ভারতীয় উপকূলে নয়টি যুদ্ধজাহাজ বিশিষ্ট এক বিশাল ফরাসি নৌবহরের আবির্ভাব হয়। কিন্তু ফরাসিদের নিজেদের মধ্যে ক্রমাগত বিরোধের ফলে এই নৌবহর বিশেষ কিছু সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ১৬৭২ সালে লা হায়ে করমণ্ডল উপকূলবর্তী সাঁও তোম দখল করেন। গোলকুণ্ডার রাজা এসময় পর্তুগিজদের কাছ থেকে সদ্য সাঁও তোম জয় করেছিলেন। ওলন্দাজ এবং গোলকুণ্ডারাজের মিলিত বাহিনী লা হায়ের কাছ থেকে সাঁও তোম উদ্ধার করে। লা হায়ের নৌবহরের সাফল্যের এখানেই ইতি। কিন্তু এই নৌবহরের এক প্রতিনিধি বেলাজঁর দ্য লেস্পিনে নিকটবর্তী বিজাপুর রাজ্যে একটি ছোট গ্রাম লাভ করেন। এই পঁদিচেরি গ্রাম পরে ভারতে ফরাসি বাণিজ্যিক কার্যকলাপের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশিদিন ফরাসি কোম্পানি ভারতে বাণিজ্য কার্যকলাপের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশিদিন ফরাসি কোম্পানি ভারতে বাণিজ্য করে। ১৬৬৫ থেকে ১৬৭৬-এর মধ্যে এরা ভারতে ৩৫টি জাহাজ পাঠায়। ১৬৭৯ থেকে ১৬৯৫-তে পাঠায় ৩৯টি জাহাজ এবং ১৬৯৭ থেকে ১৭০৬-এর মধ্যে আরো ১০টি। ইংরেজ এবং ওলন্দাজদের তুলনায় অবশ্য এ বাণিজ্য ছিল অনেক কম। ১৭১৯ সালে জাঁল-এর দ্বিতীয় ফরাসি কোম্পানি প্রতিষ্ঠার পর ভারতে কার্যকলাপ আরো বিস্তৃত হয়।

ভারতে ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য যদি হয়ে থাকে বন্দুকধারী সৈন্যদের পাহারা দেওয়া সশস্ত্র দুর্গ, তাহলে নৌ অবরোধও ছিল এই বাণিজ্যিক ঐতিহ্যের এক উল্লেখযোগ্য দিক। সুরাট বা হুগলির মতো যেসব গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্রে ইউরোপীয়দের মুঘল রাজকর্মচারীদের অধীনে ব্যবসা করতে হত এসব জায়গায় স্থলপথে কোনো বাধা পেলে ইউরোপীয়গণ নৌ অবরোধের দ্বারা ভারতীয় জাহাজগুলিকে বন্দর

ত্যাগে বাধা দিয়ে মুঘল শাসকগণের কাছে তাদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিত। ভারতীয় শাসকগণ প্রায়ই কোনোপ্রকার অমনোনীত কিছু ঘটলে ইউরোপীয় কুঠিগুলির খাদ্য এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বস্তুর সরবরাহ বন্ধ করে দিতেন। ইউরোপীয়গণ এর জবাবে তাঁদের যুদ্ধ জাহাজগুলিকে নির্দেশ দিতেন বন্দর অবরোধ করতে অথবা ভারতীয় বণিকদের জাহাজ আটকাতে। এর ফলে উভয় পক্ষকেই সমঝোতার রাস্তা নিতে হত এবং বিরোধ কখনোই খুব বেশি হিংসাত্মক রূপ নিত না। এইসব বিরোধের কারণ বহু ক্ষেত্রেই ছিল অবৈধ এবং অন্যায়ভাবে শুল্ক আদায়ের চেষ্টা। ইউরোপীয়রা মনে করত যে, এরকম শুল্ক আদায় অনুচিত। মুঘল কর্মচারীদের অবশ্য বক্তব্য ছিল যে, ইউরোপীয় বণিকরা অন্যায়ভাবে ব্যক্তিগত আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য প্রদেয় শুল্ক ফাঁকি দেবার চেষ্টা করত অথবা ভারতীয় বণিকদের পণ্য ইউরোপীয় জাহাজে তুলে সরকারি কোষাগারকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করত। ১৭১৭ সালে ইংরেজ কোম্পানি এক মুঘল ফরমান লাভ করে যাতে বাৎসরিক মাত্র ৩০০০ টাকা করের বিনিময়ে ইংরেজ বাণিজ্য সংস্থাকে সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যে শুল্ক ছাড় দেওয়া হয়। ফারুকশিয়ারের এই ফরমানই ইংরেজ কোম্পানির বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক কার্যপ্রণালীর প্রধান ভিত্তি হয়ে ওঠে। স্থানীয় শাসকের অধীনতা থেকে ইংরেজ বাণিজ্য সংস্থাকে প্রায় মুক্ত করে এই ফরমান পরবর্তীকালে নানা দুর্নীতি ও অন্যায়ের সুযোগ করে দেয়। এর ফলে দেশীয় বণিকগণ কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে থাকে এবং অনেক সময় শুল্ক এড়াবার জন্য কোম্পানির ছাড়পত্র নগদ মূল্যে কিনতে বাধ্য হয়।

১৭৪০-এর গোড়াতেই কেন্দ্রীয় মুঘল শক্তির দুর্বলতা, প্রাদেশিক স্বাধীনতা এবং মারাঠা সামরিক শক্তির অভ্যুত্থান ইউরোপীয় কোম্পানিগুলিকে বাণিজ্যিক স্বার্থে রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলছিল। এই বোধ থেকেই করমণ্ডলে দুই যুযুধান প্রতিযোগী রাজবংশের সমর্থন করতে গিয়ে ইঙ্গ-ফরাসি সংঘর্ষ বাধে। পলাশীর বিপ্লবও অনেকটা একই ধরনের ঘটনা। এভাবেই বাংলায় ইংরেজ শক্তির অভ্যুত্থান ঘটে। কোম্পানির পরিচালকবৃন্দ অনেক সময়েই তাঁদের কর্মচারীদের কার্যকলাপ সুনজরে দেখতেন না। অকারণে কোনো নতুন বাণিজ্যিক ঘাঁটির পত্তন যেমন ব্যয়বাহুল্যের কারণ বলে গণ্য হত তেমনি উপমহাদেশে রাজনৈতিক বা সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টাও অপব্যয়ের সূচনা বলে বিবেচিত হত। মনে করা হত যে, এতে বাণিজ্যিক ব্যয় বৃদ্ধি পাবে অথচ কোন অতিরিক্ত আর্থিক লাভ হবে না। ১৭৫৮ সালে পলাশীর যুদ্ধে অল্প কিছুদিন পরে যখন কলকাতা কাউন্সিল নবাবের রাজধানী মুর্শিদাবাদকে সন্ত্রস্ত রাখার উদ্দেশ্যে কাশিমবাজার কুঠিকে শক্তিশালী করে তুলতে চায় তখনও কোম্পানি তাদের লাভক্ষতির অঙ্কের হিসেব কষছিল। বাংলায় তাদের কর্মচারীদের তারা সতর্ক করে দেয় যে, সামরিক পরিকল্পনার আবেগে কর্মচারীরা যেন ভুলে না বসে যে তারা প্রকৃতপক্ষে শুধু একদল বণিক যাদের প্রধান উদ্দেশ্য ব্যবসা।

৩৬.৬ ইউরোপীয় বণিককুল ও ভারতীয় অর্থনীতি

আমেরিকায় রৌপ্যখনি আবিষ্কারের ফলে ইউরোপীয় বণিককুলের যে আর্থিক স্বাচ্ছল্যের সূচনা হয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের আন্তঃমহাদেশীয় বাণিজ্যে তার প্রতিফলন ঘটে। এর ফলে পশ্চিমি দেশগুলি এশিয়ার

সঙ্গে তাদের বাণিজ্য ঘাটতির অনেকটা পূরণ করতেসক্ষম হয়। ভারতীয় অর্থনীতিতে সোনা-রূপা আমদানির কী প্রভাব পড়েছিল তা অনিশ্চিত। সোনা-রূপা অনেক সময়েই অলঙ্কারে রূপান্তরিত হত। কিন্তু ধাতু আমদানি হত, ভারতীয় মূল্যমানে তার কী প্রভাব পড়েছিল এবং ভারতীয় অর্থনৈতিক লেনদেন এবং মুদ্রা ব্যবস্থায় সোনা-রূপার কী ভূমিকা ছিল এ সম্বন্ধে কোনো সঠিক ধারণা করা যায় না। সবসময় সোনার দাম একরকম যেত না। ব্যবসার অবস্থা অনুযায়ী ওঠানামা করত। সোনা-রূপা অনেক সময় ভারতের বাইরেও চলে যেত—যেমন ইউরোপ বা ফিলিপাইনস্ থেকে আমদানি রূপা চলে যেত চীনে। ইতালীয় পর্যটক গ্যামেলি কারোরি যে মন্তব্য করেছিলেন যে, 'সারা পৃথিবীর সোনা-রূপার স্থান ছিল মুঘল সাম্রাজ্যে', কথাটা অতিরঞ্জন। একমাত্র আমেরিকার রূপারই চূড়ান্ত গন্তব্য ছিল ভারতে। কোন পথে এই রূপা আসত সে সম্বন্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন পদাধিকারী তাঁর বিবরণ দিয়ে গেছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে স্পেনের পথে এই রূপা ছড়িয়ে পড়ত সমগ্র এশিয়ায়। এর একটা ধারা আসত রেশমের জন্য আলেপ্পো থেকে। আরেকটি ধারা এসে পৌঁছত লোহিত সাগরের মোখা বন্দর থেকে সূতিবস্ত্রের জন্যে। অপর একটি প্রবাহ পৌঁছত উত্তমাশা অন্তরীপ পেরিয়ে সুরাট এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে নীল, গোলমরিচ, লবঙ্গ, দারুচিনি এবং এলাচের জন্য। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এই পদাধিকারীর মতে, এশিয়ায় আগত সম্পূর্ণ সোনা-রূপার মূল্য ছিল ১.৫ মিলিয়ন পাউন্ড।

পর্তুগিজ ইংরেজ, ওলন্দাজ সকলেই ভারতে সোনা-রূপা আমদানি করতেন। Mercantilist-রা এভাবে ক্রমাগত সোনা-রূপার আমদানি ভালো নজরে দেখতেন না। তাঁরা মনে করতেন এতে সোনা-রূপা রপ্তানিকারী দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যে একই মুদ্রা ব্যবহৃত হবার ফলে বহির্বাণিজ্যের ঘাটতির প্রতিক্রিয়ায় সামগ্রিক অর্থনীতির ক্ষতির অপেক্ষা ছিল। সোনা-রূপার দাম ওঠানামার ফলে সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেতে পারে বলে ভাবা হত। আর্থিক মন্দার সঙ্গে মুদ্রা ঘাটতির প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল।

তাই ইউরোপীয় বণিকরা আগ্রহী ছিলেন প্রধানত এক স্থানের পণ্য অপর স্থানে বিক্রয় বা পুনঃরপ্তানি বাণিজ্যে (reexport trade)। ওলন্দাজরা অনেক সময়ে ভারতীয় বাজারে উৎকৃষ্ট মশলা আমদানির বিনিময়ে অন্য কিছু ক্রয় করতে পারতেন। ইংরেজরা আনতে পারতেন শুধু একধরনের মসৃণ কালো কাপড় এবং সিসা, টিন এবং লোহার পাত এবং নানাবিধ পাশ্চাত্যদেশীয় বিলাসদ্রব্য।

ইউরোপ থেকে ফিরতিপথে জাহাজে কী নিয়ে আসা হবে এটা ছিল এক সমস্যা। ইউরোপীয় পণ্য রপ্তানি করার সুযোগ ছিল সীমিত। বরং এশিয়া থেকে কেনা জিনিস ইউরোপ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে বিক্রি করে কিছু লাভ হত। ইউরোপ, আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল এবং আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রীতদাস কর্ষিত আবাদের মধ্যে যে ত্রিপাক্ষিক ব্যবসায়িক সম্বন্ধ ছিল তা ছিল পূর্বভারতীয় বাণিজ্যের বিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ পটভূমিকা।

ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগিজরা একমাত্র গোলমরিচের ব্যবসাতেই লিপ্ত ছিল। গোলমরিচ সংগ্রহের জন্য কোচিন, কান্নানোর, কুইলনে কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। মনে করা হয় যে, ১৬১৫ সাল মালাবারে উৎপন্ন গোলমরিচের শতকরা ৩০ ভাগ পর্তুগিজরা পাঠিয়ে দিত লিসবনে। Antwerp-এর বণিকগণ ইউরোপে পর্তুগিজ গোলমরিচ বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা করতেন। গোলমরিচের এই ঢালাও চাহিদার কারণ গোলমরিচ কেনার

জন্য কোনো বিশেষ অভিজ্ঞতা বা সংগঠন প্রয়োজন ছিল না। ইউরোপে এর অফুরন্ত চাহিদা ছিল এবং বিক্রির সুবিধাও ছিল। অন্যান্য দামী জিনিসের সঙ্গে গোলমরিচ দিয়ে জাহাজগুলিতে ভারসাম্য বজায় রাখাও সহজ ছিল।

কালক্রমে বস্ত্র ব্যবসার গুরুত্বের ফলেই মরিচ ব্যবসার গুরুত্ব হ্রাস পায়। করমণ্ডল ও গুজরাট থেকে বস্ত্র আমদানি শুরু হয় ইন্দোনেশিয়ায়। ক্রমে ইউরোপেও বস্ত্র রপ্তানি শুরু হয়। ১৬১৩ থেকে ক্যালিকোর নিয়মিত নিলাম শুরু হয়। ইউরোপে যে সব কাপড় পাওয়া যেত তার চেয়ে ভারতীয় সূতীবস্ত্র অনেক সুলভ হওয়ায় এই চাহিদার সৃষ্টি হয়। সপ্তদশ শতকের শেষে ভারতীয় বস্ত্র বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৬৬৪ সালে ইংরেজ কোম্পানির সামগ্রিক কেনাবেচার ৭৩% দখল করেছিল বস্ত্র ব্যবসায়। পরবর্তী দুই দশকে এর পরিমাণ ৮৩%-এ বৃদ্ধি পায়। ১৬৮০-র দশকে ভারতীয় বস্ত্র উৎপাদন উল্লেখযোগ্য মাত্রা অর্জন করে।

ইংরেজ ও ওলন্দাজ নথি থেকে জানা যায় যে, মোট পাঁচরকম বস্ত্র আমদানি হত—

(১) সাধারণ সাদা বস্ত্র, (২) সাধারণ রঙিন বস্ত্র, (৩) ডোরাকাটা ও চৌকো চৌকো দাগ কাটা কাপড়, (৪) জরি বসানো ও নক্‌শা করা কাপড় এবং (৫) রেশমের কাপড়। রঙের বৈশিষ্ট্যের জন্যে ভারতীয় জরির বিশেষ কদর ছিল। ভারতীয় রেশম বস্ত্রের মধ্যে বাংলার রেশমবস্ত্রই ছিল উল্লেখযোগ্য। সূতীবস্ত্রের মধ্যেও কয়েকটি ভাগ করা যেত—যেমন সাধারণ কাপড় ও মসলিন বা অতি মিহি বস্ত্র। পশ্চিম ভারতে পাওয়া সস্তা কাপড় দিয়ে আফ্রিকার সঙ্গে দাস ব্যবসা করা যেত আর মাদ্রাজ ও বাংলায় তৈরি হত মধ্যমরকম বস্ত্র। সুরাট থেকে ইউরোপীয় বাণিজ্যের গতি যেভাবে করমণ্ডল এবং সর্বশেষে বাংলার দিকে ঘুরেছিল তাতে মনে হয় যে আগে ইউরোপে ছিল সস্তা কাপড়ের চাহিদা। পরে তা পরিবর্তিত হয় অভিজাত মহলের শৌখিন বস্ত্রের চাহিদায়।

এছাড়া চাহিদা ছিল নীলের। এর পরে ছিল সোরা ও বাংলার রেশম বস্ত্র। রং করার কাজে ইংল্যান্ডে নীল ব্যবহার হত। এর রং ছিল পাকা এবং সস্তা। আমেদাবাদ ও আগ্রায় ভালো নীল পাওয়া যেত। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও স্পেন অধিকৃত আমেরিকায়ও নীল তৈরি হতে থাকে এবং ভারতীয় নীলের প্রতিযোগী হয়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতকের শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজে নীল উৎপাদন ব্যাহত হলে তবেই ভারতীয় নীলের বাজার আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ভারত থেকে সোরা আমদানি একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মোরল্যান্ডের মতে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের আগে পর্তুগিজ জাহাজে সোরা বহন করে নিয়ে যাবার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। স্থলপথে সোরা বহন করে নিয়ে যাওয়া ছিল খুবই ব্যয়বহুল। জলপথের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। এই সময়ে ইউরোপে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হতে থাকে এবং গোলাবারুদের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ভারত থেকে আমদানি সোরার চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

সোরার পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পণ্য ছিল বাংলার রেশম। কাশিমবাজারের আশপাশ এবং উত্তরবঙ্গের তুঁত বাগিচায় উৎপন্ন রেশমের উৎকর্ষ ছিল ভারতবিখ্যাত এবং এই অঞ্চলের নিকটবর্তী এলাকায় একটি বৃহৎ রেশম বয়ন শিল্প গড়ে ওঠে। ইউরোপীয় বয়ন শিল্পে রেশমের সুতোর চিরাচরিত চাহিদা মেটাত ফ্রান্স, ইতালী

ও পারস্যদেশ। ১৬৫০ থেকে বাংলার রেশম এই স্থান অধিকার করে এবং সূতীবস্ত্রের পরই সবচেয়ে মূল্যবান আমদানিকৃত পণ্য হয়ে ওঠে রেশম।

৩৬.৭ ইউরোপীয় বাণিজ্যরীতি ও তার প্রতিক্রিয়া

ওলন্দাজ ও ইংরেজরা ব্যবসা শুরু করার আগে পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল সামান্যই। পর্তুগিজদের বাণিজ্যের পরিমাণ একেবারে অবহেলার যোগ্য না হলেও নিশ্চয়ই পরবর্তী যুগের তুলনায় কম এবং বৈচিত্র্যহীন ছিল। উত্তর ইউরোপে যৌথ মালিকানার বাণিজ্য সংস্থা সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে ইউরোপের বাণিজ্য বিস্তারের ব্যাপক সুযোগ ঘটে। এই সংগঠন পরিচালিত হত কতকগুলি নিয়ম (operational rule) অনুসারে। জাহাজ যাতায়াতের জটিল দিনপঞ্জীর সমন্বয় সাধন, ক্রয় এবং বিক্রয় মূল্যের মান নির্ধারণ, ভবিষ্যৎ বাজারের গতির পরিমাপ, পণ্য ক্রয়ের নির্দেশ দেওয়া এবং সেই পণ্য সংগ্রহ করা এবং তার চেয়েও বেশি করে দেশীয় শাসককুলের সঙ্গে সুপরিকল্পিতরূপে রাজনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করা—প্রতিটি কাজের জন্যই এই ধরনের নিয়মের উদ্ভাবন হয়েছিল। ইউরোপে নির্দেশ জারি এবং ভারতে সেই নির্দেশ কার্যকরী করার মধ্যে যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান থাকত তার ফলে সিদ্ধান্তগুলি কার্যকরী করার ক্ষেত্রে যাতে কোন অসুবিধা না ঘটে তার জন্যে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব ত্রুটিহীন করার চেষ্টা ছিল।

যৌথ মূলধনের পূর্বভারতীয় বাণিজ্য সংস্থাগুলি কয়েকটি দিক থেকে আধুনিক, বহুজাতিক, বহুমুখী বাণিজ্য সংস্থাগুলির পূর্বসূরী ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। এদের বাণিজ্য ছিল পৃথিবীবিস্তৃত এবং কেন্দ্রীভূত বণ্টন-ব্যবস্থার মাধ্যমে পাইকারি বিপণন-ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত। এর অর্থ ছিল বিভিন্ন কারিগরের ব্যক্তিগত পর্যায়ে উৎপাদিত পণ্যগুলি যাতে একটি নির্দিষ্ট গুণগতমান অর্জন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা এবং সেগুলিকে আমদানির উপযোগী করে তোলা। ভারতীয় বাণিজ্য জগতে এইভাবে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ এবং এই পণ্যের যোগানদারদের কাছ থেকে পণ্যগুলি নিয়মিত সংগ্রহ করা এবং তা করতে গিয়ে সম্ভাব্য ক্ষতির মোকাবিলা করা ছিল এক অভিনব ব্যাপার। অবশ্য লোহিত সাগর, পারস্য সাগর এবং ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের বৈদেশিক বাণিজ্যে যুক্ত ভারতীয় বণিকগণও যথেষ্ট বিবেচনা করেই তাঁদের পণ্য সংগ্রহ করতেন কারণ বিশেষ বিশেষ বাজারে বিশেষ বিশেষ ধরনের বস্ত্রের চাহিদা ছিল। এই সকল স্থানে বাণিজ্যের বিশেষ বিশেষ মরসুম ছিল এবং বণিকদের সেই অনুসারে তাঁদের পণ্য সংগ্রহের সময় নির্ধারণ করতে হত। কিন্তু ভারতীয় বণিকদের সঙ্গে ইউরোপীয় বণিকদের কার্যধারার প্রধান পার্থক্য ছিল তাদের পণ্য সংগ্রহের বিপুল লক্ষ্যমাত্রায় এবং তাদের চুক্তি কার্যকরী করার নির্দিষ্ট আইনানুগ পদ্ধতিতে। জাহাজ ছাড়ার মরসুমে ইউরোপীয় সংস্থাগুলির সংগৃহীত বস্ত্রখণ্ডের সংখ্যা প্রায়ই এক মিলিয়ন ছাড়িয়ে যেত। এগুলি লন্ডন এবং আমস্টারডামে গাঁটরি হিসেবে বিক্রি হত। সম্ভাব্য ক্রেতাদের শুধু নমুনা দেখানো হত। বস্ত্রের গুণগত মান রক্ষার জন্যে ইউরোপীয় কারখানাগুলি উদ্ভাবন করেছিল তালিকা (muster) পদ্ধতির। ইউরোপ থেকে জাহাজ এসে পৌঁছনোর সম্ভাব্য সময়ের

আট-দশ মাস আগেই ভারতীয় বণিকদের সঙ্গে চুক্তি করা হত। চুক্তিতে পণ্যের সঠিক গুণগত মান, পরিধি এবং বস্ত্রের মূল্যের সঙ্গে সঙ্গে কবে সেগুলি পাওয়া যাবে এবং কোনো বিশেষ বণিকের মাধ্যমে এই সকল বিষয় স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকত। গুদামে বস্ত্র নিয়ে আসার পরে নমুনা অনুসারে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণ বস্ত্রগুলি বাছাই করতেন। 'তালিকা'র সঙ্গে কোনোরকম গরমিল দেখা গেলে তৎক্ষণাৎ বস্ত্রগুলি বাতিল হয়ে যেত অথবা তাদের চুক্তি অনুসারে প্রদেয় মূল্য হ্রাস করা হত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ বাণিজ্য সংস্থা অনেক সময়ে যতক্ষণ না সমস্ত বস্ত্র ক্রয় সম্পন্ন হত ততক্ষণ পর্যন্ত বাতিল বস্ত্র আটকে রাখতেন যাতে না জাহাজ ছাড়ার সময় নিকটবর্তী হলে ওই বাতিল বস্ত্র কোনোভাবে কেউ পুনরায় বিক্রয় করার চেষ্টা করতে পারে। বস্ত্র ববসায়ীরা অনেক সময় অভিযোগ করতেন যে, নমুনার সঙ্গে হুবহু মেলাতে গেলে অনেক সময় তাঁদের বিপুল ক্ষতি হত কারণ বস্ত্রগুলি অল্প সংখ্যায় একেকজন তাঁতীর কাছ থেকে সংগ্রহ করা হত এবং দেখা যেত যে একই তাঁতীও ঠিক একইরকম দুটি বস্ত্র বয়ন করতে পারতেন না। স্থানীয় বাজারে যেহেতু ইউরোপে পাঠাবার উপযোগী কাপড়ে কোন চাহিদা ছিল না সেহেতু ব্যবসায়ীগণ অনেক সময়ে বিপুল পরিমাণ বিক্রয়ের অযোগ্য কাপড় নিয়ে অসুবিধায় পড়তেন। তবে এ বিষয়ে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের যে একেবারেই কোন দরাদরি করার অবকাশ ছিল না এমন নয়। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি যেমন তাদের উন্নত আর্থিক সম্পদের জোরে যৌথভাবে বাজার দখল করে থাকতে পারত এবং উৎপাদনের এমন নির্দিষ্ট মান দাবি করত যা ছোট ছোট একক কারিগরি প্রচেষ্টায় একান্ত দুর্লভ তেমনি দেশীয় ব্যবসায়ীগণও অনেক সময় একেবারে জাহাজ ছাড়ার সময় পর্যন্ত পণ্য সরবরাহ করতে দেরি করতেন। এর ফলে ইউরোপীয় পণ্য সংস্থাগুলিকে হয় যেমন বস্ত্র পাওয়া যেত সেইগুলিই ক্রয় করতে হত অথবা জাহাজগুলিকে শূন্যভাবেই ফেরত পাঠাতে হত, যার ফলে সামগ্রিক ব্যয় অনেক বেড়ে যেত।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সব ইউরোপীয় বাণিজ্য সংস্থা ভারতের সঙ্গে বস্ত্র ব্যবসায়ের সমৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করছিলেন তাঁরা বুঝেছিলেন যে শিল্পোৎপাদনের সঙ্গে বাজারের একটা বিশেষ যোগসূত্র আছে। চাহিদার সঙ্গে উৎপাদনের সামঞ্জস্য সাধনের জন্য ভারতীয় তাঁতীরা দু'ধরনের সমধান উদ্ভাবন করেছিলেন। একদল তাঁতী খোলা বাজারের জন্য সুপরিচিত পুরনো রীতির বস্ত্র বয়নে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তাঁতীরা বিশেষ কিছু ব্যবসায়ীর কাছে অগ্রিম মূলধনের বিনিময়ে এক বিশেষ ধরনের কাপড় যোগান দেবার চুক্তিতে আবদ্ধ হতেন। এই দু'ধরনের প্রথার পার্থক্যের অর্থ এই নয় যে এক ধরনের কাজে নিযুক্ত থাকলে অন্য ধরনের কাজে অংশগ্রহণ করা চলত না। ব্যস্ত রপ্তানির মাসে যে তাঁতী ফরমাশমাফিক কাপড়ের যোগান দিত সেই একই তাঁতী হয়তো শ্লথ মাসগুলিতে নিজ দায়িত্বে কাপড় বুনত। কিন্তু সে যাই বুনুক, তাঁতীর সঙ্গে কোনো পর্যায়েই প্রকৃত ক্রেতার যোগাযোগ ঘটত না। মাঝখানে সবসময়েই থাকত কয়েকজন মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী। মূলধনের উৎস নিজস্ব বা দাদন যাই হোক না কেন, তাঁতী সর্বদাই তার বস্ত্র বাজারে পাঠাবার জন্য পাইকারি বিক্রেতার উপর নির্ভরশীল থাকত। ইউরোপের putting out প্রথা বা উৎপাদনের

জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহের মাধ্যমে ফরমাশ মাফিক উৎপাদন করিয়ে নেওয়ার সঙ্গে এই বাণিজ্যিক অগ্রিম অর্থ প্রদানের অনেক সময় তুলনা করা হলেও, ভারতীয় তাঁতী সর্বদাই চিরাচরিত ধারায় চুক্তি অনুযায়ী অগ্রিম অর্থই পেত, কাঁচামাল নয়। এই অগ্রিম অর্থ প্রদানের দুটি তাৎপর্য ছিল। এক হচ্ছে তাঁতীকে কাঁচামাল কিনতে সাহায্য করা এবং উৎপাদন চলাকালীন সময়ে তাদের সংসারযাত্রা নির্বাহের সংস্থান করা। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল অগ্রিম টাকা দিয়ে বিপুল পরিমাণে কাপড় বোনানো। এই চুক্তিতে দু'পক্ষেরই দায়িত্ব থাকত। বণিক যেমন সময়মতো নির্দিষ্ট মানের কাপড় পাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারত তেমনি তাঁতীও তার উৎপাদনের মূল্য পাওয়া সম্বন্ধে কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারত। বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি এইভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ অগ্রিম প্রদান করে চুক্তি পাকা করার প্রয়োজন ভালোভাবেই বুঝত। কিন্তু তারা কদাচিৎ তাঁতীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ করত। সর্বদাই যোগাযোগের মাধ্যমে ছিলেন ভারতীয় দালালরা, যাঁরা লাভের কিছুটা অংশ নিজেদের হাতে রাখতেন, অথবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীগণ যাঁরা সর্বদা জোট বেঁধে কাজ করতেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রথম আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির উপর ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রভাব পরিপূর্ণরূপে অনুভূত হয়। ১৬২৪ সালে একজন ইতালীয় অভিজাতবংশীয় পর্যটক যখন শোনেন যে, সুরাটে মুঘল কর আদায়ের প্রতিবাদে ইংরেজরা কিছু ভারতীয় জাহাজ দখল করে নিয়েছে তখন তিনি মন্তব্য করেন যে, এই পদক্ষেপ চরম ভ্রান্ত কারণ মুঘল সম্রাটের সমৃদ্ধির প্রধান উৎস তাঁর ভূ-সম্পদ। তাঁর সমুদ্র থেকে আহরিত সম্পদের পরিমাণ এতই যৎসামান্য যে এই সম্পদ তাঁর যে-কোনো সাধারণ কর্মচারী যথা, সুরাটের শাসকের উপযুক্ত। বোম্বাই-এর শাসক স্যার জন চাইল্ডও মুঘলদের সঙ্গে এক সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের পরে বুঝতে পারেন যে, ইংরেজদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা মুঘলদের উপর বিশেষ কোনো প্রভাব ফেলতে পারছে না কারণ মুঘলরা ব্যবসাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন না এবং মুঘল সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশের মানুষও এত দরিদ্র নয় যে তারা ব্যবসা না করলে অভুক্ত থাকবে। ইউরোপীয় ব্যবসা সম্বন্ধে এইরকম অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য পাওয়া যায় ১৬৯৪ সালের আরেকজন বোম্বাই পর্যটনকারী মুসলমানের লেখায়, যিনি লিখেছিলেন যে, বোম্বাই দ্বীপের রাজস্ব পাঁচ লক্ষের বেশি নয় এবং এইসব কাফেরদের বাণিজ্যের লাভও কখনোই কুড়ি লাখের বেশি নয়। ইংরেজ উপনিবেশ চালানোর বাকি খরচ আসে অন্যান্য জাহাজ লুঠতরাজ করে।

কিন্তু অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে সরকারি এবং বেসরকারি ইউরোপীয় বাণিজ্যের পরিমাণ এত বৃদ্ধি পায় যে, বণিক এবং তাঁতীর কাছ থেকে ভারতীয় শাসক প্রচুর কর আদায় করতে সক্ষম হন। এই বৃদ্ধি হয়েছিল সবচেয়ে বেশি করে বাংলায়। ১৭৮০ সালে মারাঠা আক্রমণের আগে বাংলা ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী প্রদেশগুলির অন্যতম। এখান থেকে প্রতিবছর ইংরেজ, ওলন্দাজ এবং ফরাসি বণিকরা যে বিপুল কেনাকাটা করতেন তার ফলে এই প্রদেশের বয়ন শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয় এবং বহু মানুষের এই শিল্পে কর্মসংস্থান হয়। ইউরোপীয় বাণিজ্য সংস্থাগুলি কর্তৃক সোনা-রূপা আমদানির ফলে বাংলার অর্থনীতি যে বিশেষ লাভবান হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৩৬.৮ অনুশীলনী

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

১। পর্তুগিজগণ কীরূপে ভারতের মশলা ব্যবসা দখল করেন লিখুন।

২। ওলন্দাজগণ কিভাবে ভারতের সূতীবস্ত্র ব্যবসায় বিস্তারে সাহায্য করে তার বিশদ বিবরণ দিন।

৩। ওলন্দাজরা কীভাবে ভারতে পর্তুগিজ ব্যবসা বিনষ্ট করে তার বিবরণ দিন।

৪। ভারতে ইংরেজ বাণিজ্যের ধারা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

৫। ভারতে বাণিজ্যের জন্য বিদেশী বণিকদের নৌবহর, দুর্গ এবং ঘাঁটির কী প্রয়োজন ছিল?

৬। ইউরোপীয় বাণিজ্যে কী কী পণ্যসামগ্রীর আমদানি ও রপ্তানি হত?

৭। ভারত ইউরোপীয় বাণিজ্যরীতি কীরূপ ছিল?

৮। ইউরোপীয়গণ-কর্তৃক ভারতীয় বস্ত্র উৎপাদনে অর্থ লগ্নীকরণ এবং বস্ত্র বিপণন ব্যবস্থা সম্বন্ধে কী তথ্য পাওয়া যায়?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। পর্তুগিজরা ভারতে এসেছিলেন কেন?

২। ওলন্দাজরা ভারতীয় বস্ত্র ব্যবসায়ের প্রতি আগ্রহী হয় কেন?

৩। ইউরোপীয় বণিকগণ নৌ অবরোধের আশ্রয় নিতেন কেন?

৪। আন্তঃমহাদেশীয় বাণজ্যের উপর আমেরিকায় রৌপ্যখনি আবিষ্কারের কী প্রভাব পড়েছিল?

৫। সোনা-রূপা আমদানি সম্বন্ধে মার্কেন্টিলীয় মত কী ছিল?

৬। ভারতে ইউরোপীয় বাণিজ্য পরিচালনার রীতিনীতি আলোচনা করুন।

৩৬.৯ গ্রন্থপঞ্জী

1. *Cambridge Economic History of India,* Vol. 1.
2. Chaudhuri K. N. : *Trade and Civilisation in the Indian Ocean : An Economic History from the Rise of Islam of 1750* (Cambridge University Press, 1985).
3. Bhattacharya S. K. : *The East India Company and the Economy of Bengal 1704-1740* (London, 1954).
4. Steensgaard Niels : *The Asian Trade Resolution of the Seventeenth Century (1974).*

একক ৩৭ ❐ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবিস্তারের প্রথম সোপান—বাংলা

গঠন :

৩৭.০ উদ্দেশ্য

৩৭.১ প্রস্তাবনা

৩৭.২ সিরাজউদ্‌দৌল্লা ও পলাশীর যুদ্ধ

৩৭.৩ মীরজাফর ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (১৭৫৭-১৭৬০)

৩৭.৪ মীরকাশিম ও বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬৫-১৭৬৪)

৩৭.৫ ইংরেজ কোম্পানির দেওয়ানি লাভ

৩৭.৬ সারাংশ

৩৭.৭ অনুশীলনী

৩৭.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩৭.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সিরাজউদ্‌দৌল্লার বিরোধের কারণ ও পলাশীর যুদ্ধের প্রেক্ষাপট।
- মীরজাফরের সঙ্গে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্পর্ক ও বাংলার নবাব পদ থেকে মীরজাফরের অপসারণ।
- মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানির বিরোধ ও বক্সার যুদ্ধের প্রেক্ষাপট।
- ইংরেজ কোম্পানি কর্তৃক বাংলার দেওয়ানি লাভ ও তার তাৎপর্য।

৩৭.১ প্রস্তাবনা

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মোগল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার ফলে ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। ভারতীয় শাসকদের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিতে এগিয়ে এসেছিল ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। মুনাফা ও বাজারের লোভে ইংরেজরা ভারতবর্ষে একটি গ্রাসী নীতি গ্রহণের অপেক্ষায় বসেছিল। যে মুহূর্তে ভারতীয় শক্তিসমূহের দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠেছিল, সেই মুহূর্তে তাদের আগ্রাসনমূলক তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইংরেজ শক্তি ভারতবর্ষকে একটি লাভজনক উপনিবেশে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর ছিল। তারা জানত যে, ভারতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে সেখানে তাদের অর্থনৈতিক লুণ্ঠন চালানো অনেক সহজ হবে।

কূটনৈতিক দক্ষতা, সামরিক উৎকর্ষ এবং ভারতীয় শক্তিবর্গের অনৈক্যকে পুঁজি করে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। বাংলাদেশে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এই অধ্যায়ে আমরা দেখব—ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ সচেতনভাবে কী করে বাংলার অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল। নিজেদের স্বার্থে নবাব বদলের পালায় অংশ নিয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত বাংলাদেশে নিজেদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

৩৭.২ সিরাজউদ্‌দৌল্লা ও পলাশীর যুদ্ধ

সমৃদ্ধশালী ও সম্পদশালী বাংলাদেশে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক স্বার্থ জড়িত ছিল। ১৭১৭ খ্রিঃ থেকে তৎকালীন মোগল সম্রাট ফারুখশিয়ারের ফর্মানের সুবাদে ইংরেজ কোম্পানি কতগুলি বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করত। এই ফর্মান অনুযায়ী ইংরেজ কোম্পানি আমদানিকৃত ও রপ্তানিকৃত পণ্যের ওপর কোনোরকম শুল্ক দিত না এবং এই পণ্য পরিবহনের জন্য কোম্পানি দস্তক প্রকাশ করার অধিকার লাভ করেছিল। কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বেসরকারি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনো সুযোগ-সুবিধা এই ফর্মান দেয়নি। ফলে কোম্পানির কর্মচারীরা তাদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য পণ্যসামগ্রী পরিবহনের সময় প্রায়ই দস্তকের অপব্যবহার করত। ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীদের সঙ্গে তাই বাংলার নবাবদের তিক্ত সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। মুর্শিদকুলি খান থেকে আলিবর্দী খাঁন পর্যন্ত সমস্ত দস্তকের অপব্যবহার বন্ধ করার ব্যাপারে যথেষ্ট কঠোরতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

মৃত্যুর আগে আলিবর্দি খান তাঁর দৌহিত্র সিরাজউদ্‌দৌল্লাকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। ১৭৫৬ সালের এপ্রিল মাসে আলিবর্দি খান মারা গেলে বাংলার নবাব পদে অভিষিক্ত হন সিরাজউদ্‌দৌল্লা। কিন্তু সিরাজের সিংহাসন আরোহণ অনেককেই অসন্তুষ্ট করেছিল। আলিবর্দির আর এক দৌহিত্র পূর্ণিয়ার ফৌজদার সৌকত জং বাংলার মসনদ লাভ করার জন্য লালায়িত ছিলেন। সিরাজের এক মাসি ঘসেটি বেগমও বাংলার মসনদ পেতে আগ্রহী ছিলেন। ঘসেটি বেগম মুর্শিদাবাদের কাছে মতিঝিল অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি প্রচুর ধনসম্পত্তি ও সুদক্ষ সৈন্যবাহিনীর অধিকারী ছিলেন। আলিবর্দি খানের প্রধান সেনাপতি বা 'বক্সি' মীরজাফরও সিরাজের প্রতি বিরূপ ছিলেন। সিংহাসনে বসেই সিরাজ বুঝতে পারেন যে তাঁর বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করেছে।

একই সঙ্গে সিরাজউদ্‌দৌল্লা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। সিংহাসন আরোহণের অল্প কিছু দিন পরেই, ১৭৫৬ সালের ১০ই এপ্রিল সিরাজ কৃষ্ণদাসকে তাঁর হাতে অর্পণ করার দাবি জানিয়ে ইংরেজ কোম্পানিকে একটি চিঠি দেন। কৃষ্ণদাস ছিলেন ঢাকার জায়গীরদার রাজবল্লভের পুত্র। কৃষ্ণদাস সরকারি কোষাগার থেকে ৫৩ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে কলকাতায় পালিয়ে গিয়ে ইংরেজ কোম্পানির আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানি কৃষ্ণদাসকে সিরাজের হাতে অর্পণ করেনি। সিরাজ ক্রমে জানতে

পারেন যে ইংরেজরা তাঁর দুই প্রতিপক্ষ সৌকত জং এবং ঘসেটি বেগমের সঙ্গে গোপন আঁতাত গড়ে তুলেছে। সৌকত জং-এর উপদেষ্টা গোলাম হোসেন খানের লেখা থেকে জানা যায় সৌকত জং তাঁর নবাব হবার প্রচেষ্টায় ইংরেজদের সাহায্য পাবার বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন।

নিজ কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সিরাজ কতকগুলো পদক্ষেপ নেন। তিনি ঘসেটি বেগমের প্রচুর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। মীরজাফরকে 'বক্সি' পদ থেকে অপসারিত করা হল। পরিবর্তে সিরাজ তাঁর বিশ্বস্ত মীরমদনকে 'বক্সি' পদে নিয়োগ করেন। সিয়ের-উল-সুতাক্ষারিণের লেখক গোলাম হোসেন খানের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এই সময় আলিবর্দির সময়ের সামরিক নেতা ও শাসনকার্যে গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীরা সিরাজের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। নবাবের দেওয়ান রায়দুর্লভও নবাবের বিরুদ্ধে চলে যান এবং তিনি পশ্চিমবাংলার জমিদারদের সিরাজের বিরুদ্ধে সংগঠিত করতে শুরু করেন। ১৭৫৭ সালের গোড়ার দিকে বর্ধমান, বীরভূম ও নদীয়ার জমিদারেরা সিরাজউদ্‌দৌল্লার বিরোধী হয়ে ওঠেন। সি. এ. বেইলি (C. A. Baily) বলেছেন—বড় ব্যবসায়ী ও জমিদারদের কাছ থেকে নবাব বলপূর্বক অর্থ আদায় করতেন তাই তাঁরা নবাবের বিরোধিতা করেছিলেন। অধ্যাপক সুশীল চৌধুরী অবশ্য মনে করেন—জমিদার, মহারাজ ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সিরাজের বলপূর্বক অর্থ আদায়ের স্বপক্ষে সমসাময়িককালে ফার্সি ভাষায় রচিত কোনো প্রামাণ্য দলিল পাওয়া যায় না। তবে একথা সত্যি যে, সিরাজ সে যুগের বাংলার অত্যন্ত ধনী মহাজন জগৎ শেঠের কাছ থেকে সৌকৎ জংকে দমন করার জন্য ৩০,০০০,০০০ টাকা দাবি করেছিলেন। জগৎ শেঠের সংস্থা এই টাকা দিতে অস্বীকার করলে নবাব তাকে আঘাত করেন। তখন থেকেই বাংলার শেঠরা সিরাজের বিরুদ্ধে অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেন।

১৭৫৭ সালের গোড়াতে দেখা গেল বাংলার অভিজাততন্ত্রের একটাই উদ্দেশ্য ছিল—সিরাজকে যেভাবে হোক নবাব পদ থেকে বিতাড়িত করা। ইতিমধ্যে সিরাজউদ্‌দৌল্লার সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধিতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছিল। কৃষ্ণদাসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সিরাজ ও ইংরেজদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। তারপর সিরাজ দেখলেন যে বেসরকারি ইংরেজ বণিকেরা দস্তকের অপব্যবহার ঘটিয়ে নবাবকে শুল্ক ফাঁকি দিচ্ছে। তারপর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সহযোগিতায় এশিয়ান বণিকেরাও দস্তক অপব্যবহারের সুযোগ নিয়ে বাংলার নবাবকে বাণিজ্য শুল্ক ফাঁকি দিতে লাগলেন। তদুপরি ভারতীয় পণ্য যখন ইংরেজ নিয়ন্ত্রণাধীন কলকাতায় প্রবেশ করত, তখন সেইসব পণ্যের ওপর ইংরেজ কোম্পানি শুল্ক ধার্য করতে শুরু করে। ফলে সিরাজের পক্ষে ইংরেজদের প্রতি ক্ষুব্ধ হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না।

নবাব ও ইংরেজ শক্তির মধ্যে সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে উঠল যখন নবাব জানতে পারলেন যে ইংরেজরা তাঁর কোনো অনুমতি ছাড়াই কলকাতায় একটি দুর্গ নির্মাণ করেছে। সিরাজ অত্যন্ত সঠিকভাবেই এই ঘটনাকে তাঁর সার্বভৌমত্বের ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপ বলে মনে করেছিলেন। এত ঘটনা ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও কিন্তু সিরাজ ইংরেজদের বিরুদ্ধে সরাসরি সংঘাতে যেতে চাননি। তিনি ইংরেজদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালানোর জন্য নারায়ণ দাসকে কলকাতায় পাঠান। কলকাতার ইংরেজ কোম্পানির প্রধান রজার ড্রেক নারায়ণ দাসকে অপমান করলেন।

সিরাজ তৎক্ষণাৎ ইংরেজ শক্তিকে আঘাত করার সিদ্ধান্ত নেন। সিরাজের সেনাবাহিনী কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি আক্রমণ করেন। ইংরেজরা এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু সিরাজের বাহিনী ইংরেজদের ওপর নির্বিচার হত্যাকাণ্ড বা লুণ্ঠন কোনোটাই চালায়নি। ঐতিহাসিক ব্রিজিন গুপ্তকে অনুসরণ করে বলা যেতে পারে ইংরেজরা নবাবের কাছ থেকে উদার ও মানবিক ব্যবহার পেয়েছিলেন। কোলেট ও ওয়াট্‌স—এই দুই ইংরেজকে সঙ্গে নিয়ে নবাব কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। নবাবের বাহিনী ইংরেজ শক্তিকে পরাস্ত করে ১৭৫৬ সালের ২০ জুন কলকাতা দখল করে। কোলকাতার ইংরেজ কোম্পানির গভর্নর ড্রেক ও তার অনুচরেরা কলকাতার দক্ষিণে ফলতা নামক স্থানে আশ্রয় নেন।

সিরাজউদ্‌দৌল্লা এবং ইংরেজ কোম্পানির বিরোধের সূত্রপাত নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে মতপার্থক্য আছে। এস. সি. হিল (S. C. Hill)-এর মতে সিরাজের "ব্যক্তিগত অহংকার এবং অর্থলিপ্সা" (Personal vanity and avarice) এই বিরোধের জন্য দায়ী। কেমব্রিজ ঐতিহাসিক পিটার মার্শাল Peter Marshall) তাঁর *Bengal : The British Bridgehead* প্রায় একই ধারণার বশবর্তী হয়ে বলেছেন—ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্যই সিরাজ কলকাতা আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করে ব্রিজিন গুপ্ত বলেছেন—ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ধৃষ্টতা সিরাজের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছিল। নিজ সার্বভৌমত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যেই নবাব ইংরেজদের কার্যকলাপে বাধা দিয়েছিলেন। ব্রিজিন গুপ্তের ভাষায়—একশত বছরের সম্পদশালী বাণিজ্য কতকগুলি ছোট ইংরেজ বণিককে সাম্রাজ্যবাদী দস্যুতে পরিণত করেছিল (A century of opulent trade converted the petty foggying merchants into imperialist swashbucklers)।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরাজের জয় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পরাজিত ইংরেজরা ফলতায় পালিয়ে গিয়ে মাদ্রাজ থেকে সাহায্য আসার অপেক্ষায় বসেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে একটি অত্যন্ত সুদক্ষ ও পেশাদার ইংরেজ বাহিনী কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়। ১৭৫৭ খ্রিঃ ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ায় ইংরেজরা কলকাতা পুনর্দখল করে। ১৭৫৭ খ্রিঃ ৯ই ফেব্রুয়ারি নবাব সিরাজ উদ্‌দৌল্লা ইংরেজদের সঙ্গে আলিনগরের সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ইংরেজদের ফ্যাক্টরি এবং বাণিজ্যিক অধিকারগুলি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ইংরেজ কোম্পানি কলকাতায় দুর্গ নির্মাণের এবং 'সিক্কা' টাকা তৈরির অনুমতি লাভ করে। নবাব কলকাতা আক্রমণের জন্য ইংরেজ কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃত হন।

সিরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য জগৎ শেঠ, মানিক চাঁদ, উমি চাঁদ, রায় দুর্লভ প্রভৃতিরা যে সিরাজ বিরোধী ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছিলেন, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা ধরনের বিতর্ক আছে। এস. সি. হিল বলেছেন—জগৎ শেঠ সংস্থা ও তার অনুগামীদের সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ছিল তৎকালীন হিন্দু সমাজের স্বৈরতান্ত্রিক মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি। সি. এ. বেইলির বক্তব্যও মোটামুটি একরকম। তাঁর মতে—ইংরেজ শক্তি যে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ১৭৫৭ সালে বাংলা দখল করেছিল, তা ছিল হিন্দু বাণিজ্যিক শ্রেণী কর্তৃক পরিচালিত বিপ্লবের ফল। নবাব বাংলা থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করুক এটা তাঁরা চাননি।

বেইলি আরও বলেছেন—অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় ইংরেজ কোম্পানির সাথে বাংলার হিন্দু ও জৈন বণিকদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক দৃঢ়ভাবে জড়িত ছিল। কে. এন. চৌধুরী ও ওমপ্রকাশ অষ্টাদশ শতকীয় ভারতের বাণিজ্যিক ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—১৭৪০ খ্রিঃ থেকেই জগৎ শেঠ সহ অন্যান্য ভারতীয় বণিকদের ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে বাণিজ্য অত্যন্ত লাভজনক হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু অধ্যাপক সুশীল চৌধুরীর সাম্প্রতিক গবেষণা উপরোক্ত বক্তব্যকে খারিজ করেছে। প্রথমত, কেবলমাত্র ইউরোপীয় কোম্পানিগুলিই যে ভারতে বুলিয়ন (সোনা-রূপা) আমদানি করত এ কথা ঠিক নয়। এমনকি তারা বৃহত্তম বুলিয়ন আমদানিকারীও ছিল না। দ্বিতীয়ত, পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, বাংলায় আর্মেনীয় বণিকসহ এশিয়ান বণিকদের বাণিজ্যের পরিমাণ ইউরোপীয় বণিকদের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। তৃতীয়ত, জগৎ শেঠ, উমি চাঁদ, খাজা ওয়াজিদ এই তিনজন ধনী বণিকের (এরাই সিরাজের বিরুদ্ধে প্রধানত ষড়যন্ত্রকারী ছিলেন) আয়ের উৎস ঠিকমতো অনুধাবন করলে দেখা যায় ইউরোপীয়দের সঙ্গে ব্যবসা করে তাঁরা যে অর্থ উপার্জন করতেন, অন্যান্য সূত্র থেকে তাঁদের আয়ের তুলনায় সেই আয় ছিল নিতান্ত কম। উমি চাঁদ ও খাজা ওয়াজিদের সম্পদ বৃদ্ধির প্রধান উৎস ছিল লবণ ও সোরার একচেটিয়া বাণিজ্য। জগৎ শেঠ তাঁর বাৎসরিক আয় ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৫ লক্ষ টাকাই সুদের কারবার ও মুদ্রা তৈরির মাধ্যমে উপার্জন করতেন।

সিরাজ বিরোধী ষড়যন্ত্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বেইলি, মার্শাল প্রমুখ কেমব্রিজ ঐতিহাসিকের বলেছেন—এটি ছিল মূলত হিন্দুদের মুসলিম বিরোধী ষড়যন্ত্র। ইংরেজরা ঘটনাচক্রে এই ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েছিল। এই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন সুশীল চৌধুরী। তিনি সঠিকভবেই বলেছেন—ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে আড়াল করার স্বার্থেই এ ধরনের বক্তব্যের অবতারণা করা হয়েছে। তাছাড়া এই ষড়যন্ত্রকে কেবল হিন্দুদের ষড়যন্ত্র হিসাবে দেখাও ইতিহাস সম্মত নয়। আর্মেনীয় এবং মুসলমান বণিকরাও সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। রবাট ওর্মের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, খাজা পেক্রস নামে এক আর্মেনীয় বণিক ইংরেজ কোম্পানির ওয়াট্সকে জানিয়েছিলেন যে, মীরজাফর ইংরেজদের সঙ্গে হাত মেলাতে চান।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ইংরেজ কোম্পানি সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের দ্বারা তাড়িত হয়ে সিরাজের সিংহাসন আরোহণের পর থেকেই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে আরম্ভ করে। একই সাথে সিরাজের উচ্চাভিলাষী আত্মীয়স্বজন, বাংলার ধনী বণিক ও মহাজনেরা এবং জমিদারেরা সিরাজ বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। উভয়পক্ষ তাদের সাধারণ উদ্দেশ্য (সিরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করা) চরিতার্থ করার জন্য একে অপরের সাথে হাত মেলায়। ১৭৫৭ সালের ৪ জুন উভয়পক্ষের মধ্যে একটি বোঝাপড়া হয়। জুন মাসেই সিরাজ এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারেন। কিন্তু বিরোধীদের দমন করার জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করে সিরাজ মীরজাফরকে নিজের দিকে নিয়ে আসার জন্য তাঁকেই আবার 'বক্সি' পদে নিয়োগ করেন। সমসাময়িক ইংরেজ লেখক লিউক স্ক্র্যাফটন (Luke Scrafton) এই 'ভ্রান্ত' পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সিরাজউদ্‌দৌল্লার সমালোচনা করেছেন।

ইংরেজরা প্রথম থেকেই সিরাজকে তাড়াতে চেয়েছিল, কারণ তারা জানত যে, নবাব হিসাবে সিরাজের অস্তিত্ব তাদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি বিঘ্নিত করবে। মীরজাফর ও জগৎ শেঠরা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সিরাজ বিরোধী ষড়যন্ত্রের জাল বুনে ইংরেজদের কাজ অনেকটা সহজ করে দিয়েছিলেন। মীরজাফরের লক্ষ্য ছিল বাংলার মসনদ। জগৎ শেঠ ও তাদের ঘনিষ্ঠরা মনে করেছিল সিরাজের পরিবর্তে অন্য কেউ নবাব হলে রাষ্ট্রের যাবতীয় দাবি না মেটালেও চলবে।

১৭৫৭ সালের ১৩ জুন রবার্ট ক্লাইভ তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। মুর্শিদাবাদের কাছে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজ সৈন্য ২৩শে জুন নবাবের বাহিনীর মুখোমুখি হয়। পলাশীতে নামমাত্র যুদ্ধ হয় এবং ইংরেজ শক্তি সহজেই নবাবের বাহিনীকে পরাজিত করে। তবে সম্প্রতি জেনমার্কের মহাফেজখানায় (Danish Archives) প্রাপ্ত নথিপত্র থেকে মনে হয় যে, যত সহজে ইংরেজরা পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল বলা হয়ে থাকে তত সহজে ইংরেজরা জয়লাভ করেনি। তাছাড়া রিয়াজ উস্ সালাতিনের লেখক গোলাম হোসেন সলিম বলেছেন—নবাবের পক্ষেই জয়ের আভাস পাওয়া গিয়েছিল। হঠাৎ কামানের গোলায় নবাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি মীরমদন নিহত হলে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। ইংরেজ লেখক লিউক স্ক্র্যাফটন (Luke Scrafton) পলাশীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও তাঁর বিবরণে লিখেছিলেন, "One great cause of our success was that.....we had the good fortune to kill Mir Madan." অর্থাৎ আমাদের সাফল্যের অন্যতম বড় কারণ ছিল যে, আমাদের মীরমদনকে হত্যা করার সৌভাগ্য হয়েছিল। তা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে মীরজাফর ও রায়দুর্লভের নেতৃত্বাধীন এক বিরাট সংখ্যক নবাবী সৈন্য ইচ্ছাকৃতভাবেই নিজেদের যুদ্ধের প্রক্রিয়া থেকে বিরত রেখেছিল। ফলে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভ অনেকটাই সহজ হয়েছিল। পলাশীতে পরাস্ত সিরাজ মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করে পলায়ন করেন। পথে মীরজাফরের লোকেরা তাঁকে হত্যা করে। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাহায্যে মীরজাফর বাংলার নতুন নবাব পদে আসীন হলেন।

৩৭.৩ মীরজাফর ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (১৭৫৭—১৭৬০)

জগৎ শেঠের সংস্থা বাংলার রাজস্ব বিষয়ে নতুন নবাব মীরজাফরের অংশীদার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মীরজাফরের নিরাপত্তার জন্য এই মিত্রতা ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ক্লাইভ মীরজাফরকে পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে জগৎ শেঠের মতামত নিয়ে চলেন। মীরজাফরকে বাংলার নবাব নিযুক্ত করার আগে ইংরেজ কোম্পানি তাঁর সঙ্গে কতগুলি চুক্তি করে। চুক্তিগুলো ছিল এই রকম—(১) ইংরেজ কোম্পানি বাংলাদেশে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার এবং সবরকম বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা পাবে। (২) টাকা তৈরির একচেটিয়া অধিকার আর জগৎ শেঠের হাতে থাকল না; ইংরেজ কোম্পানিও নবাবের কাছ থেকে টাকা তৈরির অধিকার লাভ করে। (৩) কোম্পানি চব্বিশ পরগনা জেলার জমিদারী পেল এবং বলা হল ঐ অঞ্চল থেকে আদায়ীকৃত রাজস্ব দিয়ে কোম্পানি তার সামরিক ব্যয় নির্বাহ করবে।

(৪) কলকাতার ওপর নবাবের কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না। (৫) মুর্শিদাবাদে একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট নিযুক্ত থাকবে। (৬) প্রয়োজনে কোম্পানি বাংলার নবাবকে সামরিক সাহায্য দেবে।

চুক্তির শর্তগুলি বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় যে, সরাসরি বাংলার শাসনভার গ্রহণ না করলেও ইংরেজ কোম্পানি বাংলার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নিজেদের আধিপত্য ভালোভাবেই প্রতিষ্ঠিত করেছিল যদুনাথ সরকার তাই পলাশীর যুদ্ধকে ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের বিভাজন রেখা হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর মতে, ইংরেজদের বিজয় ভারত ইতিহাসে এক "গৌরবময় ভোরের" (Glorious Dawn) সূচনা করেছিল। কিন্তু পলাশীর বিজয় যে ইংরেজ শক্তির ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ঔপনিবেশিক শাসন গড়ে তোলার পথ উন্মুক্ত করেছিল, সে বিষয়টির ওপর যদুনাথ গুরুত্ব আরোপ করেন নি। ইংরেজরা ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য দর্শন ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটানোর জন্য সিরাজের বিরোধিতা করেনি। নিজেদের দেশে শিল্পবিপ্লবের গতি ত্বরান্বিত করার তাগিদে বাংলা তথা ভারতের ওপর অবাধ লুণ্ঠন চালানোর উদ্দেশ্যেই তারা পলাশীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল।

মীরজাফর যখন বাংলার নবাব হলেন তখন বাংলার আর্থিক সঙ্কট চরমে পৌঁছেছিল। সৈন্যদের নিয়মিত বেতন দেওয়া সম্ভব ছিল না, তাই তাদের মধ্যে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল। মীরজাফরের আমলে বাংলায় তিনটি বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল—মেদিনীপুরের জমিদার রাজারাম সিংহের বিদ্রোহ, পূর্ণিয়াতে হজরৎ আলিশাহ্ ও অচল সিং-এর বিদ্রোহ এবং পাটনায় রামনারায়ণের বিদ্রোহ। প্রথম দুটি বিদ্রোহ মীরজাফর ইংরেজদের সাহায্যে দমন করেছিলেন। কিন্তু পাটনার রামনারায়ণ ক্লাইভের সঙ্গে একটি গোপন সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। ক্লাইভ মীরজাফরের হাত থেকে রামনারায়ণকে নিরাপত্তা দেবার আশ্বাস দেন। মীরজাফর জানতেন যে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহগুলি সংগঠিত করার পেছনে রায়দুর্লভের হাত আছে। কিন্তু রায় দুর্লভের সঙ্গেও ক্লাইভের গোপন আঁতাত ছিল। মীরজাফর ইংরেজদের ওপর এতটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন যে, ক্লাইভের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে তাঁর পক্ষে রামনারায়ণ বা রায়দুর্লভ কাউকেই দমন করা সম্ভব ছিল না। রামনারায়ণকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেবার বিনিময়ে ইংরেজ কোম্পানি উত্তর বিহারে সোরা ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার লাভ করেছিল। স্ক্র্যাফটনের লেখা থেকে জানা যায়—মীরজাফর যাতে কখনোই ইংরেজ বিরোধী না হয়ে ওঠেন সেদিকে নজর রাখার জন্য ক্লাইভ মীরজাফরের দরবারে একটি মীরজাফর বিরোধী গোষ্ঠীকে সক্রিয় রেখেছিলেন।

মীরজাফরের শাসনকালে দিল্লীর মোগল শক্তি বিহার আক্রমণ করে। ১৭৫৯ সালে শাহ্জাদা (যিনি পরে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম হয়েছিলেন) বিহার আক্রমণ করেন। সিরাজের অনুগত জমিদারেরা শাহ্জাদাকে সমর্থন করেন। ক্লাইভের সহায়তায় মীরজদাফর এই আক্রমণ প্রতিহত করেন। ১৭৬০ সালে সাহ্ আলম আবার বিহার আক্রমণ করেন। বিহারের জমিদারেরা ছাড়াও বীরভূম ও পশ্চিমবাংলার অন্যান্য জমিদারের শাহ্ আলমের পক্ষে যোগ দেন। ইংরেজ বাহিনী মীরজাফরের হয়ে যুদ্ধ করে এবং শেষপর্যন্ত ইংরেজ বাহিনীর হাতে শাহ্ আলম পরাস্ত হন। মীরজাফর ইংরেজ শক্তির ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন এবং তাঁর দুর্বলতা স্পষ্টভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়।

যুদ্ধ করে মীরজাফরকে রক্ষা করার বিনিময়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মীরজাফরের কাছ থেকে প্রচুর টাকা দাবি করেছিল। কিন্তু বাংলার আর্থিক অবস্থা এতটাই শোচনীয় ছিল যে, মীরজাফরের পক্ষে কোম্পানির দাবি মেটানো সম্ভব ছিল না। সিরাজের কলকাতা আক্রমণের ক্ষতিপূরণ হিসাবে মীরজাফর ইংরেজ কোম্পানিকে ১৭,৭০০০,০০০ টাকা দিয়েছিলেন। তার ওপর কোম্পানির কর্মচারীদের বহু টাকার উৎকোচ ও মূল্যবান সমস্ত উপঢৌকন দিতে হয়েছিল। ক্লাইভ একাই ১০ লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন। ক্লাইভ পরবর্তীকালে হিসেব করে বলেছিলেন যে, কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা বাংলার ক্রীড়নক নবাব মীরজাফরের কাছ থেকে ৩ কোটি অর্থমূল্যের সম্পদ পেয়েছিল।

কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের এত কিছু দেওয়া সত্ত্বেও এক বিরাট আর্থিক বোঝা নিয়ে মীরজাফর নবাব পদে বসেছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে ইংরেজদের দাবি ছিল ৩০ লক্ষ স্টার্লিং। কিন্তু সে মুহূর্তে মীরজাফরের পক্ষে এত টাকা দেওয়া সম্ভব ছিল না। ঠিক হয় যে এই টাকার অর্ধেক জগৎ শেঠ কোম্পানিকে দেবে। বাকি অর্ধেক নবাব তিন বছর ধরে কিস্তিতে কিস্তিতে দিয়ে যাবেন। কিন্তু এই প্রক্রিয়া ক্লাইভকে নিশ্চিত করেনি। ১৭৫৮ সালে ক্লাইভ তিনটি বড় জেলার রাজস্ব আদায়ের অধিকার দাবি করেন। এপ্রিল মাসে মীরজাফর কোম্পানিকে নদীয়া ও বর্ধমানের রাজস্ব আদায়ের অধিকার ন্যস্ত করতে বাধ্য হন। ইংরেজ কোম্পানি যেহেতু সে সময় বাণিজ্য ছাড়াও রাজনৈতিক এবং সামরিক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিল, কোম্পানির ব্যয় অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই নবাবের কাছে কোম্পানির চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৭৫৭ সালের শেষ দিকে কোম্পানি দাবি করে যে, যতদিন কোম্পানির সৈন্যরা নবাবের হয়ে যুদ্ধ করবে, সেই সময় নবাব কোম্পানিকে মাসে ১ লক্ষ টাকা করে দিয়ে যাবেন। কোম্পানির চাপে মীরজাফর এই দাবিও মেনে নিতে বাধ্য হন। এই সময় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার ওপর কোম্পানির বম্বে ও মাদ্রাজ কাউন্সিলকে কোলকাতা থেকে নিয়মিত টাকা পাঠাতে হত। সামরিক খাতে কোম্পানির ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে কোম্পানি এক চরম আর্থিক সঙ্কটের মুখোমুখি হয়।

এই আর্থিক সঙ্কট মোচনের জন্য কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা বাংলাদেশে পুনরায় রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কথা চিন্তা করতে শুরু করেন। ১৭৬০ সালের গোড়াতেই ক্লাইভ ইংল্যান্ড ফিরে যান। তখন থেকেই মীরজাফরের নবাব পদে বহাল থাকার বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। ইংরেজ কোম্পানির গভর্ণর হিসাবে ক্লাইভের উত্তরসূরী হলওয়েল মীরজাফরকে পছন্দ করতেন না। তিনি ও তাঁর সহযোগী ইংরেজরা মীরজাফরের অপশাসনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তার ওপর মীরজাফর যখন ইংরেজ কোম্পানির ক্রমবর্ধমান আর্থিক দাবি মেটাতে ব্যর্থ হলেন, তখন কোম্পানি কর্তৃপক্ষ স্বাভাবিকভাবেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। ১৭৬০ সালের অগাস্ট মাসে ভ্যান্সিটার্ট কর্নেল ক্যালিউডকে জানিয়েছিলেন যে মীরজাফর যদি কোম্পানিকে ৫০ লক্ষ টাকা বা সমমূল্যের জমি দেন, তবে তিনি নবাব হিসাবে থাকতে পারবেন। কিন্তু মীরজাফরের পক্ষে তখন কিছুই দেওয়া সম্ভব ছিল না। তখন কোম্পানি মীরজাফরের কাছে বর্ধমানের সমৃদ্ধশালী জমিদারী এবং মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা দু'টি সরাসরি দাবি করে। মীরজাফর কোম্পানির এই প্রস্তাবে রাজী হননি। তখনই ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মীরজাফরকে

পদচ্যুত করে নতুন নবাব নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। ইংরেজরা মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিমের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করে। মীরকাশিম ইংরেজদের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি কোম্পানির আর্থিক সঙ্কট মোচনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন এবং বর্ধমানের জমিদারী সহ চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর জেলা দু'টি কোম্পানির হাতে তুলে দেবে। বিনিময়ে মীরকাশিম বাংলার ডেপুটি সুবাদারের পদ লাভ করবেন। কিন্তু মীরজাফর এই বন্দোবস্ত মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তিনি মীরকাশিমকে ডেপুটি সুবাদার পদে গ্রহণ করলেন না।

তখন ১৭৬০ সালের অক্টাবর মাসে ভ্যান্সিটার্ট ও ক্যালিউড শক্তি ও ভীতি প্রদর্শন করে মীরজাফরকে পদচ্যুত করেন। মীরকাশিমকে নতুন নবাব নিযুক্ত করা হয়। রক্তপাতহীন ও নিঃশব্দ এই "বিপ্লব"-এর গুরুত্ব কম ছিল না। মীরজাফরের পদচ্যুতি স্পষ্টই প্রমাণ করেছিল ইংরেজরাই বাংলাদেশে প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী এবং রাজা তৈরির নায়ক (King maker)। ইংরেজ কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা বুঝিয়ে দিয়েছি — যে ব্যক্তি তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে এবং ক্রমবর্ধমান সম্পদ লালসা মেটাতে সাহায্য করবে, তাকেই তারা বাংলার নবাব পদে বসাবে।

৩৭.৪ মীরকাশিম ও বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬০—১৭৬৪)

১৭৬০ সালে বাংলার নবাব পদে অভিষিক্ত হয়েই মীরকাশিম ইংরেজ কোম্পানির হাতে বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রামের জমিদারী তুলে দেন। যে সমস্ত ইংরেজ তাঁকে নবাব হতে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের সন্তুষ্ট করার জন্য তিতিন প্রায় ২৯ লক্ষ টাকা মূল্যের উপঢৌকন দিয়েছিলেন। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ মনে করেছিল। মীরকাশিমকে দিয়ে তাদের স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করিয়ে নিতে অসুবিধা হবে না। কিন্তু ইংরেজরা অচিরেই আশাহত হয়েছিল।

মীরকাশিম মীরজাফরের মতো অপদার্থ ছিলেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীনচেতা এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি পূর্ব ভারতে একটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর রাজ্যের সমস্যাগুলি বোঝার ব্যাপারে তিনি তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে বাংলাকে একটি শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে গড়ে তুলতে হলে দু'টি পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রথমত, মারাত্মক আর্থিক সঙ্কট থেকে বাংলাকে মুক্ত করা এবং দ্বিতীয়ত, একটি সুদক্ষ সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা।

নবাব হওয়ার পরেই মীরকাশিম কতকগুলি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেন। প্রথমেই তিনি ইংরেজদের প্রিয়পাত্র পাটনার দেওয়ান রামনারায়ণকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। রামনারায়ণের কাছে নবাবের প্রচুর টাকা পাওনা ছিল। কিন্তু সে টাকা মিটিয়ে দিতে রামনারায়ণ অহেতুক দেরী করেছিলেন। তাছাড়া রামনারায়ণ কখনোই নবাবের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য দেখাননি। তাই মীরকাশিম তাঁকে বিতাড়িত করে হত্যা করেন। রাজ্যের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য মীরকাশিম আন্তরিক প্রয়াস চালিয়েছিলেন। তিনি জায়গীরগুলির ওপর নবাবী কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে নতুন করে কর ধার্য করেন। যেসব জমিদারীগুলিতে নির্ধারিত

রাজস্বের পরিমাণ ছিল অল্প, সেখানে বর্ধিত রাজস্বের বোঝা চাপানো হল। যদিও মীরকাশিম শাসনতন্ত্রের প্রত্যেক স্তরেই দক্ষতা এনে রাজস্ব বাবদ রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধি করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন তবুও সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে তাঁর নির্ধারিত রাজস্বের একটা বৃহৎ অংশই আদায় করা যায়নি। ইংরেজদের পাওনা মেটানোর জন্য জগৎ শেঠদের সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু উপরোক্ত কার্যসিদ্ধি হবার পর মীরকাশিম জগৎ শেঠ ও তাঁর সাঙ্গপঙ্গাদের তাঁর নতুন ব্যবস্থা থেকে বাদ দিলেন।

সামরিক সংস্কারের ক্ষেত্রে মীরকাশিম বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। প্রথমেই তিনি তাঁর রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে সরিয়ে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেন। ৯০,০০০ সৈন্য নিয়ে গড়ে ওঠা পুরনো নবাবী বাহিনীকে তিনি বাতিল করেন। পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তনের একটি সুদক্ষ বাহিনী তিনি গড়ে তোলেন। এই নতুন বাহিনীকে পাশ্চাত্য কৌশলে সুশিক্ষিত করার জন্য গুর্গিন খান নামে এক আর্মেনীয় সৈন্যাধ্যক্ষকে নিযুক্ত করা হয়। মুঙ্গেরে অস্ত্র নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়। ইংরেজদের কাছে বিষয়টি গোপন রাখার জন্যই ইংরেজ ঘাঁটি কলকাতা থেকে বহুদূরে মুঙ্গেরে মীরকাশিম তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

ইংরেজরা প্রথম দিকে মীরকাশিমের ওপর মোটামুটি সন্তুষ্টই ছিল। কোম্পানি তিনটি জেলার জমিদারী লাভ করে এবং সিলেক্ট কমিটির সদস্যরা প্রচুর মূল্যবান উপহার পেয়ে খুশি হয়েছিল। বিহারে গৃহীত কঠোর পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে ইংরেজরা মনে করেছিল মীরকাশিম বিহারে আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ রামনারায়ণের পদচ্যুতি ও হত্যা কিছু ইংরেজকে অখুশি করলেও সাধারণভাবে বিষয়টিকে তারা কুনজরে দেখেনি, কারণ গভর্নর ভ্যান্সিটার্টই স্বয়ং রামনারায়ণের ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন।

১৭৫৭ সালের পর কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বেসরকারি বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই বেসরকারি বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে মীরকাশিম ও ইংরেজ কোম্পানির মধ্যে সম্পর্কের অবনতির সূত্রপাত। ইংরেজ বণিক ও তাদের ভারতীয় দালালেরা এমন সব এলাকায় বাণিজ্যে লিপ্ত হতে লাগলেন যেখানে তারা আগে প্রবেশ করেনি। এমন সব পণ্য তারা ক্রয়-বিক্রয় করতে লাগল যে সব পণ্যের ওপর এতদিন পর্যন্ত বাংলা সরকারের একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার স্বীকৃত ছিল। লবণ ব্যবসা ছিল এরকম একটি বিষয়। লবণ তৈরির ক্ষেত্রে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর ইংরেজ বণিককরা সমগ্র বাংলাদেশে লবণ বিক্রয় করার নিজস্ব বন্দোবস্ত গড়ে তোলে। লবণ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ইংরেজ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের প্রক্রিয়া নবাবের একচেটিয়া কারবারের অধিকারকে সরাসরি লঙ্ঘন করেছিল। এই ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই মীরকাশিমকে ক্রুদ্ধ করেছিল।

নবাবের একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ইংরেজ বণিকদের দ্বারা দস্তকের মারাত্মক অপব্যবহার। মীরকাশিম দেখলেন যে, দস্তকের অপব্যবহারের ফলে বাংলার অর্থনীতি দু'ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। (১) বাণিজ্যশুল্ক বাবদ রাষ্ট্রের আয় কমছে। (২) এক অসমপ্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবার ফলে দেশীয় বণিকদের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। নবাবের কর্মচারীরা ইংরেজ বণিকদের বেআইনী ব্যবসা বন্ধ করার জন্য পদক্ষেপ নিলেন। বেশকিছু লবণবাহী নৌকো আটক করা হল। ১৭৬২ সালের জুন মাসে ভ্যান্সিটার্ট নিজে স্বীকার

করলেন যে তিনি ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীদের লবণ ব্যবসায়ের জন্য দস্তক দিয়েছেন। শুধু লবণের ক্ষেত্রে নয় পান ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও ইংরেজ বণিকেরা দস্তকের অপব্যবহার ঘটিয়ে নবাবকে প্রচুর বাণিজ্যশুল্ক ফাঁকি দিত। তামাক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তারা নবাবকে নামমাত্র বাণিজ্যশুল্ক দিত।

ইংরেজ বণিকদের বিনা শুল্কে বা অত্যল্প বাণিজ্য করার ফলে কেবল ভারতীয় বণিকরাই নয় আর্মেনীয় বণিরকাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। বিহারের সোরা কারবারের ওপর ইংরেজ বণিকদের একচেটিয়া অধিকার কায়েম হবার ফলে আর্মেনিয় বণিকরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তার ওপর এই অসম প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ বিঘ্নিত করেছিল। মীরকাশিম বুঝেছিলেন যে আর্মেনীয়দের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে তাদের ক্ষোভের নিরসন করা দরকার। তার ওপর মীরকাশিমের কাছে অভিযোগ আসে যে, ইংরেজ বণিকরা দেশীয় ব্যবসায়ীদের ওপর বলপ্রয়োগ করে বা তাদের ভীতি প্রদর্শন করে তাদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যের থেকে অনেক সস্তায় পণ্য খরিদ করতেন। ১৭৬২ খ্রিঃ মে মাসে মীরকাশিম এসব বিষয় নিয়ে ইংরেজ কোম্পানির গভর্নর ভ্যান্সিটার্টকে লিখিত অভিযোগ জানান। কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না। নবাব কোম্পানি কর্তৃপক্ষের কাছে একের পর এক অভিযোগ জানিয়ে গেলেন। কিন্তু দস্তকের অপব্যবহার অথবা কোম্পানি কর্মচারীদের দেশীয় বণিক ও কৃষক উৎপাদনকারীদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করার জন্য কোম্পানি কর্তৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ নিল না। তখন নবাব কঠোর পদক্ষেপ নেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৭৬২ সালের অক্টোবর মাসে বাংলার বিভিন্ন নদীমুখে ইংরেজ বণিকদের পণ্যবাহী নৌকো মীরকাশিমের কর্মচারীরা আটক করলেন।

এই পরিস্থিতিতে ১৭৬২ সালের শেষ দিকে নবাবের সঙ্গে আলোচনার জন্য ভ্যান্সিটার্ট মুঙ্গের যান। ভ্যান্সিটার্ট মীরকাশিমকে আশ্বাস দিলেন যে প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করেও তিনি ইংরেজ বণিক ও তাঁদের গোমস্তাদের যাবতীয় অপকর্ম বন্ধ করবেন। মীরকাশিম বলেন যে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজ বণিকদের ওপর ৯ শতাংশ হারে। ভ্যান্সিটার্ট এই প্রস্তাব মেনে নেন এবং নবাবকে কথা দেন যে ভবিষ্যতে বাণিজ্য সংক্রান্ত কোনো বিরোধ বা সমস্যা দেখা দিলে নবাবের কর্মচারীরা তার নিষ্পত্তি করবেন। কিন্তু একগুঁয়ে কলকাতা কাউন্সিল এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অস্বীকার করে। তারা জানিয়ে দেয় যে বেসরকারি ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজ বণিকরা ২$^{১}/_{২}$ শতাংশের বেশি শুল্ক দেবে না এবং ইংরেজ বণিকদের বিচার করবেন ইংরেজরা, নবাবের কর্মচারীরা নয়।

এই অবস্থায় মীরকাশিম তাঁর কর্মচারীদের অবাধ্য ইংরেজ বণিকদের কঠোর হাতে দমন করার নির্দেশ দিলেন। বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজ বণিক ও নবাবের কর্মচারীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। তার ওপর মীরকাশিম আরেকটি কঠোর সিদ্ধান্ত নেন। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তিনি যাবতীয় শুল্ক তুলে দেন। অর্থাৎ ভারতীয় ও অন্যান্য বণিকদেরও আর কোন অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যশুল্ক দিতে হবে না। ফলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আর কোনো অসম প্রতিযোগিতা রইল না। এর ফলে রাষ্ট্রের আয় বিপুল পরিমাণে হ্রাস পেল বটে, কিন্তু

দেশীয় বণিকদের রক্ষা করার এছাড়া কোনো উপায় ছিল না। ইংরেজ বণিকরা নবাবের এই সিদ্ধান্তে অসম্ভব ক্রুদ্ধ হলেন। মীরকাশিম ও ইংরেজ বণিকদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষের কারণ নিয়ে ঐতিহাসিকরা নানারকম মত দিয়েছেন। মীরকাশিমের সমসাময়িক এক ইংরেজ কর্তাব্যক্তি ভেরেলেস্ট মন্তব্য করেছেন—দস্তকের অপব্যবহার বা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নয়, মীরকাশিমের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাই এই সংঘর্ষের জন্য দায়ী। ভেরেলেস্টের বক্তব্যের ওপর নির্ভর করে ঐতিহাসিক ডডওয়েল বলেছেন—মীরকাশিম ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হতে চেয়েছিলেন। তিনি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে যুদ্ধের অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন মাত্র। পি. জে. মার্শাল বলেছেন—মীরকাশিম প্রথম থেকেই বাংলাদেশে ব্রিটিশ প্রাধান্য বিস্তারের ব্যাপারে ক্ষুব্ধ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর তিন বছরের নবাবী শাসনে পূর্ব ভারতে একটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলার আন্তরিক প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়েছিল। সুতরাং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্যা দেখা না দিলেও অন্য কোন অজুহাতে তিনি ইংরেজ বিরোধী সংঘাতে অবতীর্ণ হতেন। কিন্তু অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরী বলেছেন—মীরকাশিমের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়, বা ইংরেজ নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেকে মুক্ত করার অভিপ্রায় নয়, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সংক্রান্ত বিরোধই ইংরেজ ও মীরকাশিমের মধ্যে সংঘর্ষের জন্য দায়ী। রবার্ট ক্লাইভ বাংলায় ফিরে আসার পর ১৭৬৭ সালের ২৪শে জানুয়ারি লন্ডনে কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীকে পাঠানো একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "Inland trade had been the foundation of all bloodshed, massacre and confusion which have happened of late years in Bengal." অর্থাৎ সাম্প্রতিক কালের বাংলায় যাবতীয় রক্তপাত, হত্যা এবং ঝামেলার মূলে রয়েছে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। ক্লাইভের এই চিঠি অধ্যাপক চৌধুরীর বক্তব্যের সত্যতাই প্রমাণ করে। মালদার রেসিডেন্ট গ্রে বেসরকারি ইংরেজ বণিক ও তাদের গোমস্তাদের নবাবকে শুল্ক ফাঁকি দেওয়া এবং দেশীয় বণিক ও কৃষক-উৎপাদনকারীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালানোর জন্য তীব্র নিন্দা করেছেন। বেসরকারি ইংরেজ বণিকদের অন্যায় আচরণ বন্ধ করার বিষয়ে মীরকাশিম যখন বদ্ধপরিকর হলেন, তখন ইংরেজ কোম্পানি তাঁর বিরুদ্ধে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হবার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৭৬৩ সালের জুলাই মাসে ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে মীরকাশিমের যুদ্ধ শুরু হয়। মীরকাশিম পরপর কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, গিরিয়া, উদয়নালা ও মুঙ্গেরের যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে পরাজিত হন। মীরকাশিম অযোধ্যায় পালিয়ে যান। যে মুহূর্তে ইংরেজদের সঙ্গে মীরকাশিমের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল সে মুহূর্তে ইংরেজরা বাংলার মসনদ থেকে মীরকাশিমকে অপসারিত করে মীরজাফরকে বাংলার নবাব পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। সমস্ত বাণিজ্যশুল্ক তুলে দেবার যে আদেশ মীরকাশিম দিয়েছিলেন, নবাব হবার পরই মীরজাফর তা প্রত্যাহার করে নেন। ইংরেজ কর্মচারীরা বিনা শুল্কে বেসরকারি বাণিজ্য করার অনুমতি পেল। বলা হল, কেবলমাত্র লবণের ওপর ইংরেজ বণিকেরা ২$^{১}/_{২}$ শতাংশ হারে বাণিজ্যশুল্ক দেবেন। তাছাড়া কোম্পানির যুদ্ধের খরচ মেটানোর জন্য মীরজাফর কোম্পানিকে মাসিক ৫ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হলেন। বাংলা নবাবীর স্বাধীন সত্তা বলে কিছু রইল না। বাংলার প্রতিরক্ষা পুরোপুরি ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে চলে গেল।

পরপর যুদ্ধগুলিতে ইংরেজদের হাতে পরাজিত হয়েও মীরকাশিম হতোদ্যম হননি। তিনি ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে শেষ লড়াইএ অবতীর্ণ হবার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। মীরকাশিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্‌দৌল্লা এবং দিল্লির তৎকালীন মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটি ইংরেজ বিরোধী মোর্চা তৈরি করেন। ১৭৬৪ সালের অক্টোবর মাসে এই তিন শক্তির মিলিত বাহিনীর সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ বক্সারের যুদ্ধ নামে খ্যাত। বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজ শক্তি ১৭৬৪ সালের ২৩শে অক্টোবর উপরোক্ত তিন ভারতীয় শক্তির মিলিত বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে। দ্বিতীয় শাহ আলম তৎক্ষণাৎ ইংরেজ পক্ষে যোগ দেন। সূজাউদ্‌দৌল্লা রোহিলখণ্ডে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেন। মীরকাশিম আত্মগোপন করেন। ১৭৭৭ সালে মীরকাশিম মারা যান।

বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। পলাশীর প্রান্তর থেকে ইংরেজ শক্তি যে বিজয় অভিযান আরম্ভ করেছিল বক্সারে তা সম্পূর্ণতা লাভ করে। বাংলাদেশের ওপর ইংরেজ কোম্পানির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাছাড়া এই যুদ্ধে ইংরেজরা কেবল বাংলার নবাবকে নয়, অযোধ্যার নবাব এবং দিল্লির মোগল বাদশাকেও পরাস্ত করেছিল। ফলে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইংরেজদের গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে ক্ষমতা বিস্তারের পথ উন্মুক্ত হয়েছিল। বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজ কোম্পানির বিজয় ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করেছিল।

৩৭.৫ ইংরেজ কোম্পানির দেওয়ানি লাভ

১৭৬৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মীরজাফর মারা যান। বাংলার নতুন নবাব হন মীরজাফর পুত্র নজমউদ্‌দৌল্লা। ফেব্রুয়ারি মাসে ইংরেজরা নজমউদ্‌দৌল্লার সঙ্গে একটি চুক্তি করে। এই চুক্তিতে বলা হয় ইংরেজদের মনোনীত এক ব্যক্তি বাংলার নায়েব নাজিম বা ডেপুটি সুবাদার পদে অধিষ্ঠিত হবেন এবং তিনিই বাংলার শাসনতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি দেখাশোনা করবেন। ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা না করে নবাব নায়েব নাজিমকে পদচ্যুত করতে পারবেন না। ইংরেজ কোম্পানি মহম্মদ রেজা খানকে নায়েব নাজিম পদে মনোনীত করে। রেজা খানের মাধ্যমে বাংলার শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা ইংরেজরা হস্তগত করে এবং নবাব নজমউদ্‌দৌল্লাকে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে ১৭৬৫ সালের মে মাসে ক্লাইভ বাংলাদেশে পুনরায় ফিরে আসেন।

বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজ কোম্পানির বিজয়ের পর যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উত্থান ঘটেছিল, সেই পরিস্থিতির উত্থান ঘটেছিল, সেই পরিস্থিতিকে ক্লাইভ ইংরেজ শক্তির স্বার্থে ব্যবহার করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। যেহেতু মীরকাশিম ছাড়া অযোধ্যার নবাব সূজাউদ্‌দৌল্লা এবং দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম ইংরেজদের হাতে পরাস্ত হয়েছিলেন সেহেতু ক্লাইভ বাংলা থেকে দিল্লি পর্যন্ত উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইংরেজ আধিপত্য অনায়াসেই কায়েম করতে পারতেন। কিন্তু ধুরন্ধর কূটনীতিবিদ রবার্ট ক্লাইভ সেই মুহূর্তে এই বিস্তৃত অঞ্চলের ওপর ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাননি। তিনি ইংরেজ শক্তির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে ক্লাইভ দ্বিতীয় শাহ্ আলম এবং সুজাউদ্‌দৌল্লার সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর

করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৭৬৫ সালের ১২ই অগাস্ট এলাহাবাদ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সুজাউদ্‌দৌল্লা তাঁর রাজ্য ফিরে পেলেন। বিনিময়ে তিনি ইংরেজ কোম্পানিকে ৫০ লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য হলেন। কেবলমাত্র কারা এবং এলাহাবাদ অযোধ্যা রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে মোগল সম্রাটকে দিয়ে দেওয়া হল। মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমকে দিল্লির সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হল। বিনিময়ে শাহ্ আলম একটি ফরমানের মাধ্যমে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি ইংরেজ কোম্পানির হাতে তুলে দেন। ইংরেজরা এর বিনিময়ে শাহ্ আলমকে বছরে ২৬ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। তাছাড়া ইংরেজরা বাংলার নবাব নজমউদ্‌দৌল্লাকে বাৎসরিক ভাতা হিসাবে ৫৩ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হয়।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বাংলা দেওয়ানি লাভ ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। দেওয়ানি লাভ করে কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের পূর্ণ অধিকার লাভ করে। এই অধিকার লাভ করার ফলে কোম্পানি আর্থিক দিক যথেষ্ট লাভবান হয়েছিল। মীরকাশিমের সঙ্গে যুদ্ধ করে কোম্পানির প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছিল। শাহ্ আলমের থেকে বাংলার দেওয়ানি লাভ করে ক্লাইভ ইংরেজ কোম্পানির আর্থিক সঙ্কট মোচন করতে চেয়েছিলেন। এই প্রয়াসে তিনি সফলও হয়েছিলেন।

তাছাড়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। বাংলার প্রাদেশিক অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ করার আইনি স্বীকৃতি লাভ করেছিল ইংরেজরা। আর এই অধিকার তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন স্বয়ং দিল্লির সম্রাট। নজমউদ্‌দৌল্লার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে ইংরেজরা আগেই বাংলার অভ্যন্তরীণ শাসনতন্ত্রে হস্তক্ষেপ করার অধিকার লাভ করেছিল। শাহ্ আলমের ফরমান তাদের রাজস্ব আদায়ের অধিকার দিয়েছিল।

৩৭.৬ সারাংশ

বাংলার দেওয়ানি লাভ করে ইংরেজরা যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। ফলে সামরিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে তাদের আরও সাফল্যলাভের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। ইংরেজ কোম্পানি কর্তৃক বাংলার দেওয়ানি লাভের ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা গেল যে ১৭৬৫ সালের পর থেকে ইংল্যান্ড থেকে সোনা-রূপা বা বুলিয়ন আমদানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়। পলাশীর আগে বাংলাদেশের বাণিজ্যে বিনিয়োগ করার জন্য ইংরেজ বণিকরা দেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে বুলিয়ন আনত। পলাশীর পর থেকে তারা যে সম্পদ আহরণ করতে শুরু করেছিল তা দিয়েই তারা বাণিজ্যে বিনিয়োগ করত। ফলে তখন থেকেই ইংল্যান্ড থেকে বুলিয়ন আমদানি হ্রাস পেতে থাকে। দেওয়ানি লাভের পর বাংলার রাজস্ব বাবদ ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যে আয় হত, তা ছিল বিনিয়োগের পক্ষে যথেষ্ট বেশি। ১৭৬৫ সালের পর ইউরোপ থেকে সোনা, রূপা আমদানি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের পর থেকেই বাংলার নবাবরা ইংরেজ শক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিলেন। বক্সারের যুদ্ধে জয়ী হয়ে ইংরেজরা তাদের ক্ষমতা আরও নিরঙ্কুশ করেছিল। ১৭৬৫ সালে ইংরেজ কোম্পানির দেওয়ানি লাভের ফলে বাংলার নবাবদের সার্বভৌম কর্তৃত্বের শেষ রেখাটুকু মুছে গেল।

৩৫.৭ অনুশীলনী

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

১। পলাশীর যুদ্ধের কারণ ও তাৎপর্য আলোচনা কর।

২। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৭৬৪ গাল পর্যন্ত ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিভাবে বাংলাদেশে তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

৩। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের তাৎপর্য আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

৪। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সিরাজউদ্‌দৌল্লার বিরোধের কারণগুলি লেখ।

৫। ইংরেজ কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা কেন মীরজাফরকে বাংলার নবাব পদ থেকে অপসারিত করেন?

৬। বাংলার দেওয়ানি লাভ কীভাবে ইংরেজ কোম্পানিকে উপকৃত করেছিল?

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন :

৭। সিরাজের কোন দু'জন আত্মীয় সিরাজ নবাব হবার ফলে ক্ষুব্ধ হন?

৮। আলিনগরের চুক্তি কাদের মধ্যে এবং কত সালে হয়েছিল?

৯। পলাশীর যুদ্ধের সময় ইংরেজ কোম্পানির প্রধান কে ছিলেন?

১০। মীরকাশিম বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে কোথায় স্থানান্তরিত করেন?

১১। এলাহাবাদ চুক্তি কবে ও কাদের মধ্যে সম্পাদিত হয়?

৩৫.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। Susil Chaudhuri : *Prosperity and Poverty in Bengal*, Delhi, 1997.

২। —— 'Sirajuddaulah, the English Company and the Plassey Conspiracy' in *Indian Historical Review,* 1986—87, Vol. 13 (1—2).

৩। P. J. Marshall : *Bengal : The British Bridgehead,* Cambridge, 1987.

৪। C. A. Bayly : *Indian Society and the Making of the British Empire,* Cambridge, 1988.

৫। Brijin Gupta : *Sirajuddaulah and the East India Company,* 1756—57, Leiden, 1962.

৬। S. C. Hill : *Bengal in 1756—57,* Vol. 1—3, London, 1905.

৭। Rajat Kanta Ray : 'Colonial Penetration and the Initial Resistance : The Mughal Ruling Class, The English East India Company and the Struggle for Bengal 1756—1800' in *Indian Historical Review,* 1985—86, Vol. 12(1—2).

৮। Benoy Chaudhury : 'Political History' in N. K. Sinha (ed.), *The History of Bengal (1757—1905),* Calcutta, 1967.

৯। Suranjan Chatterjee and Siddhartha Guha Ray : *History of Modern India,* Calcutta, 1997.

১০। রজত কান্ত রায় : *পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ,* কলকাতা, ১৯৯৪।

১১। সিদ্ধার্থ গুহরায় ও সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় : *আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস,* কলকাতা, ১৯৯৬।

একক ৩৮ ❐ বাংলায় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো আদিযুগ

গঠন :

৩৮.০ উদ্দেশ্য

৩৮.১ প্রস্তাবনা

৩৮.২ রেগুলেটিং অ্যাক্ট (১৭৭৩)

৩৮.৩ পিটের ভারত আইন (১৭৮৪)

৩৮.৪ বিচার বিভাগীয় সংস্কার

৩৮.৪.১ ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার বিভাগীয় সংস্কার

৩৮.৪.২ কর্নওয়ালিসের বিচার বিভাগীয় সংস্কার

৩৮.৫ ভূমিরাজস্ব নীতি

৩৮.৫.১ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও তারপর

৩৮.৫.২ ওয়ারেন হেস্টিংসের ইজারাদারী বন্দোবস্ত ও তার পরিণতি

৩৮.৫.৩ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রেক্ষাপট

৩৮.৫.৪ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলার ইতিহাসে তার প্রভাব

৩৮.৬ সারাংশ

৩৮.৭ অনুশীলনী

৩৮.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩৮.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়ার কথা।
- ওয়ারেন হেস্টিংস ও কর্নওয়ালিসের বিচার বিভাগীয় সংস্কার।
- বাংলার ভূমিব্যবস্থায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রভাব।
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রেক্ষাপট ও পরিণতি।

৩৮.১ প্রস্তাবনা

১৭৬৫ সালে ইংরেজ কোম্পানির বাংলার দেওয়ানি লাভের ফলে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তাকে ঐতিহাসিকেরা দ্বৈত শাসনব্যবস্থা (Dual system of administration) বলে আখ্যায়িত

করেছেন। বাংলাদেশ প্রকৃতপক্ষে দুজন শাসকের অধীনস্থ হয়। বাংলার রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা সমেত যাবতীয় অর্থনৈতিক প্রশাসন রইল ইংরেজ কোম্পানির হাতে। অন্যদিকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও নিজামতের দায়িত্ব সমেত আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রইল নবাব নজম উদ্দৌল্লার হাতে। কিন্তু দেওয়ানির দায়িত্ব না থাকার ফলে নবাবের রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই বলা হয়েছে এলাহাবাদ চুক্তির ফলে ইংরেজ কোম্পানি পেল দায়িত্ববিহীন অধিকার এবং বাংলার নবাব পেলেন অধিকারবিহীন দায়িত্ব। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ, যা বাংলার ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' (১১৭৬ বঙ্গাব্দে হয়েছিল বলে) নামে পরিচিত বাংলার অর্থনীতিতে এক বিরাট বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। বহু ইংরেজই মনে করেছিলেন বাংলার অবস্থার পরিবর্তন জরুরি। তাছাড়া বাংলায় ইংরেজ কর্মচারীদের দুর্নীতি, অসৎ উপায়ে সম্পদ আহরণ, উদ্ধত আচরণ ও অত্যাচার ইংল্যান্ডে উত্তপ্ত বিতর্কের সূচনা করেছিল। তখন থেকেই বাংলাদেশে একটি ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো গড়ে তোলার ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। বাংলাদেশে কোম্পানির কার্যকলাপে ব্রিটিশ সরকার কতটা হস্তক্ষেপ করবে তা নিয়েও বিতর্ক চলে। এই পরিস্থিতিতে কোম্পানি এবং ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে বাংলাদেশে একটি সুবিন্যস্ত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়াস চালানো হয়; যা আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করব।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল একটি বণিক সংস্থা। তাই এই প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ছিল তারগ বাণিজ্যিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। কোম্পানির তিনটি প্রধান ঘাঁটি ছিল কলকাতা, বম্বে ও মাদ্রাজ এই ঘাঁটিগুলো স্বতন্ত্র তিনটি কাউন্সিল বা পরিষদ দ্বারা পরিচালিত হত। এই কাউন্সিলগুলি লন্ডনে কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী বা কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস্-এর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখে কাজ করত। কোম্পানির মালিক ও অংশীদারদের নিয়ে এই কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস্ গঠিত হত। প্রতিটি ভারতীয় ঘাঁটিতেই বণিকদের ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাস থাকত। কেবলমাত্র সফল বণিকরাই কাউন্সিলের সদস্য হতেন। এই সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে কাউন্সিলের সভাপতি করা হত। এই সভাপতি হতেন সংশ্লিষ্ট ঘাঁটির গভর্নর। কাউন্সিলগুলি তাঁদের নিজস্ব ঘাঁটির রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করত।

কোম্পানির কর্মচারীদের বেতন ছিল সামান্য। কিন্তু তাঁরা ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে এবং দূরপ্রাচ্যের সঙ্গে বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত থেকে নিজেদের আয় বাড়াতে পারতেন। তবে ইংল্যান্ডের সঙ্গে বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত। এক্ষেত্রে কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত বেসরকারি বাণিজ্য চালানোর সুযোগ পেতেন না। পলাশীর পর থেকেই বাংলাদেশের কোম্পানি কর্মচারীদের সম্পদ বিপুল হারে বৃদ্ধি পায়। এই সম্পদশালী ইংরেজ বণিকের দল আঠেরো শতকের ইংল্যান্ডে একটি প্রতিপত্তিশালী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। ১৭৬৭ সালের মধ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এই গোষ্ঠীর প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। দুর্নীতিগ্রস্ত এই বণিকগোষ্ঠী ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রভাবশালী হয়ে ওঠার ফলে ইংল্যান্ডের নীতিজ্ঞানসম্পন্ন রাজনীতিবিদেরা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এইসব ইংরেজ বণিকের দল প্রায়ই অসৎ উপায় অবলম্বন করে কোম্পানির শাসনতান্ত্রিক কাঠামোকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলেছিলেন। কিন্তু কোম্পানি এদের বিরুদ্ধে কোনো

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেনি, কারণ কোম্পানির ভেতর থেকেই বাধা এসেছিল। অসদুপায়ে বিপুল সম্পদ অর্জনকারী সকলেই ছিলেন কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদের আত্মীয় অথবা ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। তাছাড়া কোম্পানির মালিক ও অংশীদারেরাও এই বিপুল সম্পদে ভাগ বসাতে আগ্রহী ছিলেন। ১৭৬৬ সালে কোম্পানির অংশীদারদের লভ্যাংশ বা ডিভিডেন্ডের হার করা হয় ১০ শতাংশ। ১৭৬৭ সালে ডিভিডেন্ডের হার আরও বাড়িয়ে করা হয় ১২$^{১}/_{২}$ শতাংশ। ফলে কোম্পানি এক মারাত্মক আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। এই পরিস্থিতিতে ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ করা হয়।

৩৮.২ রেগুলেটিং অ্যাক্ট (১৭৭৩)

১৭৭২ সালে কোম্পানির কার্যকলাপে সরকারি হস্তক্ষেপের যে তৎপরতা চলেছিল, তারই পরিণতি ১৭৭৩-এর রেগুলেটিং অ্যাক্ট। কোম্পানির কাছ থেকে ব্রিটিশরাজের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রথম পদক্ষেপ ছিল এই আইন। এই আইনের কতকগুলি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত, কোম্পানির অংশীদার ও পরিচালকদের মধ্যে সম্পর্ক নির্দিষ্ট করা। দ্বিতীয়ত, কোম্পানির ওপর ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও মন্ত্রিসভার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। তৃতীয়ত, বম্বে ও মাদ্রাজ কুঠির সঙ্গে কলকাতা তথা বাংলার সম্পর্ক কি হবে তা নির্ধারণ করা। এই আইন অনুযায়ী ৫০০ পাউন্ড শেয়ারহোল্ডারদের ভোটদানের ক্ষমতা নাকচ করা হয়। কমপক্ষে ১০০০ পাউন্ড শেয়ারহোল্ডারদের যথাক্রমে ২, ৩ ও ৪টি ভোট দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। অর্থাৎ কোম্পানিতে বিত্তবানদের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এই আইনে বলা হয় যে, কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টরস্ ব্রিটিশ সরকারের কাছে কোম্পানির শাসন ও অর্থনীতি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পেশ করতে বাধ্য থাকবে। এইভাবে ব্রিটিশ সরকার কোম্পানির উপর কর্তৃত্ব কায়েম করতে চেয়েছিল। বম্বে ও মাদ্রাজ কুঠির ওপর বাংলার প্রাধান্য স্বীকৃত হয়।

রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী গভর্নর জেনারেল নামে নতুন একটি পদ সৃষ্টি করা হয়। সিদ্ধান্ত হয় বাংলার গভর্ণর, গভর্নর জেনারেল পদে আসীন হবেন। চারজন সদস্যবিশিষ্ট গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল গঠিত হয়। এই আইনেই গভর্নর জেনারেল হিসাবে ওয়ারেন হেস্টিংসের নাম এবং কাউন্সিল সদস্য হিসাবে ক্ল্যাভারিং, মনসন্, বারওয়েল এবং ফিলিপ ফ্রান্সিসের নাম ঘোষিত হয়। গভর্নর জেনারেলের শাসনকালের মেয়াদ হয় পাঁচ বছর। বলা হয় গভর্নর জেনারেল কলকাতা থেকে কোম্পানির বম্বে ও মাদ্রাজ কুঠির ওপর কর্তৃত্ব খাটাবেন। বস্তুত কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানীতে পরিণত হয়। রেগুলেটিং অ্যাক্ট ছিল ভারতবর্ষে এককেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এবং কোম্পানির বিষয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব জাহিরের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ।

৩৮.৩ পিটের ভারত আইন (১৭৮৪)

অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই রেগুলেটিং অ্যাক্টের ত্রুটিগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই আইনের ফলে কোম্পানির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়নি। আবার কোম্পানির কর্মচারীদের ওপর পরিচালকমণ্ডলীর (Court of Directors) কর্তৃত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। একইভাবে কাউন্সিলের ওপর গভর্ণর জেনারেলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বম্বে ও মাদ্রাজ কাউন্সিলের ওপর বাংলার কর্তৃত্ব স্থাপনের বিষয়টিও অস্পষ্ট থেকে গিয়েছিল। তার ওপর কতকগুলি বিষয় পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছিল। কাউন্সিল সদস্যদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিবাদ, কাউন্সিলের সঙ্গে সুপ্রীম কোর্টের বিরোধ, প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ও অন্যান্য যুদ্ধের জন্য ইংরেজ কোম্পানির বিপুল অর্থব্যয় কোম্পানি কর্তৃপক্ষ তথা ইংরেজ সরকারকে বিপন্ন করে তুলেছিল। এই অবস্থায় লর্ড নর্থ কোম্পানির শাসনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু সংস্ক ও বার্ক এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করায় এই প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। ১৭৮১ সালের চার্টার আইনের মাধ্যমে কিছু কিছু পরিবর্তন আনা হলেও তা বিশেষ সাফল্যলাভ করেনি। সমস্যাগুলো থেকেই গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ইংল্যান্ডের নতুন প্রধানমন্ত্রী হন পিট। ১৭৮৪ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত ভারত আইন জারী করেন। এই আইন পিটের ভারত আইন (Pitt's India Act) নামে পরিচিত।

১৭৮৪ সালের পিটের ভারত আইন ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ওপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করেছিল। ১৭৮৫ সালের ১লা জানুয়ারি ভারতবর্ষে এই আইন কার্যকর করা হয়। এই আইন অনুযায়ী একটি বোর্ড অফ কন্ট্রোল (Board of Control) গঠিত হয়। সিদ্ধান্ত হয়—ভারত সচিব (Secretary of State), অর্থসচিব (Chancellor of the Exchequer), চারজন প্রিভি কাউন্সিলার—এই ছয়জন কমিশনারকে নিয়ে বোর্ড অফ কন্ট্রোল গঠিত হবে। এই বোর্ডকে কোম্পানি কর্তৃক সামরিক ও অসামরিক শাসনকার্য পরিচালনা ও রাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালনার বিষয়গুলি দেখাশোনা ও নিয়ন্ত্রণ করার পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়। বলা হয়—বোর্ড অফ কন্ট্রোল ইচ্ছেমতো কোম্পানির কাগজপত্র দেখতে পারবে ও নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ইংরেজ কুঠির গভর্নরদের ক্ষেত্রে কলকাতার গভর্নর জেনারেলের নির্দেশ মানা যে বাধ্যতামূলক এ বিষয়ে রেগুলেটিং অ্যাক্টে কোনো নির্দিষ্ট আইন ছিল না। পিটের ভারত আইন এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করে এবং বলে যে, ভারতে কর্মরত কোম্পানির যেকোনো স্তরের প্রশাসনিক কর্তাই গভর্নর জেনারেলের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে তাঁর নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

৩৮.৪ বিচার বিভাগীয় সংস্কার

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) পর বাংলার রাজনীতিতে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৭৬৫ সালে বাংলার দেওয়ানি লাভ করে ইংরেজ কোম্পানি তাদের আর্থিক সমৃদ্ধি অনেকটাই বাড়িয়ে নিয়েছিল। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর) পর ইংরেজ কোম্পানি বাংলাদেশে আর দ্বৈত

শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে চায়নি। তারা সরাসরি বাংলাদেশের সামগ্রিক শাসনব্যবস্থা নিজেদের হাতে তুলে নিতে চেয়েছিল। ১৭৭২ সালে ইংরেজ কোম্পানি সরাসরি বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। বালাদেশে কোম্পানির গভর্নর হয়ে আসেন ওয়ারেন হেস্টিংস। ১৭৭৩-এর রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী হেস্টিংস হন গভর্নর জেনারেল। হেস্টিংস দেখেছিলেন যে, তৎকালীন বাংলাদেশে কোন সুষ্ঠু ও সুবিন্যস্ত বিচারব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল না। বাংলাদেশে কোম্পানির শাসনকে একটি স্থায়ী ও সুদৃঢ় রূপ দেবার জন্য বিচার বিভাগীয় সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। বিচার সংক্রান্ত শাসনব্যবস্থাকে একটি চূড়ান্ত রূপ দেবার জন্য কোম্পানি কর্তৃপক্ষ নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

৩৮.৪.১ ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার বিভাগীয় সংস্কার

১৭৭২ সালে ভ্রাম্যমাণ কমিটির (Committee of Circuit) সুপারিশ অনুসারে বাংলার প্রত্যেক জেলায় একটি করে দেওয়ানি আদালত ও একটি করে ফৌজদারি আদালত গঠিত হয়। কলকাতায় দু'টি উচ্চ আদালত গঠিত হয়েছিল। দেওয়ানি মামলার বিচারের জন্য সদর দেওয়ানি আদালত এবং ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তির জন্য সদর নিজামৎ আদালত কলকাতায় তৈরি হয়েছিল। এই দুটি আদালতই ছিল আপীল আদালত। জেলার দেওয়ানি আদালতগুলির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন কালেক্টর। সদর দেওয়ানি আদালতের মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনা করতেন কাউন্সিলের সদস্যরা। সভাপতির দায়িত্ব পালন করতেন প্রেসিডেন্ট। ফৌজদারি আদালতগুলি ভারতীয় বিচারকদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ভারতীয় বিচারকেরা প্রচলিত রীতিনীতি ও নজিরের ওপর ভিত্তি করে ফৌজদারি মামলার বিচারকার্য সম্পাদন করতেন। তবে প্রয়োজনে জেলা ফৌজদারি আদালতগুলির বিষয়ে কালেক্টর এবং সদর নিজামৎ আদালতের বিষয়ে কাউন্সিল সদস্যরা হস্তক্ষেপ করতে পারতেন।

১৭৭৪ সালে জেলা দেওয়ানি আদালতগুলি পরিচালনার জন্য 'আমিল' নামে একজল ভারতীয় কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়েছিল। আমিলের বিচারে অসন্তুষ্ট হলে, যে-কোনো পক্ষই প্রাদেশিক কাউন্সিলে (Provincial Council) আবেদন করতে পারত। সেখানেও যদি কোন মামলার সঠিক নিষ্পত্তি না হত তবে সদর দেওয়ানি আদালতে আপীল করা যেত। ১৭৭৫ সালে সদর নিজামৎ আদালতকে কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করা হয়। নায়েব নাজিম নামক ভারতীয় পদাধিকারীর ওপর সদর নিজামৎ আদালতের দায়িত্ব অর্পিত করা হয়। নায়েব নাজিম নামক ভারতীয় পদাধিকারীর ওপর সদর নিজামৎ আদালতের দায়িত্ব অর্পিত হয়। অপরাধমূলক মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য প্রত্যেক জেলায় একজন করে ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়।

১৭৮০ সালে ছয়টি প্রাদেশিক কাউন্সিলের বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ছয়টি দেওয়ানি আদালতের হাতে অর্পিত হয়। কোম্পানির উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের এই দেওয়ানি আদালতগুলির সভাপতিত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৭৮১ সালে দেওয়ানি আদালতের সংখ্যা বাড়িয়ে ১৮ করা হয়। এই দেওয়ানি আদালতগুলির মধ্যে ৪টিতে কালেক্টরেরা বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। অবশিষ্ট ১৪টিতে ইউরোপীয় বিচারকেরা বিচারের দায়িত্ব পালন করতেন। উচ্চতর আপীলের জন্য সদর দেওয়ানি আদালতে যেতে হত। জেলা আদালতের বিচারকেরা ক্রমে ফৌজদারি মামলার বিষয়েও ফৌজদারদের পরিবর্তে দেখাশোনা করতে আরম্ভ করেন। তবে ফৌজদারি

মামলার ক্ষেত্রে নায়েব নাজিম তখনও চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ উপভোগ করতেন। দেওয়ানি বিচারের জন্য ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে একটি হিন্দু আইনবিধি ও একটি মুসলিম আইনবিধি সঙ্কলিত হয়। এই আইনবিধি দুটি ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

ইতিমধ্যে রেগুলেটিং অ্যাক্টের সুপারিশ অনুসারে ১৭৭৪ সালে কলকাতায় একটি সুপ্রীম কোর্ট তৈরি হয়েছিল। এই সুপ্রীম কোর্টে একজন প্রধান বিচারপতি এবং তিনজন বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়। ইংল্যান্ডের রানী এই আদালত তৈরি করেছিলেন। বলা হয়েছিল যে, সুপ্রীম কোর্ট কেবলমাত্র ব্রিটিশ নাগরিকদের বিচার করবে। কিন্তু এই আদালত তৈরি হবার ফলে বেশ কিছু বাস্তব অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। সুপ্রীম কোর্ট সবার ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে শুরু করে। এই আদালত প্রায়ই কোম্পানির তৈরি করা আদালতগুলির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করত। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে উক্ত আদালতগুলির বিচারক ও কর্মচারীদের বিচারের দায়িত্ব নিয়ে নিত। সুপ্রীম কোর্ট যে সমস্ত আইনী নীতি ও পদ্ধতি অবলম্বন করত, তা ছিল ভারতীয়দের কাছে সম্পূর্ণ বিদেশী। ফলে সুপ্রীম কোর্টের কাজকর্ম বাংলার জনমানসে ক্ষোভ ও বিরক্তির সঞ্চার করেছিল। সিলেক্ট কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল—"এই আদালত ভারতীয়দের কাছে ভীতিজনক হয়ে উঠেছে এবং কোম্পানির সরকারকে অসুবিধায় ফেলেছে" (The Court has been generally terrible to the natives and has distracted the government of the Company.)।

১৭৮০ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এলিজা ইম্পেকে সদর দেওয়ানি আদালতের সভাপতি নিযুক্ত করেন। ইম্পেকে মোটা টাকার বেতনে বহাল করা হয়। কিন্তু এই কাজের জন্য হেস্টিংস কঠোরভাবে সমালোচিত হন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল তিনি ইম্পেকে উৎকোচ প্রদান করেছেন। বস্তুত এক বিশাল পরিমাণ বেতনের বিনিময়ে এলিজা ইম্পেকে সদর দেওয়ানি আদালতের সভাপতি নিযুক্ত করা ছিল উৎকোচ প্রদানেরই নামান্তর। লন্ডনে কোম্পানির কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস্ এবং হাউস অফ কমন্স সরকারের কাছে ইম্পেকে দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি তোলে। ১৭৮২ সালে ইম্পে ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে এবং তাঁর সমস্ত বেতন ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যে ১৭৮১ সালের একটি আইনের মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্ট ও কাউন্সিলের মধ্যে বিরোধ মিটিয়ে ফেলা হয়। সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ারে থাকবে না। গভর্নর জেনারেল ও তার কাউন্সিলের কোন বিষয়ে সুপ্রীম কোর্ট হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কলকাতার সমস্ত অধিবাসীদের ওপর সুপ্রীম কোর্টের বিচার ক্ষমতা স্বীকার করে নেওয়া হয়। ১৭৮২ সালে এলিজা ইম্পে ভারত ত্যাগ করার পর গভর্নর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিল সদর দেওয়ানি আদালতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

৩৮.৪.২ কর্নওয়ালিসের বিচার বিভাগীয় সংস্কার

ওয়ারেন হেস্টিংস ইংল্যান্ডে ফিরে যাবার পর অল্প কিছুদিনের জন্য গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেছিলেন ম্যাকফার্সন। তারপর ১৭৮৬ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জেনারেল হয়ে বাংলায় আসেন লর্ড কর্নওয়ালিস। কর্নওয়ালিসের আমলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিচার বিভাগীয় সংস্কার সাধিত হয়েছিল।

১৭৮৭ সালে ঢাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদ ছাড়া সমস্ত জেলা আদালতগুলিকে পুনরায় কালেক্টরের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হল। কালেক্টরদের হাতে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হল এবং তাঁরা সীমিত ভাবে ফৌজদারি মামলা পরিচালনার অধিকারী ছিলেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারি মামলার বিচার তখনও জেলা ফৌজদারি আদালতগুলিতে এবং সদর নিজামৎ আদালতেই হত। কালেক্টররা রাজস্ব সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি করতে পারতেন না। রাজস্ব সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তির দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল রাজস্ব পরিষদে (Board of Revenue) ওপর।

১৭৯০ সালে এই ব্যবস্থায় বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়। রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির ব্যাপারে রাজস্ব পরিষদ বিশেষ সাফল্যলাভ করেনি। তখন রাজস্ব সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তির জন্য কালেক্টরের অধীনে একটি করে স্থানীয় আদালত গঠিত হয়েছিল। ফৌজদারি মামলার বিচারের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ছিল আরও সুদূরপ্রসারী। সদর নিজামৎ আদালত মুর্শিদাবাদ থেকে পুনরায় কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। একজন মুসলমান বিচারকের পরিবর্তে গভর্নর জেনারেল ও তার কাউন্সিল এই আদালতে সভাপতিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ভারতীয় আইন বিশেষজ্ঞরা তাঁদের সাহায্য করতেন। জেলা ফৌজদারি আদালতগুলি তুলে দেওয়া হয়। তার পরিবর্তে কলকাতা, ঢাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদে চারটি ভ্রাম্যমান আদালত গঠিত হয়। কোম্পানির দু'জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ভারতীয় আইন বিশেজ্ঞদের সহায়তায় এই আদালতগুলির মামলা পরিচালনা করতেন। এই বিচারকদের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় তাদের বছরে দুবার ভ্রমণ করতে হত। কালেক্টরদের হাতে বিচারকের ক্ষমতা (Magistrate's Power) বৃদ্ধি করা হয়েছিল। কালেক্টরেরা চারটি প্রাদেশিক ফৌজদারি বিচারালয়ের রায় অনুযায়ী অপরাধীদের শাস্তি দেবার দায়িত্ব নিতেন।

১৭৯৩ সালের মে মাসে বিখ্যাত 'কর্নওয়ালিস কোড' প্রণীত হয়। এই আইনবিধিতে আইনী পরিবর্তনগুলিকে বিশ্লেষণ করে আরও কিছু নতুন আইনের সূচনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে "বিখ্যাত 'কর্নওয়ালিস কোড' ব্রিটিশ ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ইস্পাত কাঠামো তৈরি করেছিল" (The famous Cornwallis Code formed the steel frame of British-Indian administration)। এই সময় মূলত দুটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কর্নওয়ালিসের বিচার বিভাগীয় নীতি নির্ধারিত হয়েছিল। প্রথম উদ্দেশ্য ছিল কালেক্টরদের হাত থেকে বহুমুখী দায়িত্ব হ্রাস করা। বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব হাতে পেয়ে কালেক্টরেরা অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছিল। কালেক্টরেরা জেলাগুলিতে ব্রিটিশ কর্তৃত্বের একমাত্র প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। ফলে কালেক্টরদের হাত থেকে বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। পরিবর্তে জজ্ (Judge) নামে একদল নতুন অফিসারকে বিচারক হিসাবে নিয়োগ করা হয়। জেলার রাজস্ব আদালতগুলি এবং বোর্ড অফ রেভেনিউ বা রাজস্ব পরিষদের বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা তুলে দেওয়া হল। এখন থেকে জজেরাই দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তি করার অধিকার পেলেন। পাটনা, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে তিনটি নগর আদালত এবং ২৩টি জেলা আদালতের বাইরেও অনেকগুলি নিম্ন আদালত (Lower Courts) গঠিত হল। সর্বনিম্ন আদালত ছিল মুনসিফের আদালত। সেখানে ৫০ টাকা পর্যন্ত মামলা চলত। তার ঠিক ওপরের স্তরে ছিল রেজিস্ট্রারের আদালত। এইসব আদালতের রায়ে কেউ সন্তুষ্ট না হলে সে জেলা আদালতে আপীল করতে পারত।

কর্নওয়ালিসের বিচার ক্রান্ত নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল—শাসনতন্ত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে

ভারতীয়দের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব যতদূর সম্ভব হ্রাস করা। তিনি আগেই ভারতীয়দের হাত থেকে ফৌজদারি মামলার বিচারের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন। নিজস্ব এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে জমিদারেরা যে ক্ষমতা উপভোগ করতেন—কর্নওয়ালিস এবার তা বাতিল করলেন। জমিদারেরা নিজস্ব পুলিশ বাহিনী বাতিল করতে বাধ্য হলেন। প্রত্যেক জেলায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দারোগ নামে একদল কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। দারোগা ছিল সরাসরি সরকারি কর্মচারী। দারোগারা নির্ধারিত এলাকায় ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে কাজ করত।

এইভাবে কর্নওয়ালিস প্রত্যেক জেলার শাসনতন্ত্র দু'জন ইউরোপীয় অফিসারের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। একজন ছিলেন কালেক্টর। তাঁর দায়িত্ব ছিল রাজস্ব সংগ্রহ করা। অন্যজন ছিলেন একাধারে জজ ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর কাজ ছিল বিচারকের দায়িত্ব পালন করা ও এলাকার অপরাধমূলক কার্যকলাপ দমন করা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল শাসনতান্ত্রিক পদগুলি থেকে ইচ্ছাকৃতভাবেই ভারতীয়দের অপসারিত করেছিলেন কর্নওয়ালিস।

৩৮.৫ ভূমিরাজস্ব নীতি

বাংলাদেশে ১৭৬৫ থেকে ১৭৭২ সাল পর্যন্ত দ্বৈত শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করার পরই তাদের মনোনীত নায়েব নাজিম মহম্মদ রেজা খানকে নায়েব দেওয়ান পদে নিযুক্ত করে তার ওপর ভূমিরাজস্ব আদায়ের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করে। ১৭৬৫ সালের পর থেকে ইংরেজ কোম্পানির একমাত্র লক্ষ্য ছিল যত বেশি সম্ভব রাজস্ব আদায় করা। নায়েব দেওয়ান নিযুক্ত হয়েই রেজা খান বুঝে যান যে তাঁর অস্তিত্ব নির্ভর করছে অধিক পরিমাণে রাজস্ব আদায় করার দক্ষতার ওপর সেই সময় ভূমিরাজস্ব আদায়ের জন্য আমিলদের নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব কোম্পানি মনোনীত নায়েব দেওয়ানের হাতে তুলে দিতে বলা হয়েছিল। আমিলদের উদ্দেশ্যই ছিল কৃষকের ওপর চরম উৎপীড়ন চালিয়ে আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করা ও নায়েব দেওয়ান তথা ইংরেজ কেম্পানিকে সন্তুষ্ট রাখা। দ্বৈত শাসনব্যবস্থার যুগে উৎপাদন অনুপাতে ভূমিরাজস্ব আদায়ের হার এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে কৃষিক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব সঙ্কট দেখা দিল।

পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে ইংরেজ কোম্পানির তৎকালীন গভর্নর ভেরেলেস্ট ১৭৬৯ সালে বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় সুপারভাইজার নামে একদল কোম্পানির কর্মচারী নিয়োগ করেন। আমিলদারী ব্যবস্থার অবসান ঘটে। নবনিযুক্ত সুপারভাইজারদের নিজ নিজ জেলাগুলির আর্থিক অবস্থা ও সেখানের অধিবাসীদের রাজস্ব দেবার ক্ষমতা সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করতে বলা হয়। এই কর্মচারীদের রায়তরা বিভিন্ন জেলায় কী ধরনের অধিকার উপভোগ করেন এবং তাদের কাছ থেকে কী হারে রাজস্ব দাবী করা হয়, সে সম্পর্কেও একটি তালিকা প্রস্তুত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। নায়েব দেওয়ানের মতো সুপারভাইজাররাও মুর্শিদাবাদ দরবারে নিযুক্ত ইংরেজ রেসিডেন্টের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন। ১৭৭০ সালের মধ্যেই সুপারভাইজারী প্রথা একটি অদক্ষ

ব্যবস্থায় পরিণত হয়। কারণ প্রতেক সুপারভাইজারই তাঁর জেলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ওপর তার একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য ১৭৭০ সালের জুলাই মাসে মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় দুটি "রাজস্ব নিয়ামক পরিষদ" (Comptrolling Council of Revenue) গঠিত হয়।

৩৮.৫.১ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও তারপর

নায়েব দেওয়ান রেজা খানের আমলে আমিলদারী ব্যবস্থা বাংলার কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় করে তুলেছিল। কৃষকদের করভারে জর্জরিত করে চরম উৎপীড়ন চালিয়ে তাদের কাছ থেকে ভূমিরাজস্ব আদায় করা হত। এর সঙ্গে যুক্ত হল অজন্মা। ১৭৬৮ ও ১৭৬৯ সালে অনাবৃষ্টির জন্য ফসল উৎপাদন বিঘ্নিত হল। মারাত্মক হারে খাদ্যদ্রবের মূল্যবৃদ্ধি এবং বণিক ও সুপারভাইজারের গোমস্তাদের কালোবাজারি মানুষের দুর্দশার মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছিল। এইসব ঘটনার অনিবার্য পরিণতি হিসাবেই ১৭৭০ সালে অর্থাৎ ১১৭৬ বঙ্গাব্দে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এই দুর্ভিক্ষ "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে পরিচিত। মন্বন্তরের পরেই এলো এক সর্বগ্রাসী মহামারী। পূর্ণিয়া, নদীয়া, বীরভূম রাজশাহী, বর্ধমানের একাংশ, রাজমহল, ভাগলপুর, হুগলী, যশোর, মালদা ও চব্বিশ পরগনা ছিল সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলা। ১৭৭০ সালের মে মাসে কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী বলেছিল—বাংলার সমগ্র জনসংখ্যার $^{১}/_{৩}$ অংশ মানুষের জীবনহানি ঘটেছিল এই মন্বন্তরের ফলে। ১৭৭২ সালে বাংলার বিভিন্ন এলাকা ভ্রমণ করে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন ওয়ারেন হেস্টিংস। উইলিয়াম হান্টার লিখেছেন—সমগ্র জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশ এবং কৃষিজীবী মানুষের অর্ধেক এই দুর্ভিক্ষের ফলে মারা গেলেও কোম্পানি সরকার ভূমিরাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ঘাটতি মেনে নেয়নি।

১৭৬৫-৬৬ সাল থেকে ১৭৬৮-৮৯ সাল পর্যন্ত কোম্পানি সরকারের রাজস্ব আদায় ৫৩.৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। হেস্টিংসের সরকার ১৭৭৩ সালে স্বীকার করেছিল যে, সরকার রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্তরণ বজায় রেখেছিল বলেই এতবড় দুর্ভিক্ষের পরও আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস পায়নি। হান্টার লিখেছেন—"এমনকি ৫ শতাংশও ভূমিরাজস্বের হারে ছাড় দেওয়া হয়নি এবং পরের বছরের জন্য তা ১০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছিল। ত্রাণব্যবস্থা ছিল অমানবিক রকমের অপর্যাপ্ত" (Not even 5 per cent of the land revenue was remitted and 10 per cent was added to it next year. The relief measures were inhumanly inadequate.)। কুখ্যাত "নাজাই" বন্দোবস্ত রাজস্ব ক্ষেত্রে সরকারি কঠোর নিয়ন্ত্রণের নগ্নতম রূপ উদঘাটিত করেছিল। এই ব্যবস্থায় বলা হয়েছিল—জেলাগুলির নিকৃষ্ট ও অনুর্বর অঞ্চলে যারা বসবাস করছে তাদের ওপর অতিরিক্ত কর ধার্য করা হবে, কারণ তাদের মৃত বা পলাতক প্রতিবেশীদের জন্য রাজস্বের যে ক্ষতি হচ্ছে সেটা তাদেরই পূরণ করতে হবে। কোম্পানির বর্ধিত রাজস্ব চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকেরা আরও কঠোর পরিশ্রম করে উৎপাদন বাড়াতে মনযোগী হল। তাছাড়া দুর্ভিক্ষের পরই সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাবার ফলে কৃষিপণ্যের মূল্য কমতে থাকে। একদিকে অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য কঠোর পরিশ্রম এবং অন্যদিকে কৃষিপণ্যের মূল্য হ্রাস কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় করে

তোলে। কৃষিপণ্য বিক্রি করে সঠিক দাম না পাওয়ার জন্য কৃষকরা সরকারের রাজস্ব চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হয়। এই অবস্থায় গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর জন্য ও রাজস্ব খাতে কোম্পানির আয় বাড়ানোর জন্য নুতন ভাবনাচিন্তা শুরু করেন।

৩৮.৫.২ ওয়ারেন হেস্টিংসের ইজারদারী বন্দোবস্ত ও তার পরিণতি

১৭৭২ সালের এপ্রিল মাসে লন্ডনের কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস্ বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব কোম্পানিকে সরাসরি গ্রহণ করার নির্দেশ পাঠায়। এই নির্দেশ অনুযায়ী কোম্পানির ভারতীয় কর্তৃপক্ষ নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খানকে এবং বিহারের দেওয়ান সিতাব রাইকে বিতাড়িত করেন। রাজস্ব নিয়ামক পরিষদ তুলে দেওয়া হয় এবং সুপারভাইজাররা কালেক্টর হিসাবে পরিচিত হন। ভূমিরাজস্ব বিষয়ে নজরদারী করার জন্য ১৭৭২ সালে একটি ভ্রাম্যমান কমিটি (Committee of Circuit) গঠিত হয়। ১৭৭৩ সালে কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, বর্ধমান ও ঢাকায় পাঁচটি প্রাদেশিক পরিষদ (Provincial Council) গঠিত হয়।

এই পরিস্থিতিতে ওয়ারেন হেস্টিংস ভূমিরাজস্ব খাতে সরকারের আয় বাড়ানোর তাগিদে বাংলাদেশে একটি নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী জমির নিলাম ডাকা হল। সর্বোচ্চ নিলামদারকে জমি পাঁচ বছরের জন্য ইজারা দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থাই 'ইজারাদারী বন্দোবস্ত' (Farming system) নামে পরিচিত। পাঁচ বছরের জন্য জমি ইজারা দেওয়া হত বলে এই ব্যবস্থাকে 'পাঁচসালা বন্দোবস্ত' (Five year settlement) নামেও অভিহিত করা হয়েছে।

এই ব্যবস্থা অনুযায়ী আগামী পাঁচ বছরের জন্য ইজারাদারদের ওপর নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব তুলে দেবার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। বাংলার বহু এলাকায় পুরনো জমিদারদের বাতিল করা হয়। পরিবর্তে সর্বোচ্চ নিলামদারকে ইজারদার হিসাবে বসানো হয়। যেসব এলাকায় জমিদারেরাই সর্বোচ্চ নিলামদার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সে সব জায়গায় অবশ্য জমিদাররাই পাঁচ বছরের জন্য ইজারাদারী লাভ করেছিল। এই ব্যবস্থার অন্যতম বড় ত্রুটি ছিল যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধার্যকৃত রাজস্বের পরিমাণ বেশি হয়ে গিয়েছিল। অধিকাংশ নিলামদারই ছিল কলকাতা শহরের লোক এবং গ্রামীণ সমাজ সম্পর্কে তারা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ। জমির ইজারাদারী লাভের আশায় তারা কোনো কিছু চিন্তা না করেই দেয় রাজস্বের পরিমাণ সর্বোচ্চ নিলাম হিসাবে হেঁকে দিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে এই অতিরিক্ত পরিমাণ রাজস্ব কোম্পানি সরকারকে তুলে দেওয়া সম্ভব হয়নি। অনেক ইজারাদারই রাজস্বের প্রথম কিস্তির টাকা সরকারকে দিতে পারেনি। কোনো কোনো জমিদার বাংলার ভূমিব্যবস্থায় বানিয়াদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার তাগিদে উচ্চতর নিলাম হেঁকে নিজস্ব জমিদারি বজায় রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু তারাও তাদের প্রতিশ্রুত রাজস্ব কোম্পানি সরকারকে দিতে ব্যর্থ হয়। ফলে ভূমিরাজস্ব খাতে কোম্পানির আয় বৃদ্ধি পেল না।

ইজারাদারী ব্যবস্থা বাংলার ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে হেস্টিংসের ব্যর্থতা সূচিত করেছিল। হেস্টিংসের নতুন ব্যবস্থায় রায়তদের পাট্টা দেবার কথা ছিল। কিন্তু পাট্টা ব্যবস্থা সুদক্ষভাবে কার্যকর করা যায়নি। যেহেতু নতুন পাট্টা দেওয়ার সময় প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করার ব্যাপারে কারও কোনো উৎসাহ ছিল না সেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই পাট্টা নথিভুক্ত হত না। ঐতিহাসিক নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ বলেছেন—অনেক সময়ই এর সুযোগ নিয়ে রায়তরা তাদের কৃষিজমির এলাকা বাড়িয়ে নিত বা খাজনার হারে ছাড় নিয়ে নিত। ফলে দরিদ্র রায়তদের ওপর অতিরিক্ত খাজনার বোঝা চাপানো হত। খাজনার ন্যায্য ও সঠিক হারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হল। হেস্টিংসের

নয়া বন্দোবস্তের মারাত্মক কুফল হিসাবে বাংলার গ্রামাঞ্চলে হিংসাত্মক ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ইজারাদারী ব্যবস্থা বেনিয়াদের জমির সঙ্গে তাদেরস্বার্থ জড়িত করার সুযোগ উন্মুক্ত করেছিল। বেনিয়াদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিল তাদের ইংরেজ প্রভুরা। ১৭৭৩ সালে "পার্লামেন্টারি কমিটি অফ সিক্রেসী" তার প্রতিবেদনে লিখেছিল—কোম্পানি কর্মচারীরা প্রায়ই বেনিয়াদের সঙ্গে জমির খাজনা থেকে আসা লাভ ভাগ করে নিচ্ছে। ১৭৭৫ সালে ফিলিপ ফ্রান্সিস অভিযোগ করেন যে, গ্রামাঞ্চলে ইংরেজ কর্মচারী ও বেনিয়াদের মধ্যে অশুভ আঁতাত গড়ে উঠেছে এবং তার ফলে কোম্পানির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। ১৭৭৬ সালে কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী স্বীকার করে যে, গ্রামবাংলার ভূমিব্যবস্থায় তথা রাজস্ব ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক গোষ্ঠী স্বার্থের উল্লেখযোগ্য অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

ইজারাদারী ব্যবস্থার ব্যর্থতার কথা বুঝতে পেরে হেস্টিংস ১৭৭৭ সালের এপ্রিল মাসে ইজারাদারদের বাতিল করে জমিদারদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রতিটি জেলার রাজস্ব দেবার ক্ষমতা মূল্যায়ন করার জন্য ১৭৭৬ সালে আমিনী কমিশন বসানো হয়। তাছাড়া লন্ডনের পরিচালকমণ্ডলী নির্দেশ পাঠায় যে, ইংরেজ কোম্পানিকে রাজস্ব বিষয়ে জমিদারদের সঙ্গে একটি বার্ষিক চুক্তি করতে হবে। তাই করা হল। রাজস্ব বিষয়ে জমিদারদের সঙ্গে কোম্পানির এক বছরের চুক্তি হত বলে এই ব্যবস্থাকে বলা হত একসালা বন্দোবস্ত।

এই নতুন ব্যবস্থা অনুসারে সিদ্ধান্ত হয় যে জমিদারের সঙ্গে কোম্পানির চুক্তি হবে শেষ কথা। অন্য কেউ যদি জমিদারের থেকে বেশি রাজস্ব দেবার প্রস্তাব দেয়, তবে তা গ্রাহ্য হবে না। কিন্তু রাজস্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে আগের ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিই বহাল রাখা হল। ইজারাদারী ব্যবস্থায় রাজস্ব নির্ধারণের সময় জমির উৎপাদিকা শক্তি বা সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকদের খাজনা দেবার ক্ষমতা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা না করেই নিলাম ডেকে ভূমিরাজস্ব স্থির করা হয়েছিল। নূতন ব্যবস্থাতেও ঐ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। বিগত তিন বছরে সরকারি কোষাগারে যে পরিমাণ রাজস্ব জমা পড়েছিল তার নীট গড় বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ হিসাবে জমিদারদের ওপর ধার্য করা হয়। সেহেতু ইজারাদারী ব্যবস্থার রাজস্ব নির্ধারণের ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি এ ক্ষেত্রেও বহাল রাখা হয়েছিল, সেহেতু মানুষের ওপর অতিরিক্ত খাজনার বোঝা চাপানোর প্রবণতা থেকে গেল। বহু জমিদারই নির্ধারিত রাজস্ব দিতে পারলেন না। ফলে তাদের জমির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। কোম্পানি সরকারকে নির্ধারিত পরিমাণ রাজস্ব জমা দেওয়ার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই জমিদারেরা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ঋণ পরিশোধের জন্য তাঁরা রায়তদের কাছ থেকে বর্ধিত হারে খাজনা আদায় করতে থাকেন। দরিদ্র রায়তদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ভূমিরাজস্ব নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ওয়ারেন হেস্টিংসের দ্বিতীয় পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়।

এই অবস্থায় হেস্টিংস একটি কেন্দ্রীভূত রাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ১৭৮১ সালে প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলি বাতিল করে একটি "রাজস্ব কমিটি" (Committee of Revenue) গঠিত হয়। তা সত্ত্বেও রাজস্ব আদায় বাড়ল না। রাজস্ব ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন কমিটির অন্যতম সদস্য স্যার জন শোর। রাজস্ব ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে জোরালো বক্তব্য শোর জেলা স্তরে একজন করে

ইউরোপীয় কালেক্টর রাখার কথা বলেন। হেস্টিংসের ভূমিরাজস্ব নীতি বাংলার রায়তদের খাজনার ভারে জর্জরিত করেছিল। ফলে গ্রামীণ সমাজে হিংসাত্মক ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। হিংসাত্মক ঘটনার বৃদ্ধি রাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়াকে জটিল করে তুলেছিল। অভিজ্ঞতা থেকে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ উপলব্ধি করে যে কোম্পানির নিজস্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার তাগিদে বাংলার জমিদারদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করা দরকার এবং এর অত্যাবশ্যক শর্ত ছিল জমিদারদের আদিম ও ঐতিহ্যগত অধিকারগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া। এই পরিস্থিতিতে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জেনারেল হয়ে ১৭৮৬ সালে কলকাতায় আসেন লর্ড কর্নওয়ালিস।

৩৮.৫.৩ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রেক্ষাপট

ফরাসি ফিজিওক্র্যাট অর্থনীতিবিদদের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যতম কাউন্সিল সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস বিশ্বাস করতেন যে রাষ্ট্র কেবলমাত্র ভূমির ওপর কর দাবি করতে পারে। ফিলিপ ফ্রান্সিস ১৭৭৬ সালে বাংলার জমিদারদের সঙ্গে ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে একটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গড়ে তোলার স্বপক্ষে তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—জমির প্রকৃত মালিক জমিদারেরা, ফলে সরকারের সরাসরি রায়তদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজন নেই। জমিদারেরা রায়তদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে তার একাংশ সরকারি কোষাগারে জমা দেবেন। পাট্টার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছিল যে, এটা হবে জমিদার ও তাঁর প্রজাদের মধ্যে স্বেচ্ছামূলক একটা চুক্তি। জমিদার ও প্রজারা পারস্পরিক সুবিধার কথা মাথায় রেখে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হবেন। প্রথম থেকেই ফ্রান্সিসের বক্তব্য ছিল—অতিরিক্ত মাত্রায় রাজস্বের বোঝা না চাপিয়ে সরকারের প্রয়োজন অনুযায়ী যুক্তিগ্রাহ্য একটি রাজস্বের হার ধার্য করা উচিত। কিন্তু লর্ড কর্নওয়ালিসের উদ্দেশ্য ছিল যত বেশি সম্ভব ভূমিরাজস্ব খাতে সরকারি আয় বৃদ্ধি করা। পিটের ভারত আইনে (১৭৮৪) জমিদারদের ক্ষোভের কারণগুলি অনুসন্ধান করে সেগুলিকে প্রশমিত করতে ও রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে জমিদারদের সঙ্গে চুক্তি সংক্রান্ত চিরস্থায়ী আইন প্রণয়ন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

১৭৮৬ থেকে ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত নানা ধরনের অনুসন্ধান চালানোর পর এখন ১৭৮৪-এর পিটের ভারত আইনের নির্দেশ মাথায় রেখে কর্নওয়ালিস ১৭৮৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে ভূমিরাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে জমিদারদের সঙ্গে একটি দশসালা বন্দোবস্ত গড়ে তোলেন। বলা হয়—এই পরিকল্পনা দশ বছরের জন্য গৃহীত হবে। পরবর্তীকালে লন্ডনের কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস্-এর অনুমোদন সাপেক্ষে এই বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী রূপ দেওয়া হবে। কিন্তু জন শোর কর্নওয়ালিসের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন—এই বন্দোবস্ত দশ বছর বহাল রাখার ব্যাপারে তাঁর কোন আপত্তি নেই। কিন্তু দশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এই বন্দোবস্ত অপরিবর্তিত থাকবে, এখনই এরকম প্রস্তাব নেওয়া ঠিক নয়। জেমস্ গ্র্যান্ট বাংলায় রাজস্বের হার কম ধার্য করা হয়েছে এই যুক্তিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধিতা করেছিলেন। গ্র্যান্টের এই যুক্তি অবশ্য জন শোর গ্রহণ করেননি। জন শোর তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে স্পষ্টই উপলব্ধি করেছিলেন যে—এই বিষয়ে চট্‌জলদি সিদ্ধান্ত গ্রহণের অর্থ ভূমিব্যবস্থায় কতকগুলি অসুবিধাকে জিইয়ে রাখা। তাঁর বক্তব্য ছিল ধীরে ধীরে ক্রমিক পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করা উচিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হবার প্রাক্-মুহূর্তে শোর মন্তব্য

করেছিলেন—বহু পুরনো জমিদার তাঁদের অক্ষমতা ও অলসতার জন্য ধ্বংস হয়ে যেতে পারেন। শোরের এই বক্তব্যের উত্তরে কর্নওয়ালিস বলেছিলেন—অলস জমিদারদের অদক্ষ তত্ত্বাবাধানের ফলশ্রুতি হিসাবে তাঁদের মালিকানাধীন ভূসম্পত্তি যদি অধিকতর পরিশ্রমী ও উদ্যোগী মানুষের হাতে যায়, তবে তা রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে।

কর্নওয়ালিস জন শোরের প্রস্তাব গ্রহণ না করে নিজস্ব পরিকল্পনা মোতাবেক এগোতে চেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি ভারত সচিব হেনরী ডান্ডাসের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিলেন। ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কাজ করা বা একটি বাস্তবসম্মত বন্দোবস্ত গড়ে তোলা—এর কোনটিই ডান্ডাসের বিবেচনাধীন ছিল না। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানিরস্বার্থ রক্ষা করা ও ভূমিরাজস্ব খাতে কোম্পানি সরকারের আয় বৃদ্ধি করা। ১৭৯২-এর ২৯শে অগাস্ট কর্নওয়ালিসের পরিকল্পনা লন্ডনের কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস্ বা পরিচালকমণ্ডলীর অনুমোদন লাভ করে। ১৭৯৩ সালে এই অনুমোদন পত্র কর্নওয়ালিসের হাতে এসে পৌঁছয়, অর্থাৎ ১৭৮৯ সালের দশসালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরিণত করার নির্দেশ পাঠানো হয়। ১৭৯৩-এর ২২শে মার্চ কর্নওয়ালিস বাংলার জমিদারদের সঙ্গে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" (Permanent Settlement) ঘোষণা করেন।

৩৮.৫.৪ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলার ইতিহাসে তার প্রভাব

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী বাংলাদেশে নীট রাজস্বের পরিমাণ সাব্যস্ত হল ২৬,৮০০,৯৮৯ টাকা। বলা হল—জমির ওপর জমিদারদের বংশানুক্রমিক ও হস্তান্তরযোগ্য অধিকার কোম্পানি স্বীকার করে নেবে। বিনিময়ে বৎসরান্তে জমিদার তাঁর ওপর ধার্য রাজস্ব কোম্পানির কোম্পানি সরকারকে মিটিয়ে দেবে। কোনো জমিদার কোম্পানির পাওনা রাজস্ব সময়মতো মিটিয়ে দিতে ব্যর্থ হলে, তার জমি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং নিলামের মাধ্যমে সেই জমিদারি অন্য জমিদারের কাছে বিক্রি করা হবে। রাজস্বের হার নির্ধারণ নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। বারবার রাজস্বের হার নির্ধারণের সমস্যা এড়ানোর জন্য কর্নওয়ালিস সুপারিশ করেন—১৭৮৯-৯০ সালে জমিদারেরা তাদের প্রজাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ খাজনা আদায় করেছিলেন, তার নয়-দশমাংশ তাঁরা সরকারকে রাজস্ব হিসাবে দেবেন। এই রাজস্বকে চিরস্থায়ী রাজস্ব হিসাবে ধরে নেওয়া হবে। পরবর্তীকালে জমিদারের আয় বৃদ্ধি পেলেও রাজস্বের এই পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকবে এবং সরকার বর্ধিত রাজস্ব দাবী করবে না। এই হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। বাংলার ভূমিব্যবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষিত হবার পরই লন্ডনের কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস্ একটি প্রতিবেদনে বলেছি—উৎপাদনশীল নীতির (Productive Principles) সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল হিসাবে বাংলায় কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের অগ্রগতি ঘটবে এবং সাধারণভাবে সম্পদ ও সম্পত্তির বৃদ্ধি ঘটবে।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী এবং বাংলার গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস কোম্পানির স্বার্থ চরিতার্থ করার তাগিদেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করেন। প্রথমত, ঔপনিবেশিক শাসকেরা এদেশে একদল রাজনৈতিক মিত্র পাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন। তাঁরা সঠিকভাবেই মনে করেছিলেন যে,

জমিদারদের ভূ-সম্পত্তির ওপর পূর্ণ অধিকার স্বীকার করে নেওয়ার এবং অপরিবর্তনীয় ও চিরকালীন ভূমিরাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত করার ফলশ্রুতি হিসাবে জমিদারেরা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার খাতিরে ব্রিটিশরাজকে সমর্থন করবে এবং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম প্রধান সহায়ক স্তম্ভে পরিণত হবে। রাষ্ট্র ও সাধারণ মানুষের মধ্যবর্তী এলাকায় একটি সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রক স্তর হিসাবে জমিদারেরা বিরাজ করবে। দ্বিতীয়ত, ইংরেজ কোম্পানিকে ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত সমস্যা ১৭৬৫ সাল থেকেই বিব্রত রেখেছিল। কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলন করে ভূমিরাজস্ব খাতে একটি স্থিতিশীল ও নির্দিষ্ট আয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন। তৃতীয়ত, কর্নওয়ালিস সহ বহু ইংরেজই মনে করেছিলেন যে, জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করে নিলে কৃষির উন্নতি ও সম্প্রসারণ অবশ্যম্ভাবী। খোদ ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞতা তাদের মধ্যে এ ধরনের চিন্তা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। কারণ অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে ইংল্যান্ডের বহু জমিদার ও বর্ধিষ্ণু চাষীর উদ্যোগে কৃষি উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছিল। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে এই ঘঠনা "কৃষি বিপ্লব" (Agricultural Revolution) নামে বিখ্যাত। ইংল্যান্ডের শিল্প-বিপ্লবের অন্যতম পূর্বশর্ত ছিল এই কৃষি বিপ্লব। ১৭৯৩ সালের মার্চ মাসে কর্নওয়ালিস আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, ভূ-সম্পত্তির ওপর জমিদারদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করে নিলে জমিদারেরা বনাঞ্চল ও পতিত জমিগুলিকে কৃষিজমিতে পরিণত করার উদ্যোগ নেবেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জমি অনাবাদী হয়ে পড়েছিল। কোম্পানির আশা ছিল জমিদারি উদ্যোগ এই অঞ্চলগুলিকে কৃষিযোগ্য করে তুলতে সাহায্য করবে। চতুর্থত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলনের সময় নিয়ম করা হয়েছিল জমিদারকে তার রাজস্ব দেবার নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের আগে কোম্পানির কাছে রাজস্ব জমা দিতে হবে। অপারক হলে তাঁর জমি নিলাম করে হস্তান্তরিত হবে। এই আইন সূর্যাস্ত আইন (Sunset Law) নামে পরিচিত। কোম্পানি কর্তৃপক্ষের তরফে আশা করা হয়েছিল জমিদারি পরিচালনায় ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে দক্ষতার ঘাটতি দেখা দিলে অদক্ষ জমিদারের পরিবর্তে দক্ষ জমিদারের মালিকানা জমিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। পঞ্চমত, অসংখ্য রায়তের পরিবর্তে মুষ্টিমেয় সংখ্যক জমিদারের হাতে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তুলে দিয়ে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ মনে করেছি —রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে এটিই সবচেয়ে সরল ও সস্তা প্রক্রিয়া।

বাংলার জমিদারেরা খুশি মনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলনের পরই দেখা গেল যে দীর্ঘদিন ধরে চলা কৃষিপণ্য মূল্যের স্বল্পতা জমিদারদের বেশ অসুবিধা ফেলেছিল। ১৭৯৪-১৭৯৭ সালের মধ্যে কৃষিপণ্যের দাম বিশেষ বাড়েনি। সর্বাধিক সংখ্যক জমিদারি বিক্রির ঘটনা সম্ভবত এই সময়েই ঘটেছিল। পুরনো জমিদারেরা প্রায়ই কোম্পানির রাজস্ব চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই জমিদারি সূর্যাস্ত আইন অনুযায়ী নিলাম হত ও অন্য জমিদারের হাতে চলে যেত। অষ্টাদশ শতকের শেষাশেষি ও ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে দেখা গেল যে বহু প্রাচীন ও ঐতিহ্যশালী জমিদারিগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোম্পানিকে রাজস্ব জমা দিতে না পেরে হস্তান্তরিত হয়েছিল। এইসব জমিদারিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল রাজশাহী, নদীয়া, দিনাজপুর, বীরভূম, বিষ্ণুপুর ও চন্দ্রদ্বীপের জমিদারি। ঐতিহাসিক সিরাজুল

ইসলাম তাই বলেছেন—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে বৃহৎ জমিদারিগুলির অস্তিত্ব ছিল সম্পূর্ণ সঙ্গতিবিহীন। ছোট জমিদারীগুলি কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

কোম্পানির তরফ থেকে অবশ্য বড় জমিদারিগুলি ধ্বংস হবার কারণ হিসাবে জমিদারদের অমিতব্যয়িতা ও জমিদারীগুলির অদক্ষ পরিচালন ব্যবস্থাকে দায়ী করা হয়েছিল। এই বক্তব্যের সত্যতা আংশিক। নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ মনে করেন—সে সময়ের নিরিখে (১৭৯৩—৯৪) নির্ধারিত রাজস্বের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত বেশি।

প্রাপ্ত ঐতিহাসিক দলিল থেকে এ কথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার বড় ও ঐতিহ্যশালী জমিদারিগুলিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছিল। এই ধ্বংস রোধ করার জন্য এবং জমিদারি নিজের হাতে রাখার জন্য বড় জমিদারেরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলনের কিছুদিনের মধ্যেই এক অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করেন। প্রজাদের কাছ থেকে দ্রুত খাজনা আদায়ের জন্য তাঁরা তাঁদের জমিদারি ভাগ করে দিতেন। এইভাবে বাংলার কৃষিসমাজে এক নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হল। বড় জমিদাররা যাদের মধ্যে জমিদারি ভাগ করে দিয়ে ভূমিরাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দিতেন তাদের বলা হয় মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার (Intermediary landlords)। ১৭৯৯ সালে বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র সঙ্কট এড়ানোর তাগিদে মধ্যত্বাধিকারীদের মধ্যে তাঁর জমিদারি ভাগ করে দিয়েছিলেন। এই ব্যবস্থাকে বলা হত পত্তনি ব্যবস্থা। পত্তনি ব্যবস্থার ফলে বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় জমিদার ও রায়তের মাঝখানে একাধিক মধ্যবর্তী স্তরের সৃষ্টি হল। জমিদার একজন মধ্যস্বত্বভোগীর হাতে তাঁর জমিদারির একাংশ তুলে দিতেন। সেই মধ্যস্বত্বভোগী আবার তাঁর অধীনস্থ বিভিন্ন উপস্বত্বভোগী, যথা—পত্তনিদার, ইজারাদার প্রভৃতির হাতে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তুলে দিতেন। বহু ক্ষেত্রে জমিদারেরা মধ্যস্বত্বাধিকারীদের হাতে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তুলে অর্পণ করে কলকাতায় চলে গিয়ে সেখানে নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতেন। ফলে অনুপস্থিত জমিদারের (Absentee Landlord) সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলশ্রুতি হিসাবে পুরাতন ঐতিহ্যশালী বহু জমিদারিগুলি হস্তান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু জমিদারি হস্তান্তরের ফলে নতুন জমিদার হয়ে বসেছিল কারা? অর্থাৎ জমিদারিগুলি কারা কিনেছিল? জেমস মিল এরকম একটি ধারণা সৃষ্টি করেছিলেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাই জমিদারিগুলি পুরনো জমিদারদের থেকে কিনে নিয়েছিল। এই বক্তব্য সঠিক নয়। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম তথ্য সহকারে দেখিয়েছেন যে—কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাই জমিদারিগুলি পুরনো জমিদারদের থেকে কিনে নিয়েছিল। এই বক্তব্য সঠিক নয়। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম তথ্য সহকারে দেখিয়েছেন যে—কেবল ব্যবসাদার নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমিদারের আমলা, উকিল ও কর্মচারী এবং পেশাদার মানুষ সুদের কারবারি এরা সকলেই সূর্যাস্ত আইনের শিকার জমিদারিগুলি ক্রয় করে নতুন জমিদার হয়ে বসেছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার জমির বারকে এক ব্যাপকতর ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবাধীন এলাকাগুলিতে দু'টি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছিল—বাজারী অর্থনীতির অনুপ্রবেশ এবং কৃষির বাণিজ্যকরণ। রাজস্ব ও খাজনার অতিরিক্ত বোঝা কৃষির বাণিজ্যকরণ ঘটাতে সাহায্য

করেছিল। মাত্রাতিরিক্ত খাজনার ভারে জর্জরিত কৃষকেরা ক্রমেই বেঁচে থাকার তাগিদে গ্রামীণ মহাজনদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। বর্ধিত খাজনার চাহিদা মেটানোর জন্য তারা প্রায়ই ঋণ নিত। মহাজনেরা নিজেদের পছন্দমত শস্য ফলাতে অধমর্ণ কৃষকদের বাধ্য করেছি । বর্ধমান ও নদীয়ার চাষীরা নীল, আখ, তুলা প্রভৃতি বাণিজ্যিক ফসল ফলাতে বাধ্য হয়েছিল এবং তাদের ওপর খাজনার হার আরও বাড়ানো হয়েছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল বাংলার রায়তদের। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সময় কোম্পানি সরকারের সঙ্গে জমিদারদের যেমন চুক্তি হয়েছিল, জমিদারদের সঙ্গে রায়তদের সেরকম কোনো চুক্তি হয়নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল যে পরিকল্পনা ফিলিপ ফ্রান্সিস ১৭৭৬ সালে পেশ করেছিলেন তাতে কিন্তু রায়তদের পাট্টা দেবার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু কর্নওয়ালিসের ব্যবস্থায় রায়তদের পাট্টা দেওয়া হয়নি বা জমিদার ও রায়তদের মধ্যে কোন চুক্তি হয়নি। ফলে জমিদার রায়তদের ওপর খাজনার হার নির্দ্বিধায় বৃদ্ধি করতে পারত। বর্ধিত খাজনার চাপে জর্জরিত রায়তেরা খাজনা দিতে ব্যর্থ হলে তাদের ওপর চলত নিষ্ঠুর জমিদারি উৎপীড়ন। ১৭৯৯ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সংশোধিত আইনের ৭ নম্বর রেগুলেশনে বলা হল—খাজনা দিতে ব্যর্থ রায়তকে জমিদার ইচ্ছেমত জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারবে। এই আইন রায়তকে তার জমিদারের করুণার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করে তুলেছিল. ঐতিহাসিক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ বলেছেন—এই আইন জমিদারদের অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী করেছিল। সিরাজুল ইসলামের মতে এই আইন ছিল ব্রিটিশ ভারতের "প্রথম কালা কানুন"। পত্তনি ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর জমিতে যখন বিভিন্ন স্তরের উপস্বত্বভোগী বসল তখন কৃষকদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৬০ সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে বাংলার কৃষকের ওপর মধ্যবর্তী ভূস্বামীদের শোষণ সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেছিলেন। নির্ধারিত খাজনার বাইরেও নানা বেআইনি কর এবং আবওয়াব কৃষকদের ওপর বসানো হয়েছিল, যার অনিবার্য পরিণতি ছিল উনিশ শতকের বাংলায় একের পর এক জঙ্গি কৃষক বিদ্রোহ।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইংরেজ কোম্পানির স্বার্থে আংশিক সাফল্য এসেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ব্যবস্থা বাংলার রায়তদেরবা সার্বিকভাবে বাংলার কৃষিব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছিল। উনিশ শতকের প্রথম দশকগুলিতে কর্নওয়ালিসের দুটি উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়েছিল। প্রথমত, কোম্পানির সরকার ভূমিরাজস্ব খাতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বার্ষিক আয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, জমিদারদের সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানির রাজনৈতিক মিত্রতা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু "উৎপাদনশীল নীতি" (Productive Principle) কথাটিকে কর্নওয়ালিস ও তার সহযোগীরা ১৭৯৩ সালের আগে ব্যাপক প্রচারের আলোয় নিয়ে এসেছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উৎপাদশীল নীতির পরিপন্থী হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছিল। কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেরই আশা ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলায় কৃষি বিপ্লব নিয়ে আসবে। কিন্তু তা আসেনি। উনিশ শতকে বাংলার জমিদারদের আয় বেড়েছিল মূলত রায়তের ওপর চাপানো বর্ধিত খাজনার জন্য। কৃষির উন্নতির ফলে জমিদারের আয় বৃদ্ধি পায়নি। কৃষি থেকে আসা আয় জমিদারেরা বিলাস-বৈভব বাদান-খয়রাতিতে ব্যয় করত; সেই আয়

কৃষি বা শিল্পের উন্নতির জন্য বিনিয়োগ করা হয়নি। জমিদারদের পক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মঙ্গলজনক হয়েছিল। একদিকে তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল, অন্যদিকে বিভিন্ন ব্যাপারে বাংলার জমিদারেরা ব্রিটিশ রাজশক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। এই অতিরিক্ত নির্ভরশীলতাই ইংরেজ সরকারের প্রতি অনুগত এক ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির দ্বারা বাংলায় জমিদারদের আচ্ছন্ন করেছিল।

৩৮.৬ সারাংশ

১৭৬৫ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলার দেওয়ানি লাভ বাংলাদেশে কোম্পানির অর্থনৈতিক প্রভূত্ব স্থাপন করেছিল। দ্বৈত শাসনব্যবস্থার যুগে বাংলার নবাবের অস্তিত্ব মূল্যহীন হয়ে পড়ে। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর) বাংলার অর্থনীতিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। ১৭৭২ সালে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ সরাসরি বাংলার শাসনভার গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোকে সুবিন্যস্ত করার জন্য রেগুলেটিং অ্যাক্ট (১৭৭৩) এবং পিটের ভারত আইন ১৭৮৪) পাশ হয়। এই আইনগুলির উদ্দেশ্য ছিল ভারতে কোম্পানির শাসনক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপের সুযোগ উন্মুক্ত করা এবং বম্বে ও মাদ্রাজে কোম্পানির কুঠির ওপর বাংলার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে বিচার-সংক্রান্ত সংস্কারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়। শেষ পর্যন্ত 'কর্নওয়ালিস কোড' (১৭৯৩) ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থাকে অনেকটাই পরিণত রূপ দিতে পেরেছিল। একইভাবে রাজস্ব শাসনের ক্ষেত্রেও হেস্টিংস নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। কোম্পানির রাজস্ব নীতির মূল লক্ষ্য ছিল যেভাবে হোক্ রাজস্ব খাতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আয় বাড়ানো। ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে কোম্পানির সংস্কার পরিণতি লাভ করেছিল কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) মধ্যে। পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং সর্বোপরি কোম্পানির স্বার্থ কোম্পানি কর্তৃপক্ষকে জমিদারদের সঙ্গে ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে একটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গড়ে তুলতে বাধ্য করেছিল।

৩৮.৭ অনুশীলনী

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

১। ওয়ারেন হেস্টিংস ও কর্নওয়ালিসের বিচার বিভাগীয় সংস্কার আলোচনা কর।

২। ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূমিরাজস্ব নীতির ব্যর্থতার কারণ আলোচনা কর।

৩। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার গ্রামীণ সমাজের ওপর কী প্রভাব ফেলেছিল?

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

৪। রেগুলেটিং অ্যাক্ট ও পিটের ভারত আইনের উদ্দেশ্য কী ছিল?

৫। বাংলার কৃষির ওপর ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রভাব আলোচনা কর।

৬। বাংলার ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কেন প্রবর্তিত হয়েছিল?

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন :

৭। কোন্ আইনের দ্বারা গভর্নর জেনারেল পদটি সৃষ্টি হয়?

৮। কোন্ আইনের সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সচিব পদটি সৃষ্টি হয়?

৯। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে ভূমিরাজস্ব বিষয়ে কী কমিশন কত সালে বসানো হয়?

১০। সুপ্রীম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি কে ছিলেন?

১১। চিরস্থায়ী প্রবর্তনের সময় কার সঙ্গে কর্নওয়ালিসের মত বিরোধ হয়?

৩৮.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। Percival Spear : *The Oxford History of Modern India.* Delhi, 1965.

২। R. C. Majumdar. H. C. Raychaudhury and K. K. Datta : *An Advanced History of India,* London, 1985.

৩। A. C. Banerjee : *Constitutional History of India.* Calcutta, 1963.

৪। B. H. Baden Powell : *The Land Systems of British India,* Oxford, 1982.

৫। N. K. Sinha : *The Economic History of Bengal (3 Vols.), 1956—63.*

৬। —— (Ed.), *The History of Bengal* (1737—1905), Calcutta, 1967.

৭। Sirajul Islam : *The Permanent Settlement of Bengal :* A Study of its Operations, *Dhaka, 1979.*

৮। Ranajit Guha : *Towards a Rule of Property for Bengal,* Hague, 1967.

৯। S. C. Gupta : *Agrarian Relations and Early British Rule in India,* Bombay, 1963.

১০। Suranjan Chatterjee and Siddhartha Guha Ray : *History of Modern India,* Calcutta, 1997.

১১। সব্যসাচী ভট্টাচার্য : *ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি,* কলকাতা, ১৩৯৬ (বঙ্গাব্দ)।

১২। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় : *বাংলার আর্থিক ইতিহাস : অষ্টাদশ শতাব্দী,* কলকাতা, ১৯৮৫।

১৩। সিদ্ধার্থ গুহরায় ও সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় : *আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস,* কলকাতা, ১৯৯৬।

একক ৩৯ ❐ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন/কোম্পানির রাজনৈতিক ক্ষমতার বিস্তার; উত্তর ভারত, মহীশূর ও মহারাষ্ট্র

গঠন :

৩৯.০ উদ্দেশ্য

৩৯.১ প্রস্তাবনা

৩৯.২ আঠারো শতকের মধ্যভাগে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা

৩৯.২.১ ব্রিটিশ আগ্রাসনের পিছনে মূল অভিঘাত কী ছিল?

৩৯.৩ ব্রিটিশ কোম্পানি ও উত্তর ভারত

৩৯.৩.১ অযোধ্যা ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

৩৯.৩.২ অযোধ্যার ওপর কোম্পানির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের পর্যায় (১৭৬৪-১৮০৫)

৩৯.৩.৩ কোম্পানি ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল : পাঞ্জাব, সিন্ধু ও আফগানিস্তান

৩৯.৪ মহীশূর ও ব্রিটিশ শক্তি

৩৯.৪.১ হায়দার আলি ও ব্রিটিশ

৩৯.৪.২ টিপু সুলতান ও ব্রিটিশ

৩৯.৫ মারাঠা শক্তির উত্থান

৩৯.৫.১ পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধোত্তর মারাঠা শিবির (১৭৬১-১৭৭৩)

৩৯.৫.২ মারাঠা গণরাজ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সলবঈ-এর চুক্তি (১৭৭৩-১৭৯৯)

৩৯.৫.৩ বেসিনের চুক্তি ও পেশবাতন্ত্রের সমাপ্তি (১৮০১-১৮১৮)

৩৯.৬ ঔপনিবেশিকতায় উত্তরণ : প্রতিরোধ ও সহযোগিতা

৩৯.৭ অনুশীলনী

৩৯.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩৯.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে মুঘল সাম্রাজ্যের ভেঙে পড়া কাঠামোয় গড়ে-ওঠা দেশীয় রাজ্যগুলি কীভাবে ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের শিকার হয়।

- ব্রিটিশ আগ্রাসনের মূল প্রেরণাগুলি;
- দেশীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে কোম্পানির শক্তি বিস্তার;
- কোন্ কোন্ শক্তি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ক্ষমতার বিস্তারে সহায়ক হয়েছিল।

৩৯.১ প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্যতে বিধৃত হয়েছে যে এই এককটিতে মধ্য-আঠারো শতকের মুঘল-পরবর্তী যুগের রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। কীভাবে দেশীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে, মূলত অর্থনৈতিক আগ্রাসনের সূত্র ধরে, ক্রমে রাজনৈতিক বৃত্তেও, কোম্পানি সক্রয় হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। মূলত, ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের একটা বির্তনের চিত্র, বিভিন্ন এলাকায় তার রাজনৈতিক গ্রাসনের বিবরণসহ তুলে ধরা হয়েছে এই এককে।

৩৯.২ আঠারো শতকের মধ্যভাগে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা

মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর মুঘল শাসনব্যবস্থার অনুকরণে কয়েকটি স্বাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। এগুলি ছিল বাংলা, অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর ও মারাঠা রাজ্য। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই শক্তিগুলি ভারতের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ব্রিটিশ শক্তির সার্বভৌম ক্ষমতা বিস্তারের রোধের চেষ্টা চালায়। এই রাজ্যগুলির মধ্যে অধিকাংশই মুঘল শক্তি অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেরা স্বাধীন ও শক্তিশালী হতে শুরু করে—যদিও তা সবসময়ই মুঘল সম্রাটের মৌখিক আনুগত্য স্বীকার করেই হত। এই রাজ্যগুলির শাসকরা নিজ নিজ রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা এবং কার্যকরী শাসন ও আর্থিক ব্যবস্থা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে উপরোক্ত কোনো রাজ্যই স্ব-সীমার মধ্যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় করতে সক্ষম হয়নি। এই রাজ্যগুলিতে অন্তর্বাণিজ্য ব্যবস্থার ভাঙন রোধ করার চেষ্টা হয়েছিল, এমন বহির্বাণিজ্য বিস্তারেরও চেষ্টা চলেছিল। কিন্তু কাঠামোগত আধুনিকীকরণের অভাবে তা ব্যর্থ হয়।

৩৯.২.১ ব্রিটিশ আগ্রাসনের পিছনে মূল অভিঘাত কী ছিল?

আঠারো শতকের শেষার্ধে মুঘল-পরবর্তী দেশীয় রাজ্যগুলির জায়গা ক্রমশ নিতে থাকে ব্রিটিশ আধিপত্য ১৭৫০ ও ১৭৬০-এর দশকের দুটি যুদ্ধের মাধ্যমে ব্রিটিশ কর্তৃক বাংলা-বিজয় দিয়ে এই ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের শুরু হয়। দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পাঞ্জাব দখল করা ও অযোধ্যা রাজ্য গ্রাসের মাধ্যমে, ১৮৪০ ও ১৮৫০-এর দশকে, এই আধিপত্যবাদের বৃত্ত পূর্ণ হয়। এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কঠিন ও সুসংহত প্রতিরোধ এসেছিল মহীশূর রাজ্য, মারাঠা যুক্তরাজ্য ও শিখশক্তির মতো দেশীয়, আঞ্চলিক শক্তিগুলির তরফে। কিন্তু এই প্রতিরোধের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী—বিশেষত, দেশীয় বণিক ও পুঁজিপতি শ্রেণী ব্রিটিশ বণিকবাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই সাহায্য কালক্রমে সেই দেশীয় রাজ্যের স্বাধীন বুনিয়াদকে দুর্বল করে দেয়, যে দেশীয় রাজ্যের আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এই দেশীয় পুঁজিপতির দলই

ছিল প্রধান স্তম্ভ। বণিকগোষ্ঠী থেকে রাজনৈতিক প্রভুত্বে এই বিবর্তনের সহযোগী কারণ হিসাবে যে অভিঘাতগুলি কাজ করেছিল তা হল—

(ক) বিশ্বের অন্যান্য অংশে 'পরোক্ষ সাম্রাজ্যবাদী' আগ্রাসনের মাধ্যমে 'প্রভাবিত অঞ্চল' তৈরির চেষ্টা চলছিল অন্যান্য পশ্চিমী ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির তরফে। কিন্তু ভারতে ইংরেজ কোম্পানি 'প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকেই অস্ত্র করে উপনিবেশ স্থাপন করে।

(খ) তার পিছনে ছিল মূলত ভারতে ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইউরোপের এই দুটি দেশের পারস্পরিক হানাহানি ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধের সূত্রপাত করে কর্ণাটকের যুদ্ধ নামে (১৭৪৬—৪৮, ১৭৫১—৫৪ ও ১৭৫৬—৬৩ সালে)। এই দ্বন্দ্বে দেশীয় শক্তিগুলি, তাদের পারস্পরিক অন্তর্কলহের ও সংঘাতের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কেউ ইংরেজ, কেউ ফরাসিদের পক্ষ নেয়। একদিকে দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে, অন্যদিকে সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই কৌশল শেখে যে কীভাবে রাজনৈতিক প্রয়োজনে তার উন্নত সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করা যায়। একই সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলির অঢেল সম্পদ ও অর্থনৈতিক কাঠামোটিকে সুপরিকল্পিতভাবে শোষণ ও ধ্বংস করার কৌশলটিকেও ব্যবহার করতে শুরু করে (অর্থাৎ, দেশীয় বণিকগোষ্ঠীর সঙ্গে আঁতাত রাজনৈতিক চক্রান্ত ও অস্থিরতার সঞ্চার করে সামরিক হস্তক্ষেপের এক সুচতুর বিন্যাস।)

(গ) কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক ক্রিস্টোফার বেইলির মতে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধের ইউরোপে বিপ্লবের হাওয়া ও নেপোলিয়নের যুদ্ধের পরিবেশ ব্রিটেনে এক নতুন জাতীয়তাবাদী ভাবধারা সৃষ্টি করে। বিশ্বব্যাপী অবাধ বাণিজ্যের জোরদার আদর্শের পাশাপাশি উন্নত ব্রিটিশ জাতির সার্বিক শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাটিকে বাইরের জগতে বলপূর্বক ছড়িয়ে দেওয়ার একটা তাগিদ বিশেষত লর্ড ওয়েলেসলির মতো সাম্রাজ্যবাদী শাসকের প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বেইলি এই প্রেরণাকে *'nationalistic imperialism'* বা *'জাতীয়তাবাদী সাম্রাজ্যবাদ'* বলে আখ্যাত করে বলেছেন, ঔপনিবেশিক অর্থনীতিকে জোরদার করতে এই আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ ছিল অন্যতম ইন্ধন।

৩৯.৩ ব্রিটিশ কোম্পানি ও উত্তর ভারত

মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়; পাশাপাশি স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন অযোধ্যা রাজ্যের উত্থান; ১৭৬৯ সালে মহাদজী সিন্ধিয়ার নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির উত্তর-ভারত অভিযান, দিল্লি অধিকার ও মুঘল সম্রাটকে মারাঠা সুরক্ষা-বলয়ে নিয়ে আসা—এ সবই গভর্নর হিসাবে ওয়ারেন হেস্টিংসকে প্রণোদিত করে লর্ড ক্লাইভের আমলের বিদেশনীতিকে পরিবর্তিত করতে।

৩৯.৩.১ অযোধ্যা ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

আঠারো শতকের মধ্যভাগ অব্দি অযোধ্যা ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে কোনও বিরোধ ছিল না। বস্তুতপক্ষে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ অব্দি ভারতে কোম্পানির কার্যকলাপ মূলত উপকূলীয় বাণিজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল (মাদ্রাজ—১৬৪০-এ কোম্পানির দখলে আসে, বোম্বাই—

১৬৬৮-তে ও কলকাতা—১৬৯০-তে স্থাপিত হয়) একটি Joint Stock Company হিসাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রাথমিকভাবে তার অংশীদারদের সন্তোষজনক লভ্যাংশ দিতেই বেশি মনোযোগী ছিল।

অন্যদিকে অযোধ্যা রাজ্যও দিল্লির সম্রাটকে প্রায় ক্রীড়নক বানিয়ে প্রধান ক্ষমতাবান সুবা হিসাবে যথেষ্ট শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ১৭৬৪ সালে প্রথম ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও অযোধ্যা রাজ্য মুখোমুখি সংঘাতে লিপ্ত হয়।

৩৯.৩.২ অযোধ্যার উপর কোম্পানির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের পর্যায় (১৭৬৪-১৮০৫)

১৭৬৪ সালে অযোধ্যার তৎকালীন নবাব সুজাউদ্দৌলা মুঘল সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে বাংলার নবাব মীরকাশিম-এর সহযোগী হিসাবে কোম্পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হন। বক্সারের যুদ্ধে কোম্পানি জয়ী হয়। কিন্তু তৎকালীন পরিস্থিতিতে অযোধ্যার মতো বিশাল রাজ্যকে কোম্পানির প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে নিয়ে আসার জন্য ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন বা প্রয়োজনীয় অর্থ, রসদ, প্রশাসনিক কর্মচারী অথবা সেনাবাহিনী কোনোটাই ছিল না। অতএব, একজন 'অধীনস্থ মিত্রের' মর্যাদা নিয়ে নবাব সুজাউদ্দৌলাকেই পুনরায় অযোধ্যার সিংহাসনে বসানো হয় ও ভবিষ্যতে মারাঠা বা আফগান শত্রুদের আক্রমণে অযোধ্যা রাজ্যকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করা হতে লাগল। অযোধ্যার বিপুল আর্থিক সম্পদকেও প্রয়োজনমতো কোম্পানির কাজে ব্যবহারের সুবিধা পাওয়া গেল। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্তানুযায়ী অযোধ্যার কিয়দংশ কোম্পানি আত্মসাৎ করল ও বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে অযোধ্যার বাকি অংশ নবাবকে প্রত্যর্পণ করা হল। এছাড়াও, কোম্পানির প্রতি আনুগত্যের সূচক হিসাবে, এই চুক্তির দ্বারা নবাব তাঁর রাজ্যের প্রতিরক্ষার ভার এবং অযোধ্যায় বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার কোম্পানিকে দিয়ে দিলেন। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে কোম্পানি অযোধ্যাকে এতটাই নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়েছিল যে, ইউরোপীয় কায়দায় ও সজ্জায় নবাব তাঁর সেনাবাহিনীকে শিক্ষিত করে তুলতে চাইলে, কোম্পানি ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে আর একটি চুক্তি অযোধ্যার ওপর বলবৎ করে। এর বলে অযোধ্যার সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতম আয়তন ও সংখ্যা বেঁধে দেওয়া হয় ও তার এক-তৃতীয়াংশেরও কম সংখ্যাকে ইউরোপীয় কৌশলে শিক্ষিত করা যাবে—এই শর্ত চাপানো হয়। পুনরায়, ১৭৭৩ সালে, বেনারসের চুক্তির দ্বারা অযোধ্যার সেনাবাহিনীর আয়তন কমিয়ে তার এক অংশকে কোম্পানির অধীনস্থ সেনাবাহিনীতে (subsidiary force) পরিণত করা হয়, যার ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব চাপানো হয় অযোধ্যার ওপরে। ক্রমশ, এইভাবে অযোধ্যার অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে কোম্পানি হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে।

ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে কোম্পানির বিদেশনীতিতে অযোধ্যাই ছিল মূলস্তম্ভ। ১৭৭৩ সালের চুক্তির ফলে সুজাউদ্দৌলা রোহিলাখণ্ড নিয়ে কোম্পানির সঙ্গে দর-কষাকষিতে প্রবৃত্ত হন। হিমালয়ে দক্ষিণপ্রান্ত বরাবর এক বিস্তীর্ণ উর্বর এলাকা জুড়ে ছিল রোহিলা আফগানদের গণরাজ্য। এর ভৌগোলিক অবস্থান যে কোম্পানির কাছে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা ওয়ারেন হেস্টিংসের লেখায় বোঝা যায়,—"রানি এলিজাবেথের শাসনের

পূর্বে ইংল্যান্ডের কাছে স্কটল্যান্ডের যে গুরুত্ব ছিল, অবিকল সেই ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব নিয়ে অযোধ্যার নিরাপত্তার প্রশ্নে রোহিলাখণ্ডকে দেখা উচিত।" অতএব অযোধ্যা-সুবার সুরক্ষাবলয়কে দৃঢ় করতে রোহিলাখণ্ডকে গ্রাস করা দরকার, এই উপলব্ধিতে নবাব সুজাউদ্দৌলা ও কোম্পানি সহমত ছিল।

রোহিলা যুদ্ধ : (১৭৭৪)—১৭৭২ সালে রোহিলা উপজাতির প্রধান হাফিজ রহমত খান, নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে কোম্পানির প্রতিনিধি স্যর রবার্ট বার্কারের উপস্থিতিতে, এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এর শর্তানুসারে, রোহিলা ভূখণ্ড থেকে মারাঠা সৈন্যকে অপসারিত করতে পারলে সুজাউদ্দৌলা রোহিলাদের কাছ থেকে ৪০ লক্ষ (চল্লিশ লক্ষ) টাকা পাবেন।

মারাঠা সৈন্য রোহিলাখণ্ড ত্যাগ করেও ১৭৭৩ সালে পুনরায় ফিরে আসে। কিন্তু পেশবা প্রথম মাধবরাও-এর মৃত্যুর পর দাক্ষিণাত্যে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে মারাঠারা সেখানে ফিরে যায়। সুজাউদ্দৌলা এইবার রোহিলাদের কাছে চুক্তির শর্তমতো অর্থ দাবি করলে তারা তা দিতে অস্বীকার করে। অতএব ১৭৭৩ সালে বেনারসে সম্পাদিত কোম্পানি ও অযোধ্যার মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্তানুযায়ী সুজাউদ্দৌলা রোহিলাখণ্ডের বিরুদ্ধে কোম্পনির সৈন্য সাহায্য দাবি করেন। এর বিনিময়ে যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করা ছাড়াও তিনি কোম্পানিকে চল্লিশ লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। ১৭৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কর্নেল চ্যাম্পিয়নের নেতৃত্বে কোম্পানির সৈন্য রোহিলাখণ্ড আক্রমণ করে ও অযোধ্যা সেনাবাহিনীর সহায়তায় রোহিলানেতা হাফিজ রহমত খানকে মিরানকাট্‌রা-র যুদ্ধে নিহত করেন (এপ্রিল, ১৭৭৪)। রোহিলাখণ্ড অযোধ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়।

রোহিলা-যুদ্ধের পিছনে অযোধ্যার নবাবের ব্যক্তিগত লোভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রবণতাকেই দায়ী করা হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথমে এই আগ্রাসনে সহযোগী থাকলেও খানিকটা দূরত্ব রেখে সুজাউদ্দৌলাকে সমর্থন দেন। সাময়িকভাবে সুজাউদ্দৌলাও যুদ্ধে নিবৃত্ত থাকেন ও হেস্টিংসের সম্মতি পান। কিন্তু ১৭৭৪ সালে নবাব পুনরায় হেস্টিংসকে চাপ দিলে অবশেষে কোম্পানির সৈন্য রোহিলাখণ্ড আক্রমণ করে। আলফ্রেড লায়াল কোম্পানির অপরিণত বিদেশনীতিতে রোহিলাযুদ্ধ যে দুর্বল কৌশলেরই পরিণাম, তা লিখে এই বলে সমালোচনা করেছেন যে, দ্বিধাদীর্ণ-নীতি বস্তুতপক্ষে দুর্বল সীমান্তের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর [A shifty line policy is far more unsafe than a weaker frontier.]

এই আগ্রাসন যেভাবে বিনা প্ররোচনায় রোহিলাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল ও নবাব যে সুকৌশলে কোম্পানির সৈন্যকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেছিলেন, তার জন্যই ওয়ারেন হেস্টিংসকে কূটনৈতিক ব্যর্থতার জন্য সমালোচিত হতে হয়। 'Indeed, some company officers complained that their troops bore the brunt of the fighting while the Awadh party gained all the spoils and subsequent advantages'.

অতএব, ১৭৭৪ সালের পরবর্তীতে অযোধ্যার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক শক্ত হাতে পরিচালিত করতে কোম্পানি একজন রেসিডেন্ট নিয়োগ করে। ক্রমশ, কোম্পানি ও নবাবের মধ্যে যাবতীয় যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় এই রেসিডেন্ট ও প্রকৃপক্ষে অযোধ্যা রাজ্যের যাবতীয় আর্থিক ও বৈদেশিক নীতি পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের ভার চলে যায় রেসিডেন্টের হাতে। ভারতের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের ক্ষেত্রেও এই পরোক্ষ

নিয়ন্ত্রণ কায়েমের পরম্পরায় প্রথম দৃষ্টান্ত হয় অযোধ্যা। সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর অযোধ্যা কোনোরকমে মুঘল সুবার পরিচয়টুকু টিকিয়ে রেখে ক্রমশই কোম্পানির দখলে চলে যায়।

নতুন নবাব আসফউদ্দৌলার আমলে, ১৭৭৫ সাল থেকে লক্ষ্ণৌ হয় অযোধ্যা রাজ্যের নুতন রাজধানী। একদিকে উত্তর ভারতে একরটি গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় রাজ্য হিসাবে অযোধ্যা কোম্পানির কাছে জরুরি কেন্দ্র হয়ে ওঠে, অন্যদিকে তার সামরিক বাহিনীকে পুরোপুরি রেসিডেন্টের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কোম্পানির নিয়মিত সৈন্যদের সরিয়ে একটি স্বতন্ত্র 'Oudh Auxiliary Force' বা একটি ভাড়াটে বাহিনী তৈরি করা হয় যার পুরো ব্যয়ভারই অযোধ্যার তহবিল থেকে কাটা যাবে স্থির করা হয়। এর পরোক্ষ ফল হল, নবাবের নিজস্ব সৈন্যবাহিনীকে অব্যবহৃত রেখে ক্রমশ অকেজো করে দেওয়া।

আসফউদ্দৌলা-র মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্যা অযোধ্যাকে আরও দুর্বল করে তোলে। প্রথমদিকে ক্ষমতার অন্যতম দাবীদার ওয়াজির আইলকে (১৭৯৭-৯৮) সমর্থন জানালেও তাঁর স্বাধীনচেতা মনোভাব কোম্পানিকে অসন্তুষ্ট করে।ফলে দীর্ঘ বাইশ বছর কোম্পানির আশ্রয়ে রাজনৈতিকভাবে নির্বাসিত থাকা সাদাত আলি খানকে কোম্পানি সিংহাসনে বসায়।

এই ক্ষমতা লেনদেনের ব্যবসায়ে কোম্পানি আর্থিকভাবে আরও লাভবান হয়। আরও রাজ্যাংশ গ্রাস করা ছাড়াও কোম্পানি তার রেসিডেন্টের মাধ্যমে অযোধ্যার বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপেও দখলদারির হাত বসালো—বিশেষত, যুদ্ধের প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ তৈরির কাঁচামাল সোরা (Saltpetre), বিভিন্ন হস্তশিল্প, যেমন বস্ত্র ও অন্যান্য শৌখিন সামগ্রী; খাদ্য ও বিবিধ পণ্যশস্য—যেমন নীল উৎপাদন—যা ব্রিটেনের বস্ত্রশিল্পের জন্য দরকার ছিল—এ সবই কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে চলে এল। এছাড়াও নগদ অর্থ, যা অযোধ্যার ভূখণ্ডে অবস্থিত কোম্পানির পোষ্য সেনাবাহিনীর ভরণপোষণ বাবদ তারা আদায় করত; কিংবা স্বল্পসুদে কোম্পানির ঋণ গ্রহণ; কিংবা নবাবের তরফে কোম্পানির তহবিলে (বাধ্যতামূলক) সরকারি বা বেসরকারিভাবে দেয় দান (donation)—বিভিন্ন প্রকারে অযোধ্যা কোম্পানির তহবিলে অর্থদানে বাধ্য হয়। [১৭৬৪ থেকে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ অব্দি কোম্পানি কেবল জরিমানা বাবদ ৬০,০০,০০০ টাকা; ঋণ বাবদ ৫২,০০,০০০ টাকা ও ভর্তুকি বাবদ ৮০,০০০,০০০ থেকে শুরু করে ১০০,০০০,০০০ টাকা আদায় করে।

এতদসত্বেও নবাব সাদাত আলি খান অযোধ্যার প্রশাসনে স্বনির্ভরতা ও স্বাধিকার ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হলে নতুন গভর্নর-জেনারেল ওয়েলেসলি (১৭৯৮-১৮০৫) কোম্পানির আগ্রাসী ভূমিকাকে তীব্রতর করেন। তাঁর রেসিডেন্টের মাধ্যমে অযোধ্যার অন্তর্ভুক্ত গোরক্ষপুর ও রোহিলাখণ্ড এবং দেয়াবের কিছু উর্বর এলাকা প্রত্যক্ষভাবে কোম্পানির এলাকাভুক্ত করেন। এছাড়াও তিনি অযোধ্যার অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে সংস্কারের দাবী জানান। সাদাত আলি খান কোম্পানির আর্থিক দাবিদাওয়া পূরণ করলেও রাজ্যের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে কোম্পানির ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেন। অতএব লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০১ সালের এক নতুন চুক্তি দ্বারা অযোধ্যার নবাবের ওপর কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ কায়েম করলেন। নবাবের প্রবল আপত্তি সত্ত্বে অযোধ্যার

সীমার বাইরে যাবতীয় ভূখণ্ড, যার বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৩,০০০,০০০ টাকা, কোম্পানির সেনাবাহিনীর চিরস্থায়ী ভাতা হিসাবে অধিকার করে নেওয়া হল। কোম্পানির দখলিকৃত এলাকা চতুর্দিক দিয়ে অযোধ্যাকে ঘিরে রইল। অযোধ্যাকে 'কুশাসনের' একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরে কোম্পানি তার ভূসম্পদ, বাণিজ্য, শ্রমসম্পদ ও অর্থসম্পদ—সবদিকেই শোষণের জাল বিস্তার করে।

পরবর্তী নবাব গাজীউদ্দিন হায়দারের আমলেও (১৮১৪-২৭) ইস্ট ইন্ডিয়ার কোম্পানির নেতৃত্বে অযোধ্যা গ্রাসের চক্রান্ত বহাল থাকে।

৩৯.৩.৩ কোম্পানি ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল : পাঞ্জাব, সিন্ধু ও আফগানিস্তান

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী নীতি ১৮০৩ সালে চরমে পৌঁছায়, যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিল্লি দখল করে। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে মধ্যভারতের পিণ্ডারী অশ্বারোহী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যখন ব্রিটিশরা অভিযান চালাল তখন স্বাভাবিকভাবেই মারাঠা জনজাতি কোম্পানির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠল। অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ মারাঠা জাতি কোম্পানির বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা চালানো সত্ত্বে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে তাদের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে।

আঠারো-শতকের আর একটি যোদ্ধা জাতি হিসাবে বাকি ছিল পাঞ্জাবের শিখরা। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে রণজিৎ সিংহ যে রাজনৈতিক আধিপত্য গড়ে তুলেছিল তার অন্যতম ভিত্তি ছিল ইউরোপীয় কায়দায় শিক্ষণপ্রাপ্ত একটি সুশৃঙ্খল, সুসজ্জিত, শক্তিশালী সেনাবাহিনী। প্রতিবেশী রাজ্য সিন্ধুর মতোই পাঞ্জাবও উত্তর ভারতের মূল ভরকেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থানের কারণে কোম্পানির আগ্রাসী নজরে পড়েনি। সমৃদ্ধ কৃষি ও বাণিজ্যিক অর্থনীতি পাঞ্জাবে একটি শক্তিশালী সরকার গঠনে সাহায্য করে। সিন্ধুপ্রদেশের অর্থনীতিও সিন্ধুনদ-ভিত্তিক বাণিজ্যের যথেষ্ট লাভ তুলেছিল। ১৮৩০-র দশকের শেষদিকে কোম্পানি তার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের সুরক্ষা বিষয়ে সচেতন হলে এই দুটি দেশের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে।

চার্লস নেপিয়ার ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু অঞ্চল জয় করার পর সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন "আমি পাপ করেছি"। সিন্ধু দখলের ক্ষেত্রেও, বাংলার মহাজন জগৎ শেঠের মতো বণিক হটচাঁদ সেখানে কোম্পানির দখলের রাস্তা সুগম করেন। কোম্পানি অবশ্যই তার প্রতিদান দেয় জাহাজ শিল্প ও সমুদ্র বাণিজ্যের কারবার থেকে হটচাঁদকে হটিয়ে দিয়ে। পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ দখল করার অন্তর্বর্তী সময়ে কোম্পানি আফগানিস্তানে একটি বিপর্যয়কারী অভিযান চালায়, যার ফলে ব্রিটিশদের প্রায় ১৬,০০০ সৈন্য কাবুল দখল করতে গিয়ে প্রাণ হারায়।

রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর (১৮৩৯) পাঞ্জাবের সমাজ ও রাজনৈতিক বৃত্তে দলাদলির সুযোগ নিতে কোম্পানি দেরি করেনি। পূর্ব-পাঞ্জাবের কিছু শিখ সর্দারের সক্রিয় সহযোগিতায়, দুটি ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের পরে, ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাব ব্রিটিশদের দখলে যায়। জম্মুর ডোগরা-শাসকদের প্রতিভূ গুলাব সিং, যিনি লাহোর দরবারের একজন সভাসদও ছিলেন, পাঞ্জাব দখলে কোম্পানিকে সাহায্য করেন। তারই পুরস্কারস্বরূপ ১৮৪৬

সালের অমৃতসরের চুক্তিতে, গুলাব সিং ও তার বংশধররা 'চিরকালের জন্য' কাশ্মীর লাভ করেন। গুলাব সিং প্রতিদানে ব্রিটিশ সরকারের শ্রেষ্ঠত্ব ও আনুগত্য ঘোষণায় দ্বিধা করেননি।

পাঞ্জাব, সিন্ধু ও আফগানিস্তান অভিযান ও অগ্রাসন কোম্পানির প্রচুর আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় তার ক্ষতিপূরণে 'অধিক অর্থবলে সমৃদ্ধ' অধীন কিছু রাজ্যকে কোম্পানি লর্ড ডালহৌসির মস্তিষ্কপ্রসূত 'স্বত্ববিলোপ নীতির' দ্বারা গ্রাস করে, যেমন ১৮৪৮-তে মাতারা, ১৮৫৩-তে ঝাঁসি ও ১৮৫৪-য় নাগপুর। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যাকে চূড়ান্তভাবে গ্রাস করা হয়, এবং এরপর ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব প্রশ্নাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩৯.৪ মহীশূর ও ব্রিটিশ শক্তি

৩৯.৪.১ হায়দার আলি ও ব্রিটিশ

হায়দ্রাবাদের পরেই দাক্ষিণাত্যে যে রাজ্য মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল সেটি ছিল মহীশূর। এটি গড়ে উঠেছিল হায়দার আলির নায়কত্বে। মহীশূর সৈন্যবাহিনীর নীচুস্তরের সৈন্য হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করে তাঁর সাহস, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও উদ্যমের দ্বারা ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে নান্‌জারাজকে পরাজিত করে হায়দার আলি মহীশূর রাজ্যের কর্তৃত্ব লাভ করেন। বিদ্রোহী পলিগার (জমিদার)-দের শায়েস্তা করে তিনি বিদনুর, সুণ্ডা, সেরা, কানাড়া ও মালাবার অঞ্চল জয় করেন। একটি কলহ-দীর্ণ রাজ্য থেকে অল্পকালের মধ্যেই হায়দার মহীশুরকে ভারতবর্ষের একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন।

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই মারাঠাপেশবা, নিজাম ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে তাঁকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। ১৭৬৪-৬৫, ১৭৬৬-৬৭ ও ১৭৬৯-৭২ খ্রিস্টাব্দে পেশবা মাধব রাও-এর নেতৃত্বে মারাঠা-মহীশূর যুদ্ধ হায়দারের পক্ষে বেশ ক্ষতিকর হয়। কিন্তু মাধব রাও-এর মৃত্যুর পর মারাঠা দুর্বলতার সূত্রে তিনি বেলারি, গুটি, চিতলদ্রুগ ও কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী মারাঠা এলাকা দখল করেন।

ইংরাজদের অন্যতম মিত্র আর্কটের নবাব মুহম্মদ আলির প্রতিদ্বন্দ্বী মাহ্‌ফুজ আলিকে হায়দার আশ্রয় দেন। এছাড়া আর্কট ও মহীশূরের মধ্যে এলাকা দখল নিয়েও দ্বন্দ্ব ছিল। মাদ্রাজের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হায়দারের প্রত্যক্ষ সংঘাতের সূত্র জোগায় মালাবার উপকূল মহীশূরের দখলে চলে যায়, যেখানে ব্রিটিশদের ফ্যাক্টরি ছিল। অতএব ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি যখন নিজামের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করলেন, হায়দার স্বভাবতই কোম্পানির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হলেন। নিজাম কোম্পানির সাহায্যকারী সৈন্য নিয়ে এমন সময়ে মহীশূর আক্রমণ করলেন যখন অন্যদিকে পেশবা মাধবরাও-এর সঙ্গে হায়দার যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত। পেশবা ও নিজামকে কূটনীতির দ্বারা নিজপক্ষে এন হায়দার নিজাম-সহ আর্কটের বিরুদ্ধে আক্রমণ এগোলেন। শুরু হল প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৬৭-৬৯)।

কোম্পানির সেনাধ্যক্ষ কর্নেল স্মিথ হায়দার ও নিজামের যৌথবাহিনীকে চান্‌গামা ও ত্রিনোমালির (১৭৬৭) যুদ্ধে পরাস্ত করলে নিজাম মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেন (১৭৬৮)। হায়দার যুদ্ধ চালিয়ে যান

ও একক কৃতিত্বে আকস্মিক আক্রমণে মাদ্রাজের উপকণ্ঠে এসে উপনীত হন (১৭৬৯)। মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষ হতচকিত হয়ে হায়দার আলির সঙ্গে আত্মরক্ষামূলক একটি চুক্তি করেন (১৭৬৯)।

এর পরবর্তীকালে হায়দার তাঁর বিদেশনীতিতে রক্ষণাত্মক নীতি অবলম্বন করেন। ১৭৬৯-৭২ খ্রিস্টাব্দে মারাঠারা যখন পুনরায় তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে তখন তিনি কোম্পানির সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু ধূর্ত ব্রিটিশরা সাড়া দেয়নি। পরর্তীকালে (১৭৭৫-৮৩) প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সূচনাকালে মারাঠারা হায়দারের সাহায্য ভিক্ষা করলে তিনি ইংরেজ শক্তির সমবেত বিরোধিতার প্রয়েনীয়তা সম্যক উপলব্ধি করেন। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ শক্তিকে কর্ণাটক থেকে মুছে ফেলার ইচ্ছা ছিল হায়দারের। ইংরেজ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ফরাসীরা (মাহে থেকে) হায়দারকে তাঁর সৈনবাহিনীকে শিক্ষিত করা ও প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ সরবরাহ করে সাহায্য করেছিল। ইউরোপে ফ্রান্স-ইংলন্ডের যুদ্ধ শুরু হলে ১৭৭৯-তে ইংরেজরা এদেশে মাহে দখল করে। মালাবার উপকূলে তাঁর কর্তৃত্ব থাকায় হায়দার ইংরেজদের মাহে দখলে বাধা দেন।

ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সুবাদে দাক্ষিণাত্যে ব্রিটিশ-বিরোধী এক ত্রিশক্তি-আঁতাত গড়ে ওঠে, যার শরিক ছিল মারাঠা-নিজাম ও মহীশূর। এই শক্তি-সমবায়ের সুযোগে হায়দার পুনরায় তাঁর পুরোনো শত্রু আর্কটের মুহম্মদ আলিকে আক্রমণ করলে (১৭৮০) ইংরেজদের সঙ্গেও সংঘাত বাধে। পরপর যুদ্ধে বিখ্যাত ইংরেজ সেনাধ্যক্ষরা পিছু হটেন (বক্সার-বিজয়ী মান্‌রো, কর্নেল ব্রেথওয়েট প্রমুখ)। এইসময়ে সলবঈ-এর (১৭৮২) সন্ধির মাধ্যমে মারাঠারা যুদ্ধে নিবৃত্ত হয়, কিন্তু হায়দার একাই ব্রিটিশ-বিরোধিতা চালিয়ে যান। হায়দারের সুযোগ্য পুত্র টিপু-ও যুদ্ধে অংশ নেন। ফরাসি নৌবহরের একটি অংশ ১৭৮২-তে মহীশূরের সমর্থনে এগিয়ে আসে। সিংহলের অংশ ত্রিঙ্কামালি ফরাসি দখলে চলে যায়।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ চলাকালীন সময়েই (১৭৮০-৮৪) হায়দার মারা যান (১৭৮২)। টিপু সুলতান মহীশূরের পরবর্তী শাসক হিসাবে ঘোষিত হন। অচিরেই ইউরোপে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে যুদ্ধ সমাপ্ত হলে ভারতেও ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা থামে। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে টিপু ও ইংরেজদের মধ্যে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর সমাপ্তি হয়।

৩৯.৪.২ টিপু সুলতান ও ব্রিটিশ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের কাছে টিপু সুলতান ছিলেন একজন অবৈধ (usüper) ও গোঁড়া ইসলাম-মনোভাবাপন্ন-অত্যাচারী-শাসক, যিনি প্রায় ষোল বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারতের মাটিতে ব্রিটিশ স্বার্থস্থাপনে বাধা দিয়ে গেছেন। তাঁদের মতে টিপু শেষমেষ ফরাসি শক্তির সাহায্য নেওয়ার মতো অবিমৃষ্যতা ও ঔদ্ধত্য দেখানোর জন্য নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনেন।

অপরদিকে মুসলিমদের কাছে টিপু সুলতান ছিলেন একজন শহীদ যিনি বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হন। পরের দিকে এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যুক্ত হয় 'জাতীয়তাবাদী' মাত্রা—যা টিপুকে একজন 'আলোকপ্রাপ্ত' ও 'আধুনিক' শাসক হিসাবে চিত্রিত করেছে। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন ঠেকাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ টিপু কালের সঙ্গে সমতালে চলার জন্য পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছিলেন। নতুন ধরনের পঞ্জিকা, নতুন মুদ্রাব্যবস্থা ও ওজনের মান প্রবর্তনের আগ্রহী ছিলেন টিপু। ফরাসি বিপ্লব সম্বন্ধে

তাঁর যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসা ছিল। শ্রীরঙ্গাপত্তমে তিনি 'স্বাধীনতা-বৃক্ষ' রোপণ করেন। 'জ্যাকেবিন ক্লাবের'ও সদস্য হন তিনি। টিপুর সেনাবাহিনী শেষপর্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে লড়াই করে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছিল। টিপু জায়গীর প্রথা লোপের চেষ্টা করেন যার ফলে রাজকোষের আয় বেড়েছিল। পলিগারদের পুরুষানুক্রমিক ভাবে সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার বিলোপের চেষ্টাও তিনি করেন। তাঁর ভূমিরাজস্বের পরিমাণ বেশ চড়া ছিল—মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ। অষ্টাদশ শতকের যে কোনো ভারতীয় শাসকদের চেয়ে আগে ও পরিপূর্ণভাবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্রিটিশ শক্তি শুধু দাক্ষিণাত্যে নয়, সমগ্র ভারতের পক্ষেই বিপদের কারণ। ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ শক্তির শত্রুরূপে অবিচল দৃঢ়তা সহকারে তিনি তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। ফলে ইংরেজরা তাঁকে ভারতে তাদের ভয়ঙ্করতম শত্রুরূপে গণ্য করত।

টিপু সুলতানের শাসনকালকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে—প্রাক্ ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দ ও উত্তর ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দ। প্রথম পর্যায়ে টিপু সাফল্যের সঙ্গে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটান; ম্যাঙ্গালোরের চুক্তি স্বাক্ষর করেন; কুর্গের বিদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে দুটি অভিযান পাঠান (১৭৮৫)। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের শেষাশেষি ও ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের শুরু দিকে মারাঠা-মহীশূর যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন ও মারাঠাদের সঙ্গে গজেন্দ্রগড়ের সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এছাড়াও টিপু ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের ইস্তানবুলে অটোমার সুলতান প্রথম আব্দুল হামিদের কাছে এবং ১৭৮৭ সালে ফ্রান্সের বুরবোঁ বংশীয় সম্রাট ষোড়শ লুই-এর কাছে দূত প্রেরণ করেন। ১৭৮৮ সালে কুর্গের অধিবাসীরা ফের বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং মহীশূরের বিরুদ্ধে এবারের অভ্যুত্থানে তারা অনেকটাই সফল হয়। যাইহোক, ১৭৯০ সাল অব্দি টিপু তাঁর সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন খুবই মনোযোগী ছিলেন, বিশেষত, বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্মের উন্নয়নে। কিন্তু ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দেরই মাঝামাঝি থেকে মহীশূরের সমৃদ্ধির চাকা ঘুরে যায়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে টিপুর প্রথম সংঘাত হয় দেশীয় ক্ষুদ্র রাজা ত্রিবাংকুরে সঙ্গে। ১৭৬৪ সালে ত্রিবাংকুরের রাজা রামবর্মা তাঁর রাজ্যের উত্তর সীমানা সুরক্ষিত করার সময় অবৈধভাবে মহীশূরের করদ রাজ্য কোচিনের সীমা লঙ্ঘন করেন। এছাড়া মালাবার উপকূল এলাকায় কিছু দ্বীপভূমি ও সংলগ্ন দুর্গ রামবর্মা ডাচদের কাছ থেকে ক্রয় করেন, যার ওপর টিপুর বহুদিনের নজর ছিল। ফলে দুই রাজ্যের মধ্যে সংকট ঘনীভূত হয়। ব্রিটিশদের মিত্রশক্তি হিসাবে ত্রিবাংকুর-রাজ টিপুর বিরোধী কিছু বিদ্রোহী শক্তিকেও আশ্রয় দেন। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি টিপু ত্রিবাংকুর রাজ্য আক্রমণ করলে তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস একেই উপলক্ষ করে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশুর যুদ্ধের সূচনা করেন।

১৭৯০ সালের শেষাশেষি মহীশূর-বিরোধী সমস্ত দক্ষিণী শক্তিগুলির সঙ্গে (মারাঠা, নিজাম, কান্নান্নোর, কুর্গ ও কোচিনের রাজা ও মালাবারের শাসকবর্গ) লর্ড কর্নওয়ালিস মিত্রতাচুক্তি স্বাক্ষর করেন। মহীশূরের হিন্দু রাজবংশের সঙ্গেও কর্নওয়ালিসের গোপন সমঝোতা হয়। কর্ণাটকের বিরুদ্ধে টিপু বহু যুদ্ধে জয়লাভ করলেও মালাবার এলাকায় ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। ১৭৯২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে কর্নওয়ালিস মহীশূর রাজ্যে প্রবেশ করেন, মার্চে ব্যাঙ্গালোরের দুর্গ দখল করে নেন, এবং মে মাস নাগাদ রাজধানী শ্রীরঙ্গাপত্তমের কাছে উপনীত হন। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে সমগ্র দক্ষিণী শক্তিবর্গ একত্রে মহীশূরের বিভিন্ন দুর্গ দখল

করে রাজধানীর ওপর আঘাত হানলে টিপু অবশেষে হার মানেন। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই মার্চ শ্রীরঙ্গাপত্তমের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

শ্রীরঙ্গাপত্তমের সন্ধি (১৭৯২) টিপুর পক্ষে অত্যন্ত অপমানজনক হয়। মহীশূর রাজ্যের অর্ধাংশ তাঁকে ছেড়ে দিতে হয় যার মধ্যে বরামহল ও দিন্দিগুল জেলা দুটি—কান্নানোর ও কালিকট বন্দর যায় কোম্পানির ভাগে। কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ সীমা অব্দি মারাঠা এলাকা বিস্তৃত হয়; নিজাম পান কুমবুম, কুডাপ্পা, গঞ্জিকোটা ও তুঙ্গভদ্রার নিম্ন ভূ-ভাগ থেকে মারাঠা শক্তি ও নিজাম যে ভূমিগত এলাকা লাভ করেন—তাকে পুনরাধিকার বলা যায়, কারণ সেখানে এই দুই শক্তির দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। কিন্তু ব্রিটিশরা যা দখল করল, তা সম্পূর্ণভাবে তাদের নতুন এলাকা—যা স্রেফ বাহুবলে বিজিত।

রাজ্যাংশ হারানো ছাড়াও টিপু বিজয়ী মিত্রশক্তিকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ তিন কোটি তিরিশ লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য হন। এই বাধ্যবাধকতার শর্তগুলি আদায়ে টিপুর ওপর জোর খাটাতে তাঁর দুই নাবালক পুত্রকে পণবন্দি হিসাবে দিতে কর্নওয়ালিস বাধ্য করেন।

এই অপমান টিপুর ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবকে ক্রমে 'জেহাদে' রূপান্তরিত করে। শ্রীরঙ্গাপত্তম চুক্তির দ্রুত রূপায়ণে এবং ভারত থেকে ব্রিটিশ শক্তি নির্মূল করতে যুগপৎ মনোযোগী হয়ে ওঠেন টিপু সুলতান। ভারতে অবস্থিত ফরাসি শক্তি, আফগানিস্তানের শাসক জামান শাহ ও অটোমান সুলতানের কাছে তিনি মিত্রতার বার্তা পাঠান। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি শক্তির কাছে টিপু ভারতে থেকে ব্রিটিশদের উচ্ছেদকল্পে একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পাঠান, যাতে বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সি অঞ্চলে তাদের যৌথ প্রয়াস গড়ে তোলা যায়। অটোমান সুলতানের কাছে প্রেরিত (১৭৯৯ সালে) একটি বার্তাতেও টিপু বিস্তারিতভাবে ভারতের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য, যেমন—বাংলা, অযোধ্যা, আর্কট আগ্রাসনে ব্রিটিশ শক্তির নীতি ও কৌশলের যেভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন, তাতে সমসাময়িক ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিন্যাসের পটভূমিকার ওপর তাঁর গভীর জ্ঞান লক্ষ্য করা যায়।

১৭৯৭ সালের শেষাশেষি ফরাসি শক্তির সঙ্গে টিপুর সম্ভাব্য রাজনৈতিক আঁতাত ব্রিটিশ শিবিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া তোলে। ওই বছরের অক্টোবর মাসে নিজাম কোম্পানির সঙ্গে 'অধীনতামূলক মিত্রতা' চুক্তিতে আবদ্ধ হন ও একটি পুতুল শক্তিতে পরিণত হন। ১৭৯৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ শক্তি মহীশূরের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করে। মে মাসেই এই যুদ্ধ সমাপ্ত হয়। শ্রীরঙ্গাপত্তম রক্ষার্থে টিপু যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন। মহীশূর ব্রিটিশ দখলে আসে।

মহীশূরের রাজনৈতিক পতনের পিছনে কোম্পানির অর্থনৈতিক অভিসন্ধির চেহারাটা স্পষ্ট হওয়া দরকার। বাংলা সহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আগ্রাসনেই (সিন্ধু, পাঞ্জাব, মহীশূর) কোম্পানি দেশীয় পুঁজিপতি ও মহাজন শ্রেণী ও সামাজিক মধ্যবর্গীয় শ্রেণীর সহযোগিতা আদায় করে নিয়ে তবেই রাজনৈতিক আগ্রাসনে হাত বাড়িয়েছিল (৩.২.১ অধ্যায়ে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে)। দক্ষিণ-পূর্বে করমণ্ডল উপকূল এলাকা ও দক্ষিণ-পশ্চিমে মালাবার উপকূলে কোম্পানির একক আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা পূরণে সহযোগী ছিল গুজরাটী মহাজন গোষ্ঠী ও হিন্দু রাজস্ব ব্যবসায়ী শ্রেণী (এ চিত্র নিজামের অন্তর্গত এলাকা কৃষ্ণা-গোদাবরীর মধ্যবর্তী উত্তর সরকারের ক্ষেত্রেও একই ছিল)। আরও দক্ষিণে কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত পুঁজি-লেনদেনের ব্যবসায়ে

হিন্দু রাজস্ব ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি নিজেদের নিয়োজিত করেছিল। আর্কটের নবাবকে এই দেশী ও বিদেশী পুঁজিপতি শ্রেণী ঋণের জালে আবদ্ধ করেছিল। অতএব, কোম্পানি অতি সহজেই আর্কটের মতো একটি দেশীয় রাজ্যকে 'অধীনতামূলক মিত্রতা' চুক্তির জালে আবদ্ধ করে, যার শর্তানুসারে বাৎসরিক দেয় একটি নির্দিষ্ট করের বিনিময়ে নবাব ইংরেজদের কাছ থেকে সুরক্ষা 'ক্রয়' করতে বাধ্য হন।

মারাঠা ও মহীশূরের মতো শক্তিশালী দেশীয় রাজ্যগুলি অপরপক্ষে একদিকে 'উত্তর সরকার' কিংবা 'আর্কট' ত্রাসে উদ্যোগী হলে কোম্পানি কোনরকম 'অধীনতামূলক' চুক্তির আড়ালে না থেকে আঠারো শতকের শেষাশেষি, দাক্ষিণত্যের 'মিত্র' শক্তিগুলিকে প্রত্যক্ষ শাসনের আওতায় নিয়ে আসে।

১৭৬০ -এর দশকে মহীশূর, মালাবার কিংবা করমণ্ডল উপকূলে কোম্পানির অনুপ্রবেশকে চ্যালেঞ্জ জানায়। মালাবার এলাকায় হিন্দু বণিকদের সঙ্গোস্বার্থঘটিত আঁতাত স্থাপন ও ঐ এলাকার বাণিজ্যিক পুঁজির কারবার থেকে মহীশূর রাজ্যকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই কোম্পানি আগ্রাসী ভূমিকা নেয়। টিপু সুলতানের আমলে উদ্বৃত্ত রাজস্বের বেশিরভাগটাই আসত পলিগার-শ্রেণীর ভূ-স্বামী ও মধ্যস্বত্বভোগী জমিদারদের উপর চাপানো কর থেকে—গরিব রায়তদের শোষণ করে নয়। বাণিজ্যিক পুঁজির ওপর থেকে রাজস্ব আদায়ে যেমন টিপু মনোযোগী ছিলেন, তেমনি বহির্বাণিজ্যে প্রসার ঘটানোর জন্য আরব ও ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কও স্থাপন করেন। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে জনৈক ইংরেজ যুদ্ধবন্দীর স্মৃতিকথায় মহীশূরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির চেহারা ধরা পড়েছে এইভাবে—"...extensive paddy fields and country which was very rich, highly cultivated, full of cocoanut trees, groves, fields abounding with grain, and well-built and populous villages"। এই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির আরও ছবি পাওয়া যায় বুকাননের *JOURNEY FROM MADRAS*-এ।

অতএব, ১৭৯০-এর দশকের সমৃদ্ধ মহীশূর রাজ্য, যা টিপু সুলতান তাঁর পিতা হায়দার আলির কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসাবে লাভ করেছিলেন, এবং গোটা উপদ্বীপিয় ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা জুড়ে যা অবস্থান করছিল, সামরিক ক্ষমতায়ও যে রাজ্য সমসাময়িক সকল দেশীয় শক্তির মোকাবিলা করতে পারত—ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্রম-আগ্রাসী অর্থনৈতিক স্বার্থে তা বাধাস্বরূপ ছিল—এ কথা বলাই বাহুল্য।

৩৯.৫ মারাঠা শক্তির উত্থান

ধ্বংসোন্মুখ মুঘল শক্তির দুর্বলতার সুযোগে ভারতের স্বাধীন দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে মারাঠা শক্তিই হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। মুঘল সাম্রাজ্যের হীনাবস্থায় ভারতের রাজনৈতিক শূন্যস্থান পূর্ণ করার মতো শক্তি একমাত্র মারাঠারাই অর্জন করতে পেরেছিল। এই নেতৃত্ব গ্রহণের উপযুক্ত সামরিক ও রাজনৈতিক নেতারও অভাব এদের মধ্যে ছিল না। কিন্তু মারাঠা সর্দারদের মধ্যে একতার অভাবই সর্বভারতীয় মারাঠা সার্বভৌমত্ব গড়ে তোলার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে পাণিপথের পরাজয় মারাঠাদের জন্য আরও শোচনীয় পরিণাম বহন করে এনেছিল—যা রাজনৈতিকভাবে তাদের মর্যাদা খর্ব করে দিয়েছিল। মারাঠাদের এই পরাজয়ে

সবচেয়ে লাভবান হয়েছিল ইংরেজরা, কারণ মারাঠাদের দুর্দশার সুযোগে তারা বাংলা ও দক্ষিণ ভারতে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির সুবিধা পেয়ে গিয়েছিল। বস্তুত পাণিপথের এই তৃতীয় যুদ্ধের মীমাংসাটি হয়েছিল নঞর্থক—অর্থাৎ ভারত-শাসনের অধিকার কার থাকবে না, এই প্রশ্নের।

৩৯.৫.১ পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধোত্তর মারাঠা শিবির (১৭৬১-৭৩)

১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে সপ্তদশবর্ষীয় পেশবা মাধবরাও—যিনি রণদক্ষ ও রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন—ক্ষমতায় আসেন। তিনি নিজামকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন ও মহীশূরের হায়দার আলিকে রাজস্ব প্রদানে বাধ্য করেন। রোহিলা-আফগান, রাজপুত রাজাদের ও জাঠ-সর্দারদের দমন করে তিনি উত্তর-ভারতে আর একবার মারাঠা জাতির প্রভুত্ব স্থাপন করেন। ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে মারাঠা শক্তির সহায়তায় সম্রাট শাহ্ আলম দিল্লীর সিংহাসনে আসীন হন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি মারাঠা-আশ্রিত একজন বৃত্তিভোগী সম্রাট হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ক্ষয়রোগে মাধব রাও-এর মৃত্যু মারাঠা জাতির ওপর একটা প্রচণ্ড আঘাতের আকারে নেমে এসেছি । অতঃপর মারাঠা সাম্রাজ্যে বেশ একটা বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়। পেশবাতন্ত্রের সদর এলাকা পুণেতে ক্ষমতা দখল নিয়ে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সংঘর্ষ নিয়ে এই অশান্তির সৃষ্টি—একজন দাবিদার বালাজী বাজিরাও-এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাঘোবা বা রঘুনাথ রাও, ও অন্যজন ছিলেন মাধব রাও-এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ রাও। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে নারায়ণ রাও একটি চক্রান্তে নিহত হলে একদিকে রঘুনাথ রাও ও অপরদিকে প্রধানমন্ত্রী নানা ফড়নবীশ-এর দল গৃহবিবাদে জড়ায়। সদ্যোজাত সওয়াই মাধব-রাও, যিনি পিতা নারায়ণ রাও-এর মৃত্যুর সময়ে মাতৃগর্ভে ছিলেন, তাঁকে ভবিষ্যৎ পেশবা হিসাবে ঘোষণা করে নানা ফড়নবীশ ও 'বারাভাই' নামে মারাঠা সর্দারদের একটি সমিতি রঘুনাথ রাও-এর তীব্র বিরোধিতা করেন। পেশবা-র গদি না পেয়ে হতাশ রঘুনাথ রাও ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ক্ষমতাসীন হওয়ার চেষ্টা চালান।

পেশবা-র ক্ষমতাও এই সময়ে বেশ সংকুচিত হয়ে এসেছিল। নানা ফড়নবীশ-এর নেতৃত্বে সওয়াই মাধব রাও-এর সমর্থকদের সঙ্গে রঘুনাথ রাও-এর পক্ষাবলম্বীদের বিরোধ ও ষড়যন্ত্রে রাজধানী পুণের পরিবেশ অত্যন্ত বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে উত্তর ভারতে বড় বড় মারাঠা সর্দাররা নিজেদের জন্য অর্ধ-স্বাধীন বা প্রায়-স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এঁদের মধ্যে মহাদ্‌জী সিন্ধিয়ার মতো প্রবল প্রতাপশালী মারাঠা সেনাপতি, কিংবা নাগপুরের ভোঁসলে, ইন্দোরের হোলকার ও বরোদার গায়কোয়াড় বংশ উল্লেখ্য। সিন্ধিয়া ও নানা—এই দুই প্রতিভাদর ক্ষমতার কেন্দ্র পরস্পরকে সমীহ করে চললেও একমতে কখনোই উপনীত হতে পারেননি। পেশবাতন্ত্রের প্রতি এঁদের আনুগত্য কমলেও পুণের ক্ষমতাচক্রে হস্তক্ষেপ করতে এঁরা প্রতেকেই উৎসাহী ছিলেন।

অন্যদিকে ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং এ্যাক্টের মাধ্যমে ভারতে অবস্থিত সমস্ত ব্রিটিশ প্রেসিডেন্সিগুলিকে—অর্থাৎ মাদ্রাজ ও বোম্বাইকে কলকাতার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। ওয়ারেন হেস্টিংসকে গভর্নর জেনারেল পদে উন্নত করে তাঁর সাহায্যকারী হিসাবে চার সদস্যের একটি কাউন্সিল গড়ে দেওয়া হয়। এই সময় ১৭৫৬

সালে ইউরোপের সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শেষ হলেও পরবর্তী এক দশকেরও কিছু বেশি সময় ধরে ব্রিটেনের নৌ-ক্রিয়া ও আগ্রাসী কার্যকলাপে কিছুটা ভাঁটা পড়ে। সেসময়—অর্থাৎ ফরাসি-বিপ্লব পুর্ববর্তীকালে, সামুদ্রিক আধিপত্যের লড়াইয়েও ফ্রান্স ইংরেজদের কিছুটা হঠিয়ে দেয়।

এই পরিস্থিতিতে ১৭৭২ সালে পেশবা মাধবরাও-এর মৃত্যু একদিকে মারাঠা যুক্তরাজ্যের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এবং অন্যদিকে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ভারসাম্য—উভয়কেই প্রভাবিত করে।

৩৯.৫.২ মারাঠা গণরাজ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সলবঈ-এর চুক্তি (১৭৭৩-১৭৯৯)

এই পর্বে উত্তর ভারতে মহাদ্‌জী সিন্ধিয়ার নেতৃত্বে মারাঠারা প্রায় একচ্ছত্র ক্ষমতার অধীশ্বর হয়। সিন্ধিয়ার হাতে ছিল সেই সময়ের সর্বোৎকৃষ্ট সামরিক বাহিনী। পুরানো গেরিলা রণনীতি ত্যাগ করে বিখ্যাত ফরাসি সেনাপতি De Boinge-এর তত্ত্বাবধানে তা ক্রমশই ইউরোপীয় মডেলে শিক্ষিত হচ্ছিল। ১৭৮৪ সালে সম্রাট শাহ্ আলমকে তিনি তাঁর সুরক্ষা কবচে বন্দী করে ফেলেন এবং পেশবা পদটি সম্রাটের সহকারী মর্যাদাভুক্ত হবে (নায়েব-ই-মুনাইব)—এই স্বীকৃতি সম্রাটের কাছ থেকে আদায় করেন। এর সঙ্গে শর্ত ছিল এই যে স্বয়ং মহাদ্‌জী সিন্ধিয়াই পেশবার প্রতিনিধিরূপে কাজ করে যাবেন। সেই সময়ের দক্ষ কূটনীতিজ্ঞ নানা ফড়নবিশের সঙ্গে এইভাবে রণনীতিজ্ঞ সিন্ধিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন, যার নেতিবাচক প্রভাব সলবঈ-এর চুক্তিতে পড়ে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ১৭৭৪ সালে পেশবা নারায়ণ রাও-এর হত্যার পর দীর্ঘদিনের আকাঙ্খার শেষে রঘুনাথ রাও প্রভূত অমর্যাদার সঙ্গে পেশবাপদ দখল করেন। তাঁর বিরুদ্ধে পুণায় নারায়ণ রাও -এর শিশুপত্রের পক্ষ নিয়ে গড়ে ওঠে পাল্টা কেন্দ্র—যার নেতৃত্বে ছিলেন বালাজী জনার্দন বা নানা ফড়নবীশ, সখারাম বাপু, মহাদ্‌জী সিন্ধিয়াকে নিয়ে তৈরি 'বারাভাই'-নামে একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী। ১৭৯৪ সাল অব্দি এই গোষ্ঠী নানা-র নেতৃত্বে মারাঠা রাজনীতিকে পরিচালনা করে। হতাশ রঘুনাথ রাও ১৭৭৫ সালে বোম্বাই-এর কোম্পানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ফলে ১৭৭৭ সাল নাগাদ মারাঠারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এই যুদ্ধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রতিবেশি মহীশূরের সঙ্গে মারাঠারা সন্ধি স্থাপন করে এবং হায়দ্রাবাদ, মহীশূরের হায়দার আলি ও মধ্যভারতে নাগপুরের ভোঁসলে গোষ্ঠীর সঙ্গে একত্রিত হয়ে একটি ব্রিটিশ-বিরোধী চুক্তিতে উপনীত হয়। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত এই চতুঃশক্তি-সমবায় স্থির করে যে একসঙ্গে তারা বাংলা, উত্তর সরকার পরগণা (নিজামের এলাকা) ও কর্ণাটক বিভিন্নমুখী আক্রমণ চালিয়ে কোম্পানির সৈন্যকে ব্যতিব্যাস্ত করবে।

কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংসের সুচতুর কূটনীতির খেলায় নিজামকে গুন্টুর ফেরত দিয়ে কোম্পানি এই শিবির ভেঙে দেয়। মাধোজী ভোঁসলেকে-ও প্রচুর অর্থ দিয়ে ক্রয় করা হয়। ১৭৮০-তে কল্যাণ ও বেসিন দখল করে কোম্পানি নানা-র ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি মারাঠা শক্তিকে সন্ধি করতে বাধ্য করে।

সলবঈ-এর চুক্তি : প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটায়, কিন্তু হেস্টিংসের কূটনীতির কাছে পরাজিত হয়ে মারাঠারা অচিরেই মহীশূরের বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য হয়। কর্ণাটকে মহীশূর-অধিকৃত সমস্ত এলাকা হায়দার

আলিকে প্রত্যর্পণে বাধ্য করানোই ছিল মারাঠাদের দায়িত্ব। এ কাজে ভবিষ্যতে পেশবা কোম্পানির সঙ্গে সামরিক আঁতাতেও রাজি বলে মহাদ্‌জী জানান। এছাড়াও সন্ধির শর্তানুযায়ী, সলসেট কোম্পানিকে দিয়ে দেওয়া হয়, কোম্পানিকে বাণিজ্যগত সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, পেশবাকে অন্য কোনো ইউরোপীয় শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে নিষেধ করা হয় ইত্যাদি।

অতএব যুদ্ধের প্রাক্কালে শান্তির জন্য উদ্‌গ্রীব ব্রিটিশ পক্ষ, যারা মহাদ্‌জীর প্রবল সামরিক পরাক্রমে উদ্বিগ্ন হয়ে কর্তৃপক্ষকে জানায়—"We are altogether unequal to the difficult and dangerous contention in which we are now engaged."—(কোম্পানির সেনাপতি স্যর আয়ারকূটের চিঠি থেকে উদ্ধৃত) এই পরিস্থিতি থেকে কোম্পানিকে বাঁচায় মহাদ্‌জী সিন্ধিয়া ও নানা ফড়নবীশ-এর পারস্পরিক মতানৈক্য। ব্রিটিশদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাত এড়াতে সিন্ধিয়া চাইছিলেন উত্তর ভারতে মারাঠা শক্তির বিস্তার ঘটাতে; অন্যদিকে নানা-র নীতি ছিল মহীশূরের পতন ঘটিয়ে দক্ষিণমুখী বিস্তার ঘটাতে। সলবঈ-এর চুক্তি রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে মহাদ্‌জী সিন্ধিয়া মারাঠা রাজনীতিতেও প্রধান পুরুষ হতে চান। ঐতিহাসিক স্টুয়ার্টগর্ডনের ভাষায়—"the tail was wagging the dog". সলবঈ-এর চুক্তিতে মহাদ্‌জীর ভূমিকা নিয়ে নানা-ও ক্ষুব্ধ হন। নানা-র দক্ষিণমুখী নীতি বাস্তবে অবশ্য কার্যকরী হয়নি, কারণ মহীশূরের নতুন শাসক টিপু সুলতান এই চুক্তিকে কোনো গুরুত্ব না দিয়ে কোম্পানির সঙ্গে একদিকে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি স্বাক্ষর করেন, ১৭৮৪ সালে নিজামকে যুদ্ধে হারিয়ে বহু এলাকা দখল করেন এবং ১৭৮৬—৮৭ সালে মারাঠারা টিপুকে হারালেও আর্থিক বা আঞ্চলিক, কোন দিক দিয়েই লাভবান হয়নি।

১৭৮৮-৮৯ সাল থেকে লর্ড কর্নওয়ালিসের নেতৃত্বে দক্ষিণ ভারতীয় রাজনীতিতে ইংরেজরা পুনরায় চালকের আসনে বসে। ১৭৯০ সালে ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে মারাঠা শক্তি ও নিজাম—উভয়েই ইংরেজদের সহায়তা করে। ১৭৯২-এর শ্রীরঙ্গাপত্তমের সন্ধি দ্বারা মারাঠা বা নিজাম যা অঞ্চল লাভ করে, তার থেকে অনেক বেশি লাভবান হয় কোম্পানি।

১৭৯২-পরবর্তী পর্যায়ে দ্বিধান্বিত মারাঠা শিবির পুনরায় টিপুর দিকে ঝোঁকেন। এইসময় লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৯৮-১৮০৫) নতুন গভর্নর জেনারেল হিসাবে ভারতে আসেন ও কোম্পানির ইতিহাসে আগ্রাসনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়।

১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী অর্ধদশক মহাদ্‌জী সিন্ধিয়া উত্তর ভারতের মালব, দিল্লির পার্শ্ববর্তী এলাকা, আহির, কিচি, বুন্দেল প্রভৃতি উপজাতি গোষ্ঠী ও রাজপুতদের পরাজিত করেন ও তাঁর সামরিক খাতে ব্যয় উপর্যুপরি বেড়েই যায়। অন্যদিকে দুর্বল নিজামের বিরুদ্ধে বিদার, আদোনি ও বেরার প্রদেশের ওপর চৌথ আদায়ের দাবি নিয়ে মারাঠা সৈন্য যুদ্ধে নামে। ১৭৯৫ সালের শেষে সওয়াই মাধব রাও-এর মৃত্যু হলে পুনরায় গৃহবিবাদ তুঙ্গে ওঠে। ইতিমধ্যে মহাদ্‌জী সিন্ধিয়ার মৃত্যু হলে দৌলত রাও সিন্ধিয়া নতুন পেশবা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নানা-র বিরোধী শিবির গড়ে তোলেন। বহু চক্রান্তের পরে রঘুনাথ রাও-এর পুত্র দ্বিতীয় বাজিরাও-কে নানা পেশবা করতে সক্ষম হন। কিন্তু ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে নানা ফড়নবিশের মৃত্যু মারাঠা শক্তির পতনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

৩৯.৫.৩ বেসিনের চুক্তি ও পেশবাতন্ত্রের সমাপ্তি (১৮০১-১৮১৮)

লর্ড ওয়েলেসলির 'অধীনতামূলক মিত্রতা' চুক্তি দক্ষিণের অবশিষ্ট স্বাধীন দেশীয় রাজ্যগুলিও ফরাসি শক্তির মধ্যে সম্ভাব্য মিত্রতা রুখতে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে আগ্রাসন চালায়। মারাঠা আক্রমণ থেকে বাঁচতে হায়দ্রাবাদের নিজাম প্রথম অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তির মাধ্যমে কোম্পানির সার্বিক বশ্যতা স্বীকার করেন। মারাঠা ও মহীশূর—এই উভয় শক্তিই কোম্পানির প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সন্দিহান ছিল। টিপু মারাঠা প্রতিনিধি হরিপন্থ ফাড়কে-কে লেখা চিঠিতে স্পষ্ট লেখেন যে মহীশূর রাজ্য নয়, মারাঠাদের প্রকৃত শত্রু হল কোম্পানি। অতএব, ১৭৯৯ সালে টিপুর রাজ্য আক্রমণে কোম্পানি কোনো ভণিতা করেনি।

কিন্তু ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে নানা ফড়নবিশ-এর মৃত্যু নির্জীব মারাঠা শক্তিকে ব্রিটিশদের সামনে নতজানু করে। দ্বিতীয় বাজিরাও-এর মতো অযোগ্য পেশবা, উত্তর মালব ও বুরহানপুরে হোলকার ও সিন্ধিয়ার মধ্যে যুদ্ধ মারাঠা জাতিকে শক্তিহীন করে তোলে। ১৮০২ সালের অক্টোবর মাসে পুণাতে হোলকারের সৈন্যবাহিনী সিন্ধিয়া ও পেশবার যুগ্ম বাহিনীকে পরাস্ত করে ও পুণে হোলকার সেনার দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বাজিরাও ব্রিটিশদের আশ্রয়ে পালিয়ে যান ও ১৮০৩ সালে ব্রিটিশদের সঙ্গে অধীনমূলক মিত্রতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। সুরাট ব্রিটিশদের হস্তগত হয় ও পুণায় কোম্পানির প্রতিনিধিকে পেশবার কাজে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের অধিকার দেওয়া হয়।

একদিকে লর্ড ওয়েলেসলি ও লর্ড লেকের অধীনে বিশাল ও সুশিক্ষিত কোম্পানির সৈন্যবাহিনী পুণের সদর দফতর দখল করে ও গোটা ১৮০৩-০৪ সাল ধরে উত্তর মহারাষ্ট্রে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের বাহিনীকে বিভিন্ন যুদ্ধে পরাস্ত করে। বুরহানপুর, আসির প্রভৃতি এলাকা কোম্পানির দখলে চলে যায়। কোম্পানির সেনাদলের অপর একটি শাখা দিল্লি, আগ্রা ও চম্বলের উত্তরে সিন্ধিয়ার যাবতীয় ভূখণ্ড দখল করে নেয়; এমনকি মুঘল সম্রাটের ওপর প্রতীকী কর্তৃত্বের অধিকারও। পুণে দখলের পর মালবের উত্তরে বিভিন্ন রাজপুত গোষ্ঠী, জাঠ, রোহিলা ও বুন্দেলা—সব গোষ্ঠীই কোম্পানির অধীনতা স্বীকার করে নেয়।

এই পর্যায়ে ব্রিটিশ শক্তির চূড়ান্ত আগ্রাসী নীতির ফলে কোম্পানি আর্থিকভাবে প্রায় দেউলিয়া হয়ে পড়লে, কোম্পানির পরিচালকবৃন্দ—যাঁরা ভূখণ্ড আগ্রাসনের চেয়ে আর্থিক লাভের হিসাবে অধিকতর আগ্রহী ছিলেন, —লর্ড কর্নওয়ালিসকে পুনরায় ভারতে পাঠান। দ্বিতীয়ত, মারাঠা-যুদ্ধের (১৮০৩-০৫) সন্তোষজনক মীমাংসার্থে কর্নওয়ালিসের নতুন ব্যবস্থায় হোলকার ও সিন্ধিয়া—উভয়েই তাঁদের হাত এলাকার অল্প অংশ ফেরৎ পেলেন (মালব সমভূমি অঞ্চল); উপরন্তু রাজপুতানার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলি কোম্পানি বাতিল করল। তৃতীয়ত, পেশবার কর্তৃত্বের ন্যূনতম চিহ্নটুকুও মুছে দিয়ে বিভিন্ন মারাঠা গোষ্ঠীগুলিকে কোম্পানির কাছে তাদের দাবিদাওয়া সরাসরি পেশ করতে বলা হল। কেবল পদমর্যাদাটুকু বজায় রেখে পেশবার যাবতীয় ক্ষমতা—এমনকি খাজনা আদায় করাও কোম্পানি হরণ করে নিল।

ক্ষমতাহীন পেশবাতন্ত্রের এই মর্যাদাহীন কাঠামো আরও দশবছর টিকে ছিল। ১৮১৭-র জুন মাসে পেশবা ও কোম্পানির ম্ধ্য একটি নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার ঘোষণাপত্রে পেশবাতন্ত্রকে পুরোপুরি 'অকার্যকরী'

বলে চিহ্নিত করা হয়। অন্যান্য মারাঠা রাজ্যগুলি অবশেষ স্ব-স্ব বলে কোম্পানির সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে দেশীয় রাজ্য হিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখল।

মারাঠা শক্তির পতন ও পর্যালোচনা : ঐতিহাসিক স্টুয়ার্ট গর্ডন, তাঁর 'The Marathas : 1600-1800' গ্রন্থে মারাঠা শক্তির অন্তর্নিহিত দুর্বলতা নিয়ে আলোচনায় বলেছেন—(১) মারাঠা জাতিসংঘের মূল শক্তি কেন্দ্রমুখী না হয়ে ক্রমেই বিকেন্দ্রীভূত হয় (Shift in power from the centre to the peripheral Maratha States)। ১৭৩০ সালের পর থেকেই দেখা যাচ্ছিল যে, সিন্ধিয়া, হোলকার, ভোঁসলে ও গায়কোয়াড় গোষ্ঠী নিজস্ব শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলছিল, এমনকি নিজস্ব কর সংগ্রহ ও বিচারব্যবস্থা পর্যন্ত। (২) পুণার কেন্দ্রীয় শক্তি ক্রমশই উপরিল্লিখিত দুটি বা তিনটি গোষ্ঠীর সাহায্যের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছিল। ক্ষমতা ক্রমেই তার হাতেই কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল যে যত নিপুণ দক্ষতার রাজস্ব-সংগ্রাহক আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে। ফলে পুণেতেও দেখা গেল ক্ষমতার বিভাজন। ক্রমে শিবাজীর বংশধরদের হাত থেকে পেশবা; পেশবা-র বংশধরদের হাত থেকে অধীনস্থ কর্মচারী নানা ফড়নবীশ-র হাতে ক্ষমতা চলে যায়। (৩) এছাড়াও একা রঘুনাথ রাও-কে তুরূপের তাস করে ব্রিটিশরা মারাঠা যুক্তরাজ্যে কার্যকরী ফাটল ধরাতে পেরেছিল—যে অস্ত্র 'বাংলা' বা 'অযোধ্যাতেও' তারা খাটিয়েছিল, অর্থাৎ ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীকে চক্রান্তে প্রলোভিত করা।

পুনরায় মহাদ্‌জী সিন্ধিয়া ও নানা ফড়নবীশ-এর অহংবোধ ও পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস, ক্ষমতার অলিন্দে 'শিবিরীকরণ' ঘটায়। মুঘল সাম্রাজ্যে ভারতীয় জনগণের মধ্যে যে রাজানুগত্য দেখা যেত তার চেয়ে বেশি কিছু মারাঠা সাম্রাজ্যের ভারতীয় প্রজাদের মধ্যে দেখা যায়নি। মুঘলদের মারাঠারাও করভার বৃদ্ধি করে প্রজাদের শোষণ করত। অতএব সাধারণ প্রজা ও শাসকদের মধ্যে কোনো জনসংযোগ বা আনুগত্য কখনই দেখা যায়নি। "The Maratha State, like the Holy Roman Empire, was a curious and baffling political puzzle. Its whole texture was neither solid, nor rational".

৩৯.৬ ঔপনিবেশিকতায় উত্তরণ : প্রতিরোধ ও সহযোগিতা

আঠারো শতকের শুরুতে ইউরোপে উৎপাদন ব্যবস্থার বিস্তার ও প্রাচুর্য ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতেও বিস্ফোরণ ঘটায় ও তার প্রভাব এসে পড়ে ভারতে ব্রিটিশ বণিকবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদের বিবর্তনে। এইসময়ে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের সবচেয়ে লাভজনক পণ্য ছিল বস্ত্রসম্ভার। ইউরোপ থেকে রূপা আমদানির মধ্য দিয়ে এর মূল্য মেটানো হত। আঠারো শতকের শুরুর দিকে ইংল্যান্ড থেকে এই ব্যাপক রূপো চালানের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় পুঁজিবাদের জগতে সমালোচনার ঝড় ওঠে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য রাস্তা খোঁজা হয় এইভাবে যে, ভারতীয় রাজস্ব উৎপাদনের মূল উৎসের ওপর প্রভাব বিস্তার করা যায় কিনা (তখনও পুরোপুরি দখল বা নিয়ন্ত্রণ করার কথা ভাবা হয়নি)।

অবশ্য ইউরোপ থেকে রূপোর নির্গমন ঠেকানোর জন্যই কেবল ভারতে উপনিবেশ বিস্তার হয়— তা নয়। প্রকৃতপক্ষে আঠারো শতকের শেষদিকে ভারতে রাষ্ট্রকাঠামো ও তার অর্থনৈতিক পরিকাঠোমোর অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য ও স্ববিরোধতা কোম্পানির হস্তক্ষেপের রাস্তা তৈরি করে দেয়। এক্ষেত্রে মুঘল যুগের উত্তরাধিকারী স্বাধীন দেশীয় রাজ্যগুলিতে বণিক-পুঁজিপতি শ্রেণীর নেতিবাচক সক্রিয়তা প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ভারতের অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যে কোম্পানির কর্মচারীদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ।

আঠারো শতকের শেষাশেষি দেখা যায়, কিছু আঞ্চলিক রাজ্য এই দেশীয় পুঁজিপতি ও ব্যবসাদার শ্রেণীর ওপর তাদের আর্থিক নির্ভরতা কমিয়ে আনার চেষ্টা করে ও তাদের ওপর করের পরিমাণ বাড়ায়। তুলনামূলক শক্তিশালী রাজ্যগুলির তরফে এই আর্থিক জঙ্গিপনা (military fiscalism) বা বলপ্রয়োগের নীতি সেখানকার বণিক-পুঁজিপতি শ্রেণীকে বিমুখ করে ও কোম্পানির প্রতি চক্রান্তমূলক সহযোগিতায় প্রবৃত্ত হতে উৎসাহিত করে। ফলে সুযোগমতো বিদেশী মূলধনী শক্তির তরফে দেশীয় বণিক-পুঁজিপতি শ্রেণীকে তথাকথিত 'নব্য-সুলতানী' রাজ্যগুলির বিরোধিতায় উৎসাহিত করা হয়। এটাই ঔপনিবেশিকতার বিবর্তনে আর একটি ধাপ। সামুদ্রিক বাণিজ্যে ইউরোপীয় বণিকদের বিপুল অভিজ্ঞতা তথা আধিপত্য, সুদূর বিদেশ থেকে পুঁজির অনুপ্রবেশ, এদেশে দেশীয় সম্পদের অনাবৃত উৎসের প্রতি লালসা ও সর্বোপরি সামরিক প্রযুক্তির দিক দিয়ে ব্রিটিশদের উন্নত-রণকৌশল—আঠারো শতকের আঞ্চলিক রাজ্যগুলির পতনে এদের প্রত্যেকটিরই অবদান ছিল।

শেষে, স্বাধীন এই দেশীয় রাজ্যগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ বিস্তারে ইংরেজরা খুব নিপুণ কৌশলে অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসিদের হটিয়ে দেয়। বিস্ময়ের কথা, দেশীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের অভ্যাসে ফরাসিরা ইংরেজ শক্তির চেয়ে দৌড়ে এগিয়ে থাকলেও, শেষ লড়াইয়ে ব্রিটিশরাই বিজয়ী হয়।

৩৯.৭ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

১। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের পিছনে মূল প্রেরণার উপাদানগুলি কী কী?

২। মহীশূর রাজ্যের আর্থিক সমৃদ্ধির কী চিত্র মেলে?

৩। মারাঠা যুক্তরাজ্য পতনের মূল কারণ কোথায় নিহিত ছিল?

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

৪। টিপু সুলতানের চরিত্র ও কার্যাবলী বিচার করে তাঁর শাসনকাল বিশ্লেষণ কর।

৫। অযোধ্যা, মহীশূর—এই দেশীয় রাজ্যগুলির গ্রাসের পিছনে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের কোনো মূল ধারা খুঁজে পাও কি?

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

৬। রোহিলা যুদ্ধের সময় কে গভর্নর জেনারেল ছিলেন?

৭। কোন্ সন্ধির দ্বারা চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ শেষ হয়?

৮। বেসিনের সন্ধি কে, কবে স্বাক্ষর করেন?

৩৯.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। বিপান চন্দ্র, ভাষান্তর—গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত : আধুনিক ভারত।

২। A. C. Banerjee : The New History of Modern India, 1707-1947.

৩। Sugata Bose & Ayesha Jalal : Modern South Asia—History, Culture, Political Economy.

৪। Stuart Gordon : The Marathas : 1600—1800.

৫। Kate Bnrittlebank : Tipu Sultan's Search for Legitimacy.

৬। C. A. Bayly : Indian Society and the Making of the British Empire.

একক ৪০ ❐ ভারতে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের বিস্তার : ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে ডালহৌসী

গঠন :

৪০.০ উদ্দেশ্য
৪০.১ প্রস্তাবনা
৪০.২ আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে ভারতের রাজনীতিতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব—বণিকবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদ (১৭৬৫-১৮৫০)
৪০.৩ ওয়ারেন হেস্টিংস ও কোম্পানির আগ্রাসন (১৭৭২-১৭৮৫)
৪০.৩.১ ওয়ারেন হেস্টিংস ও অযোধ্যা
৪০.৩.২ ওয়ারেন হেস্টিংস ও মারাঠা শক্তি
৪০.৩.৩ ওয়ারেন হেস্টিংস ও মহীশুর
৪০.৪ লর্ড কর্নওয়ালিস ও দেশীয় রাজ্য (১৭৮৬-১৭৯৩)
৪০.৫ লর্ড ওয়েলেসলির অধীনে সাম্রাজ্যবিস্তার (১৭৯৮-১৮০৫)
৪০.৫.১ অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি
৪০.৫.২ ওয়েলেসলি ও মারাঠা শক্তি
৪০.৬ লর্ড হেস্টিংস ও সাম্রাজ্যবাদ (১৮১৩-১৮২৩)
৪০.৭ লর্ড ডালহৌসী ও রাজ্যগ্রাস নীতি (১৮৪৮-১৮৫৬)
৪০.৭.১ কোম্পানির সাম্রাজ্যবিস্তার নীতি ও মূল্যায়ন
৪০.৮ অনুশীলনী
৪০.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৪০.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- বিভিন্ন গভর্নর-জেনারেলদের নেতৃত্বে কোম্পানির সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনমূলক নীতিসমূহ;
- ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাঠামোগত পরিবর্তন ও শাসকসংগঠন হিসাবে উত্তরণ;
- কোম্পানি একশত বৎসরের ভারত-শাসনের চরিত্র ও ফলাফল (১৭৫৭-১৮৫৭)।

৪০.১ প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য থেকে জানা গেল যে, এই এককে একটি বাণিজ্যিক সংগঠন থেকে কীভাবে সামরিক আগ্রাসনের সাহায্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের প্রধান রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হল, তাই বিধৃত হয়েছে। যে

বিশেষ উদ্দেশ্য ও কৌশলগুলি কোম্পানি দেশীয় শক্তিগুলির বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল, তার চরিত্র, কার্যকারিতা ও ফলাফল, এবং সামগ্রিক বিচারে প্রথম একশ' বছরে কোম্পানির শাসনের পর্যালোচনা করাই এই অধ্যায়ের মূল বক্তব্য/উপজীব্য বিষয়।

৪০.২ আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে ভারতের রাজনীতিতে ব্রিটিশদের প্রভুত্ব—বণিকবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদ (১৭৬৫-১৮৫০)

১৭৫৭ সালের পরবর্তী দশকগুলিতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, যা এশিয়া মহাদেশে মূলত বাণিজ্যের ছাড়পত্র নিয়ে এসেছিল, ভারতে তার বিজিত অঞ্চলগুলি শাসন করার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করে। বাণিজ্যে লভ্যাংশ বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভূমিরাজস্ব আদায়েও কোম্পানি কর্মচারী নিয়োগ করে। ইতিহাস চর্চার একটি অন্যতম কৌতুহলোদ্দীপক ক্ষেত্র হিসাবে ঔপনিবেশিক যুগের শুরুতে কোম্পানি তার প্রশাসনিক সংগঠন কতটা পুরাতন দেশীয় কাঠামোকে আশ্রয় করেই গড়ে তুলেছিল, তা নিয়ে প্রভূত গবেষণা হয়েছে। কিন্তু সমাজ ও অর্থনীতিতে যে এই যুগ একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারণা ও কাঠামোর জন্ম দেয়, যা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন আনে, তা নিয়ে সংশয় নেই।

একটি সামরিক স্বৈরতন্ত্র (military despotism)-এক আশ্রয় করে আঠারো শতকের শেষভাগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সর্বোচ্চ রাজনৈতিক অধিকার কায়েম করে। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার প্রভুত্ব কব্জা করার সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতাও কোম্পানি 'দেওয়ান' হিসাবে কুক্ষিগত করে। অন্যদিকে নিজামতের—অর্থাৎ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বও তারা নিয়েছিল। কোম্পানি আর্থিক আধিপত্য ভোগের সঙ্গে সঙ্গে সেই অর্থের জোরে সেনাবাহিনীও পুষত, যার বেশিরভাগ 'সিপাহী আসত বিহার ও উত্তরপ্রদেশের উচ্চবর্ণের কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে। ১৭৬৮ সালে কোম্পানির অধীনে সিপাহীদের সংখ্যা ছিল ২৫,০০০; ১৮১৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৫,০০০-এ। ১৮১৪ সাল নাগাদ গোটা উত্তর ভারত জুড়েই এই 'সিপাহী'-দের নিয়ে গঠিত 'বেঙ্গল-আর্মি'-র দাপট দেখা যায়। এইভাবে রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভুত্ব খাটানো সত্ত্বেও শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে কোম্পানি সরাসরি কোন যোগাযোগ রাখত না। প্রশাসনের গলদের জন্যে নবাব ও তাঁর কর্মচারীদের দায়ী করা হত আর শাসকজনিত সুবিধাগুলি কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা ভোগ করত।

এইভাবে ভারতের রাজনীতিতে ব্রিটিশ পুঁজি ও কোম্পানির তরফে প্রবল চাপ তৈরি করা হয়। একাজে তারা দেশীয় বণিক ও পুঁজিপতি শ্রেণীর কাছ থেকে গোপন ও কার্যকরী সহযোগিতা লাভ করে। এর ফলে কোম্পানি সুনির্দিষ্ট ও পরিকল্পিত উপায়ে দেশীয় রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক উৎপাদনের উৎসগুলিকে ধ্বংস করতে পারে ও অন্যদিকে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দখল করার পর দেশীয় মধ্যবর্তী-পুঁজিকেও অচিরেই অধস্তন-পর্যায়ে ঠেলে সরাতে পারে। অর্থাৎ এককথায়, আঠারো শতকে সাম্রাজ্যবাদের স্পন্দনশীল ও অনুকুল অর্থনৈতিক অভিঘাতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে যে আগ্রাসী ভূমিকা নেয়, তার ধাক্কায় উনিশ শতকে ভারতীয় অর্থনীতি একটা গতিহীন, অবরুদ্ধ চেহারা নেয়।

৪০.৩ ওয়ারেন হেস্টিংস ও কোম্পানীর আগ্রাসন (১৭৭২-১৭৮৫)

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ভারতের রাজনীতিতে ব্রিটিশরা একটি বিশেষ ক্ষমতাধর শক্তিরূপে প্রতিভাত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ইংল্যান্ডে এর পরিচালকরা ভারতের অবশিষ্ট অংশে নতুনভাবে প্রভুত্ব বিস্তারের প্রস্তুতি হিসাবে বাংলায় তাদের ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে স্থাপন করায় মনোনিবেশ করে। কোম্পানি ইতিপূর্বে ভারতের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করছিল; নতুন নতুন রাজ্যজয় ও অর্থলালসাও তারা সংযত রাখতে পারেনি। কাজেই বাংলায় তাদের শাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই তারা বিভিন্ন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্ণর হয়ে আসেন ও ১৭৭৪ সালে গভর্ণর জেনারেল পদে উন্নীত হন। তাঁর আমলে অযোধ্যা রাজ্যটিকে কেন্দ্র করে উত্তর ভারতে মারাঠাদের এক উল্লেখযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে কোম্পানিকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়। বস্তুতপক্ষে, হেস্টিংসের আমলেই কোম্পানির মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সী উভয়েই যথাক্রমে মহীশূরে হায়দার আলি ও হায়দ্রাবাদের নিজাম এবং মারাঠা নেতৃত্বের সঙ্গে সংঘাতে জড়ায়। অর্থাৎ তৎকালীন দেশীয় শক্তির তরফে সবচেয়ে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি পড়ে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে ফরাসিরাও সেইসময় এদেশে ব্রিটিশ কর্তৃত্বস্থাপনে অন্যতম বাধা ছিল।

৪০.৩.১ ওয়ারেন হেস্টিংস ও অযোধ্যা

হেস্টিংসের বিদেশনীতির মূল স্তম্ভ ছিল অযোধ্যা—মূলত উত্তরভারতে অযোধ্যাকে শক্তিশালী একটি মিত্রশক্তিতে পরিণত করাই ছিল হেস্টিংসের উদ্দেশ্য। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লার সঙ্গে হেস্টিংস বেনারসের চুক্তি সম্পাদন করেন, যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল শর্তসাপেক্ষে সুজাউদ্দৌল্লার সঙ্গে কোম্পানির সম্পর্ক দৃঢ় করা। এই সূত্রেই কেম্পানি ১৭৭৪ সালে অযোধ্যার হয়ে রোহিলখণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

১৭৭১ সালে পুনরুজ্জীবিত মারাঠা শক্তি উত্তরভারতে দিল্লী দখল করলে মুঘল সম্রাট শাহ্আলম তাদের হাতে বন্দী হন এবং অযোধ্যা ও রোহিলাখণ্ড উভয় শক্তির কাছেই মারাঠাদের উপস্থিতি ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতএব ১৭৭২ সালে সুজাউদ্দৌল্লা রোহিলা-আফগান নেতা হাফিজ আহ্মেদ খানের সঙ্গে একটি রক্ষণাত্মক চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যার দ্বারা চল্লিশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে সুজাউদ্দৌল্লা রোহিলাদের হয়ে মারাঠা বিতাড়ন করবেন, স্থির হয়। কিন্তু মারাঠারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রোহিলাখণ্ড ত্যাগ করলেও সুজাউদ্দৌল্লা উপরোক্ত অর্থ দাবী করেন। এই অন্যায় দাবিপূরণে ওয়ারেন হেস্টিংসের পূর্ণসম্মতি না থাকা সত্ত্বেও কোম্পানি অযোধ্যাকে রোহিলাখণ্ড আগ্রাসনে সামরিক সাহায্য দেয়। এই যুদ্ধের (১৭৭৪) ফলে রোহিলাখণ্ড অযোধ্যার সঙ্গে যুক্ত হয়।

হেস্টিংসের ভূমিকা প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে। ঐতিহাসিক রবার্টস 'কেম্ব্রিজ ইতিহাসে' [P. E. Roberts—Cambridge History of India—Vol. VI] এবং ডেভিস তাঁর 'ওয়ারেন হেস্টিংস অ্যান্ড

আউধ' বইতে হেস্টিংসের কাজের সমর্থন করেন এই যুক্তিতে, যে, রোহিলাখণ্ড আগ্রাসনের পিছনে অযোধ্যার একটি স্বাভাবিক সুরক্ষিত সীমান্তের যুক্তিটি খুবই জোরালো ছিল। এছাড়াও অযোধ্যা এরপর থেকে কোম্পানির নিজস্ব সুরক্ষার প্রশ্নে 'প্রথম সীমান্তে'র কাজ করে ও কোম্পানি আর্থিকভাবেও নবাবের কাছ থেকে প্রভূত অর্থলাভ করে। কিন্তু অচিরেই তাঁর নিজের কাউন্সিলের সদস্যদের দ্বারাই হেস্টিংস প্রভূতভাবে সমালোচিত হন মূলত এক্ষেত্রে তাঁর কূটনৈতিক ব্যর্থতার জন্য।

অযোধ্যা ও রোহিলাখণ্ড ছাড়াও হেস্টিংস পুনরায় প্রবল সমালোচিত হন বেনারসের রাজা চৈত সিং-এর ঘটনায় ও অযোধ্যার বেগমদের সম্পদ লুঠ করার ঘটনায়। মূলত মারাঠাশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে ও কর্ণাটকের যুদ্ধে কোম্পানির প্রচুর আর্থিক ব্যয় হয়ে যায় ও কোষাগার পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে হেস্টিংস, 'কোম্পানির স্বার্থেই' দেশীয় শক্তিগুলির সম্পদ লুঠ ['squeezing' wealthy natives to support India's 'pacification'] করতে প্রবৃত্ত হন। বস্তুত, উত্তরভারতে বেনারস বাণিজ্যিক লেনদেন ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করেছিল। ১৭৭৯ সালের পর থেকে ক্রমাগত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কারণে হেস্টিংস বেনারসের রাজাকে চাপ দিতে থাকেন, যাতে বার্ষিক দেয় ৪৫ লক্ষ টাকার ওপরেও বাড়তি অর্থ দেওয়া হয়। চৈত সিং তা দিতে অপারগ হলে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। এর বিরুদ্ধে সেনা-অভ্যুত্থান হলে হেস্টিংস তাঁর দাবিতে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হন। এই অভ্যুত্থান বস্তুতই হেস্টিংসের কূটনৈতিক ব্যর্থতা-জাত বলে সমালোচিত হয়েছে।

একইভাবে ১৭৮২ সালে মাদ্রাজ ও বোম্বাইস্থিত কোম্পানির আর্থিক দাবি মেটাতে হেস্টিংস অন্যায়ভাবে অযোধ্যার বেগমদের সম্পদ লুঠ করেন, এই অজুহাতে যে, তাঁরা চৈত সিং-কে সমর্থন করেছিলেন।

৪০.৩.২ ওয়ারেন হেস্টিংস ও মারাঠাশক্তি

কোম্পানির পররাষ্ট্রীয় নীতির ক্ষেত্রে অযোধ্যা যদি হেস্টিংসের কাছে নির্ভরতার প্রথম স্তম্ভ ছিল, তাহলে দ্বিতীয় স্তম্ভ ছিল মারাঠাশক্তির বিরোধিতা। ১৭৬১-তে পাণিপথে শোচনীয় পরাজয়ের পর মারাঠাশক্তি কার্যত ছিন্নশক্তিতে পরিণত হয়। দক্ষিণে নিজাম ছিল তাদের প্রধান শত্রু। এর ওপর, ১৭৭২ সালে পেশবা মাধব রাও-এর মৃত্যুর পর কার্যত মারাঠারা উত্তরাধিকারিত্বের প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। অযোগ্য রঘুনাথরাও-এর ক্ষমতালিপ্সা, মাধবরাও-এর পুত্র পেশবা নারায়ণ রাও -এর হত্যা (১৭৭৩), পেশবাতন্ত্রের রক্ষক ও রঘুনাথ রাও-বিরোধী শিবির হিসাবে পুণেতে নানা ফড়নবিশ-এর নেতৃত্বে মারাঠা গোষ্ঠীতন্ত্রের উত্থান—এ সবই দক্ষিণে কোম্পানির হস্তক্ষেপের সুযোগ করে দেয়। ইতিমধ্যে মৃত নারায়ণ রাও-এর পুত্রের জন্ম হলে হতাশ রঘুনাথ রাও পেশবা পদের দাবিদার হিসাবে কোম্পানির রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন সলসেট—যা বোম্বাই-কর্তৃপক্ষের কাছে আকাঙ্ক্ষিত ছিল, তার বিনিময়ে রঘুনাথ রাও-কে কোম্পানি সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। অতএব ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সলসেট দখল করে ও রঘুনাথ রাও-এর সঙ্গে 'সুরাটের চুক্তি' স্বাক্ষর করে। রঘুনাথ রাও কোম্পানিকে সলসেট ও বেসিন প্রদানের প্রতিশ্রুতি ছাড়াও

ব্রোচ ও সুরাটের রাজস্বের এক অংশ দিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। অতএব বোম্বাই-কর্তৃপক্ষ ২৫০০ সৈন্য দিয়ে (যার ব্যয়ভার অবশ্যই রঘুনাথ রাও বহন করবেন) পুণে-কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে।

১৭৭৫-৮২ খ্রিস্টাব্দ জুড়ে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ শুরু হয়। ইতিমধ্যে কলকাতা-কর্তৃপক্ষ সুরাটের চুক্তি 'অবিবেচনাপ্রসূত ও বিপজ্জনক' বলে সাব্যস্ত করলে নতুন করে পুণে-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ইংরেজদের আলোচনা শুরু হয়। ১৭৭৬ সালে পুরন্দরের চুক্তির মাধ্যমে মারাঠাদের সঙ্গে কোম্পানি নতুন লেনদেনের শর্তে আবদ্ধ হয় যার বলে রঘুনাথ রাও-কে নির্বাসনে পাঠানো হয়, সলসেট ব্রিটিশ-কর্তৃপক্ষকে দিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া ব্রোচের রাজস্বের এক অংশ ও যুদ্ধের ব্যয়ভার বাবদ বার লক্ষ টাকা কোম্পানি আদায় করে।

কোম্পানির পরিচালকবৃন্দ ও বোম্বাই-কর্তৃপক্ষ ও রঘুনাথ রাও—কেউই পুরন্দরের চুক্তি সমর্থন না করলে পুনরায় মারাঠাশক্তি ও কোম্পানীর সৈন্য মুখোমুখি হয়। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির সেনাবাহিনী মারাঠা সৈন্যের মুখোমুখি হয় ও পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে ওয়াদগাঁও কনভেন্শনের মধ্যে দিয়ে যুদ্ধের সাময়িক বিরতি ঘটে। কিন্তু হেস্টিংস এই সমঝোতার বিরোধিতা করলে পুনরায় মারাঠা-ইংরেজ শক্তি পরীক্ষার সূচনা হয়।

এই পরিস্থিতিতে মারাঠা, হায়দার আলি ও নিজামকে নিয়ে একটি ত্রিশক্তি আঁতাত গড়ে উঠলে দাক্ষিণাত্যে কোম্পানির কূটনৈতিক ব্যর্থতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। একদিকে মাদ্রাজ-কর্তৃপক্ষ নিজামের প্রতিদ্বন্দ্বী বসালাত জঙ্গকে প্রশ্রয় দিতে শুরু করলে নিজাম বৃটিশ বিরোধী হয়ে ওঠেন; অন্যদিক মহীশূরের হায়দার আলিও মালাবারে ব্রিটিশদের আধিপত্য বিস্তার ও মাহে বন্দর দখলের প্রচেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করেন। অতএব দক্ষিণী রাজ্যগুলি ব্রিটিশ-বিরোধিতায় একত্রিত হয়ে ঠিক করে যে নিজাম 'উত্তর সরকার' দখলে অগ্রসর হবেন, হায়দার আলি কর্ণাটক দখলে অগ্রসর হবেন, বেরার-এর ভোঁসলে বাংলা আক্রমণ করবেন ও মারাঠারা বোম্বাই এলাকায় হানা দেবে।

কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস এইসময় অসম্ভব কূটনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে ভোঁসলে ও নিজামকে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে নিবৃত্ত করেন ও ব্রিটিশ সেনাপতি গডার্ড পরপর অভিযানে গুজরাটের আমেদাবাদ, বেসিন ও কোঙ্কন দখল করে নেন। অন্যদিকে পরাক্রমী মারাঠা সেনাপতি মহাদ্জী সিন্ধিয়াকেও হেস্টিংস দুর্বল করে দেওয়ার জন্য আক্রমণ চালান।

১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংস মহাদ্জী সিন্ধিয়ার মাধ্যমেই পুণে-কর্তৃপক্ষের কাছে আলোচনার প্রস্তাব পাঠান। সিন্ধিয়া এই চুক্তির রূপায়ণে একদিকে পুণের রাজনৈতিক-কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি ও অন্যদিকে কোম্পানির কাছে চুক্তি রূপায়ণের মুখ্য জামিনদার হিসাবে রইলেন।

সলবঈ চুক্তির শর্তানুযায়ী ব্রিটিশ-কর্তৃপক্ষ সলসেট অধিকার করে; রঘুনাথ রাওকে অবসরভাতা দেওয়া হয়; মহীশূরের বিরুদ্ধে পুণে কর্তৃপক্ষকে দিয়ে আগ্রাসী পদক্ষেপ নেওয়ানো হয়; এবং সর্বোপরি পরবর্তী কুড়ি বছরের জন্য ইঙ্গ-মারাঠা সম্পর্কে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়—যে সময়টির মধ্যে ইংরেজরা বাংলায় তাদের শাসন সংহত করে নেয়। অন্যদিকে মারাঠা সর্দারেরা নিজেদের শক্তি সংহত না করে পারস্পরিক তিক্ত বিবাদে এই সময়ের অপচয় করে।

৪০.৩.৩ ওয়ারেন হেস্টিংস ও মহীশূর

১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে হায়দার আলির সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বাধে। ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে এর আগে হায়দার আলি একের পর এক যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজিত করেছিলেন, বহু ইংরেজ-সৈন্য আত্মসমর্পণ করতেও বাধ্য হয়েছিল। এই যুদ্ধেও হায়দারের সেই পুরানো রণকুশলতা অব্যাহত ছিল। এই যুদ্ধের ফলে সমগ্র কর্ণাটক অঞ্চল তাঁর করতলগত হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস নিজামকে ঘুষ দিয়ে তাঁকে ব্রিটিশ-বিরোধী শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। ১৭৮১-৮২ খ্রিস্টাব্দে মারাঠা ভীতি থেকেও কোম্পানি চুক্তির দ্বারা মুক্ত হলে পুরো সামরিক শক্তি নিয়ে ব্রিটিশরা এখন মহীশূরের বিরুদ্ধে নামে। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে সেনাপতি আয়ারকূটের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনী পোর্টোনোভো-র যুদ্ধে হায়দার আলি-কে পরাস্ত করে। ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হায়দার আলির মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র টিপু সুলতান ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত হয়ে ওঠায় অবশেষে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে উভয়পক্ষের মধ্যে একটি সন্ধি স্থাপিত হয়। এর শর্ত অনুসারে পরস্পরকে বিজিত রাজ্য প্রত্যর্পণ করতে হয়েছিল।

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে ওয়ারেন হেস্টিংস যে দাবি করেন তা এইরকম : "মারাঠা যুদ্ধের মূল কারণ ও সূত্রপাত নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। আমার মূল দায়িত্ব ছিল একটি প্রেসিডেন্সিকে (বোম্বাই) কুখ্যাতি ও দুটি প্রেসিডেন্সিকেই (বোম্বাই ও মাদ্রাজ) ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো।"

৪০.৪ লর্ড কর্নওয়ালিস ও দেশীয় রাজ্য (১৭৮৬-৯৩)

কেবল গভর্নর জেনারেল হিসাবেই নয়, কোম্পানির সেনাবাহিনীর সর্বেসর্বা হিসাবেও লর্ড কর্নওয়ালিস ভারতে আসেন। পিটের ভারত আইনে কোম্পানির গ্রাসী ভূমিকার ওপর প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা হলেও কর্নওয়ালিসের সময় মহীশূরের বিরুদ্ধে (১৭৮৯) কোম্পানি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। মহীশূরের সম্পদ, যা অবশ্যই কোম্পানির কাছে বাংলা ও মাদ্রাজের আর্থিক লোকসানকে চাঙ্গা করার জন্য লোভনীয় ছিল, কর্নওয়ালিসকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করে। ১৭৯২-এ টিপু সুলতানের পরাজয়ের ফলে মালাবার উপকূল কোম্পানি দখল করে। এই যুদ্ধে কোম্পানি পেশবা ও নিজামের সহযোগিতা লাভ করেছিল। মারাঠারা এই সময়ে মহাদ্‌জী সিন্ধিয়ার নেতৃত্বে উত্তরে প্রবল আগ্রাসন চালাচ্ছিল। টিপুর প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও সমসাময়িক কোন দেশীয় শক্তিই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একত্রিত হওয়ার দুরদর্শিতা দেখায়নি।

৪০.৫ লর্ড ওয়েলেসলির অধীনে সাম্রাজ্য বিস্তার (১৭৯৮-১৮০৫)

ভারতে লর্ড ওয়েলেসলির (লর্ড মর্নিংটন হিসাবে আগমন ও টিপু সুলতানের পরাজয়ের পর 'মার্কুইস অফ ওয়েলেসলি' উপাধি লাভ) আগমন ইউরোপ, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে অবনতির

সমসাময়িক। নেপোলিয়ন সেই সময়ে (১৭৯৮-৯৯) ইংল্যান্ডের সমুদ্র আধিপত্যকে অগ্রাহ্য করে ইজিপ্ট আক্রমণ করেছেন। ১৮০৫ সাল অবধি ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মুখে দাঁড়িয়ে—'were nervous with apprehension and tense with resolution' ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে অত্যন্ত ভাবিত ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে ওয়েলেসলির সময় পর্যন্ত দেশীয় রাজদরবারগুলি ভাড়াটে ফরাসি সৈন্য বা সেনাপতি দ্বারা অধ্যুষিত ছিল—এক্ষেত্রে সিন্ধিয়া, কিংবা নিজাম বা, টিপু সুলতান, সকলেই ফরাসী-যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

ভারতে ফরাসী-ভীতিই বাস্তবিকভাবে ওয়েলেসলির প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি করে দেয়। দেশীয় রাজ্যগুলির ওপর থেকে যাবতীয় ফরাসী প্রভাব মুছে ফেলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ওয়েলেসলি এতদিনের কোম্পানির রক্ষণশীল নীতিকে ত্যাগ করে আগ্রাসী মনোভাব গ্রহণ করেন। তাঁর সময়ের বৈশিষ্ট্য ছিল ফরাসী বিতাড়নের মত নেতিবাচক কর্মসূচীর পাশাপাশি ভারতে সার্বভৌম শক্তি হিসাবে ব্রিটিশদের উত্থানের মত ইতিবাচক কর্মসূচী গ্রহণ—যা ছিল একই মুদ্রার দুই দিক। ব্রিটিশ প্রভুত্বের ও সার্বভৌম ক্ষমতার সুরক্ষার ক্ষেত্রে, ওয়েলেসলির মতে, এমন একটি ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজন ছিল যা হবে চুক্তিনির্ভর ও গোটা ভারতব্যাপী। এই আক্রমণাত্মক সবগ্রাসী দৃষ্টিভঙ্গী ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে পিট্-এর ভারত আইন (Pitt's Indian Act—1784)-এর পরিপন্থী ছিল। কোম্পানি-কর্তৃপক্ষ ততদিনই ওয়েলেসলির এই নীতির বিরোধিতা করেননি, যতদিন তা কোম্পানির স্বার্থবিরোধী হয়নি।

১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ভারতের মহীশূর ও মারাঠা এই দুই বৃহৎ শক্তির গৌরব অস্তমিত হয়েছিল। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের পর মহীশূর বা কর্ণাটক রাজ্য তার অতীত-গৌরব ধরে রাখতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। মারাঠা সর্দাররা পরস্পরের মধ্যে বাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত থেকে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ এই অনুকূল পরিস্থিতিতে উপলব্ধি করেছিল যে, ব্যবসায়িক স্বার্থের ক্ষতি না করে রাজ্যবিস্তার নীতি মুনাফালাভের সম্ভাবনাকেই বাড়িয়ে তুলবে।

৪০.৫.১ অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি

রাজনৈতিক দিক থেকে লর্ড ওয়েলেসলির নীতি ছিল ত্রিমুখী। অধীনতামূলক মিত্রতা, প্রত্যক্ষ যুদ্ধ ও কোন সময়ে বিজিত রাজ্যগুলি দখল—এই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। দেশীয় রাজ্যে কিছু কোম্পানির সৈন্য মোতায়েন রেখে প্রতিবেশী আক্রমণ থেকে সুরক্ষা দান ও সংশ্লিষ্ট সৈন্যদের ব্যয়ভার ওই রাজ্যের কাছ থেকে আদায় করা—এই প্রচলিত পুরাতন নীতি-র বদলে ওয়েলেসলি এমন কৌশলে চুক্তির শর্ত সাজালেন, যাতে এই আশ্রিত রাজ্যগুলি কোম্পানির সর্বময় প্রভুত্বের আওতায় এসে পড়ে। ওয়েলেসলির 'অধীনতামূলক মিত্রতা' নীতি কার্যক্ষেত্রে ছিল এই যে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যে স্থায়ীভাবে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী মোতায়েনের ব্যবস্থার বিনিময়ে সৈন্যবাহিনীর খরচ ওই রাজ্যের কাছেই কোম্পানি আদায় করবে। শুধু তা-ই নয়, উপরন্তু এই নীতির বলে রাজ্যটির তরফে কোম্পানির প্রভুত্ব মেনে নিয়ে সৈন্যবাহিনীর ব্যয়ভারের নামে কোম্পানিকে রাজস্ব বা কর দান করতে হবে। অনেক সময় ব্রিটিশের অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি কবলিত শাসক বা রাজ্যকে বাৎসরিক খাজনার বদলে তার রাজ্যাংশ কোম্পানিকে ছেড়ে দিতে হত। এই 'অধীনতামূলক মিত্রতা' ব্যবস্থায় প্রায়ই

কিছু শর্তও জড়িত থাকত—যেমন, সংশ্লিষ্ট রাজ্যের দরবারে একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে রেসিডেন্টরূপে রাখতে হবে; ব্রিটিশের বিনা অনুমতিতে কোনো ইউরোপীয় (অ-ইংরেজ) কর্মচারী নিয়োগ করা চলবে না, এবং গভর্নর জেনারেলের বিনা অনুমতিতে সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা শাসক প্রতিবেশী রাজ্যের কোনো বিষয়ে কোনো কথাবার্তা চালাতে পারবে না।

প্রকৃতপক্ষে ওয়েলেসলির 'অধীনতামূলক মিত্রতা' ব্যবস্থা ছিল একটা ফাঁদ। কোনো রাজা বা রাজ্যের পক্ষে নিজের স্বাধীনতা বিকিয়ে দেওয়া ছিল এই চুক্তির অর্থ। শুধু পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতাই নয়, রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও তাঁর স্বাধীনতা সংকুচিত হয়েছিল। ব্রিটিশ রেসিডেন্ট ক্রমশই দেশীয় রাজ্যের দৈনন্দিন প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করত। এছাড়াও ব্রিটিশ-সেনার ভরণপোষণের খরচ চালাতে সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করতে বাধ্য হত রাজা ও তার করভারপীড়িত প্রজাসাধারণ। এর ওপর 'আশ্রিত' রাজ্যগুলির নিজস্ব সেনাবাহিনীকে ভেঙে দেওয়ায় পুরুষানুক্রমে সৈনিক বৃত্তিধারী লক্ষ লক্ষ সৈন্য ও সেনানায়করা জীবিকাচ্যুত হয় ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যে দারিদ্র্য ও নৈতিক পতন দেখা দেয়। অন্যদিকে 'মিত্রতার' বন্ধনে আবদ্ধ দেশীয় রাজারা তাদের প্রজাদের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেও ক্রমে চ্যুত হন, যখন প্রজাবিদ্রোহের কোনো আশঙ্কা আর থাকে না, কারণ সাহায্যের জন্য কোম্পানির ভাড়াটে সৈন্য রয়েছে।

অতএব ব্রিটিশ-শক্তির পক্ষে 'অধীনতামূলক মিত্রতা' চুক্তি অত্যন্ত সুবিধার হাতিয়ার হয়। ভারতীয় শাসকদের টাকায় তারা এক বিরাট সৈন্যবাহিনী পোষণ করতে পারত; যে-কোনো সময় আশ্রিত রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করে সেই দেশীয় রাজ্য অধিকার করা যেত। অতএব, ওয়েলেসলির সময়ে যত এলাকা ব্রিটিশের অধিকারভুক্ত হয়েছিল 'অধীনতামূলক মিত্রতা'-র কৌশলে, আর কখনও তা হয়নি। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে টিপু সুলতান শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন এবং মহীশূরের প্রায় অর্ধাংশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত হয় ও মাদ্রাজের সঙ্গে ভারতের পশ্চিম উপকূল যুক্ত হয়। মহীশূরের উত্তরাঞ্চলের কিছুটা জোটে নিজামের ভাগ্যে—কারণ ১৭৯৯-এর যুদ্ধে মহীশূরের বিরুদ্ধে তিনি কোম্পানিকে সাহায্য করেছিলেন। বাকি এলাকা মহীশূরের পুরোনো হিন্দু রাজবংশকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে হায়দ্রাবাদের নিজাম সর্বপ্রথম অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, যার দ্বারা নিজামের সেনাবাহিনীকে ভেঙে দেওয়া হয়। নিজস্ব বাহিনীর পরিবর্তে, বাৎসরিক ২৪১,৭১০ পাউন্ড ব্যয়ের বিনিময়ে, কোম্পানির ছয় ব্যাটালিয়ন ব্রিটিশ-সৈন্য তাঁর রাজ্যরক্ষা করত। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত আর একটি চুক্তির দ্বারা নিজামের রাজ্যে কোম্পানির সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়, তাঁর রাজ্যের একাংশের বিনিময়ে (তুলা-উৎপাদনে সমৃদ্ধ বেরার প্রদেশ)।

১৮০১ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যার নবাবকে বাধ্য করা হল এই চুক্তি সম্পাদনে, যার দ্বারা চুক্তিবদ্ধ নবাব তাঁর রাজ্যের সমৃদ্ধ পশ্চিম দোয়াব ও রোহিলাখণ্ড এলাকা কোম্পানিকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। লক্ষ্ণৌ চতুর্দিক দিয়ে ব্রিটিশ-সৈন্যের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়। অবশিষ্ট 'আউধ' রাজ্যেও নবাবের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়; স্বরাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও ও অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায়ও কোম্পানির প্রতিনিধি ও আরক্ষা বাহিনীর হাতেই রইল চূড়ান্ত ক্ষমতা। একদিকে পশ্চিম উপকূলের সমৃদ্ধ সুরাট বন্দর ও অন্যদিকে দক্ষিণের তাঞ্জোর কোম্পানির অধিকার আসে। অতঃপর ভারতের ব্রিটিশ শাসন বহির্ভূত শক্তিগুলির মধ্যে মারাঠারাই মুখ্য স্থানের অধিকারী হয়েছিল। এইবার ওয়েলেসলি মারাঠাদের প্রতি মনোনিবেশ করলেন।

৪০.৫.২ ওয়েলেসলি ও মারাঠা

মারাঠাজাতির দুর্ভাগ্যবশত, আঠারো শতকের শেষদিকে একজন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নায়কের অভাবে তারা যৌথ ও বিকেন্দ্রীভূত একটি সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে থাকে, যার মুখ্য নেতৃবৃন্দ প্রত্যেকেই স্ব স্ব উদ্দেশ্য ওস্বার্থসাধনে মনোযোগী ছিলেন। যেমন পুণেতে পেশবা, গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়া, ইন্দোরে হোলকার, নাগপুরে ভোঁসলে ও বরোদায় গায়কোয়াড় বংশ। মহাদ্‌জী সিন্ধিয়া, তুকোজী হোলকার, কি অহল্যাবাঈ, পেশবা দ্বিতীয় মাধব রাও-এর পরে শেষ উল্লেখযোগ্য মারাঠা কূটনীতিজ্ঞ নানা 'ফড়নবিশ সকলেই আঠারো শতকের শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক, নতুন মারাঠা সর্দাররা কেউই ব্রিটিশ আগ্রাসনকে যোগ্য গুরুত্ব না দিয়ে আত্ম-সিদ্ধিসাধনে তীব্র গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হন। একদিকে যশোবন্ত রাও হোলকার ও অন্যদিকে দৌলত রাও সিন্ধিয়া এবং পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও-এর মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলছিল।

১৮০২ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর হোলকার, পেশবা ও সিন্ধিয়ার মিলিত বাহিনী পরাজিত হওয়ার পর পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও ওয়েলেসলির মিত্রতা প্রস্তাবে রাজী হলেন। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর অসহায় ও ভীত পেশবা ব্রিটিশ হুমকির সামনে বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করেন ও 'সাধারণ প্রতিরক্ষা আঁতাত' হিসাবে অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি 'বেসিনের চুক্তি' হিসাবে খ্যাত হয়, যার বলে কোম্পানির সৈন্য পেশবার ভাতায় স্থায়ীভাবে পুণেতে বহাল হল এবং এর ব্যয়ভার হিসাবে পেশবার রাজ্যাংশ থেকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায়কারী এলাকা কোম্পানির হাতে দিয়ে দেওয়া হয়। শুধুমাত্র বহিঃশত্রু নয় অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রদানেও এই সেনাবাহিনী বহাল হয়। সুরাট নগরী ও নিজামের এলাকার ওপর থেকে 'চৌথ' আদায়ের দাবিও পেশবা কোম্পানিকে ছেড়ে দেয়। ইংরেজ ব্যতিরেকে অপর কোনো ইউরোপীয় শক্তির বা সেনা-প্রশিক্ষণে সাহায্য গ্রহণ পেশবার ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হল।

বেসিনের চুক্তি গোটা দাক্ষিণাত্যে কোম্পানির একচ্ছত্র আধিপত্যকে সুনিশ্চিত করে, যা ইতিমধ্যেই নিজামের অধীনতামূলক চুক্তিতে বশ্যতা স্বীকার, বা টিপু সুলতানের পতন অথবা আর্কটের নবাবের রাজ্য কোম্পানির দ্বারা অধিগ্রহণের দ্বারা নিকটস্থ হয়েছিল। উত্তরভারতেই মূলত হোলকার, ভোঁসলে ও সিন্ধিয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। যদিও দীর্ঘদিন আগেই পেশবা তাঁর প্রকৃত ক্ষমতা থেকে অপসৃত হয়েছিলেন, তবু এই চুক্তি আনষ্ঠানিকভাবে মারাঠা আধিপত্য নষ্ট করে।

অন্যদিকে তৎকালীন বোর্ড অফ কন্ট্রোল এই চুক্তির বিরোধিতা করে যেহেতু তা সরাসরি পিট্-এর ভারত আইন (১৭৮৪) ও ১৭৯৩ সালের চার্টার আইনের উল্টো পথে চলেছিল। উপরোক্ত দুটি আইনেই কোম্পানি দ্বারা কোন দেশীয় রাজ্য বলপূর্বক অধিগ্রহণে কিছু প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হয়েছিল। রাজনৈতিকভাবেও, বোর্ড অফ কন্ট্রোল সভাপতি এই চুক্তির বিরোধিতা করেন কারণ, ভবিষ্যতে কোম্পানি মারাঠা রাজনীতির অশান্ত ঘূর্ণিতে আরও জড়িয়ে পড়বে—এই আশঙ্কায়। এই আশংকাকে সত্যি প্রমাণ করে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে ১৮০৩ সালে ও হোলকার ১৮০৪ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে।

কিন্তু এই বিপদের দিনেও মারাঠা নেতারা একত্রিত হয়ে ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হতে পারেননি। সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে যখন অস্ত্র ধরলেন, তখন হোলকার তা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, গায়কোয়াড় মিত্র হিসাবে ইংরেজদের সাহায্য করলেন, এবং যখন হোলকার বিপদগ্রস্ত হলেন, তখন ভোঁসলে ও সিন্ধিয়া নির্বিকার রইলেন। ভারতে কোম্পানিই যে প্রধান শত্রু ও তার সামরিক ক্ষমতা কত—সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রস্তুতি না নিয়েই মারাঠা নেতারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন।

দাক্ষিণাত্যে আর্থার ওয়েলেসলির নেতৃত্বে ব্রিটিশবাহিনী ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আসাই-নামক স্থানে ও নভেম্বর মাসে আরগাঁও-তে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে। উত্তর ভারতে লর্ড লেকের নেতৃত্বে ইংরেজবাহিনী ১৯০৩ সালের নভেম্বরে সিন্ধিয়াকে যুদ্ধে হারিয়ে আলিগড়, দিল্লি, আগ্রা সব দখল করে নেন। পুনরায় মুঘল সম্রাট শাহ্ আলম ব্রিটিশদের আশ্রিত হন। সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে উভয়কেই অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তির আওতাভুক্ত হতে হয়েছিল। এঁরা দুজনেই নিজ নিজ রাজ্যাংশ ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়ে নিজেদের দরবারে ইংরেজ রেসিডেন্টের উপস্থিত মেনে নিয়েছিল। অতএব, উপকূলীয় উড়িষ্যা থেকে গঙ্গা-যমুনার মধ্যস্থ ভূভাগ—সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয়।

এতদিন যশোবন্ত রাও হোলকার নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবে ছিলেন এই বিশ্বাসে যে, দীর্ঘ, ক্লান্তিকর অভিযানে ব্রিটিশশক্তি হতোদ্যম হয়ে পড়লে তাদের আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করা সহজ হবে। হোলকারের সহযোগী ভরতপুরের রাজা ইংরেজ সেনাপতি লেকের আক্রমণই সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করেছিলেন। এই অবস্থায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অংশীদারেরা সচেতন হয়ে ওঠেন যে, সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ব্যাপক সামরিক অভিযানের পিছনে তুমুল ব্যয়স্বীকারে কোম্পানির লাভের অঙ্কে টান ধরছে। কোম্পানির ঋণের মাত্রা ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে ছিল £১৭ মিলিয়ন, ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে তা বর্ধিত হয়ে দাঁড়ায় £৩১ মিলিয়নে। অপরদিকে ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়নের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধের আতঙ্ক ও প্রস্তুতি স্বদেশে ইংল্যান্ডের আর্থিক অবস্থা বিপন্ন করে তুলেছিল। অতএব আর যুদ্ধ নয়—এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর প্রবল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ লর্ড ওয়েলেসলিকে ইংল্যান্ডে ফিরতে হয়েছিল। তাঁর রাজ্যের বেশিরভাগ অংশ তাঁকে প্রত্যর্পণ করা হয়েছিল। লর্ড কর্নওয়ালিস দ্বিতীয় বারের ও অত্যন্ত অল্পকালের জন্য ভারতে পুনঃপ্রেরিত হন।

লর্ড ওয়েলেসলি, যাঁকে 'নব্য মুঘল' বলে অভিহিত করা হয়েছে (স্ট্যানলি উলপার্টের ভাষায়), প্রকৃতপক্ষে ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে "ব্রিটিশের ভারতীয় সাম্রাজ্যে" রূপান্তরিত করেন [The British Empire in India became the British Empire of India.]। নিজাম, টিপু সুলতান, মারাঠা নেতৃবৃন্দ—প্রতিটি দেশীয় শক্তির ভরকেন্দ্রগুলিকে তিনি ধ্বংস করেন। মুঘল সম্রাট যিনি লর্ড ওয়েলেসলির মতো মদগর্বী ও জেদী ইংরেজ প্রশাসকের কাছ থেকেও সম্মান আদায় করে নেন—শাহ্ আলমকে ওয়েলেসলি কোম্পানির আশ্রিত করে তোলেন। দক্ষিণে মহীশূর, আর্ক, অযোধ্যা—এই ত্রিশক্তির রাজ্য গ্রাস করে মারাঠা শক্তিকেও পদানত করেন। তাঁর অসমাপ্ত আগ্রাসী নীতি, কয়েক বছর বিরতির পর, লর্ড হেস্টিংসের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

শুধু যুদ্ধই নয়, একজন সুদক্ষ সুশৃঙ্খল ও পরিচ্ছন্ন প্রশাসক হিসাবেও তিনি কোম্পানির সাম্রাজ্যের ভিতকে সুসংহত করেন। ইংল্যান্ড থেকে নবাগত ইংরেজ কর্মচারীদের এদেশে সমাজ, সংস্কৃতি ও প্রশাসন সম্পর্কে সুদক্ষ করে তুলতে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সরকারি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। কোম্পানির আমলে ভারতে বিখ্যাত প্রশাসনিক কর্মচারীদের অধিকাংশই—যেমন মানরো, মেটকাফ, ম্যালকম বা, এলফিনস্টোন—লর্ড ওয়েলেসলির অধীনে জীবন শুরু করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর অধীনে ভারতে কোম্পানির শ্যাসনব্যবস্থার এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়।

৪০.৬ লর্ড হেস্টিংস ও সাম্রাজ্যবাদ (১৮১৩-২৩)

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ মারাঠা প্রধানদের শক্তি ও প্রভাব চূর্ণ করে দিলেও ধ্বংস করে দিতে পারেনি। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা তাঁদের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে শেষ চেষ্টা চালান। ইংরেজ রেসিডেন্টের কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকেও মারাঠা প্রধানদের মিলিত করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে এই শেষ সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন পেশবা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, আরও একবার মারাঠারা এক সম্মিলিত ও সুচিন্তিত কর্মধারা অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে পেশবা পুণের ইংরেজ রেসিডেন্টের কার্যালয় ও বাসভবনে হানা দেন। নাগপুরের আপ্পা সাহেব নাগপুর রেসিডেন্সি আক্রমণ করেন। এই রেসিডেন্সিগুলি ছিল ব্রিটিশ শক্তির প্রতীক। অন্যদিকে মাধব রাও হোলকারও ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রস্তুতি নেন।

লর্ড হেস্টিংস সমুচিত ঔদ্ধত্যের সঙ্গে মারাঠা স্পর্ধার জবাব দেন। পেশবা বাজীরাও ১৮১৮ খিস্টাব্দের ১৮ই জুন আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। তাঁর পদ বিলুপ্ত করা হয় তাঁর এলাকা গ্রাস করে বর্ধিত আয়তনের বোম্বাই প্রেসিডেন্সি গঠিত হয়। তাঁকে একটা ভাতা মঞ্জুর করে কানপুরের কাছে বিঠুরে নির্বাসিত করা হয়। হোলকার ও ভোঁসলেকে তাঁদের নিজ নিজ রাজ্যে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী পোষণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। সব মারাঠা প্রধানরাই নিজ নিজ রাজ্যের বিস্তৃত অঞ্চল ইংরেজদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। এরপর থেকে ভারতের অন্যান্য স্থানের দেশীয় নৃপতিদের মতো মারাঠাশক্তির পতনের মূল কারণ—বেইলির মতে, সাধ্যাতিরিক্ত বিস্তার ও আগ্রাসন তাদের মূল ভিত্তিতে ফাটল ধরায় [rapid expansion of their politics created fractures]।

এইভাবে পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ ব্যতীত সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ব্রিটিশের অধিকারে এসে গিয়েছিল। এই সাম্রাজ্যের একাংশ ছিল ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন। বাকী অংশ বহুসংখ্যক দেশীয় রাজা ও নবাবদের দ্বারা শাসিত হলেও ব্রিটিশের সর্বময় প্রভুত্বের অধীনে পরিচালিত হত। এই দেশীয় রাজ্যগুলির নিজস্ব সৈন্যবাহিনী বলতে প্রায় কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। অযোধ্যার মতো দেশীয়, নিজস্ব সেনাবাহিনীকে কোনো কাজে না লাগিয়ে বাড়তি ভাতা দিয়ে কোম্পানির সৈন্যকে কাজে লাগানো হত। বহির্জগত কিংবা অন্য রাজ্যের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতাও দেশীয় শাসকবর্গের রইল না। অভ্যন্তরীণ প্রশাসনেও রেসিডেন্টের তরফে হস্তক্ষেপের মাত্রা বাড়তে লাগল। এইভাবে ভারতে রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার

করে কোম্পানি একদিকে নজর দিল পাঞ্জাবের দিকে এবং অপরদিকে সামাজিক-ধর্মীয় ক্ষেত্রেও তাঁরা ধীরে ধীরে হস্তক্ষেপের দিকে ঝুঁকল।

৪০.৭ লর্ড ডালহৌসী ও রাজ্যগ্রাস নীতি (১৮৪৮-১৮৫৬)

অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি ওয়েলেসলির সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে মূল অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হলেও ডালহৌসীর আমলে তা ধার হারিয়ে ফেলে। এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ছিল অযোধ্যা বা আউধ। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত চুক্তির মাধ্যমে অযোধ্যার নবাব বাৎসরিক বিপুল অঙ্কের করপ্রদানের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে কোম্পানির কাছ থেকে সুরক্ষা ক্রয় করেন। করের দেয় টাকা যোগাড় করতে গিয়ে নবাব ক্রমশই রাজ্যের অধীনস্থ জমিদার, রায়ত সেনাবাহিনী ও অন্যান্য শ্রেণীকে বিরূপ ও বিরক্ত করে তুলছিলেন, কারণ রাজ্যের এই ক্রম দেউলিয়াকরণে তাদের ভাগের প্রাপ্য অর্থ ও বেতন তারা পাচ্ছিল না। এই চুক্তির অনিবার্য পরিণতি হিসাবে নবাব ক্রমশ ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ছিলেন। উত্তর ভারতে এইভাবে অযোধ্যা ও দক্ষিণে আর্কট উভয় রাজ্যের ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক ক্রিস্টোফার বেইলি-র মতে—"the financial demands of the alliance merely served to erode the basis of the state, and ultimately to provide the conditions for British annexation," অর্থাৎ আর্থিক দাবিদাওয়া ক্রমশ রাজ্যের পায়ের তলার মাটি সরিয়ে দেয়, ফলে ব্রিটিশ আগ্রাসনের ক্ষেত্রেও সহজ হয়।

এই পরিস্থিতিতে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ডালহৌসী গভর্নর-জেনারেল রূপে ভারতে আসেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বিশ্বাসী ডালহৌসী চেয়েছিলেন ভারতের যতটা অঞ্চলে ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ অধিকার বা শাসন ব্যপ্ত করা সম্ভব তা তিনি করে যাবেন। তিনি আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে, "ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীনতাহরণ সুনিশ্চিত, তবে সেটা কিছু সময়সাপেক্ষ ব্যাপার মাত্র।" ডালহৌসীর এই নীতির পিছনে ছিল তাঁর এই ধারণা যে, দেশীয় শাসকদের রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ছিল প্রজাপীড়ন ও দুর্নীতিপুষ্ট। সেই তুলনায় ব্রিটিশ-ভারতের শাসনব্যবস্থা বহু পরিমাণে উন্নত। তবে এই রাজ্যবিস্তার নীতির মূল প্রেরণা ছিল ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধি। অন্যান্য সাম্রাজ্যবিস্তারকামী ইংরেজদের মতোই ডালহৌসীর এই বিশ্বাস ছিল যে, দেশীয় রাজ্যগুলিতে ব্রিটিশ পণ্যের কম কাটতির কারণ ঐ রাজ্যসমূহে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার অভাব। তাছাড়া এই গোত্রীয় শাসকরা ভাবতেন যে, তাদের 'ভারতীয় মিত্ররা' ইতিমধ্যেই তাঁদের ভারত বিজয়ের পথ সুগম করে দিয়েছিল যে উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গে মিত্রতা করা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। দেশীয় রাজ্যের পক্ষে প্রশাসনিক অক্ষমতার কারণটি এই মিত্রতাকে জীর্ণ করে দিয়েছে।

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে লর্ড ডালহৌসী 'স্বত্ববিলোপ নীতি'-কে কাজে লাগিয়েছিলেন। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপক আর্থিক ব্যয় খানিকটা লাঘব করার জন্যেও ডালহৌসী এই আশ্রিত রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। এই নীতি অনুসারে কোনো 'আশ্রিত' রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তার রাজ্য সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেওয়া হত। চিরাচরিত 'হিন্দুপ্রথা' অনুসারে অপুত্রক ব্যক্তির সম্পত্তি 'দত্তক' পুত্রের পাওয়ার কথা। ডালহৌসীর আইনে এটা মানা হয়নি। জীবিত অবস্থায় আশ্রিত 'অপুত্রক' রাজা যদি কোনো 'দত্তক' পুত্র নিয়ে থাকেন এবং এটি যদি ব্রিটিশ-কর্তৃপক্ষ দ্বারা আগে থেকেই অনুমোদিত

হয়ে থাকে শুধু সে ক্ষেত্রেই রাজ্যটি আশ্রিত রাজ্য হিসাবে টিকে থাকবে—স্বত্ববিলোপ নীতি এইভাবে প্রযোজ্য হয়েছিল। অতএব, ১৮৪৮ সালে সাতারা, ১৮৫৩ সালে ঝাঁসি এবং ১৮৫৪-তে নাগপুর সরাসরি ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসে।

লর্ড ডালহৌসী বহু ভূতপূর্ব রাজা বা শাসকের সনদ ও উপাধি বাতিল করে দেন, প্রাপ্য বৃত্তিও (যেমন পেশবা) বন্ধ করে দেন। কর্ণাটক ও সুরাটের নবাব এবং তাঞ্জোরের রাজার উপাধি কেড়ে নেওয়া হয়।

অযোধ্যা রাজ্যটিকে গ্রাস করবার জন্য লর্ড ডালহৌসী ব্যগ্র ছিলেন। ১৮০১ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তির পরবর্তীকালে 'আউধের' অবস্থা ক্রমশ হীন হয়। লর্ড বেন্টিঙ্ক, লর্ড অকল্যান্ড প্রমুখ গভর্ণর জেনারেলরা প্রত্যেকেই 'আউধের' প্রশাসনিক সংকট নিয়ে নবাবকে সতর্ক করলেও তার কোন উন্নতি হয়নি। ডালহৌসী এর প্রতিকারকল্পে তিনটি উপায় দর্শান—অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের ক্ষমতা স্থায়ীভাবে কোম্পানির হাতে তুলে দিয়ে বা অযোধ্যার নবাব কিছুদিনের জন্য রাজ্যের প্রশাসনিক দায়িত্ব কোম্পানিকে সঁপে দিয়ে অথবা অযোধ্যাকে দখল করে নিয়ে—এই সমস্যার সমাধান ঘটানো সম্ভব। যেহেতু বক্সার-যুদ্ধের আমল থেকে 'আউধের' নবাব ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে এসেছেন, এবং উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নে এই রাজ্য গ্রাস করা যেত না। ফলে ডালহৌসী বা কোম্পানিকে প্রশাসনিক নিপীড়ন থেকে অযোধ্যার প্রজাদের উদ্ধার করার সাধু উদ্দেশ্য দর্শানো ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। অতএব, ডালহৌসীর পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, যে, নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ্ ঠিকমতো রাজ্যশাসনে মনোযোগী নন। অতঃপর ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি 'নবাবকে ' ভাতা দিয়ে অযোধ্যা গ্রাস করে।

এতে সন্দেহ নেই অযোধ্যার অভ্যন্তরীণ সংকটে অন্যান্য সামন্ততান্ত্রিক শাসকদের মতো নবাবরাও স্বার্থপরভাবে ভোগবিলাসে ব্যস্ত থেকে ইন্ধন জুগিয়েছিল। কিন্তু এই শোচনীয় পরিস্থিতির জন্য কোম্পানির কূটনীতি ও ধুরন্ধর রাজনৈতিক চালও কম দায়ী ছিল না। ১৮০১ সাল থেকে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও কোম্পানি পিছন থেকে নবাবের স্বাধীন ক্ষমতায় লাগাম টেনে ধরে ও অযোধ্যা-র রাজনৈতিক ও আর্থিক ব্যাপারে দাবিদাওয়া বাড়িয়েই চলে। ডালহৌসীর হৃদয় অযোধ্যার প্রজাদের দুঃখে কাতর হয়ে ওঠার একটা গূঢ় কারণ ছিল এই যে, তাঁর মনে হয়েছিল এই রাজ্যটি ম্যাঞ্চেস্টারের শিল্পসম্ভারের খুব ভালো বাজার হতে পারে, এই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য রাজ্যটির প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব দরকার হয়ে পড়েছিল। ব্রিটেনের বস্ত্রশিল্পে কাঁচাতুলার অভাব দূর করার জন্য ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে ডালহৌসী নিজামের হাত থেকে বেরার প্রদেশের কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেন। কারণ এই এলাকা তুলা উৎপাদনে সমৃদ্ধ ছিল। বিশেষত ১৭৮৪ সালের পর থেকে দেখা যায়, গুজরাট ও চীনদেশের মধ্যে তুলা রপ্তানির ব্যবসা এত লাভদায়ক হয়ে দাঁড়ায়, যে কোম্পানি ও তার বেসরকারি বণিকরা ক্রমশই পশ্চিম উপকূলীয় এলাকার গুরুত্ব সম্পর্কে অধিক সক্রিয় হয়ে ওঠে।

অযোধ্যা ও উল্লিখিত অন্যান্য দেশীয় রাজ্য ছাড়াও ডালহৌসী দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের মাধ্যমে (১৮৪৮-৪৯) পাঞ্জাব দখল করেন। এক্ষেত্রেও মূলতানের একটি সামান্য বিদ্রোহ ও দুজন কোম্পানির কর্মচারীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ বাধে। ডালহৌসী এই কারণে সমালোচিত হন, যে বিদ্রোহের সময় প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিল

কোম্পানি ও মহারাজা দিলীপ সিং ছিলেন নাবালক শাসক ও কোম্পানিরই অভিভাবকত্বে। তাঁকে প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার অজুহাতে সিংহাসনচ্যুত করা অন্যায় ছিল।

এই ব্যাপক আগ্রাসী অভিযানের ফলে লর্ড ডালহৌসীর সময়ে যত দেশীয় রাজ্য কোম্পানির প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আসে, তা আয়তনে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস্-এর দ্বিগুণ ছিল এবং অন্য যে-কোনো গভর্নর-জেনারেলের অধীনে দখলিকৃত এলাকারও দ্বিগুণ।

৪০.৭.১ কোম্পানির সাম্রাজ্যবিস্তার নীতি ও মূল্যায়ন

ব্রিটিশ কর্তৃক কোনো দেশীয় রাজ্য অধিকারের আর বিশেষ কোনো তাৎপর্য ছিল না, কারণ দেশীয় রাজ্যগুলিকে কোনোরকমেই ভারতীয় রাজ্য বলা চলত না। পুরোপুরি ব্রিটিশ-অধিকারভুক্ত হওয়ার আগে থেকেই এর সবকিছুই ব্রিটিশের কর্তৃত্বাধীন ছিল। ব্রিটিশ-ভারতের জনসাধারণের অবস্থার সঙ্গে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের অবস্থার কোনো তফাত ছিল না। দেশীয় রাজ্যগুলিকে সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশের দিক থেকে একটা শাসনতান্ত্রিক লাভ। ভারতীয় জনগণের অবস্থায় কোনো গুণগত পরিবর্তন এই মালিকানা-বদল আনতে পারেনি।

অতএব, শেষ বিচারে যদি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রকৃত কারণ খোঁজা হয়, তাহলে বিচার্য বিষয়গুলি হবে অবশ্যই অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রাথমিকভাবে ক্ষমতায় আসে, কারণ তা অধীনস্থ সামরিক বাহিনীকে খুব মূল্যবান আর্থিক নিরাপত্তার যোগান দিতে পারে। বাংলার রাজস্বের ওপর দখল ক্রমশই উপকূলীয় অর্থনৈতিক কাজকর্মের ওপর দখল নিতে সাহায্য করে। এই দৃঢ় আর্থিক বুনিয়াদ না থাকলে ভারতব্যাপী যুদ্ধের ব্যয় বহন করতে সম্ভব হত না। বাণিজ্যিক লাভের অঙ্ক যে কী পরিমাণ ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের পিছনে কাজ করেছিল তা বোঝা যায় কোম্পানির পশ্চিম উপকূল দখলের দৃষ্টান্তে। চীনের বিকাশশীল বাজারে রপ্তানির জন্য তুলা উৎপাদনের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা ১৭৮৪ সালের পর কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে পড়েছিল। ১৭৮৩ থেকে ১৮০২ সালের মধ্যে গুজরাট থেকে বোম্বাই হয়ে প্রেরিত তুলার পরিমাণ দাঁড়ায় বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা থেকে ৩৫ লক্ষ টাকায়। বোঝাই যাচ্ছে, বেইলির মতে—"The company was drawn into conquest in the Western Deccan and Central India Primarily because the demand of its fiscal and military machine."

এছাড়াও, শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ আগ্রাসনকেই অস্ত্র করে নয়, অধীনস্থ দেশীয় মিত্রশক্তিবর্গ ও নির্ভরশীল দেশীয় সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে গূঢ় কূটনৈতিক কৌশলে বা চালে নিজস্বার্থে ব্যবহার করেও কোম্পানি কার্যোদ্ধার করেছিল। অধীনস্থ রাজা বা নবাবদের সামরিকভাবে নিবীর্য করে দিলেও, তাদের সম্পদ বা আর্থিক সংগতিকে সুকৌশলে কোম্পানি তার সাম্রাজ্যবিস্তারে বা বিদ্রোহ দমনে ব্যবহার করত। এক্ষেত্রে দেশীয় অধীনস্থ শক্তিবর্গকে স্বজাতিরই বিদ্রোহ দমনে খুব সুকৌশলে ব্যবহার করেছিল কোম্পানি (যেমন সিন্ধিয়া ভোঁসলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গায়কোয়াড়কে সহযোগী হিসাবে কোম্পানির ব্যবহার)।

৪০.৮ অনুশীলনী

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

১। ওয়েলেসলির সাম্রাজ্যবিস্তারের পিছনে তৎকালীন পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর গুরুত্ব কী? সাম্রাজ্যবিস্তারে সাফল্যের জন্য কী কী কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল?

২। লর্ড ডালহৌসীর রাজ্যগ্রাস নীতি ও রাজ্যজয় বিশ্লেষণ কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

৩। কী কারণে মারাঠাশক্তি ব্রিটিশদের কাছে পরাস্ত হয়?

৪। ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে ব্রিটিশদের অযোধ্যা নীতি কী ছিল?

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

৫। 'স্বত্ববিলোপ নীতি'-র মূল সূত্র কী ছিল?

৬। বেসিনের সন্ধি ও সলবঈ-এর চুক্তির সময় ও স্বাক্ষরকারীদের নাম লেখ।

৪০.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। S. M. Burke, Salim Al-Din Qureishi : *The British Raj in India : An Historical Review.*

২। A. C. Banerjee. : *The New History of Modern India.*

৩। বিপান চন্দ্র (অনুবাদ—গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত) : আধুনিক ভারত।

৪। C. A. Bayly : *The New Cambridge History of India : Indian Society and the Making of the British Empire.*

একক ৪১ ❐ ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের পরিবর্তনশীল ধারা—আর্থিক নিষ্ক্রমণ—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ : ব্রিটিশ আধিপত্যের প্রভাব—অবশিল্পায়ন

গঠন :

৪১.০ উদ্দেশ্য
৪১.১ প্রস্তাবনা
৪১.২ প্রারম্ভিক কথা
৪১.৩ কোম্পানির বাণিজ্য
৪১.৪ কোম্পানির বাণিজ্য ও এজেন্সি হাউস
৪১.৪.১ কোম্পানির বিনিয়োগ ও ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ভূমিকা
৪১.৫ একচেটিয়া কারবারের প্রভাব : ভারতীয় বাজার ও উৎপাদক
৪১.৬ পরিবর্তনশীল বাণিজ্যের ধারা
৪১.৭ অবশিল্পায়ন
৪১.৭.১ অবশিল্পায়ন ও সুতিবস্ত্র শিল্প
৪১.৮ আর্থিক নিষ্ক্রমণ বা সম্পদ নির্গম
৪১.৯ সারাংশ
৪১.১০ অনুশীলনী
৪১.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৪১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করতে পারবেন—

- ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আধিপত্যের প্রভাব অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কীভাবে কাজ করেছিল।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য নীতি ও বিনিয়োগ।
- ইংরেজ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য।
- কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য।
- পরিবর্তনশীল বাণিজ্যের ধারা।
- অবশিল্পায়ন।
- আর্থিক নিষ্ক্রমণ।

৪১.১ প্রস্তাবনা

ইংরেজরা ভারতবর্ষে এসেছিল বণিকরূপে কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শাসক হিসেবে—রাজনৈতিক ইতিহাসে এই বহুপ্রচলিত কথাটি তথ্যভিত্তিকভাবে প্রমাণিত। ইংরেজ শাসনের অর্থনৈতিক প্রভাবের একটি দিক এই এককটিতে আলোচিত হয়েছে। ইংরেজরা ভারতবর্ষকে পুরোপুরি ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আনার বহুপূর্বে ভারতবর্ষকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই। কীভাবে ইংল্যান্ডের প্রয়োজন অনুসারে ভারতীয় অর্থনীতি ও সম্পদের উৎসগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছিল এই এককটিতে তাই আলোচনা করা হয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিনিয়োগ নীতি, ইংরেজ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য, ১৮১৩-তে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অবসান সমস্তই নির্ধারণ করা হয়েছিল ইংল্যান্ডের স্বার্থের কথা ভেবেই। ভারতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ক্ষতিকর অভিঘাত সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতীয় কুটিরশিল্পের ধ্বংস ও ভারতীয় সম্পদের উৎসের ক্রমিক নির্গমন এরই ফল। এই এককটি পাঠ করলে কীভাবে তা ঘটেছিল তা জানা যাবে।

৪১.২ প্রারম্ভিক কথা

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অপকেন্দ্র শক্তি অত্যন্ত শক্তিশালী ও কেন্দ্রীভূত মোগল সাম্রাজ্যকে ভেঙে টুকরো করেছিল, ফলে কতকগুলি আঞ্চলিক শক্তির উত্থান ঘটেছিল। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করার পর ভারতীয় ইতিহাসের অন্য এক অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছিল। আমাদের দেশে ব্রিটিশ শোষণের পরপর তিনটি পর্ব ছিল বলে অনেক ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন। এর প্রথম পর্বটি ছিল ১৭৫৭ থেকে ১৮১৩-র বণিক পর্যায়। সরাসরি লুঠ ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসা ছিল এই পর্বের লক্ষণ। ইংল্যান্ডে ও ইউরোপে রপ্তানির জন্য ভারতে তৈরি মাল যথেষ্ট কম দামে কিনে ও তা থেকে উদ্বৃত্ত বিনিয়োগ করে এটি চলেছিল। ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব নাটকীয়ভাবে পাল্টে দিয়েছিল ব্যবসার পুরো ধাঁচটাই। ১৮১৩ থেকে ১৮৫৮ অবধি সময়কে বলা যেতে পারে অবাধ ব্যবসার, শিল্পবাদী শোষণের ধ্রুপদী যুগ। ভারতের চিরায়ত হস্তশিল্পকে এসময়ে উপড়ে ফেলা হল এবং অচিরেই তাকে ম্যানচেস্টার থেকে আনা কাপড়ের বাজারে ও কাঁচামালের উৎসে পরিণত করা হয়। এই এককটি পড়লে জানা যাবে কিভাবে ব্রিটিশ শোষণের অর্থনৈতিক নাগপাশ ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল যার অবশ্যম্ভাবী ফল হয়েছিল ভারতীয় হস্তশিল্পের ধ্বংস ও পরবর্তী পর্যায়ের আর্থিক নিষ্ক্রমণ।

৪১.৩ কোম্পানির বাণিজ্য

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতের বহির্বাণিজ্য এবং অন্তর্বাণিজ্যে প্রধানত তিন ধরনের বণিকরা লিপ্ত ছিল। বিভিন্ন ইওরোপীয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অর্থাৎ ইংরেজ, ফরাসি, ওলন্দাজ ইত্যাদি চার্টার্ড কোম্পানিগুলি,

আর্মেনিয় বণিকদের মতো এশীয় বণিকেরা এবং ভারতীয় বণিকগণ। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট, ফারুকশিয়ারের ফরমান ইংরেজ কোম্পানিগুলিকে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়ে তাদের অন্যান্য বণিকদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। ফরমানে বলা হয়েছিল যে, ইংরেজ কোম্পানি মোগল সাম্রাজ্যে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার বিনিময়ে সম্রাটকে বছরে ৩,০০০ টাকা নজরানা দেবে। যদিও অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধেই মোগল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়তে থাকে, বাণিজ্যে কিন্তু অবক্ষয়ের চিহ্ন দেখা যায়নি। ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দে কেবল ব্রিটেনই ৪,৯৩,২৫৭ পাউন্ড মূল্যের ভারতীয় পণ্য নিজ দেশে আমদানি করেছিল। ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেন আমদানি করেছিল ১,০৫৯,৭৫৯ পাউন্ড মূল্যের ভারতীয় পণ্য। বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে এই ব্রিটেনকৃত ভারতীয় পণ্যের আমদানি দাঁড়ায় ১,০৯৮,৭১২ পাউন্ড। অপরদিকে ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারত ব্রিটেনের কাছ থেকে বুলিয়নের মাধ্যমে ১৭,০৪৭,১৭৩ পাউন্ড লাভ করেছিল।

কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের দুর্বলতার ফলে ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দের ফর্মানকে আইন অনুযায়ী প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। কোম্পানির কর্মচারীরা প্রায়ই দস্তকের অপব্যবহার করে ফর্মানের শর্ত লঙ্ঘন করত। পলাশীর বিজয় বাংলায় ব্রিটিশ প্রভাবকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করল, ফলে কোম্পানির কর্মচারীরা অন্তর্বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও শুল্ক ছাড়ের সুযোগ নিতে লাগল অথচ ফারুখশিয়ারের ফর্মানে কোম্পানির নিজস্ব আমদানি-রপ্তানির ওপরই কেবল শুল্ক ছাড়ের সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোম্পানির কর্মচারীদের পুরো শুল্ক দিতে হবে। দস্তকের অপব্যবহারের ফলে ভারতীয় বণিকগণ গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল কারণ তাদের আগের মতোই চড়া হারে শুল্ক দিতে হচ্ছিল।

১৭৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাণিজ্যিক দিক দিয়ে বাংলা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে পরিণত হয়েছিল। ইংরেজ কোম্পানির বাংলা বিজয় এবং ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার দেওয়ানি লাভ বাংলার বাজারের ওপর ইংরেজ কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। ফলে বাংলার উৎপাদকেরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী তাদের উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রি করার সুযোগ ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য নির্দিষ্ট কোম্পানির কর্মচারী ও গোমস্তাদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য থাকত এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্যও ধার্য করে দিত কোম্পানির কর্মচারীরা। দেওয়ানি লাভের পর অর্থাৎ বাংলার রাজস্বের ওপর নিরঙ্কুশ অধিকার লাভ করার ফলে ইংরেজ কোম্পানির বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আরও একটি সুদুরপ্রসারী পরিবর্তন দেখা দিল।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের আগে ভারতে বুলিয়ন আমদানি করে ইংরেজ কোম্পানি তার রপ্তানি বাণিজ্য চালাত। কিন্তু দেওয়ানি লাভের পরে রপ্তানিযোগ্য ভারতীয় পণ্য ক্রয়ের জন্য ইংরেজ কোম্পানিকে আর বুলিয়ান আমদানি করতে হয়নি। কারণ কোম্পানি তখন থেকে বাংলার রাজস্ব দিয়েই তার বার্ষিক বিনিয়োগ করত। বাংলা কেবলমাত্র ইওরোপীয় বাজারে প্রধান পণ্য সরবরাহকারীই ছিল না, কোম্পানি চীন থেকে যে চা ও রেশম কিনত তার জন্য বুলিয়ন যোগান দিতেও বাংলা বাধ্য হয়েছিল। রৌপ্যমুদ্রা রপ্তানি হয়ে যাওয়ার অবশ্যম্ভাবী কুফল হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে টাকার যোগান হ্রাস পেয়েছিল।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকেই ভারতের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতীয় বাণিজ্য পুঁজির পরিমাণ কমতে থাকে। ইংরেজ কোম্পানি ও ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত ইংরেজ বণিকদের এজেন্সি হাউসগুলির মাধ্যমে বিনিয়োগকৃত পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধির ফলেই ভারতীয় বণিকদের পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল।

১৭৭৯ থেকে ১৭৮৬-র মধ্যে শিল্পবিপ্লবজাত নানা নতুন প্রযুক্তির উদ্ভবের ফলে ১৭৮৭ নাগাদই ল্যাংকাশায়ার সূতীবস্ত্র শিল্প ভারতীয় শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারছিল। তবে সূক্ষ্মতম মসলিনবস্ত্রের ক্ষেত্রে ভারতীয় বস্ত্রের কোনো তুলনাই ছিল না। বস্ত্রশিল্পে বিনিয়োগকারী ইংল্যান্ডের শিল্পস্বার্থ চাইছিলো ভারতবর্ষ থেকে সূক্ষ্ম সূতো ও সূতীবস্ত্র রপ্তানির পরিবর্তে তুলো আমদানি করতে। ১৭৯২-৯৩-এ এই দাবি আরও জোরদার হয়েছিল এবং ম্যানচেস্টারের বস্ত্রশিল্পে বিনিয়োগকারীগণ চাইছিল ভারতীয় সূতিবস্ত্র আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হোক। কিন্তু এই দাবির সঙ্গে আরও অন্যান্য গোষ্ঠীর দাবি ও স্বার্থও প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছিল, ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের সনদের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এই সমস্তস্বার্থও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের সনদের মাধ্যমে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত বণিকেরা কতগুলি সুবিধা আদায় করেছিল। এই সনদে বলা হল যে তারা ৩,০০০ টন ওজনের পণ্য পর্যন্ত কোম্পানির জাহাজে আমদানি-রপ্তানি করতে পারবে। কিন্তু এর জন্য যে ভাড়া তাদের দিতে হবে তার হার ছিল যথেষ্ট বেশি। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে একটি আইনের মাধ্যমে গভর্নর-জেনারেল ওয়েলেসলি বেসরকারি ইংরেজ বণিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য একটি আইন করেন। এই আইন অনুসারে ব্যক্তিগত ইংরেজ বণিকরা ভারতীয় জাহাজে করে ব্রিটেনে পণ্য রপ্তানি করার অনুমতি পায়। এই পদক্ষেপ ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করেছিল। বাংলা থেকে ইংরেজ বণিককরা অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক পর্বে মূলত নীল, কাঁচা রেশম, সূতি ও রেশমী বস্ত্রের থান, কাঁচা তুলো, চিনি, শস্য ও সোরা ইউরোপের বাজারে রপ্তানি করত। এই সময় সূতি ও রেশম বস্ত্রের রপ্তানি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নীল, কাঁচা তুলা এবং আফিমের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংল্যান্ড যে পরিমাণে পণ্য ভারতে রপ্তানি করত, তার ৩৩ শতাংশই আসত ভারতে। বুলিয়ন ছাড়া ইংরেজরা যে সব পণ্য ভারতে রপ্তানি করত সেগুলি হল মদ, স্পিরিট, কাচ, ছুরি, কাঁচি, লোহা, পশমের বস্ত্র, বই এবং টুপি। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানির নীতি ছিল ইংল্যান্ডের শিল্পজাত পণ্য যত বেশি সম্ভব ভারতে রপ্তানি করা, যাতে ভারতীয় ভোক্তারা ঐ সমস্ত পণ্য ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতীয় বাণিজ্যদ্রব্য ক্রয়কেই কোম্পানির "বিনিয়োগ" বলা হত। বাংলায় সপ্তদশ শতকের শেষে ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে এই বিনিয়োগের মাধ্যম মূলত ছিল দাদ্‌নি বণিকেরা। এই বণিকগণ কোম্পানির কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে তাঁতিদের দিত নিয়মিত দ্রব্য সরবরাহের জন্য। এছাড়াও নগদ দ্রব্য ক্রয়ের ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু দাদ্‌নি বণিকদের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে এই বিনিয়োগ অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নানা কারণে পরিত্যাগ করা হয়েছিল।

পরিবর্তে ভারতীয় গোমস্তা বা কোম্পানির দালাল নিয়োগ করা হয়েছিল যারা কোম্পানির ইউরোপীয় কর্মচারীদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে কোম্পানির জন্য দ্রব্য ক্রয় করত। পরবর্তী বিভাগে এ বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা প্রসঙ্গক্রমে আসবে।

৪১.৪ কোম্পানির বাণিজ্য এবং এজেন্সি হাউস

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে ভারতের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানি এবং ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত ইংরেজ বণিকরা। কোম্পানির দাদ্‌নি ব্যবস্থা অবলুপ্তির ফলে ব্যক্তিগত বাণিজ্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। বৈদেশিক বাণিজ্যের বৃদ্ধির ফলে ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত ইংরেজ কর্মচারীরা তাদের নিজস্ব বাণিজ্য সংস্থা গড়ে তুলতে আরম্ভ করেছিল। এই সংস্থাগুলিকে বলা হত "এজেন্সি হাউস"। এই এজেন্সি হাউসগুলি ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত ইংরেজ কর্মচারীদের টাকা স্বদেশে প্রেরণ করার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ চীনের সঙ্গে আফিন বাণিজ্য শুরু হওয়ার সময় বাংলায় কম করে ১৫টি এজেন্সি হাউসের অস্তিত্ব ছিল এবং ঐগুলি অধিকাংশই ছিল ইংরেজ নিয়ন্ত্রিত। ভারতে ব্রিটিশ ব্যক্তিগত বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এই এজেন্সি হাউসগুলি। যদিও মূলত এই সংস্থাগুলি ছিল বাণিজ্য কুঠি কিন্তু একই সঙ্গে এগুলি ব্যাংকার, হুণ্ডির দালাল, জাহাজের মালিক, বিমার দালাল ও পণ্য সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করত। নীল, আফিম এবং উপকূল বাণিজ্য ইংরেজ ব্যক্তিগত বাণিজ্যের নতুন ক্ষেত্র খুলে দিয়েছিল।

এজেন্সি হাউসগুলি গড়ে ওঠার আগে দেশীয় বণিকরাই ইংরেজদের পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দালালের কাজ করত। এজেন্সি হাউসগুলি গড়ে ওঠার পর ভারতের বাণিজ্যিক অর্থনীতিতে ভারতীয় বেনিয়ানদের বা দালালদের গুরুত্ব ক্রমশ কমতে থাকে। এর ফলে অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকেই ভারতীয় বাণিজ্যে ভারতীয় পুঁজির পরিমাণ কমতে থাকে ও ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত ইংরেজ বণিকদের পুঁজির পরিমাণ বাড়তে থাকে। ভারতীয় বাণিজ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বেনিয়ানদের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে আসে।

১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল। এর আগে পর্যন্ত এজেন্সি হাউসগুলিই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ইংরেজ বণিক ও নীল আবাদকারীদের কাছে ব্যাঙ্কের কাজ করত। আলেকজান্ডার অ্যান্ড কোম্পানির মতো এজেন্সি হাউস নোট ছাপাবার অধিকারও লাভ করেছিল। ১৭৮০ ও ৯০-এর দশকে নীলচাষ আরও হয়েছিল, ইংরেজ বণিকদের চীনে আফিম বিক্রির লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল এবং জাহাজ ব্যবসারও বিকাশ ঘটেছিল, ফলে এজেন্সি হাউসগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকল। ১৮৩০-এর গোড়ার দিকে একটি এজেন্সি হাউসই হয় সম্পূর্ণ মালিক হিসেবে নয় অংশীদার হিসেবে অন্তত ৫৬টি নীল তৈরির কারখানার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই সময়ে বাংলার আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ওপর কয়েকটি এজেন্সি হাউসের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এজেন্সি হাউসগুলির প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে কোম্পানির সরকার। বৃহত্তর এজেন্সি হাউসগুলিকে কোম্পানির সরকার ঋণদান করে। কোম্পানি সরকারের বাজেট ঘাটতি হওয়া সত্ত্বেও এজেন্সি

হাউসগুলির আর্থিক সঙ্কটের সময় সরকার সেগুলিকে উদার হাতে ঋণদান করতে থাকে। এই সরকারি সাহায্যদানের পিছনে কতকগুলি জোরালো কারণ ছিল। প্রথমত, এজেন্সি হাউসগুলির বণিকদের স্বার্থের সঙ্গে প্রশাসনিক ও সামরিক কাজে লিপ্ত কর্মচারীদের স্বার্থ সংযুক্ত ছিল। দ্বিতীয়ত সরকারি রাজস্ব অনেকটাই ইংরেজ বণিকদের সাফল্য ও ব্যর্থতার ওপর নির্ভর করত।

১৮৩০ থেকে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে একের পর এক এজেন্সি হাউসগুলি কিন্তু ভেঙে পড়তে থাকে। এজেন্সি হাউসগুলির ধ্বংসের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে ইংরেজ বণিকদের ফাটকা কারবার যা মূলত নীল তৈরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ১৮০-এর দশকে ইংল্যান্ডের বাজারে যে আর্থিক মন্দা দেখা দেয় তার ফলে ইংল্যান্ডের নীলের ও অন্যান্য পণ্যের বাজারের প্রভূত ক্ষতি হয়। অবশ্যম্ভাবীভাবে এজেন্সি হাউসগুলি আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে পড়ে। নীলের কারবারের ক্ষতি এজেন্সি হাউসগুলির ধ্বংসের অন্যতম কারণ ছিল। এজেন্সি হাউসগুলির ভাঙনের প্রভাব মারাত্মকভাবে ব্যাঙ্কগুলির ওপর পড়লো। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে পামার কোম্পানি ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গেই উক্ত কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক ভেঙে পড়ে। ম্যাকিনটস কোম্পানির পতন ও কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের পতন প্রায় একই সঙ্গে হয়েছিল। এমনিতেই ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় দেশী বণিকদের ভূমিকা ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ক্রমক্ষীয়মাণ হয়ে পড়ছিল। ব্যাঙ্কগুলি থেকে যারা ঋণ পায় তাদের মধ্যে ভারতীয় নাম বিরল হয়ে দাঁড়ায়। ত্রিশের দশকে এজেন্সি হাউসগুলির ব্যবসার মন্দাতে বাংলার বণিকরাও অনেক খেসারৎ দেয় এবং তারা ইংরেজ চালিত ব্যবসা থেকে সরে যেতে থাকে। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার বাইরে, টাকার বাজারেও দেশি পুঁজির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল। এর জন্য দায়ী ছিল ইংরেজ পুঁজির স্বার্থের খাতিরে কোম্পানি সরকারের হস্তক্ষেপ। বহুবার কোম্পানি রাজস্ব থেকে কম সুদে ইংরেজ বণিকদের ঋণ দেয় এমন এক সময়ে যখন পুঁজির বাজারে টানাটানির দরুন ভারতীয় বণিকরা উঁচু হারে সুদ আদায় করার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু কোম্পানির হস্তক্ষেপের ফলে তা সম্ভব হয়নি। পূর্বভারতে এভাবে বিদেশী পুঁজির আধিপত্যের ভিত্তি তৈরি হয়েছিল বলে অনেক ঐতিহাসিকই মনে করেন।

৪১.৪.১ কোম্পানির বিনিয়োগ ও ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ভূমিকা

১৭৫৭ থেকে ১৮১৩ এই সময়ের মধ্যে ব্রিটেন শোষণ চালিয়েছিল দুটি উপায়ে—ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার দ্বারা এবং এই বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত ইওরোপীয় বণিক দলের সক্রিয় সহায়তা দ্বারা কোম্পানির চীন বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই সহায়তা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা কোম্পানি থেকে প্রাপ্ত তাদের বেতন, যেহেতু তা যথেষ্ট কম ছিল, ব্যক্তিগত বাণিজ্যের মাধ্যমে পরিপূরণ করার প্রচেষ্টা করত। আগে বলা হয়েছে যে ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে ফারুকশিয়ারের কাছ থেকে পাওয়া ফরমানের জোরে ইংরেজ কোম্পানি বাণিজ্যে পণ্যের ওপর শুল্ক ছাড় পেয়েছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোম্পানির কর্মচারীদের পুরো শুল্ক দিতে হবে একথাও বলা শর্ত লঙ্ঘন করে বিনাশুল্কে তাদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য চালাতে থাকে।

১৭৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাণিজ্যিক দিক দিয়ে বাংলা সবচেয়ে গরুত্বপূর্ণ প্রদেশে পরিণত হয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধ এবং ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার দেওয়ানি লাভ ইংরেজ কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বাংলার বাজারের ওপর এই একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখতে কোম্পানি অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণও কাজে লাগিয়েছিল ফলে বাংলার উৎপাদকগণ নিজেদের ইচ্ছানুসারে তাদের পণ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রি করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের আগে ভারতে বুলিয়ন আমদানি করে ইংরেজ কোম্পানি তার বাণিজ্য চালাত। বছরে এই বুলিয়ন আমদানির পরিমাণ ছিল ৭ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ পাউন্ড। দেওয়ানি লাভের পরে রপ্তানিযোগ্য ভারতীয় পণ্য ক্রয়ের জন্য ইংরেজ কোম্পানিকে আর বুলিয়ন আমদানি করতে হয়নি। কোম্পানি বাংলার রাজস্ব দিয়েই তার বার্ষিক বিনিয়োগ করতে শুরু করেছিল।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। কোম্পানির কর্মচারীরা এই আয় দেশে পাঠানো নিয়ে সমস্যায় পড়ে। প্রচলিত প্রথা ছিল এইরকম যে, ইংরেজ বণিকরা তাদের অর্জিত মুনাফা ভারতে ইংরেজ কোম্পানির তহবিলে জমা রাখবে; পরিবর্তে তারা পেত বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ। দেশে ফিরে তারা কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টরস্-এর কাছ থেকে এই বিল মারফৎ সে টাকা ভাঙিয়ে নিতে পারত। কিন্তু এইভাবে পাঠানো টাকার বিনিময় হার কোম্পানির ইংরেজ বণিকদের কাছে আদৌ লাভজনক ছিল না। এইজন্য তারা ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি ইউরোপীয় কোম্পানির মাধ্যমে এই টাকা পাঠাতে শুরু করে। ফল হল এই যে, এই কোম্পানিগুলিও ইংরেজ বণিকদের টাকার ওপর নির্ভর করতে শুরু করল এবং ইংরেজ বণিকদের গচ্ছিত টাকা বিদেশি কোম্পানিগুলি ভারতে তাদের পণ্য ক্রয় করার জন্য বাণিজ্যিক পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করতে লাগল। আগেও বলা হয়েছে যে এর ফলে বিদেশি কোম্পানিগুলি ইউরোপ থেকে সোনা বা রূপা অর্থাৎ বুলিয়ন আমদানি বন্ধ করে দিতে লাগল।

আগের বিভাগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের সনদের মাধ্যমে ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত বণিকরা কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিয়েছিল। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দের অপর একটি আইনের দ্বারা বেসরকারি ইংরেজ বণিকদের ভারতীয় জাহাজে পণ্য রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হয়। এর ফলে ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যের বৃদ্ধি ঘটে। বাংলাদেশ থেকে ইংরেজ বণিকগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে মূলত নীল, কাঁচা রেশম ও সূতি বস্ত্রর থান, কাঁচা তুলো, চিনি, শস্য ও সোরা ইউরোপের বাজারে রপ্তানি করত। এইসময় সূতি ও রেশম বস্ত্রের রপ্তানি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ১৮১২ নাগাদ নীল, কাঁচা তুলো এবং আফিমের রপ্তানি বৃদ্ধি পেতে লাগল।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৭০-এর দশকে চীনের ক্যান্টন বন্দর থেকে বছরে ৬ মিলিয়ন পাউন্ড চা কিনত। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৩৫ মিলিয়ন পাউন্ড। ১৭৭০-এর দশক পর্যন্ত ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চীন থেকে চা কিনত মূলত ইংল্যান্ডের রূপো দিয়ে। কিন্তু ১৭৯০-এর দশকে ইংরেজ কোম্পানি কর্তৃক বাংলার বাণিজ্যের ওপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর দেখা গেল যে

ইংরেজ কোম্পানি চীনে সমগ্র রপ্তানির মাত্র ৮.৭ শতাংশ ছিল ইংল্যান্ডের রূপো, ৩৭.২ শতাংশ ছিল ব্রিটিশ পণ্য এবং ৫৪.১ শতাংশ ছিল ভারতীয় পণ্য। ১৮৩০-এর গোড়ার দিকে ইংরেজ কোম্পানি চীনের সঙ্গে বাণিজ্য চালাত প্রায় ভারতীয় পণ্যের মাধ্যমেই। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার শেষ হয়ে গেলে বেসরকারি ব্যক্তিগত বণিকদের মুনাফার অংশ স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পেতে লাগল। ব্রিটেনের বদলে চীনে ভারতীয় পণ্য রপ্তানি করে তারা আরও লাভবান হচ্ছিল। ফলে কোম্পানি এবং ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত বণিকরা উভয়েই চীনে প্রচুর আফিম রপ্তানি করে মুনাফা অর্জন করতে লাগল। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারত থেকে চীনে প্রতি বছর গড়ে ১২,২৬১ চেস্ট আফিম রপ্তানি হত। ১৮৩১-১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারত থেকে চীনে আফিম রপ্তানির বার্ষিক গড় পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৪৩,৫৪৮ চেস্ট। চীনের সঙ্গে এই আফিমের ফলাও ব্যবসা দুদিক থেকে ইংরেজদের লাভের কারণ হচ্ছিল। একদিকে, আফিম বাণিজ্য থেকে কোম্পানি পেত প্রচুর রাজস্ব, অপরদিকে আফিম ব্যবসায় আহৃত বিপুল মুনাফার একটা অংশ ইংরেজ বণিকরা নিজের দেশে পাঠাত।

১৭৯৫-৯৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ বণিকদের ভারত থেকে রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য ছিল ২০.৫ মিলিয়ন টাকা। ১৮১১-১২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এই পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৩৪ মিলিয়ন টাকা। এই সময়ের মধ্যে ইংল্যান্ড কাঁচা তুলো, নীল, চিনিশস্য প্রভৃতি ভারতীয় পণ্য রপ্তানির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাজার ছিল। এক্ষেত্রে এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, ইংরেজ কোম্পানির ভারতে বিনিয়োগ অষ্টাদশ শতকের শেষে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে স্পষ্টতই ছিল ব্রিটিশ অর্থনীতির স্বার্থে ও প্রয়োজনে। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদের কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার লুপ্ত হলেও ব্যক্তিগত বাণিজ্যে যুক্ত ইংরেজ বেসরকারি বণিকরাও ইংল্যান্ডের লাভের জন্যই ভারতে তাদের বাণিজ্য নীতি পরিচালনা করেছিল।

৪১.৫ একচেটিয়া কারবারের প্রভাব : ভারতীয় বাজার ও উৎপাদক

কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকারের ফল ভারতীয় বণিক এবং উৎপাদনকারীদের ওপর হয়েছিল অত্যন্ত ক্ষতিকর ও বিধ্বংসী। ভারতীয় বণিকদের কাছ থেকে ভারতীয় বণিকদের সরাসরি পণ্য ক্রয়ের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। নানারকম অর্থনৈতিক এবং অর্থনীতি বহির্ভূত নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ইংরেজ বণিকরা সরাসরি উৎপাদকদের কাছ থেকে কম মূল্য দিয়ে পণ্য ক্রয় করার ব্যবস্থা করে। স্বাধীন ভারতীয় উৎপাদকদের উৎপাদনকেও নিরুদ্যম করা হয় কখনো সরাসরি নানা বিধিনিষেধ আরোপ করে, আবার কখনো রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণকে কাজে লাগিয়ে। কোম্পানির এই ভূমিকা কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সুস্পষ্ট ছিল।

কোম্পানির বাণিজ্য নীতিতে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ভারতীয় রেশমশিল্প। ভারতের রেশম বণিকেরা ১৭৪৯-৫৩'র মধ্যে কাশিমবাজার থেকে ১৯,৫০৩ মণ কাঁচা রেশম ক্রয় করেছিল। ১৭৬৪-৬৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ৬,৮৫৮ মণ। উল্লিখিত সময়ের মধ্যেই রেশম থান কেনার পরিমাণও ১,০৫,৬৫১ থেকে কমে ৭১,৪৯৫ মণ দাঁড়ায়। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের পর মুর্শিদাবাদ থেকে সুরাটে রেশম যাওয়া বন্ধ হয়ে

যায়। রেশম বাণিজ্যের সবচেয়ে খারাপ দিক ছিল কাঁচামাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোম্পানির হস্তক্ষেপ। এই হস্তক্ষেপের ফলে দাদ্‌নি বণিকরা ও বেনিয়ানরা কোম্পানির কর্মচারীদের গোমস্তা বা এজেন্ট হিসেবে বাণিজ্যে অংশ নেবার সুযোগ হারিয়েছিল। ১৭৮৮-৮৯ সাল নাগাদ এজেন্সি ব্যবস্থা গড়ে ওঠার ফলে কোম্পানির বস্ত্র আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে দালালরাও গুরুত্ব হারাল। এজেন্সি হাউসগুলির প্রতিষ্ঠা আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য থেকেও ভারতীয় বণিকদের সম্পূর্ণ বিতাড়িত করে। কিছু ভারতীয় বণিক ইংরেজ বাণিজ্যকুঠিগুলিকে ঋণদান করতে থাকে কিন্তু ঋণদানের শর্ত সম্পূর্ণ ইওরোপীয় বণিকদের পক্ষে যাওয়ার ফলে তারা পুঁজি জমিদারি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ইত্যাদিতে খাটাতে শুরু করল। কোম্পানির একচেটিয়া কারবারের দ্বারা ভারতীয় উৎপাদকরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল।

লবণ এবং আফিম তৈরির ক্ষেত্রেও একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোম্পানির প্রকৃত নজর ছিল রাজস্বের দিকে, বাণিজ্যের দিকে নয়। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে হাউস অফ্ কমন্স-এর তৈরি একটি কমিটির সামনে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে হল্ট ম্যাকেঞ্জি একথা বলেন। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে কোম্পানি লবণ তৈরি করার দায়িত্ব নিজের হাতে নেয় এবং বাংলার বিভিন্ন লবণ উৎপাদনকারী অঞ্চলে যেমন মেদিনীপুরের হিজলীতে, নোয়াখালির ভুলুয়াতে, চট্টগ্রাম এবং যশোরে ইউরোপীয় এজেন্ট নিযুক্ত করে। লবণের দাম ধার্য করে দেয় কোম্পানির গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল। ১৭৮৬-৮৭ সালে কর্নওয়ালিস এই ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন করে বছরের কতকগুলি সময়ে জনসাধারণের মধ্যে নীলামের মধ্যে লবণ সরবরাহের নিয়ম চালু করেন। এই ব্যবস্থায় প্রথমে লবণ প্রস্তুতকারী মোলুঙ্গীদের কাছ থেকে লবণ সংগ্রহ করা হত ও এই লবণ বিভিন্ন লবণ উৎপাদনকারী জেলাগুলির সরকারি গুদামে রাখা হত। এই সংগৃহীত লবণ এরপর সালকিয়ার বড় গুদামে রাখা হত এবং সেখান থেকে বছরে চারবার নীলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হত। এর আগে মোলুঙ্গীরা, যেহেতু তাদের খুব কম পারিশ্রমিকে কাজ করতে হত, তাদের উৎপাদনের একটা অংশ গোপনে দেশীয় বণিকদের বিক্রয় করত। কোম্পানি নানা আইনের মাধ্যমে তাদের এই গোপন ব্যবসা বন্ধ করে দেয়। ফলে মোলুঙ্গীরা অত্যন্ত দারিদ্র্যপীড়িত অবস্থায় পড়ে ও কোম্পানির ঋণের জালে সারাজীবনের মত বাঁধা পড়েছিল।

কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার আফিম চাষীদেরও অর্থনৈতিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিল। এজেন্সি ব্যবস্থায় আফিমের ক্ষেত্রে কোম্পানির এজেন্টরা দাদন হিসেবে রায়তদের অগ্রিম টাকা দিত এবং তাদের কাছ থেকে কাঁচা মাল সংগ্রহ করত। এই কাঁচা আফিম কোম্পানির কারখানাগুলিতে তৈরি করা হত বিক্রয়যোগ্য পণ্যে। রায়তদের দাদন দেওয়া হত তাদের জমির পরিমাপ অনুযায়ী। রায়তরা কোম্পানির এজেন্টদের কাছ থেকে আফিমের মূল্য পেত খুবই কম হারে এবং অনেকসময়ই আফিমের গুণগত মান নিকৃষ্ট এই অছিলায় রায়তদের তাদের প্রাপ্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করা হত। শুধু তাই-ই নয়, আফিম কারখানার নিম্নতম কর্মচারীরা দরিদ্র রায়তদের ওপর উৎপীড়ন চালাত, বলপূর্বক সেলামী আদায় করত ও ওজনের সময় ঠকাত।

সুতি ও রেশম তাঁতিদের ক্ষেত্রেও কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য ক্ষতিকর হয়ে উঠছিল। এক্ষেত্রেও তাঁতিরা অগ্রিম নিয়ে কাজ করত ফলে তারা ক্রমশই কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছিল। তাদের

উৎপাদিত বস্ত্র সংগ্রহ করার আগেই পরিমাণ ও মূল্য ধার্য করে দেওয়া হত। অপরদিকে কঠোর সরকারি নিয়ন্ত্রণের ফলে তাঁতিরা কেবল কোম্পানির কাছেই তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য ছিল। কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার এভাবে দেশীয় বণিকদের ক্ষতিগ্রস্ত করে ও মোলুঙ্গী, রায়ত এবং তাঁতিদের জীবনে বিধ্বংসী প্রভাব ফেলে। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে উইলিয়াম বোল্টস্ লিখেছিলেন, দেশের গরিব উৎপাদক ও কারিগরদের ওপর অকল্পনীয় উৎপীড়ন ও কঠোরতা চালানো হচ্ছে এবং কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের ফলে তারা দাসের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ছে।

৪১.৬ পরিবর্তনশীল বাণিজ্যের ধারা

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য আধিপত্যের অবসান ঘটল। একচেটিয়া কারবারের অবসানের ফলে ভারতে ব্রিটিশ পণ্যের আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতে রপ্তানিকৃত ব্রিটিশ পণ্যের মূল্য ছিল ১৮ লক্ষ পাউন্ড। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতে রপ্তানিকৃত ব্রিটিশ পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৪৫ লক্ষ পাউন্ড। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের পর বাংলার আমদানি ও রপ্তানি উভয়ই বৃদ্ধি পায়। ১৮১৩-১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮১৭-১৮ পর্যন্ত বাংলা থেকে ভারতীয় পণ্য রপ্তানি ৪০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সমগ্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ১৮২৮ থেকে ১৮৪০ পর্যন্ত ভারত থেকে ব্রিটেনে রপ্তানিকৃত ভারতীয় পণ্যের মূল্য ছিল ১১৮.২ মিলিয়ন টাকা; ব্রিটেন থেকে ভারতে এসেছিল ৪৮.৮ মিলিয়ন টাকা মূল্যের ব্রিটিশ পণ্য। আপাতদৃষ্টিতে তখনও বাণিজ্যিক ভারসাম্য ভারতের দিকেই ঝুঁকে ছিল একথা মনে হতে পারে। কিন্তু এই নতুন বাণিজ্যধারার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ভারত থেকে কাঁচামাল যেত ব্রিটেনে আর ব্রিটেন থেকে ভারতে আসত শিল্পজাত পণ্য। ১৮১৩ সালে কলকাতা থেকে ব্রিটেনে ২ মিলিয়ন স্টার্লিং মূল্যের সুতিবস্ত্র যায় কিন্তু ১৮৩০ সালে কলকাতা বন্দর ২ মিলিয়ন স্টার্লিং মূল্যের শিল্পজাত সুতিবস্ত্র আমদানি করেছিল। ১৭৯৯-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কলকাতা থেকে ব্রিটেনে ৩,০২৬,২৫৩টি সুতিবস্ত্রের থান রপ্তানি করা হয়েছিল। ১৮২৯-৩০ খ্রিস্টাব্দে এই সংখ্যা কমে হয়েছিল ১,৯৫,৭২৫টি। ১৮১৪ সালে ভারত ৬,৮০,২৩৪ গজ সাদা ও ছাপার কালিকো কাপড় ব্রিটেন থেকে আমদানি করেছিল; ১৮২৮-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৪,৮৪৩,১১০ গজ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ব্রিটিশ বাণিজ্য নীতির কুফল। ভারতে আমদানিকৃত ব্রিটিশ-শিল্পজাত পণ্যের ওপর সাধারণত কোনো শুল্ক ধার্য করা হত না, বা করা হলেও তার পরিমাণ ছিল অত্যন্ত কম কিন্তু ভারতীয় শিল্পজাত পণ্য ব্রিটেনে আমদানি করলে তার ওপর চড়া হারে আমদানি শুল্ক ধার্য করা হত। ফলে শুরু হয়েছিল এক অসম প্রতিযোগিতা। সরকারের এই নীতির মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়লো ভারতীয় শিল্পগুলির ওপর। ভারতে প্রথম পর্যায়ের অবশিল্পায়ন শুরু হয়েছিল।

৪১.৭ অবশিল্পায়ন

সাধারণভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় হস্তশিল্পের বিপর্যয়কে ঐতিহাসিকরা অবশিল্পায়ন বলে অভিহিত করেছেন। অবশিল্পায়ন বলতে বোঝায় শিল্পায়নের বিপরীত, শিল্পের অধোগতি। শিল্পায়নের লক্ষণ হল কৃষিকার্য

থেকে উৎপন্ন জাতীয় আয়ের অংশের তুলনায় অনুপাতে শিল্পকর্ম থেকে উৎপন্ন অংশ বাড়ে, শিল্পকর্মে নিযুক্ত জনসংখ্যা কৃষিকর্মে নিয়োজিত মানুষের অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। এর বিপরীত যখন ঘটে, অর্থাৎ যদি দেশের মানুষ শিল্পকর্ম ছেড়ে কৃষি দ্বারা জীবিকা অর্জন করতে শুরু করেন, অর্থাৎ জাতীয় আয়ে কৃষিজ অংশ বাড়তে এবং শিল্পজ অংশ কমতে থাকে, তাকে অবশিল্পায়ন বলা যায়।

ঔপনিবেশিক ভারতে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ এই অবশিল্পায়নের ধারার ওপর জোর দিয়েছিলেন। রমেশ দত্ত, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, সখারাম গণেশ প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ অবশিল্পায়ন বলতে বুঝিয়েছেন দেশীয় শিল্পের অবক্ষয়—ভারতীয় শিল্পের অবক্ষয় ও কুটিরশিল্পের ধ্বংস। পরবর্তীকালে রজনীপাম দত্ত, গ্যাডগিল, সারদা, রাজু, নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ ইত্যাদি ঐতিহাসিকগণ প্রায় একই কথা বলেছেন। অবশিল্পায়নের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন অমিয় বাগচী।

জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদগণ তৎকালীন বিভিন্ন উপাদান থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে আঠারো শতক অবধি ভারতীয় কুটিরশিল্পের অবস্থা যা ছিল তার ক্রমিক অবনতি দেখিয়েছেন উনিশ শতকের শুরু থেকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে আমদানি-রপ্তানির হিসেবে দেখা যায় যে, কুটিরশিল্পজাত শিল্পদ্রব্যের রপ্তানি একদিকে কমেছে, অপরদিকে শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি বেড়েছে। বিশেষ করে সুতির কাপড়ের আমদানি বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। রমেশ দত্তের মতে, উনিশ শতকের গোড়ায় রপ্তানি কমার অর্থ দাঁড়াল এই যে দেশী শিল্প বিদেশী বাজার হারাল এবং আমদানি বাজার স্বদেশের বাজার থেকেও দেশী শিল্পপণ্য উৎখাত হল।

ঐতিহাসিকরা অবশিল্পায়নের ভিন্ন ভিন্ন কারণ উপস্থাপনা করেছেন। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল তাকেও কারণ হিসেবে অনেক সময় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু হরিরঞ্জন ঘোষাল এবং সারদা রাজু যথাক্রমে বাংলা এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির ক্ষেত্রে দেখিয়েছেন যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সূতিবস্ত্র শিল্পের কেবল সাময়িক ক্ষতি করেছিল, স্থায়ী অবনতি ঘটায়নি। ডি. আর. গ্যাডগিলের মতে, অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে বহু দেশীয় রাজা-মহারাজাগণ ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন। তাঁদের দরবারে যে সৌখিন বস্ত্রের চাহিদা ছিল এর ফলে তা হ্রাস পায়। অবশিল্পায়নেরও এও একটি কারণ। এছাড়াও ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয়রা উনিশ শতকে সাহেবদের অনুকরণে বিলিতি কাপড় ও আমদানিকৃত শহুরে বিলাসদ্রব্যের দিকে ঝোঁকেন। দেশের উঁচুদরের শহুরে শিল্পগুলি এর ফলস্বরূপ পূর্বতন বাজার হারায়। যদিও এগুলি ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের স্থায়ী অবনতির কারণ ছিল কিনা তা বিতর্কসাপেক্ষ কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, ভারত তার স্বকীয় শিল্পকর্ম হারিয়ে ইংল্যান্ডের শিল্পদ্রব্যের বাজারে পরিণত হল এবং কেবলমাত্র কৃষির ওপর নির্ভরশীল হয়ে ইংল্যান্ডের কৃষিক্ষেত্র হয়ে টিকে রইল।

ভারতে এই অবশিল্পায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই। অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সস্তায় শিল্পদ্রব্য ভারত থেকে কিনে ইউরোপে বিক্রি করার লোভে ক্রমাগত ভারতীয় কারিগরদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। মুক্ত বাণিজ্যের হোতা ইংল্যান্ডের প্রতিভূ হওয়া সত্ত্বেও ইস্ট

ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রকৃতপক্ষে গায়ের জোরে একচেটিয়া ব্যবসার ফাঁদে বাংলার তাঁতিদের আটকেছিল। অত্যধিক শোষণের ফলে তাঁতি ও অন্যান্য উৎপাদকদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়েছিল এবং একই সঙ্গে বাজার থেকে দেশী পুঁজি পিছু হটে গেল। মাদ্রাজে, বাংলায়, বিহারে, অন্ধ্রপ্রদেশে, গুজরাটে সর্বত্রই শিল্পের দুরবস্থা দেখা দিল। এর ওপরে এসে পড়ল ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের ধাক্কা। প্রকৃতপক্ষে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে সনদের মাধ্যমে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার লুপ্ত হবার পর এবং মুক্ত বাণিজ্যনীতি গৃহীত হওয়ার পরই ভারতে অবশিল্পায়ন ঘটতে শুরু করল। ভারতীয় কুটির শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানি হ্রাস করে কাঁচামাল ইংল্যান্ডে পাঠানো হতে লাগল এবং সস্তা ইংল্যান্ডের মিলের তৈরি কাপড় আমদানি বৃদ্ধি করে ভারতীয় বাজার ভরিয়ে ফেলা হল। বিলিতি কাপড়ের অনুপ্রবেশ সহজতর করার জন্য আমদানিকৃত মিলের কাপড়ের ওপর শুল্ক কমিয়ে দেওয়া হল। ১৮১৫ সালে ইংল্যান্ডের শিল্পজাত বস্ত্রের ওপর মাত্র ২$^{১}/_{২}$% আমদানি শুল্ক ধার্য করা হল অথচ ১৮১৩ সালে বাংলার মস্‌লিনের ওপর ৪৪% এবং ক্যালিকো ও ডিমিটি কাপড়ের ওপর ৮৫% আমদানি শুল্ক ধার্য করা হয়েছিল। ম্যানচেস্টারের মিলে তৈরি কাপড় যখন ভারতীয় বাজার ছেয়ে ফেলল তাঁতশিল্পে এক অভূতপূর্ব বিপর্যয় দেখা দিল। সস্তা মিলের কাপড় প্রভূত পরিমাণে আসার ফলে দেশী কাপড়ের চাহিদা কমল তো বটেই সেই সঙ্গে ইংল্যান্ডের কারখানাগুলির জন্য কাঁচামাল রপ্তানি করার ফলে ভারতীয় তাঁতি ও কারিগরেরা কাঁচামালের সমস্যায় পড়লো। উপরন্তু ইংল্যান্ড ভারতীয় শিল্পপণ্যের ওপর চড়া হারে আমদানি শুল্ক ধার্য করার ফলে ভারতীয় শিল্পজাত পণ্য কেবল ইংল্যান্ডই নয় বিশ্বের অন্যান্য স্থানের বাজারও হারালো। ঊনবিংশ শতকে ভারতে কুটিরশিল্পের অবলুপ্তির বা অবশিল্পায়নের প্রধান কারণ ছিল ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের ধাক্কা। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের অবাধ বাণিজ্যনীতি ভারতীয় শিল্পের জন্য এক অমঙ্গলজনক ইঙ্গিত নিয়ে এসেছিল।

৪১.৭.১ অবশিল্পায়ন ও সুতিবস্ত্র শিল্প

ঐতিহাসিক রমেশ দত্ত সুতিবস্ত্র শিল্পের অবলুপ্তিকে ভারতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে দুঃখজনক অধ্যায় বলে বর্ণনা করেছেন। অবশিল্পায়নের প্রক্রিয়ায় বস্ত্রশিল্পের সঙ্কটকেই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলা যেতে পারে। অসংখ্য তাঁতি, সুতো-কাটুনি, রঞ্জক, ধোলাইকর, ধুনুরী, সূচিশিল্পী এবং সুতি ও রেশমশিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে। কাজের অভাবে কোম্পানি নিজেই সূতিবস্ত্র ও রেশমবস্ত্র উৎপাদনের কেন্দ্রগুলি তুলে দিতে থাকে। ১৮১৮ থেকে ১৮২৫ সালের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কুঠি ও শিল্পকেন্দ্রগুলি একের পর এক বন্ধ হয়ে যায়। ১৮১৮ সালে ঢাকার কুঠি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৮১৯-এ উঠে যায় শান্তিপুর ও পাটনার কুঠি। উঠে যাওয়া কুঠিগুলিতে কর্মরত কারিগর এবং তাঁতিরা কর্মহীন হয়ে পড়ে। কেবলমাত্র বাংলাতেই ১০ লক্ষ লোক জীবিকা হারিয়েছিল বলে জানা যায়। সমসাময়িক সরকারি দলিলপত্র থেকে পশ্চিম ভারতের সুরাট, আমেদাবাদ, ব্রোচ, পুনা, শোলাপুর ইত্যাদি স্থানের এবং দক্ষিণ ভারতের কোয়েম্বাটুর, বেলারি, তিনেভেল্লি, মাদুরা ইত্যাদি কেন্দ্রের তাঁতশিল্পীদের চরম দুর্দশার কথা জানা যায়। এইসব পেশাচ্যুত শিল্পী ও কারিগরদের বিকল্প কর্মসংস্থানের তীব্র সঙ্কট দেখা দিয়েছিল—অধিকাংশ

কৃষিকাজে লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করল। কৃষির ওপর চাপ বৃদ্ধি পেল। জনসংখ্যার প্রায় ৮০% থেকে ৮৬% হয়ে পড়ল কৃষির ওপর নির্ভরশীল, ফলে সামগ্রিকভাবে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হল। কারিগরদের মধ্যে অনেকেই ক্ষেতমজুর বা কুলির কাজ করতে বাধ্য হল। দক্ষিণ ভারতের বহু তাঁতি কর্মসংস্থানের খোঁজে স্বদেশ ত্যাগ করে সিংহল, বর্মা, মরিশাসে চলে গেল। এই কারিগর ও তাঁতিদের দুরবস্থা সামগ্রিকভাবে চিত্রিত করা সম্ভব হয়নি। একদিকে তাদের পুরোনো পেশার দ্বারা জীবিকা অর্জনের সুযোগ নষ্ট হয়ে গেল অথচ বিকল্প কর্মসংস্থানকারী কলকারখানাও গড়ে উঠল না, ফলে হস্তশিল্পের ওপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা এক চরম দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হল।

জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদদের ও পরবর্তী ঐতিহাসিকদের লেখায় অবশিল্পায়নের যে চিত্র পাওয়া যায় তার বিরুদ্ধে ষাটের দশকে কিছু ঐতিহাসিক প্রশ্ন তুলতে থাকেন। বিতর্ক সৃষ্টি হয় যে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রভাবে ভারতে অবশিল্পায়ন আদৌ ঘটেছিল কিনা। মার্কিন ঐতিহাসিক মরিস ডি. মরিস মনে করেছেন অবশিল্পায়ন আদৌ কখনো ঘটেনি, উনিশ শতকেও নয়। মরিসের মতে, জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ শিল্পদ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধি মানেই অবশিল্পায়ন একথা ভেবে ভুল করেছেন। যদি জনসংখ্যা এবং জাতীয় আয় বাড়ে তবে দেশী শিল্প অক্ষুণ্ণ থেকেও আমদানি বাড়তে পারে। দ্বিতীয়ত, শিল্পদ্রব্যের আমদানির ফলে একটি বিশেষ ধরনের দেশী শিল্পের ক্ষতি হলেও অন্য শিল্পের বৃদ্ধি ঘটতে পারে। উনিশ শতকের গোড়ায় সুতো আমদানিতে সুতো-কাটুনিরা ঘা খেল কিন্তু তাঁতিরা সস্তায় সুতো পেয়ে সস্তা কাপড় বানাতে পারল, বিদেশী কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে পারল। তৃতীয়ত, মরিসের মতে, অনেকগুলি প্রাচীন কুটিরশিল্প ম্যানচেস্টার, শেফিল্ড, বামিংহামের উৎপাদন আমদানি করা সত্ত্বেও বেঁচে থাকলো। এর কারণ কুটিরশিল্পের একটি নিজস্ব বাজার ছিল যেখানে বিদেশী প্রতিযোগিতা ছিল না যেমন পট্টবস্ত্র বা মোটা কাপড়। এসব ক্ষেত্রে কুটিরশিল্প টিকে গিয়েছিল। মরিসের বক্তব্যের মধ্যে কিছু ফাঁক থাকায় এই যুক্তিকে গ্রহণীয় বলে অনেক ঐতিহাসিকই মনে করেন না। তাঁর যুক্তির গোড়ায় গলদ হল এই যে এমন কোনো প্রমাণ নেই যে জনসংখ্যা ও মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় বাড়ার ফলে উনিশ শতকে বাজারের আয়তন বাড়ে এবং তার ফলে আমদানি ও দেশী দুই ধরনের শিল্পদ্রব্যেরই জায়গা ছিল। অতএব, দেশী শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। মরিসের বক্তব্য গ্রহণীয় নয় কারণ উৎপাদিত মোটা তাঁতবস্ত্র আঘাত পায় ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে, রেল লাইন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে। একই ধরনের বক্তব্য উপরস্থিত করেছেন মারিকা ভিজিয়ানি এবং পিটার হারনেটি। মূলত তাদের বক্তব্য হল আদমসুমারির হিসাব এবং বাণিজ্য-সংক্রান্ত সরকারি তথ্য সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। গ্রামীণ তাঁতশিল্প প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে পেরেছিল বলেও তারা মনে করেন। এই বক্তব্যের অনুরূপ মত পাওয়া যায় তীর্থঙ্কর রায় ইত্যাদি ঐতিহাসিকদের বক্তব্যের মধ্যে।

জাপানী ঐতিহাসিক তরু মাৎসুই তাঁর আলোচনায় তথ্য সহকারে দেখিয়েছেন যে ঊনবিংশ শতকে তাঁতিদের সংখ্যা কমে যায় এবং তাদের অবস্থার কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতিও প্রমাণ করা যায় না। মাৎসুই এবং ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন যে, যে পরিমাণ সুতো আমদানি করা হয়েছিল তার থেকে অনেক পরিমাণ বেশি তৈরি কাপড় এদেশে এসেছিল। অমিয় বাগচী ও তাঁর পরিসংখ্যানগত তথ্যের

ভিত্তিতে দেখিয়েছেন ১৮০৯-১৩ সাল থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে গাঙ্গেয় বিহারে কুটিরশিল্পের ওপর নির্ভরশীল কারিগরদের সংখ্য ১৮% থেকে ৮% নেমে এসেছিল। অতএব, উনিশ শতকের ভারত ইতিহাসে অবশিল্পায়ন কোনো অতিকথা নয়—একটি বাস্তব সত্য। ঔপনিবেশিক শাসন এই অবশিল্পায়ন ঘটিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিকে পশ্চাদবর্তী করে তুলেছিল। পরবর্তী পর্যায়ের ব্রিটিশ-বিরোধী বহু আন্দোলনকে বুঝতে গেলে হস্তশিল্পীদের দুদর্শাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে মনে রাখতে হবে।

৪১.৮ আর্থিক নিষ্ক্রমণ বা সম্পদ নির্গম (Economic Drain)

ঔপনিবেশিক শাসন কীভাবে ভারতীয় শিল্পকে ধ্বংস করেছিল পূর্ববর্তী বিভাগে আমরা তা আলোচনা করেছি। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রত্যক্ষ ফল ছিল ভারতীয় সম্পদের বহির্গমন। ১৮৭০-এর দশক থেকে জাতীয়তাাদী অভিযোগের প্রধান স্থায়ী বিষয় হয়ে উঠেছিল—সম্পদ নির্গম। সার্বিকভাবে আর্থিক নিষ্ক্রমণ বা economic drain বলতে বোঝায় একটি উপনিবিশের সম্পদ যখন ঔপনিবেশিক শক্তি রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিজের দেশে নিয়ে যায়, তার পরিবর্তে উপনিবেশকে কিছুই দেয় না এবং উপনিবেশি থেকে অর্জিত পুঁজি উপনিবেশের অনুৎপাদক ক্ষেত্রে ব্যবহার করে যা কখনোই সার্বিক আর্থিক উন্নয়নের সহায়ক হয় না। ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীরাও যেমন ফ্রান্সিস, ওয়ারেন হেস্টিংস, জন লোর বিভিন্ন সময়ে এই সম্পদের নির্গমন সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন। জন লোর লিখেছিলেন যে, ভারতবর্ষের সমৃদ্ধ যুগের অবসান হয়েছে; ভারতবর্ষের যে বিপুল পরিমাণ সম্পদ ছিল তা চালান করা হয়েছে এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সমৃদ্ধির জন্য তার শক্তিকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে।

দেশে সমালোচনার মুখে পড়লেও ইউরোপীয় ব্যবসাদাররা ভারতে সোনা নিয়ে আসতে বাধ্য হয় বাণিজ্যের খাতিরে। এর অন্যতম কারণ পশ্চিম ভারতীয় সূতি ও রেশম কাপড়ের বিস্তৃত ইউরোপীয় বাজার। ভারতে কিন্তু পশ্চিমী উৎপাদনের বাজার ছিল তুচ্ছ। কিন্তু ঘটনাক্রম নাটকীয় মোড় নিল পলাশীর যুদ্ধের ফলে। প্রকৃতপক্ষে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ কোম্পানি তথা বেসরকারি ইংরেজ বণিকরা বাংলাদেশ থেকে বিপুল সম্পদ লুঠ করতে থাকে। শাসক বদলের রাজনীতির দ্বারা নজরানা ও পারিতোষিক হিসেবে ইংরেজরা বিপুল পরিমাণ সম্পদ হস্তগত করে। শুল্কহীন অন্তর্দেশীয় ব্যবসার মুনাফা ও দেওয়ানি রাজস্বের উদ্বৃত্তও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। পলাশীর পরবর্তী যুগকে ইংরেজ ঐতিহাসিক পার্সিভাল স্পীয়ারই খোলাখুলি ও নির্লজ্জ লুণ্ঠনের যুগ বলে অভিহিত করেছেন।

ঐতিহাসিকগণ মনে করেন বাংলা থেকে আর্থিক নির্গমন মূলত দুটি ধারায় হতে থাকে। প্রথমত, ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত বেসরকারি বণিকদের বাণিজ্যের মাধ্যমে; দ্বিতীয়ত, কোম্পানি অনুসৃত সরকারি আর্থিক বাণিজ্যিক নীতির মাধ্যমে।

কোম্পানির কর্মচারী ও বেসরকারি বণিকদের লোভ বাংলার অর্থনীতির ওপর চরম আঘাত হেনেছিল। পলাশীর পরবর্তীকালে বাংলার রাজনীতিতে নবাব বদলের ব্যবসা করে ইংরেজ কর্মচারীরাও প্রচুর লাভ করে। অবৈধভাবে সম্পদ লাভ করার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন লর্ড ক্লাইভ। ক্লাইভকে অনুসরণ করে

ইংরেজ কর্মচারীরা ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রায় ৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছিল। এছাড়াও কত অর্থ লিখিত প্রমাণ ছাড়াও ইংরেজরা হস্তগত করে তার কোনো হিসেব পাওয়া যায় না।

দেওয়ানি লাভের পর রাজস্বের উদ্বৃত্তও ইংরেজ কোম্পানির হাতে আসে। ওয়ারেন হেস্টিংস যখন বাংলার গভর্নর-জেনারেল ছিলেন তিনি অবৈধভাবে বিপুল উপার্জনের পথ প্রশস্ত করেছিলেন এবং তার প্রিয়পাত্রদের সঙ্গে বে-আইনি চুক্তি করে তাদেরও এর ভাগ দিয়েছিলেন। কোম্পানির এজেন্টরা উৎপাদকদের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করার জন্য দামের একাংশ সেলামী হিসেবে নিয়ে তাদের লাভ বৃদ্ধি করত। এইভাবে সংগৃহীত অর্থ কিন্তু প্রকৃত ভারতীয় উন্নয়নকে কোনভাবেই সাহায্য করেনি। রমেশ দত্ত তাঁর গ্রন্থ 'ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাসে ১৭৯২-৯৩ থেকে ১৮৩৭-৩৮ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বারা সংগৃহীত রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের একটি তালিকা দিয়েছেন। এই তালিকা দ্বারা তিনি দেখিয়েছেন কী পরিমাণ উদ্বৃত্ত আয় কোম্পানির শেয়ারের অধিকারীদের লভ্যাংশ হিসেবে দিতে ব্যয় হত। তা সত্ত্বেও ভারতীয় ঋণের অঙ্ক বৃদ্ধি পেয়েছিল যার ফল ভুগতে হয়েছিল ভারতীয়দেরই। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে মন্টগোমারি মার্টিন লিখেছিলেন যে, অর্ধশতাব্দী ধরে ভারতবর্ষ থেকে প্রতি বছর প্রায় দুই থেকে তিন মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং ব্রিটেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যা দিয়ে কোম্পানির বাণিজ্যিক ব্যয়, ঋণের জন্য দেয় সুদ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় মেটানো হচ্ছে যে সম্পদ কোনোভাবেই ভারতবর্ষে ফেরৎ আসছে না।

কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা নানাভাবে বিপুল সম্পদ আহরণ করেছিল তার সবটাই তারা নিজেদের দেশে চালান দিত বিভিন্ন উপায়ে। কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা তাদের রোজগারের একটা বড় অংশ দেশে পাঠাত মূল্যবান পাথরের মাধ্যমে। এইভাবে অসংখ্য মূল্যবান রত্নসামগ্রী ভারতের বাইরে চলে গেল। বেসরকারি ইংরেজ বণিকরা তাদের অর্জিত মুনাফা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তহবিলে জমা রাখত, তারপর তারা ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়ে কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টরসের কাছে বিল-অফ্-এক্সচেঞ্জের দ্বারা তা ভাঙিয়ে নিত। এই পদ্ধতিতে তারা সন্তুষ্ট ছিল না কারণ এর বিনিময় হার তাদের কাছে আকর্ষণীয় ছিল না। আগেই বলা হয়ছে যে, বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে তারা ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি অন্য ইউরোপীয় কোম্পানির ম্ধ্যমে দেশে টাকা পাঠাতে লাগল এবং ইউরোপীয় কোম্পানিগুলিও ভারতীয় পণ্য ক্রয় করার জন্য এই টাকাই পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করতে লাগল। পরিস্থিতি দাঁড়াল এই যে, বাংলা থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ দ্বারাই বাংলা তথা ভারতের পণ্য ক্রয় করা হতে লাগল ফলে ভারতীয় অর্থনীতি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। পরবর্তীকালে বেসরকারি বণিকরা যখন এজেন্সি হাউসগুলির মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠাতে লাগল অবস্থার কোনো পরিবর্তনের কোনো সুযোগ রইল না। এইভাবে চলতে থাকল বাংলার আর্থিক নিষ্ক্রমণ।

ইংরেজ কোম্পানির সরকারি নীতিও এই নির্গমনকে বাড়িয়ে তুলছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে দ্রুতহারে বাংলার সম্পদ বাইরে চলে যেতে থাকে। এটি ছিল সম্পদ নির্গমের এক নির্লজ্জ রকমের সুস্পষ্ট প্রক্রিয়া। ভারতীয় পণ্য কেনার জন্য কোম্পানি যে ব্যয় করত তাকেই বলা হত বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগের

মাধ্যমেই সম্পদ নির্গমকে আরও সহজ করে তোলা হয়েছিল। ১৭৫৭ সালের আগে পর্যন্ত কোম্পানি ভারতীয় পণ্য ক্রয় করার জন্য ইংল্যান্ড থেকে প্রচুর পরিমাণ সোনা, রূপা বা বুলিয়ন আমদানি করত। ১৭৫৭ থেকে কোম্পানির এই নীতি পরিবর্তিত হয় কারণ এই পলাশীর পরে যে সম্পদ ইংরেজরা হস্তগত করেছিল তা কাজে লাগানো হল বাংলা থেকে রপ্তানি মাল কেনার জন্য। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি লাভের পর থেকে পরিস্থিতি একেবারেই পাল্টে যায়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের পর বাংলায় বুলিয়ন বা সোনা, রূপো আসা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। ১৭৬৫-৬৬ থেকে ছয় বছরে ইংরেজ কোম্পানি আদায়ীকৃত নিট রাজস্বের ৩০.৮ শতাংশ রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য বিনিয়োগ খাতে ব্যয় করেছিল।

ম্যানচেস্টারের প্রতিযোগিতার সামনে ভারতীয় সূতিবস্ত্র ও রেশমজাত দ্রব্যের রপ্তানি কমে যায় ফলে কোম্পানি তার কর্মচারী ও ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত বণিকদের সবার সামনেই টাকা পাঠানোর সমস্যা দেখা দিয়েছিল। নীলের চাষ ও চা কেনার জন্য চীনে আফিম রপ্তানি করে প্রথমে এই সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হয়। চীনের চা ও রেশম দ্রব্য ইংরেজ কোম্পানি বাংলা থেকে প্রচুর পরিমাণ সোনা ও রূপো চীনে পাঠাতে শুরু করল। এছাড়াও প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহ, অষ্টাদশ শতকের শেষে ও ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের ব্যয় মেটানোর জন্যও বাংলা থেকে আহৃত আয় ব্যবহৃত হতে লাগল। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে জেম্‌স গ্রান্ট তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন যে, সামগ্রিকভাবে বাংলার আর্থিক নিষ্ক্রমণের পরিমাণ ছিল ১৮,০০০,০০০ টাকা। ঐতিহাসিক হোল্ডেন বারবার দেখিয়েছেন যে, ইংরেজ কোম্পানি তার বিনিয়োগ এবং চীনে সোনা, রূপো রপ্তানির মাধ্যমে ১৭৮৩-৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৯২-৯৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলা থেকে বছরে ১.৭৮ মিলিয়ন পাউন্ড সম্পদের নির্গমন হয়েছিল। ইরফান হবিব বলেছেন, ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষ থেকে ৪.২ মিলিয়ন পাউন্ড আর্থিক নিষ্ক্রমণ হয়েছিল এবং তা ছিল ব্রিটেনের জাতীয় আয়ের ২ শতাংশেরই বেশি ও তদানীন্তন ব্রিটেনের অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের প্রায় ৩০ শতাংশ। ১৮৫০-এর দশকের পর শুরু হয়েছিল অন্য এক পর্যায় যখন ভারত থেকে নতুন ধরনের রপ্তানির—যেমন পশ্চিম ভারতের তুলো, পাঞ্জাবের গম, বাংলার পাট, আসামের চা, দক্ষিণ ভারতের তৈলবীজ ইত্যাদির দ্রুত বিস্তার ঘটে এ কাজ আরও সফলভাবে করা হল। ভারত থেকে ব্রিটেনে তহবিল হস্তান্তরের সমস্যা থেকেই যায়, প্রয়োজনও থেকে যায় এবং তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময়ে লভ্যাংশ মেটানোর দায়ের বদলে ১৮৫৮'র পর থেকে শুরু হয় ভারত সচিবের ভারত দফতরের খরচ। স্বরাষ্ট্র ব্যয় ও ব্যক্তিগত সূত্রে পাঠানো টাকা, দুই-ই চালান করা হতে থাকে ভারতীয় রপ্তানির মাধ্যমে। ভারতের ক্রমবর্ধমান রপ্তানি উদ্বৃত্তের ভিতর দিয়ে তাই প্রতিফলিত হল সম্পদ নির্গমের প্রক্রিয়াটিই। অবাধ বাণিজ্যের মাধ্যমে শোষণের পদ্ধতি ও ব্রিটিশ ভারতীয় লগ্নি পুঁজিবাদের গড়ন—এই দুইয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ব্যবসাগত নির্গম।

৪১.৯ সারাংশ

ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের ওপর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। রাজনৈতিক ও অর্থনীতি বহির্ভুত নানা কৌশল অবলম্বন করে কোম্পানি ভারতীয় উৎপাদকদের থেকে সস্তায় শিল্পজাত দ্রব্যক্রয় করে ইউরোপের বাজারে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করার লক্ষ্যে তাদের বিনিয়োগ নীতি পরিচালিত করেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। এ সময়ে ভারতীয় শিল্পদ্রব্য ইওরোপের বাজারে যেত। এই দ্রব্য ক্রয় করার জন্য ইংল্যান্ড থেকে আসত বুলিয়ন অর্থাৎ সোনা বা রূপো। কিন্তু কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যে অধিকার একদিকে উৎপাদকদের ওপর চাপ ও অত্যাচারের সৃষ্টি করতে লাগল, অপরদিকে ভারতীয় পুঁজিকে নিরুদ্যম করছিল ফলে ভারতীয় পুঁজি শিল্পক্ষেত্র থেকে ক্রমে সরে যেতে বাধ্য হল। বাণিজ্যের এই ধারা ক্রমশ পরিবর্তিতত হচ্ছিল ইংল্যান্ডের স্বার্থে। ১৭৫৭'র পলাশির যুদ্ধে জয় এবং ১৭৬৫-তে দেওয়ানি লাভ কোম্পানিকে আরও সুবিধাজনক অবস্থায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। কোম্পানি উদ্বৃত্ত রাজস্ব দ্বারা ভারতীয় পণ্য ক্রয় করতে লাগল এবং কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত বাণিজ্যের দ্বারা আহৃত অর্থ দেশে নানাভাবে পাঠিয়ে দিতে লাগল। ভারতীয় অর্থে ভারতীয় পণ্য ক্রয়ের ফলে সোনা এবং রূপোর আমদানি কমে আসতে লাগল। ভারতীয় আফিম উৎপাদন বাড়িয়ে, তা চীনে পাঠিয়ে এই প্রক্রিয়াকে আরও সহজতর করা হয়েছিল। শুরু হয়েছিল ভারত থেকে সম্পদ নির্গমের প্রথম পর্যায়।

ভারতীয় শিল্পজাত পণ্য ক্রমে বিদেশের বাজার হারাতে লাগল ও ইংল্যান্ডের শিল্পজাত দ্রব্য ভারতে প্রবেশ করে দেশী বাজার দখল করে নিতে লাগল; পরিবর্তে ভারতীয় রপ্তানি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল কাঁচামাল রপ্তানিতে—ইংল্যান্ডের কৃষিক্ষেত্র হিসাবে। ১৮১৩'র সনদে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার লুপ্ত হওয়ার পর মুক্ত বাণিজ্যের দিন শুরু হয়েছিল। ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের ধাক্কা ভারতীয় শিল্পকে আরও বিপন্ন করে তুলল। ভারতীয় শিল্পের ধ্বংস ও অবশিল্পায়নের প্রক্রিয়া দেশীয় অর্থনীতিকে পশ্চাদবর্তী করে তুলেছিল। একদিকে ভারতীয় সম্পদের বহির্গমন অপরদিকে দেশী শিল্পের ক্রমিক অবনতি ও ধ্বংস—এই দুই ধারায় ঔপনিবেশিক শোষণ ভারতীয় অর্থনীতিকে পঙ্গু করে তুলেছিল।

৪১.১০ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কোম্পানির বাণিজ্য নীতি কী ছিল?

২। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার ভারতীয় বাজার ও উৎপাদকদের ওপর কী প্রভাব বিস্তার করেছিল?

৩। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদের প্রত্যক্ষ ফল কী হয়েছিল?

৪। বাংলা থেকে আর্থিক নিষ্ক্রমণ মূলত যে দুটি ধারায় হতে থাকে তার উল্লেখ করুন।

শূন্যস্থান পূর্ণ করুন :

১। —— খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট ফারুকশিয়ারের ফরমান ইংরেজ কোম্পানিকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার দেয়।

২। এজেন্সি হাউসগুলি গড়ে ওঠার আগে —— ইংরেজদের পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দালালের কাজ করত।

৩। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের সনদের মাধ্যমে —— বাণিজ্যে লিপ্ত বণিকরা কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিয়েছিল।

৪। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির —— বাণিজ্য আধিপত্যের অবসান ঘটল।

নিচের উক্তিগুলির কোন্‌টি ঠিক (✓) এবং কোন্‌টি ভুল (×) চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন :

১। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট ফারুকশিয়ারের ফরমান ইংরেজ কর্মচারীদের বিনা শুল্কে বাণিজ্য অধিকার দিয়েছিল।

২। লবণ এবং আফিম তৈরির ক্ষেত্রেও একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোম্পানির প্রকৃত নজর ছিল বাণিজ্যের দিকে।

৩। সাধারণভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় হস্তশিল্পের বিপর্যয়কে ঐতিহাসিকরা অবশিল্পায়ন বলেছেন।

৪। ইংরেজ কোম্পানির সরকারি নীতি বাংলা থেকে আর্থিক নির্গমন বন্ধ করেছিল।

৪১.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। সরকার, সুমিত : আধুনিক ভারত, ১৮৮৫-১৯৪৭।

২। Sinha, N. K. : The Economic History of Bengal, vol-I and III.

৩। Ghosal, H. R. : Economic Transition in the Bengal Presidency.

৪। Dutt, Romesh : The Economic History of India vol-I.

৫। Chatterjee, Suranjan and Guha Roy Siddhartha : History of Modern India.

৬। ভট্টাচার্য, সব্যসাচী : ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি, ১৮৫০-১৯৪৭।

৭। Tripathi, Amalesh : Trade and Finance in the Bengal Presidency, 1793-1833.

৮। Bagchi, A. K. : The Political Economy of Underdevelopment.

একক ৪২ ❐ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তন; ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা, রাজস্ব নীতি, সর্বোচ্চ রাজস্ব সংগ্রহের কারণ; বাংলায় তিনটি রাজস্ব-সংক্রান্ত গৃহীত বন্দোবস্ত

গঠন :

৪২.০ উদ্দেশ্য

৪২.১ প্রস্তাবনা

৪২.২ ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের রূপান্তর

- ৪২.২.১ প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতে গ্রামীণ সমাজ
- ৪২.২.২ ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের রূপান্তর
- ৪২.২.৩ জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার সূচনা
- ৪২.২.৪ কৃষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্যিকীকরণ
- ৪২.২.৫ ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ সমাজের ধ্বংসের সূচনা

৪২.৩ বাংলার ভূমিবিন্যাস ব্যবস্থা

- ৪২.৩.১ প্রাচীন বাংলার ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা
- ৪২.৩.২ বাংলায় মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থা
- ৪২.৩.৩ মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব ব্যবস্থা

৪২.৪ বাংলায় ইংরেজদের রাজস্ব-সংক্রান্ত নীতি (১৭৫৭-১৭৭২)

৪২.৫ ইংরেজদের সর্বোচ্চ রাজস্ব সংগ্রহের কারণ

৪২.৬ বাংলায় ইংরেজদের রাজস্ব-সংক্রান্ত গৃহীত তিনটি পদক্ষেপ

- ৪২.৬.১ নূতন ইজারাদারী ব্যবস্থা (১৭৭২-১৭৭৭)
- ৪২.৬.২ একসালা বন্দোবস্ত বা জমিদারি ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন (১৭৭৭-১৭৮৬)

৪২.৭ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

- ৪২.৭.১ পটভূমি
- ৪২.৭.২ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে গ্রান্ট, শোর ও কর্নওয়ালিসের মধ্যে বিতর্ক

৪২.৮ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব

- ৪২.৮.১ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাব

৪২.৮.২ জমিদার শ্রেণীর উপর প্রভাব

৪২.৮.৩ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব

৪২.৯ সারাংশ

৪২.১০ অনুশীলনী

৪২.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৪২.০ উদ্দেশ্য

ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনকালে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর গুণগত পরিবর্তন ঘটেছিল তার পরিণতিতে এক নূতন ধরনের বিকাশ লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ পুঁজিবাদের ঔপনিবেশিক স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত হলেও ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের আর্থিক প্রক্রিয়ায় নূতন স্রোত সঞ্চারিত হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে ইংরেজরা পুরাতন আর্থিক কাঠামোর বিলোপ ঘটিয়ে প্রচলন করে চলেছিল নূতন আর্থিক পদ্ধতির। পরিণতিতে প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের (প্রায় হাজার বছরের পুরাতন) স্বয়ম্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়তে থাকে। গ্রামীণ স্বয়ংসম্পূর্ণ যৌথ জীবনযাত্রার বিনাশ যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন ভারতবাসীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্যের জন্য ঐতিহাসিকভাবে তার প্রয়োজন ছিল (যদিও বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক চলেছে)। এই এককটি পাঠ করার পর আপনারা—

- ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতে গ্রামীণ সমাজের রূপান্তর কেমন করে হল জানতে পারবেন।
- প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে বাংলায় ভূমি-ব্যবস্থার বিন্যাসের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হবেন।
- ইংরেজদের নূতন রাজস্বনীতি ও তার পিছনে সর্বোচ্চ রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- সর্বোপরি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিকীকরণ প্রক্রিয়ার উত্তরণ কালপর্ব (যা পাঁচ দশক পূর্বে শুরু হয়েছিল) কিভাবে সমাপ্ত হচ্ছে সেটি মূল্যায়ন করার পর—নানা তর্ক-বিতর্কের সমালোচনা করে নিজস্ব স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করতে সক্ষম হবেন।

৪২.১ প্রস্তাবনা

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আধিপত্যের তাৎপর্য নিয়ে বিতর্ক আজও চলেছে। একটা আধুনিক জাতি যারা নিজের দেশে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলোপ ঘটিয়ে বুর্জোয়া সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিল; একটি পুঁজিবাদী জাতি যারা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সামন্ততান্ত্রিক জনগোষ্ঠীর থেকে উন্নত হয়ে উঠেছিল; যে জাতির মধ্যে তখন জাতীয়তাবাদ প্রবল—সে জাতি ব্রিটিশ জাতি; যারা উপনিবেশ ভারতের আর্থিক

কাঠামোকে গড়তে চেয়েছিল নিজেদের প্রয়োজনভিত্তিক। ভারতে ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ শাসনের প্রসারের ইতিহাসের পাল্টা চিত্র হল প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উত্তরণের ইতিহাস। ব্রিটিশ শাসকরা ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করতে গিয়ে একদিকে যেমন দেশীয় শিল্পের উচ্ছেদ সাধন করেছে, অন্যদিকে 'এশীয় উপাদানভিত্তিক' সমাজের অবসান ঘটিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার বস্তুগত ভিত্তিকে স্থাপন করেছিল। এটি করার জন্য প্রয়োজন ছিল মুঘলদের থেকেও অনেক সংহত রাজনৈতিক ঐক্য। কৃষিব্যবস্থার উপর দাঁড়িয়ে যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা তাকেই ব্যবহার করে ইংরেজরা চেয়েছিল রাজনৈতিক ঐক্যের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে। যেহেতু বাংলা-সুবায় রাজনৈতিক আধিপত্য রচনার মধ্য দিয়ে তাদের ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা, তাই এই এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন নিয়ে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

ইদানিং উপনিবেশবাদ শব্দটির বহুল ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। ইতিহাস চর্চায় এই শব্দ এক ভিন্ন ঘরানার সৃষ্টি করেছে। ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চায় আমরা কয়েকটি ঘরানা দেখতে পাই—(১) জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার জনক দাদাভাই নৌরজী, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে ও রমেশচন্দ্র দত্তের লেখা, ওগুলিকে আদি ঘরানাও বলা যায়। এঁদের লেখায় দেওয়ানী লাভের পর থেকে গ্রামবাংলার অর্থনীতিতে অবক্ষয় এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে ইংরেজদের গৃহীত রাজস্ব নীতির ফলে গ্রামসমাজে উৎপাদন সম্পর্কের জটিলতা, কৃষককুলের দুর্দশা ইত্যাদির মূলে ঔপনিবেশিক শাসনকেই দায়ী করা হয়েছে। (২) থিওডর মরিসন, জর্জ চেসনি, রিচার্ড স্ট্রেচি প্রমুখের বক্তব্য হল—উপনিবেশগুলির অগ্রসর সম্ভবপর হয়েছে পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসার ফলে, রেল, রাস্তা, বন্দর, বিদ্যুৎ ইত্যাদি নিচের পরিকাঠামো এবং উৎপাদন ব্যবস্থার (কৃষি ও শিল্পে) আধুনিকীকরণ না করলে এশিয়া ও আফ্রিকা অনগ্রসর থেকে যেত (৩) মানবেন্দ্র রায়, রজনীপাম দত্ত, ডি. ডি. কৌশাম্বী প্রমুখের মার্ক্সীয় ভাবনায় প্রভাবিত অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চা নূতন মাত্রা এনেছে। (৪) গবেষকদের প্রধান বক্তব্য হল—ইংরেজদের গৃহীত উপনিবেশিক রাজস্বনীতি ও অর্থনীতির নূতনত্ব কিছু ছিল না। ঐতিহ্য-বিরোধী যা চালু করতে চেয়েছিল সেটি আসলে পুরানো ব্যবস্থারই অনুবৃত্তি মাত্র।

৪২.২ ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের রূপান্তর

ভারতীয় উপমহাদেশে শক, হুণ, পাঠান, মুঘলরা ক্ষমতা দখলের লড়াই করতে এসে কখনোই গ্রামীণ সমাজের ভিতরে অধিকার প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত হয়নি। কৃষিপ্রধান গ্রামীণ ভারতবর্ষে দেশীয় রাজায় রাজায় যুদ্ধ ছিল গ্রামের উপর অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করা, জমি দখলের লড়াই নয়। কিন্তু ইউরোপীয় ইতিহাসে দেখা যায় ভূস্বামীরা উৎপাদনের অংশের উপর অধিকার লাভেরই লড়াই করেনি, বাধ্যতামূলক শ্রমের দ্বারা কৃষিতে নূতন পদ্ধতির প্রবর্তন করতে চেয়েছে। সুতরাং গ্রামসমাজে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবসথা বলতে ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে যে অর্থ দাঁড়ায় ভারতীয় গ্রামসমাজে তার চিহ্ন বিশেষ খুঁজে পাওয়া যায় না. ইউরোপের মতো ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের কোন ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। রাজা বা মধ্যবর্তীরা গ্রামসমাজের হাত থেকে ভূমির নিয়ন্ত্রণের অধিকার কেড়ে নেয়নি এবং উৎপাদন ব্যবস্থাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে চায়নি। আসলে 'এশীয় উৎপাদনভিত্তিক

সমাজের' একটি নির্দিষ্ট চরিত্র রয়েছে। একে কখনোই সম্পূর্ণ অর্থে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ বলা যায় না। অবশ্য অনড় না হলেও ভারতীয় সমাজ ছিল 'বদ্ধ' সমাজ।

৪২.২.১ প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতে গ্রামীণ সমাজ

প্রাপ্ত উপাদানসমূহ থেকে যেটুকু তথ্য আহরণ করা গেছে তার থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, ভারতীয় সামাজিক বিন্যাস প্রধানত ভূমি-ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। ভূমি-ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল গ্রামগুলির ছিল কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রথমত, আত্মনির্ভরশীল বা স্বয়ংসম্পূর্ণতা ছিল ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের এক উল্লেখযোগ্য দিক। চাষবাসের পুরানো পদ্ধতি ও সহজ সরল যন্ত্রনির্ভর প্রয়োজনভিত্তিক হস্তশিল্পের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল আত্মনির্ভরশীল গ্রামগুলি। দ্বিতীয়ত, গ্রামে ব্যক্তিগত মালিকানার পক্ষে বিশেষ সমর্থনযোগ্য তথ্যাদি পাওয়া যায় না। গ্রামে অন্তর্গত জমির মালিকানা প্রকৃতপক্ষে ছিল গ্রামসভা বা পঞ্চায়েতের হাতে। সম্মিলিত পরিশ্রমদানের মধ্য দিয়ে চাষ-আবাদ সম্পন্ন হত। গোচারণ ভূমি, বনভূমির উপর অধিকার ছিল সবার; সেচ, জলসরবরাহ, কীটপতঙ্গ ও গবাদিপশুর হাত থেকে ফসল রক্ষা করা হত পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে। গ্রামে বসবাসকারীরা যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বিবিধ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী ছিল। কোনো সম্রাট বা তাঁর প্রতিনিধিরা গ্রামসমাজের হাত থেকে ভূমি নিয়ন্ত্রণের অধিকার কেড়ে নেয়নি। এই গ্রামীণ কৃষি উৎপাদন কাঠামো অক্ষুণ্ণ ছিল দীর্ঘকাল ধরে। (দেখুন, A. R. Desai—*Social Background of Indian Nationalism,* Bombay, 1876)।

তৃতীয়ত, গ্রামের উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল প্রয়োজনভিত্তিক। উৎপন্ন শস্যের অংশবিশেষ রাজস্ব হিসাবে প্রদানের পর বাকিটা অধিকাংশ স্থানীয় পর্যায়ে উপভোগ করত। হস্তশিল্প যা কিছু গড়ে উঠেছিল সেটিও ছিল প্রয়োজনকে ভিত্তি করে। গ্রামর ছুতোর, মুচি, কুমোর, ধোবা, তেলি প্রমুখেরা উৎপাদন করত গ্রামের প্রয়োজন মেটাতে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বিনিময় ছাড়াও গ্রামভিত্তিক বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। গ্রামের শ্রমবিভাজন ছিল অসম্পূর্ণ। কৃষকরা অবসর সময়ে যেমন সুতা কাটত, কারিগরেরাও প্রাপ্ত জমিতে চাষ করত। গ্রামের কারিগরি কলাকৌশল খুব একটা উন্নত মানের ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্য গণ্ডগ্রামের হাটেই সীমাবদ্ধ ছিল। এককথায় আর্থিক প্রশ্নে গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। চতুর্থত, গ্রামগুলিতে এক ধরনের নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে উঠে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে স্বনির্ভর গ্রামে বসবাসকারী জনগণের মন ছিল সংকীর্ণতায় আবদ্ধ। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে অসহায় অবস্থায় তাদের মন ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়তার প্রতি আকৃষ্ট হত। সার্বজনীন, আর্থিক ও সামাজিক জীবন-চেতনা গড়ে ওঠেনি তখন। ঐক্যের ধারণা যেটুকু ছিল সেটি ছিল ধর্মীয় অর্থে। পঞ্চমত, গ্রামসমাজে জাত ব্যবস্থাভিত্তিক সংগঠন। গ্রামবাসীরা জাতপ্রথাকে দৈবাদিষ্ট বলে গণ্য করত। জাতব্যবস্থা সম্পর্কে স্বাধীন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের মানসিকতা সে যুগের গ্রামবাসীর মনে প্রায় ছিলই না। এককথায় প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে ভারতীয় গ্রামসমাজ আত্মনির্ভরশীল ও ব্যক্তিমালিকানাহীন হলেও উদার মানসিকতা, জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় সত্তার অভাব ছিল *(Social Background of Indian Nationalism,* p. 22)।

৪২.২.২ ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের রূপান্তর

ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় গ্রামসমাজের রূপান্তর ঘটার পিছনে রয়েছে মূলত অর্থনৈতিক কারণ। সে সময় সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে শাসকশ্রেণী নানা ধরনের ভূমি-ব্যবস্থার উদ্ভাবন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে নায়েব-দেওয়ানকে সামনে রেখে রাজস্ব বৃদ্ধির যে প্রচেষ্টা শুরু করেছিল ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে সে পর্বের অবসান ঘটে। অন্যদিকে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের অনুসারী স্বার্থের সঙ্গে ভারতের কৃষি উৎপাদনকে জুড়ে দেওয়া হয়। এককথায় ইংল্যান্ড তার উপনিবেশ ভারতকে পুঁজিবাদী অর্থনীতির পৃথিবীব্যাপী যন্ত্রের একটি অংশে পরিণত করে। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষ বহুবার বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠী দ্বারা বিজিত হয়েছে। কিন্তু সে রাজনৈতিক জয়ের ফলে রাজনীতিতে পরিবর্ত ঘটেছিল; গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর তার বিশেষ প্রভাব পড়েনি। গ্রামীণ সমাজের চরিত্র তাই অপরিবর্তিত রয়ে গিয়েছিল দীর্ঘকাল ধরে। কিন্তু ব্রিটিশ আধিপত্যের তাৎপর্য ছিল ভিন্ন। ব্রিটিশ পুঁজিবাদের অগ্রগতি ভারতে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থায় এনেছিল ব্যাপক পরিবর্তন। পরবর্তী অধ্যায়ে সে পরিবর্তনগুলি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

৪২.২.৩ জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার সূচনা

ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষে অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ভূমিব্যবস্থা ছিল তিন ধরনের—জমিদারী, রায়তওয়ারী ও মহলওয়ারী। (১) ব্যক্তিগত আনুকূল্যে চাষ-আবাদ হলে উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাবে ও কৃষিবিপ্লব ঘটবে (যা ইতিপূর্বে ইংল্যান্ডে ঘটেছিল), (২) উদীয়মান জমিদাররা শ্রেণীস্বার্থের খাতিরে ব্রিটিশ শাসকের হাতকে শক্ত করবে, (৩) দক্ষতার অভাব দেখা দিলে জমিদারী হাত বদল হবে (বিক্রি)—এই তিন চিন্তা মাথায় রেখে জমিতে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করে নেওয়া হয় জমিদারী ব্যবস্থায় যা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সর্বপ্রথম গ্রামের অধিকারভিত্তিক প্রাচীন ভূমিব্যবস্থায় ভাঙন সৃষ্টি করে। নব প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ শাসনের অস্তিত্ব রক্ষার সামাজিক সমর্থন অর্জন করার প্রশ্নটি মাথায় রেখে জমিদারদের জমির কেনাবেচার অধিকার দান করে রাজনৈতিক স্বার্থও চরিতার্থ করতে চেয়েছিল। অপর একটি ভূমিব্যবস্থা রায়তওয়ারী, যেটিতে কৃষক জমি কেনাবেচার অধিকার লাভ করে। ব্রিটিশ উপনিবেশের ৫১ শতাংশ জুড়ে ছিল এই ব্যবস্থা। রায়তওয়ারী ব্যবস্থা ও জমিদারী ব্যবস্থা উভয় রাজস্বনীতিই গ্রামভিত্তিক মালিকানার ভারতীয় প্রথাকে ভেঙে দেয়। এইভাবে জমি ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পত্তিতে পরিণত হয়, জমি হয়ে ওঠে কেনাবেচাযোগ্য পণ্য (সব্যসাচী ভট্টাচার্য—*ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি,* কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১৬-২০)।

৪২.২.৪ কৃষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্যিকীকরণ

নূতন ভূমি-সম্পর্ক ও রাজস্ব প্রদানের প্রথা চালু হওয়ার সঙ্গে গ্রামীণ কৃষির আদিরূপ বদলে গেল। প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে কৃষিদ্রব্য উৎপাদন কেবল প্রয়োজনভিত্তিক ছিল এবং গ্রামীণ বাণিজ্য কেবল হাটেই সীমাবদ্ধ ছিল বলে অধ্যাপক এ আর. দেশাই যে মন্তব্য করেছেন অধ্যাপক ইরফান হাবিব সে যুক্তিকে অবশ্য

খণ্ডন করেছেন। গ্রামগুলি থেকে যথেষ্ট পরিমাণে কৃষিদ্রব্য যে শহরের বাজারে আসত—অধ্যাপক হাবিবের গবেষণা সেটি প্রমাণ করেছে (Irfan Habib—*The Agrarian System of Mughal India.* Bombay. 1963) এই বিতর্ক থাকলেও 'আজকের দিনে যে গণেশ কৃষি-লক্ষ্মীকে চালনা করে'—তার সূচনা কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের হাত ধরে। গ্রাম ছেড়ে ফসল শহরে বিক্রির সূচনা হল কয়েকটি কারণে—(ক) নগদে রাজস্ব প্রদানের তাড়নায় ফসল বিক্রি, (খ) ঔপনিবেশিক স্বার্থে রেল, বন্দর, রাস্তাঘাটের উন্নতির ফলে প্রত্যন্ত এলাকা থেকে শহরে মাল পরিবহনের সুযোগ সৃষ্টি, (গ) ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে নূতন নূতন ফসল উৎপন্ন করার চাহিদা, যা ড. বিনয়ভূষণ চৌধুরীর গবেষণায় ধরা পড়েছে। (B. B. Chowdhury—*Growth of Commercial Agriculture in Bengal, 1757-1900,* Calcutta, 1964) ক্রমশ কৃষিদ্রব্যের উৎপাদন ও চাহিদা নির্ভরশীল হয়ে উঠতে থাকে আন্তর্জাতিক বাজারের উপর। তাই গ্রামের অর্থনীতি যুক্ত হল বিশ্ববাজারের সঙ্গে। আত্মনির্ভরশীল গ্রাম হয়ে উঠল ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অনুসারী। কুটির-শিল্পের ধ্বংসের সূচনা হল, দেখা দিল 'অবশিল্পায়ন'। সমাজে সৃষ্টি হল নূতন শ্রেণী,—মহাজন, দালাল, ফড়ে, বেনিয়া পাইকার। জাতপাতভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল। গ্রামসমাজে নূতন ধরনের শোষণের সূচনা হল।

৪২.২.৫ ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ সমাজের ধ্বংসের সূচনা

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পরিণতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কার্ল মার্ক্স লিখেছেন—'ভৌগোলিকভাবে দেখলে কয়েক শত বা হাজার একর আবাদী বা পতিত জমি নিয়ে একত্র কটি গ্রাম, রাজনৈতিকভাবে দেখলে পৌরগোষ্ঠীর মতো। রাজস্ব আদায় থেকে পুলিশের কাজ, শস্যপাহারায় সহযোগিতা থেকে ক্ষুদে বিচারপতি, শাসনকর্তা থেকে সীমানদার—এই সরল পৌর-শাসনের আওতায় দীর্ঘকাল ধরে ভারতবাসী বাস করে এসেছে।....এই ছোট ছোট সনাতন সামাজিক সংস্থাগুলো ঔপনিবেশিক শাসনের ধাক্কায় ভেঙে গেছে। তার কারণ রক্তচোষক করসংগ্রহকারী বা কোম্পানির বর্বর সৈন্যদের অত্যাচারে নয়, ইংরেজদের বাষ্প ও অবাধ বাণিজ্যের প্রতিক্রিয়ার ফলেই (মার্ক্স ও এঙ্গেলস—প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা, সংগ্রাম, মস্কো, ১৯৭১, পৃ. ১৮-১৯) গ্রামসমাজ তার দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য নিয়ে সবরকমের রাজনৈতিক ঝড়ের মুখে বেঁচে ছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চাপে ও রাজনৈতিক শাসন ও বাণিজ্যিক প্রভাবে ভারতীয় গ্রামসমাজ পরাভূত হল। এই পরিবর্তনকে একদল স্বাগত জানিয়েছে, অপরদল বিরোধিতা জানিয়েছে। এ. আর. দেশাই প্রমুখ লেখকরা (এমনকি কার্ল মার্ক্সও) মনে করেন জাতীয়তাবাদের প্রসার, সংস্কৃতির গুণগত মান ও উন্নত সামাজিক জীবনকল্পে পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছেন। যারা এর বিরোধিতা করেছেন (গান্ধীজি থেকে রবীন্দ্রনাথ) তাদের মতে, গ্রামসমাজে পারিবারিক গোষ্ঠীগুলির ভিত্তি ছিল হাতে-কাটা সুতা থেকে কাপড় বোনা ও নিজের হাতে চাষ; সমন্বয়ের কুটিরশিল্প যা আত্মনির্ভরশীলতার শক্তি—সেটি হারিয়ে গেল। মানবিক সম্পর্ক অবলুপ্ত হল। একটা আর্থিক নিরাপত্তা ছিল যা যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের সময়ও সমাজকে রক্ষা করে চলেছিল—সেটিও হারিয়ে গেল।

ঔপনিবেশিক বাণিজ্যিক স্বার্থে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র ক্রমে গ্রামসমাজের কাজকর্ম (বিশেষত প্রতিরক্ষা) নিজের হাতে তুলে নেওয়ায় স্বশাসিত গ্রামসমাজ কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র শাসনের অঙ্গে পরিণত হতে থাকে, গ্রামের অর্থনীতি

বিশ্বব্যাপী আর্থিক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। গ্রামের আর্থিক ও শাসনতান্ত্রিক সার্বভৌমত্ব লোপ পাওয়ায় য়ৌথ সহযোগিতার পরিবর্তে গ্রামজীবনে দেখা দিল প্রতিযোগিতা ও সংঘাতের সম্পর্ক (A. R. Desai—*Social Background of Indian Nationalism,* p. 40, Bombay, 1876)।

৪২.৩ বাংলায় ভূমিবিন্যাস ব্যবস্থা

প্রাচীন বাংলার ভূমিব্যবস্থার যথার্থ পরিচয় দান আজও সম্ভব নয়, কারণ নির্ভরযোগ্য উপাদানের অভাব। তাম্রফলক ও লিপিমালা থেকে যেসব তথ্যাদি পাওয়া গেছে তার দ্বারা ভূমির স্বত্বাধিকারী নিয়ে বিতর্কের অবসানও হয়নি। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভূমি-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর বাংলার প্রাচীন ভূমিব্যবস্থার মধ্যে পাওয়া যাবে না, তবে পরবর্তী অধ্যায়ে কয়েকটি বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে। তথ্যাদি পর্যাপ্ত থাকায় অবশ্য মধ্যকালীন ভারতে রাজস্ব ও ভূমিবিন্যাস এবং ইংরেজ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত রাজস্বনীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে খুঁজে পাওয়া যাবে।

৪২.৩.১ প্রাচীন বাংলার ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা

৮০০ খ্রিঃ পূর্ববর্তী লিপিগুলি থেকে বাংলায় প্রধানত তিন ধরনের ভূমির উল্লেখ পাওয়া যায়—বাস্তু, ক্ষেত্র ও খিলক্ষেত্র; অর্থাৎ বাসযোগ্য ভূমি, কর্ষণযোগ্য ভূমি ও অনাবাদী ক্ষেত্র। পরবর্তী লিপিমালাতে তল, বাটক, আলি ইত্যাদি ভূমিরও উল্লেখ দেখা যায়। একাধিক লিপিমালায় বনভূমি, গোচারণ ভূমিদানের কথাও লিপিদ্ধ রয়েছে। গুপ্তযুগে শস্য উৎপাদনের পরিমাপ দেখে ভূমির পরিমাণ নির্ধারিত হত। গ্রামগুলি ছিল আত্মনির্ভরশীল। ভূমির মূল্য কী হতে পারে সে সম্পর্কে কোনো উপাদান বিশেষ পাওয়া যায়নি। তবে রাজস্ব হিসাবে উৎপন্ন শস্যে $^{১}/_{৬}$ অংশ বিশেষ এলাকায় সংগ্রহ করা হত, তার প্রমাণ রয়েছে। হাট, খেয়া পারাপার ইত্যাদি থেকেও রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। ৮০০-১৩০০ মধ্যবর্তী লিপিগুলি ভূমিদানের সাক্ষ্য বহন করে, এর থেকে অনুমান করা যায় সে সময় জমি ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন প্রায় ছিলই না। রাজা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়েও প্রচলিত ভূমিব্যবস্থার উপর যথেচ্ছাচার করতেন না (দেখুন, নীহাররঞ্জন রায়—*বাঙালীর ইতিহাস)*।

৪২.৩.২ বাংলায় মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থা

দিল্লিতে সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নির্দিষ্ট কোনো রাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। কিন্তু খরচার জন্য কৃষি থেকে উৎপন্নের একাংশ আদায়ের প্রয়োজন ছিল, তার জন্য চাই একটি সরকারি যন্ত্র; গড়ে ওঠে 'ইক্তা' ব্যবস্থা। মোরল্যান্ড ভূমি থেকে রাজস্ব সংগ্রহকারী অধিকারকে বলেছেন 'ইক্তা' এবং 'ইক্তা'র অধিকারী 'মুক্তি'র ছিল কিছু সামরিক দায়িত্ব। আলাউদ্দিনের শাসনকালে 'ইক্তা'র গঠন ও চরিত্রে পরিবর্তন আসে। মুঘল সম্রাট আকবরের শাসনকালে রাজস্বব্যবস্থা একটি উন্নত রূপ পায়, যার সূচনা হয়েছিল অবশ্য শেরশাহের আমলে। আকবর টোডরমলের সাহায্য নিয়ে যে ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন সেটি 'আসল জুমা তুমার' নামে পরিচিত। ১৫৮২ খ্রিঃ বাংলার ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত হয় ১,০৬,৯৩,১৫২ টাকা (N. K. Sinha—*The Eco-History of Bengal,* vol.-II. Calcutta, 1968, p. 12)। কাগজে-

কলমে সম্রাট খাজনা সংগ্রহের অধিকারী হলেও বাস্তবে সে অধিকার অর্পণ করা হয় তাঁর শাসকশ্রেণীর কিছু লোকের হাতে। সামরিক দায়িত্ব পালনের অধিকারী বিশেষ পদাধিকারী ব্যক্তিকে বলা হত 'মনসবদার', যারা একটা নির্দিষ্ট এলাকার 'জাগীর' পেতেন, যার খাজনা বেতনের সমান। দ্বিতীয় ধরনের রাজস্ব আদায়কারীরা ছিল জমিদার, এরা খাজনা আদায় করা ছাড়াও শান্তি-শৃঙ্খলা, বিচারসহ নানা দায়িত্ব পালন করেন। আদায়কারীরা ছিল জমিদার, এরা খাজনা আদায় করা ছাড়াও শান্তি-শৃঙ্খলা, বিচারসহ নানা দায়িত্ব পালন করেন। সাধারণত জমিদারগণ মালগুজারী, পেশকাশি ও খিদমৎকারী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। মুঘল যুগে খালসা ও জাগীর দুই ধরনের জমিতেই জমিদারী প্রথা প্রচলিত ছিল। বাংলার রাজমহল, রংপুর ও মেদিনীপুরের মতো সীমান্তবর্তী জেলাতেও জমিদারী ব্যবস্থার অস্তিত্ব চোখে পড়ে। মুঘল যুগে মূলত বাংলার ভূমি-রাজস্ব আদায় করা হত জমিদারদের দ্বারা। জমিদারদের উপর সরকারি চাপ যে বিশেষ ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া যাবে নিচের পরিসংখ্যান থেকে—

সাল	বাংলায় নির্ধারিত রাজস্ব (টাকা)
১৫৮২	১,০৬,৯৩,১৫২
১৭০০	১,১৭,২৮,৫৪১
১৭২১	১,৪১,০৯,১৯৪

(সূত্র—*The Economic History of Bengal,* vol-II, pp. 8-9)।

ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় মুঘল শাসকরা জমিদারদের কখনোই জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চাইত না। রাজস্ব জমা অনিয়মিত হলে ব্যক্তিগতভাবে পীড়ন করা হত তেমনি প্রয়োজনে রাজস্ব মকুবের ব্যবস্থা ছিল। সে যুগে রাজস্ব সংগ্রহে কঠোরতা থাকলেও দুর্নীতির হাত ছিল কম। বাংলায় জমিদারী প্রথা মুসলিম শাসনের পূর্ব থেকেই ছিল, কিন্তু তারা পরবর্তীকালে খাজনা দেবার শর্তে জমির অধিকার ভোগকে অক্ষুণ্ণ রাখে। অনুর্বর জমিকে চাষযোগ্য করে ভোগদখলীদার জমিদারকে বলা হত 'জঙ্গলবার'। আসলে মুঘল জমিদারী ব্যবস্থায় প্রথাগত বংশানুক্রমিক ভোগদখলী নিয়ম চালু ছিল। আকবর ও পরবর্তী শাসকগণ রাজস্ব সংগ্রহ ও প্রশাসনিক সুবিধার্থে বাংলাকে ১৬৬০টি পরগনায় বিভক্ত করেন যাদের অধীনে ছিল প্রায় এক লক্ষ গ্রাম; ১৬৬০টি পরগনাকে আবার ৩৪টি সরকারের অধীনে শাসন করা হত (*Eco-History of Bengal,* vol-II, p. 8-9)।

মুঘল সরকারের আদর্শ ছিল সরাসরি চাষীদের কাছ থেকে খাজনা গ্রহণ, কিন্তু আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে ছিল বৈপরীত্য। আদায়ের সুবিধার্তে তাই গড়ে উঠেছিল মধ্যবর্তী শ্রেণী। বিভিন্ন মুঘল দলিলে মধ্যবর্তীকে খাজনার পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়ার উল্লেখ পাওয়া গেছে। রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদার বা মধ্যবর্তী শ্রেণী লাভ করছে খাজনার একটা বড় অংশ। সে যুগে নানা কারণে খাজনার হার বৃদ্ধি পেয়েছিল, এই বোঝা চাষীদের সঙ্গে জমিদারদেরও বইতে হত। ফলে একদিকে যেমন শ্রেণীবৈষম্য বাড়ছে অন্যদিকে খাজনার বোঝা সকল শ্রেণীকে স্পর্শ করছে।

মুঘল আমলাতন্ত্র ও শাসকশ্রেণীর সদস্যদের সঙ্গে বাংলার কোনো ব্যক্তিস্বার্থ জড়িত ছিল না। এই পদগুলি (সুবাদার ও দেওয়ান) ছিল অন্য যে-কোনো দায়িত্বের মতো, যার থেকে পদোন্নতি ও বদলির আশা করা হত কেবল। এই ধরনের সরকারের হাতে ক্ষমতা থাকার একটি নেতিবাচক দিক রয়েছে। ইরফান হাবিবের গবেষণা প্রমাণ করেছে : কৃষিবিকাশের ক্ষেত্রে জাগীর হস্তান্তর বিষয়টি প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাংলায় মুঘল শাসকশ্রেণী জানতেন, যে তারা সাময়িক দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছেন। তাই তাদের কাজকর্মে ও চিন্তাভাবনায় দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের ছাপ পাওয়া যায় না। সুতরাং শাসকদের অত্যাচারের যে চিত্র তপন রায়চৌধুরী তাঁর গবেষণার মাধ্যমে *(Bengal Under Akbar and Jahangir)* এঁকেছেন তাকে অনেকাংশেই সমর্থন করা যায়। এই পরিস্থিতিতে সদা বিঘ্নমূলক ব্যয়সাধ্য শক্তি প্রয়োগ না করে মুঘল শাসকরা স্থানীয় পর্যায়ে আপস রফা করে টিকে থাকার চেষ্টা চালায়। একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে জমিদার আখ্যানপ্রাপ্ত স্থানীয় শক্তিধরদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেয়।

৪২.৩.৩ মুর্শিদকুলি খানের রাজস্ব ব্যবস্থা

নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, যদুনাথ সরকার, আব্দুল করীম ও সম্প্রতি অনিরুদ্ধ রায় মুর্শিদকুলি খানের রাজস্ব-ব্যবস্থা নিয়ে যেসব আলোচনা করেছেন তার উপর ভিত্তি করে বাংলায় মুর্শিদকুলি খানের রাজস্ব-ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করা যেতে পারে। ১৭০০ খ্রিঃ মুর্শিদকুলি খান বাংলার দেওয়ান ও মখসুদাবাদের ফৌজদার নিযুক্ত হন এবং ১৭১৭ খ্রিঃ থেকে আমৃত্যু ছিলেন বাংলার সুবাদার। নিযুক্তির পর থেকেই তিনি টাকা সংগ্রহের উপর জোর দেন। ১৭০২ এবং ১৭১১ খ্রিঃ বাংলার রাজস্ব বৃদ্ধির হার ছিল বেশি। সম্ভবত দেওয়ানের পদ লাভের জন্য রাজস্বের হার বৃদ্ধি করে তিনি মুঘল সম্রাটের দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছিলেন। ১৭২২ খ্রিঃ মুর্শিদকুলি 'কামিল জমা তুমারী' নামে নূতন রাজস্ব বন্দোবস্ত গড়ে তোলেন। নূতন 'ডাকলা' একক শুরু করে বাংলা সুবাকে তেরোটি চাকলায় বিভক্ত করা হয়। তৈরি করা হয় নূতন আর্থিক একক। আসলে মুর্শিদকুলির লক্ষ্য ছিল কঠোরভাবে রাজস্ব সংগ্রহ, ফলে অত্যাচারের কাহিনী শুরু হতে বাধ্য। সে সময় বাংলায় নগদ টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মনসবদারদের অন্য প্রদেশে বদলী শুরু হওয়ায় নগদী সৈন্যের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বেতন না পেয়ে নগদী সেনারা মুর্শিদকুলিকে একসময় আক্রমণও করে। অন্যদিকে মনসবদার বদলী হওয়ায় জাগীর জমিগুলিকে 'খলিসা'য় রূপান্তরিত করা হয় এবং সেগুলি ইজারা দেওয়া হতে থাকে।

নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ অভিযোগ করেছেন, মুর্শিদকুলি ছোট ছোট জমিদারদের উচ্ছেদ করে বড় জমিদারি গঠন করে কর সংগ্রহের কাজটি সহজ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ভূমিরাজস্বের অর্ধেক আসতো ৬টি বড় জমিদারের কাছ থেকে। যদুনাথ সরকারের অভিযোগ হল দুটি—(১) মুর্শিদকুলি বেশিমাত্রায় ইজারাদারী ব্যবস্থা চালু করায় পুরাতন হিন্দু জমিদারগুলি ধ্বংস হয়ে যায়, (২) মুর্শিদকুলির আচরণ ছিল হিন্দু জমিদারদের বিপক্ষে। আব্দুল করিমের অভিযোগই ভিন্ন। তাঁর মতে মুর্শিদকুলী জগৎ শেঠকে প্রশ্রয় দিয়ে শক্তি বৃদ্ধির সুযোগ করেছেন। এই জগৎ শেঠই শেষ পর্যন্ত সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তে বড় ভূমিকা নিয়েছিল। এই অভিযোগগুলির বিরুদ্ধে উত্তর খুঁজে পাওয়া গেছে অনুরুদ্ধ রায়ের সদ্য প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ("মুর্শিদকুলি খানের বাংলায় রাজস্ব ব্যবস্থা : একটি আলোচনা", ইতিহাস অনুসন্ধান-১৫, পৃ. ২৭৩-২৮১)। ড. রায় যুক্তি ও তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন— (ক) রাজশাহী ছাড়া অন্যান্য বড় জমিদারিগুলি আগে থেকেই বর্তমান ছিল। 'ইজারা' ব্যবস্থা

মুর্শিদকুলির সৃষ্টি নয়, এটি একটি পুরাতন মুঘল প্রথা। বাংলায় 'ইজারা' ব্যবস্থা চালু হওয়ায় জমিদাররা প্রাপ্য 'হক' থেকে কিন্তু বঞ্চিত হয়নি। (খ) জমিদারদের আয় কমে গেলেও সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়নি। জমিদারী ধ্বংসের পিছনে মূল কারণ ছিল আভ্যন্তরীণ কলহ। (গ) দীর্ঘদিন জমি জরিপ না হওয়ায় এবং মূল্য বৃদ্ধির ফলে জমিদাররা রাজস্ব বাড়িয়ে নেয়। মুর্শিদকুলি এই বেনিয়ম আয় বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। যেহেতু বাংলার অধিকাংশ জমিদার ছিল হিন্দু, সুতরাং রাজস্ব সংগ্রহের কঠোরতার বিরুদ্ধে এই হিন্দুবিরোধী প্রচার গড়ে ওঠা ছিল স্বাভাবিক। (ঘ) মুঘলদের একটি প্রথা ছিল বাণিজ্য ও ব্যবসার মধ্যে হস্তক্ষেপ না করা। আওরঙ্গজেবও সে নীতি অনুসরণ করেছিলেন, মুর্শিদকুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রথাটি অমান্য করতে চাননি। জগৎ শেঠের স্বাধীনতা ও প্রভাব (বাণিজ্যক্ষেত্রে) সম্পর্কে সে কারণেই মুর্শিদকুলি নিশ্চুপ ছিলেন।

৪২.৪ বাংলায় ইংরেজদের রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি (১৭৫৭-১৭৭২)

মীরজাফর বাংলার নবাবী পদে বসার উপঢৌকন স্বরূপ নানা অর্থসহ ২৪ পরগণার জমিদারী লাভ করে ইংরেজরা। এটি ছিল বাংলায় প্রাপ্ত প্রথম (আইনগতভাবে) ভূমি এলাকা। ফ্র্যাঙ্কল্যান্ডের নেতৃত্বে এই এলাকায় রাজস্ব সংগ্রহ শুরু হয়। তবে এই রাজস্ব আদায়ের বিষয়ে তাদের কোনো নীতি গৃহীত হয়নি। জমিদারীটি পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করে জমিদারী এলাকা ১৫ খণ্ডে বিভক্ত করে ইজারা দেওয়া হয়েছিল। জমি ইজারার সময় ফাটকাবাজরা দর তুলে দেওয়ায় তাদের ইজারাদারী পরীক্ষা ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে সেনাদলের (ইংরেজ) ব্যয় নির্বাহের প্রতিশ্রুতিতে ব্যর্থ হলে মীরজাফর বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী কোম্পানিকে প্রদান করে। ফলে বিস্তীর্ণ এলাকায় রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব কোম্পানির উপর বর্তায়। এমনকি মীরকাশিমও পূর্বোক্ত এলাকার রাজস্ব কোম্পানিকে সংগ্রহ ও গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু বাংলার ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে কোম্পানির জ্ঞান ছিল সীমিত। তাই রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের প্রশ্নে কোম্পানির কাছে তখন দুটি পথ খোলা ছিল—(ক) মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থা, যেটি চলে আসছে এবং মুর্শিদকুলি দ্বারা কিছু পরিবর্তিত হয়েছে, সেটি বজায় রাখা নতুবা (খ) একটি নূতন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ইংরেজরা যে রাজস্ব ব্যবস্থা চালু ছিল তার প্রতি আস্থাশীল ছিল না, অন্যদিকে নিজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার মত ক্ষমতাও ছিল না। সুতরাং বাংলার ভূমিরাজস্ব নিয়ে কোম্পানির চলতে থাকে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

প্রথম থেকেই কোম্পানির কর্মচারীরা বাংলার জমিদার সম্পর্কে অবিশ্বাসী মনোভাবাপন্ন ছিল। অনেক ক্ষেত্রে জমিদাররা রাজস্ব সঠিক সময়ে জমা দিত না; রাজস্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাদের ছিল অনীহা। কিন্তু খরচার একটা বড় অংশ রাজস্ব থেকে সংগ্রহে কোম্পানির আগ্রহ থাকায় তারা রাজস্ব সংগ্রহের বিকল্প পথ খোঁজে। মুঘল যুগে জমিদারি ব্যবস্থায় ইজারাদার ছিল, কিন্তু তারা ছিল এলাকারই অধিবাসী এবং বংশপরম্পরায় অধিকার ভোগ করত। মুঘল সরকার কখনোই প্রত্যক্ষ ইজারাদারী ব্যবস্থা প্রবর্তন করেনি। কিন্তু জমি থেকে অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহের আশায় ইংরেজরা ফাটকা ইজারাদারদের রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার দেয়। বেনিয়াদের কাছে ইজারা লাভ ছিল মুনাফার এক স্বর্গরাজ্য। ফাটকা ইজারাদারদের সহযোগিতায় অতিরঞ্জন রাজস্ব নির্ধারণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সর্বনাশের অধ্যায়। মীরকাশিমের সময় কঠোর রাজস্ব সংগ্রহ ও অতিরক্ত রাজস্ব নির্ধারণ বাংলায় পুরাতন রাজস্ব কাঠামোয় বড় আঘাত হেনেছিল। উৎপন্ন ফসলের উপর নির্ভরশীল বার্ষিক খাজনা

নির্ধারণের সঠিক নীতি সে সময় ভেঙে পড়ে। মীরজাফরের মৃত্যুর পর নবাব হলেন নাজম-উদ্-দৌল্লা; তার নবনিযুক্ত নায়েব নাজিম রেজা খাঁর উপর দায়িত্ব দেওয়া হল রাজস্ব বিষয়টি। সে সময় বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থাটি জরাজীর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে ১৭৬৫ খ্রিঃ কোম্পানি স্বহস্তে দেওয়ানী গ্রহণ করেছে মূলত রাজনৈতিক কারণে।

১৭৬৫ খ্রিঃ দেওয়ানী লাভ ছিল বাংলায় ইংরেজ অধিকারের আইনসঙ্গত স্বীকৃতি। এই রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে কোম্পানিকে প্রশাসনিক দায়িত্বও গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু এই ধরনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মানসিক প্রস্তুতি ও সক্ষমতা কোনোটাই কোম্পানির সে সময় ছিল না। তাই ক্লাইভ গড়ে তোলেন দ্বৈত-শাসন নামে পরিচিত এক জোড়াতালি ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় বাংলায় রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ববান ব্যক্তি ছিলেন রেজা খাঁ। যেহেতু কোম্পানির তখন একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ করা, তাই রেজা খাঁ উপলব্ধি করেন তার অস্তিত্ব নির্ভর করছে রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণের উপর। ফলে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য তিনি নিযুক্ত করেন তাদের যারা বলপূর্বক রাজস্ব আদায় করতে সক্ষম। এই কাজে রেজা খাঁ অনেকাংশে সাফল্যও পেয়েছিলেন। ১৭৬৪-৬৫ খ্রিঃ দেওয়ানী লাভের পূর্বে বাংলার সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৮১,৭৫,৫৩৩ টাকা; ১৭৬৪-৬৫ খ্রিঃ রেজা খাঁ সেখানে সংগ্রহ বাড়িয়ে করেছিলেন ১,৪৭,০৪,৮৭৫ টাকা (সূত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত—*ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস,* ১৭৫৭-১৮৩৭, পৃ. ৮৮)। রেজা খাঁ চড়া হারে রাজস্ব আদায়ের কুফল সম্পর্কে সাবধান করলেও কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। কোম্পানি দেওয়ানী এলাকাও 'Ceeded land'-এর সঠিক রাজস্ব কত হওয়া উচিত এই বিষয়টি নির্ধারণ করতে যেমন পারেনি তেমনি সময় দেয়নি রাজস্বনীতি নিয়ে চিন্তাভাবনার জন্য। সর্বোচ্চ হারে রাজস্ব না দিতে পারায় অনেক আমিনের কর্মচ্যুতি ঘটল, জমিদারদের অবস্থা হল আরও সঙ্গীন। প্রশ্ন দেখা দিল ক্লাইভের দ্বৈত-শাসন নিয়ে।

পরবর্তী গভর্নর ভেরেলেস্ট রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। তিনি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের হাতে তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। অত্যাচারী, প্রতারক ও শঠ আমিনদের ক্ষমতা হ্রাস এবং তাদের কাজকর্মের উপর নজর রাখার জন্য নিযুক্ত করলেন সুপারভাইজার। বস্তুত দেওয়ানী এলাকায় সুপারভাইজার নিয়োগ ছিল একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। ১৭৭০ খ্রিঃ রেজা খাঁর প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমিনদের রাজস্ব ব্যবস্থা থেকে সরে যেতে হয়। Court of Directors-এর নির্দেশে সুপারভাইজাররা ১৭৭২ খ্রিঃ রাজস্ব সংগ্রাহকের দায়িত্ব গ্রহণ করে। রেজা খাঁর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৭৭০ খ্রিঃ মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় গঠিত হয় "Comptrolling Councils of Revenue"। ইতিমধ্যে ১৭৬৮ খ্রিঃ বাংলায় উৎপাদন ব্যবস্থা আরও ভেঙ্গে পড়ে। ১৭৭০ খ্রিঃ সমগ্র বাংলায় দুর্ভিক্ষ চরম আকারে আত্মপ্রকাশ করে। দুর্ভিক্ষ চলাকালীন কোম্পানির সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ কিন্তু হ্রাস পায়নি। একদিকে খাদ্যাভাব, দ্রব্যমূল্যের আকাশছোঁয়া দাম, ত্রাণ সম্পর্কে শাসককুলের অনীহা, রাজস্ব সংগ্রহাকারীদের অত্যাচার, অন্যদিকে মৃত্যুর করাল গ্রাস বাংলার আর্থিক ও সামাজিক জীবনে নিয়ে আসে দুর্দশা। জনসংখ্যার $^{১}/_{৩}$ অংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, বিস্তীর্ণ এলাকা হয়ে পড়ে জঙ্গালাকীর্ণ। এই নৈরাশ্য ও নৈরাজ্যের অবসান ঘটাতে 'Court of Directors'

কোম্পানির কলিকাতা কর্তৃপক্ষকে দ্বৈত-শাসনের অবসান ঘটিয়ে নূতন রাজস্বনীতি গ্রহণের নির্দেশ পাঠায়। ওয়ারেন হেস্টিংস ক্ষমতায় এসে বাংলায় ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে এক ভ্রান্ততম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান যেটি 'নূতন ইজারাদারী' ব্যবস্থা নামে পরিচিত।

৪২.৫ ইংরেজদের সর্বোচ্চ রাজস্ব সংগ্রহের কারণ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পলাশী যুদ্ধের পর থেকে ভূমিরাজস্বের উপর গুরত্ব দিতে থাকে; দেওয়ানী লাভের পর চড়া হারে রাজস্ব আদায় শুরু করে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মতো ঘটনা ঘটলেও রাজস্ব বৃদ্ধির হার কিন্তু তারা কমায়নি। ১৭৯৩ খ্রিঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের কালে বাংলার রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৪,০০,০০০ পাউন্ড যেখানে ১৮৬৫ খ্রিঃ দেওয়ানীর সময় রাজস্ব ছিল মাত্র ১৪,৭০,০০০ পাউন্ড। কোম্পানির এই ক্রমাগত রাজস্ব বৃদ্ধির পিছনে কয়েকটি উদ্দেশ্য ও স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়োজনীয়তা লুকিয়ে ছিল। প্রথমত, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারত থেকে রেশম ও বস্ত্রসামগ্রী কিনে ইউরোপের বাজারে বিক্রয় করার জন্য বিনিয়োগ করত সোনা ও রূপা (বুলিয়ন)। ভারতে বিক্রয় করার মতো দ্রব্যও তাদের বিশেষ ছিল না। ইংল্যান্ড থেকে সোনা ও রূপা বাইরে চলে যাওয়াটি কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ভালো চোখে দেখছিল না। দেওয়ানী লাভের পর কোম্পানির কাছে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ভূমিরাজস্ব একটি আয়ের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। সংগৃহীত রাজস্বের অর্থ ব্যবসার দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হতে থাকে। ইংল্যান্ড থেকে সোনা, রূপা পাঠানোর দিন শেষ করতে চায় রাজস্বের পরিমাণ বাড়িয়ে। ইচ্ছেটা, 'মাছের তেল দিয়ে মাছ ভাজতে হবে।' এছাড়াও কোম্পানি তার কর্মচারীদের বেতনভাতা প্রদান করে অতিরিক্ত আয় বিনিয়োগ করতে চায় চীনের বাণিজ্যে। ফলে আয় বৃদ্ধির চাপটি গিয়ে পড়ে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার উপর। দ্বিতীয়ত, ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ এবং ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের মতো ব্যয়সাপেক্ষ ও দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ করতে হয়েছিল কোম্পানিকে ঔপনিবেশিক স্বার্থে। এই ব্যয়ের অর্থ এসেছিল ভারতীয় রাজস্ব থেকে। সে সময় রাজনৈতিক অস্থিরতায় ব্যবসা থেকে রাজস্ব সংগ্রহের হার কমে গিয়েছিল, তাই ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধির প্রসঙ্গটি কোম্পানির কাছে প্রাধান্য পায়। তাছাড়া মাথাভারী প্রশাসনিক কাঠামোতে ইউরোপীয় কর্মচারীদের উচ্চহারে বেতনের জন্য ব্যয়, ১৭৯৩ খ্রিঃ চার্টার আইন অনুসারে ইংল্যান্ডের 'Board of Control'-এর সদস্যদের বেতন এবং ১৮১৩ খ্রিঃ চার্টার আইনের ধারা প্রয়োজনে কোম্পানি ডিভিডেন্ট ($১০^{১}/_{২}\%$) ভারতে ভূমিরাজস্ব থেকে প্রদানের নির্দেশ—প্রমাণ করেছিল কোম্পানির ভূমিরাজস্বের উপর নির্ভরতা। সুতরাং বাজেট ঘাটতির উপর নির্ভর করত রাজস্ব বৃদ্ধির হার। তৃতীয়ত, অষ্টাদশ শতকের শেষে ঔপনিবেশিক শোষণের তিনটি ক্ষেত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—(ক) আমেরিকায় বাধ্যতামূলক শ্রমের মাধ্যমে রৌপ্যখনি থেকে সম্পদ আহরণ, (খ) আফ্রিকানদের দাস হিসাবে চালান এবং (গ) এশিয়ায় নৌচলাচল ও জমির উপর অতিরিক্ত করের বোঝা। (দেখুন, Capitalism in History—by Irfan Habib (Bengalee Muslim ইতিহাস অনুসন্ধান-১১)। হাবিবের মতে, জাভার কৃষকদের উপর নেদারল্যান্ডসের করভার দিয়ে যে শোষণের প্রক্রিয়া শুরু হয় ভারতে পলাশীর যুদ্ধের পর ব্রিটিশ দখলদারী ছিল চূড়ান্ত মুহূর্ত। কোম্পানি তার

দখলীস্বত্ব ভূমি এলাকা থেকে গৃহীত রাজস্ব মূলত নিয়ে যেত ভারতীয় বস্ত্রের আকারে। তাছাড়াও নানা আকারে প্রতিবছর বিপুল রাজস্ব ইংল্যান্ডে চলে যেত, যার পরিমাণ অষ্টাদশ শতকের শেষে দাঁড়ায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউন্ড। বাংলা থেকে বিপুল অর্থ ইংল্যান্ডে এই পাচারকে অর্থনীতিবিদগণের ভাষায় বলা হয় 'Economic Drain', অম্লান দত্ত বাংলায় তাকে বলেছেন 'অপহার'। অধ্যাপক ইরফান হাবিব মনে করেন, ঔপনিবেশ থেকে অর্জিত সম্পদ শিল্পবিপ্লবে উর্বরতা দিয়েছিল। এই নিষ্ঠুর উপনিবেশবাদ ছিল ধনতন্ত্র উদ্ভবের মৌলিক শর্ত। আভ্যন্তরীণ পুঁজি গড়তে পররাজ্যের অর্থনীতিতে দখল করা ছিল জরুরি (দেখুন, ইতিহাস অনুসন্ধান-১১, পৃ. ৮-৯)। এককথায় শিল্পবিপ্লবের স্বার্থে নিরবচ্ছিন্ন পুঁজি সরবরাহে ইংল্যান্ড অনেকখানি নির্ভরশীল ছিল বাংলার ভূমিরাজস্বের উপর, তাই সকলেই চেয়েছিল রাজস্ব বাড়িয়ে পুঁজির যোগানকে অব্যাহত রাখতে।

৪২.৬ বাংলায় ইংরেজদের রাজস্ব সংক্রান্ত গৃহীত তিনটি পদক্ষেপ

১৭৭০ খ্রিঃ এর পর বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ঘন ঘন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠিত Comptrolling Councils of Revenue-এর সভাপতি নির্বাচন করা হল দরবারের ইংরেজ রেসিডেন্টকে। ১৭৭১ খ্রিঃ আগস্ট মাসে 'বোর্ড অব্ ডিরেক্টরস্' দেওয়ানী নিজের হাতে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং কোম্পানির কর্মচারীদের ভূমিরাজস্বের দায়িত্ব গ্রহণের নির্দেশ দেয়। এই গুরুদায়িত্ব নিয়ে হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রিঃ বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত হন। কিন্তু হেস্টিংসের কাছে রাজস্ব আদায় ও রাজস্ব পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মচারী যেমন ছিল না, তেমনি জমির কত রাজস্ব হতে পারে তার কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্যাদিও ছিল না। অন্যদিকে কোম্পানির কর্মচারীদের দুর্নীতি, সীমিত ক্ষমতা ও কাউন্সিলের সদস্যদের সদা বিরোধিতা সমস্যাকে আরো জটিল করে তোলে। এই অবস্থায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি রাজস্ব বিষয়ক সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজতে স্বচেষ্ট হন।

৪২.৬.১ নূতন ইজারাদারী ব্যবস্থা (১৭৭২-১৭৭৭)

রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে হেস্টিংস দুটি বিষয়ে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন—(১) যেহেতু জেলা, পরগনা বা গ্রামের জমির রাজস্ব সঠিক কত হতে পারে সেটি যখন জানা নেই তখন নিলামের বন্দোবস্ত করে সর্বোচ্চ রাজস্ব কত, সেটি জেনে নেওয়া যেতে পারে। (২) পাঁচ বছরের জন্য নিলামের ব্যবস্থা করে রাজস্ব ব্যবস্থায় স্থিতিলতা নিয়ে আসা। অতপর তাঁর এই চিন্তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য গড়ে তুললেন নূতন প্রশাসনিক কাঠামো ১৭৭২ খ্রিঃ কাউন্সিলের সদস্য নিয়ে গঠিত হল 'বোর্ড অব্ রেভেন্যু' বা রাজস্ব পরিষদ যার হাতে রইল রাজস্ব পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব এই পরিষদের কয়েকজন সদস্য নিয়ে গড়ে তোলা হল 'কমিটি অব্ সার্কিট' যাদের কাজ হল প্রতিটি জেলায় ঘুরে কালেক্টরদের সহযোগিতায় সর্বোচ্চ নিলামের মাধ্যমে পাঁচ বছরের জন্য রাজস্ব আদায়ের জন্য জমি ইজারা দেওয়া। এই ব্যবস্থাটি নূতন ইজারাদারী ব্যবস্থা নামে পরিচিত। প্রতিটি জেলায় রাজস্ব আদায়ের জন্য নিযুক্ত হলেন একজন করে ইউরোপীয় কালেক্টর, যাকে সাহায্য করবে একজন দেশীয় দেওয়ান। অবলুপ্তি ঘটানো হল 'সুপারভাইজার' পদটির।

১৭৭২ খ্রিঃ জুন মাসে হেস্টিংস 'কমিটি অব্ সার্কিট'-এর সভাপতি হিসাবে নদীয়া জেলায় উপস্থিত হলেন। নদীয়াকে ধরা হল সমগ্র প্রদেশের আদর্শ জেলা হিসাবে, সেখানে যে নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন হবে সেই ব্যবস্থা চালু হবে অন্যত্র। নদীয়ার জমিদারকে বাদ দিয়ে সর্বোচ্চ রাজস্ব প্রদানে আগ্রহী ব্যক্তির সঙ্গে ইজারার ব্যবস্থা হল। পাঁচ বছরের জন্য চুক্তিতে জমিদারদের ইজারাদারে পরিণত করার প্রক্রিয়া চলতে থাকল নানা জেলায়। জমিদার, তালুকদার, ছোট জমিদার সকলেই এখন ইজারাদার—জমিদার বলে কিছু রইল না। কিছুদিনের মধ্যে হেস্টিংসের নূতন ইজারাদারী ব্যবস্থা সবার কাছে ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। নিলামে জমি বন্দোবস্তের ফলে অনেকে মর্যাদা রক্ষার্থে ও জেদের বসে চড়া হারে নিলাম ডাকলেও রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ হয়। ফলে ইজারাদাররা রাজস্ব বাকী রাখে, কোম্পানির রাজস্ব ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা ভাবনাটি অবাস্তবে পরিণত হয়। তাছাড়াও কোম্পানির কিছু কর্মচারীও বেনামীতে জমি বন্দোবস্ত নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে রাজস্ব বাকি রাখতে থাকে। অন্যদিকে ইজারাদারীতে অংশ নিয়েছিল অধিকাংশ বেনিয়ান ও মহাজন শ্রেণীর লোক; যাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ইজারাভুক্ত জমি থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা আদায়। তাদের অধীনস্থ দর-ইজারাদারগণ রায়তদের উপর অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের জন্য চালাতে থাকে অবাধ লুণ্ঠন। অনেক পুরাতন জমিদার যারা বংশমর্যাদা রক্ষার্থে চড়া হারে রাজস্ব দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তারাও বিপাকে পড়লেন। উদাহরণস্বরূপ রানি ভবানীর কথা বলা যেতে পারে, রাজস্ব বাকি থাকায় তাঁর জমিদারী কেড়ে নেওয়া হল। সুতরাং সব মিলিয়ে ইজারাদারী ব্যবস্থা চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। হেস্টিংস তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে দেখে নূতন তথ্য সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করলেন 'আমিনী কমিশন' (১৭৭৬)। এদিকে পাঁচ বছরের ইজারাদারী ব্যবস্থার মেয়াদ শেষ হলে, তাকে বাতিল করে চালু করা হল অপর এক নূতন ব্যবস্থা।

৪২.৬.২ একসালা বন্দোবস্ত বা জমিদারী ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন (১৭৭৭-১৭৮৬)

হেস্টিংসের পঞ্চবার্ষিক নূতন ইজারাদারী ব্যবস্থার আশ্চর্যতম দিক হল দুর্ভিক্ষের পূর্বের তুলনায় কম সংখ্যক রায়তদের কাছে ইজারাদারদের অনেক বেশি খাজনার দাবী। ফলে এই ইজারাদারী ব্যবস্থার ধাক্কায় 'রায়তরা তলিয়ে গেল দুর্দশার অন্ধকারে, পুরাতন জমিদার হারাল তার প্রাক্তন সম্মান, দুর্ভিক্ষ যে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটিয়েছিল সেটি নিল আরো ভয়ঙ্কর রূপ' (নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ—*বাংলার অর্থনৈতিক জীবন,* পৃ. ৫৩)। ১৭৫৭ খ্রিঃ পর থেকে কোম্পানির রাজস্বের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সামনে মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থা যেমন অকেজো হয়ে পড়েছিল, অন্যদিকে পাঁচসালা নূতন ইজারাদারী ব্যবস্থাও যে ব্যর্থ হয়েছে সেটি দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় 'Court of Directors' রাজস্ব ব্যবস্থার ঘন ঘন পরিবর্তন, কমিটি গঠনের মাধ্যমে অনুসন্ধান ও ভবিষ্যতে রাজস্বনীতি সম্পর্কে তর্ক-বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে এক চিঠিতে জানিয়ে দেয়, আপাতত কোনো চূড়ান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ না করে জমিদারদের সঙ্গে স্বল্পমেয়াদী বন্দোবস্ত করা উচিত। ফলে ১৭৭৭ খ্রিঃ পাঁচসালা বন্দোবস্তের মেয়াদ শেষে একসালা বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে জমিদারী ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করা হল। এই বন্দোবস্ত অনুসারে—(১) ইজারাদারদের অবলুপ্তি ঘটিয়ে জেলার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হল জমিদারদের। জমিদারের থেকে কেউ বেশি রাজস্ব প্রদানে আগ্রহী থাকলেও সেখানে

অগ্রাধিকার পাবে জমিদার (২) রাজস্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিবগত তিন বছরের গড় রাজস্বকে ধরা হল। (৩) রাজস্ব বাকি পড়লে কেবল উৎপন্ন শস্য থেকে বকেয়া মিটিয়ে ফেলার সুযোগ দেওয়া হল। আসলে এই একসালা বন্দোবস্ত ছিল একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা, হেস্টিংস একটি স্থায়ী ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জমিদারগণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও ইতিমধ্যে অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছিল। ইজারাদারী ব্যবস্থার ফলে জমিদার হাতছাড়া হওয়ায় কানুনগো কার্যালয় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল; তাই জমি-সংক্রান্ত দুর্নীতি রোধ করা আর সম্ভব হল না। রাজস্ব যা নির্ধারিত হয়েছিল সেটিও ছিল মাত্রাতিরিক্ত। এই অবস্থায় ১৭৮৬ খ্রিঃ কর্নওয়ালিস ভারতে এলেন, তার কিছুদিন আগেই পিটের ভারত আইনে (১৭৮৪) কোম্পানিকে রাজস্ব চিরস্থায়ী করার নির্দেশ দিয়েছে। এই নির্দেশ পালনের দায়িত্বটি পড়ল কর্নওয়ালিসের উপর।

৪২.৭ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে আমরা দুটি সমান্তরাল ধারা লক্ষ্য করে থাকি— (১) এই ব্যবস্থাটি ছিল রাজস্ব বিষয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের চূড়ান্ত পরিণতি। (২) অন্যদিকটি হল তত্ত্বগত ভাবনাচিন্তা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত সাধারণের মনে এই ধারণা ছিল যে কর্নওয়ালিস হলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রণেতা। এই ধারণাটি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন জেমস্ মিল তাঁর 'The History of British India' (London, 1848) গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে। বিংশ শতকের প্রথম দশকে বিদ্যোৎ সমাজে মিলের প্রভাব ক্ষীণ হয়ে আসে, অনেকের মনে ধারণা জন্মাতে থাকে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য একা কর্নওয়ালিসকে দায়ী করা যায় না। রণজিৎ গুহের A Rule of Property of Bengal'. 'An Essays on the Idea of Permanent Settlement', Cambridge Eco-History of India (Vol.-2), বিনয়ভূষণ চৌধুরীর প্রবন্ধ, নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের 'The Eco-History of Bengal,' (Vol.-II), ইত্যাদি গবেষণা-গ্রন্থ যেমন বিষটির উপর নূতনভাবে আলোকপাত করেছে, তেমনি সৃষ্টি করেছে বিতর্ক। ড. গুহ ইউরোপীয়দের মানসিকতা বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করেছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে মত গড়ে ওঠার পিছনে ছিল ফরাসী ফিজিওক্র্যাট অর্থনীতিবিদ্দের প্রভাব। ড. বিনয়ভূষণ চৌধুরীর প্রবন্ধের বক্তব্য হল, কোম্পানির বাণিজ্যিক উন্নতি বিধানের জন্য ও বুলিয়ন ইংল্যান্ড থেকে আসা বন্ধ করতে নিয়মিত ভূমি-রাজস্ব আদায়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় মাল খরিদের (Investment) ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল। এইসব নূতন নূতন তর্ক-বিতর্কের প্রেক্ষাপটেই আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে।

৪২.৭.১ পটভূমি

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর যখন বাংলার সমগ্র অর্থনীতিকে গ্রাস করেছে ঠিক তখনই স্কটিশ চিন্তাবিদ আলেকজান্ডার দাও প্রথম দাবি করলেন, বাংলাকে রক্ষা করতে হলে দ্বৈত-শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা উচিত (দেখুন, Alexander Daw—*The History of Hindoostan,* London, 1968)। আলোকজান্ডারের প্রস্তাবের ঠিক দু'বছর পরই এক ফিজিওক্র্যাট হেনরী পেট্রলো তাঁর 'Essays

upon the Cultivation of the Lands and Improvements of the Revenues of Bengal' (London, 1772) গ্রন্থে প্রাক্-বিপ্লব যুগের ফ্রান্সের সঙ্গে বাংলার করুন অবস্থার তুলনা করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করার পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন। এই দুই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবক্তার অবশ্য দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছিল। ইতিমধ্যে কোম্পানি স্বহস্তে দেওয়ানীর কার্যকরী দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং চালু হয় নূতন ইজারাদারী (পাঁচ বছরের জন্য) ব্যবস্থা। এই রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে সে সময়ই বিতর্ক শুরু হয়েছিল। কাউন্সিল সদস্য ফিলিপ ডেকারস, ঢাকা থেকে রিচার্ড বারওয়েল এবং মুর্শিদাবাদ থেকে মিডলটন জমিদারদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির কথা বলেন। নীতিগতভাবে এইসব রাজস্ব কর্মচারীরা একমত হলেও নানা বিষয়ে তাদের মধ্যে ছিল মতানৈক্য। তবে এই বিষয়ে সবথেকে জেরালো বক্তব্য রেখেছিলেন ফিজিওক্র্যাট চিন্তাধারায় প্রভাবিত, মন্টেস্কু ও এ্যাডাম স্মিথের লেখায় মুগ্ধ ফিলিপ ফ্রান্সিস। হেস্টিংসের প্রচলিত নূতন ইজারাদারী ব্যবস্থার সমালোচনা করে ১৭৭৬ খ্রিঃ জানুয়ারি মাসে একটি পাল্টা রাজস্ব ব্যবস্থার পরিকল্পনা কোম্পানির কাছে পেশ করেন। এই পরিকল্পনা রচনায় তাঁকে সাহায্য করেছিল তৎকালীন বাংলার রাজস্ব বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মচারীগণ যারা ছিল চিরস্থায়ী ব্যবস্থার সমর্থক। ফ্রান্সিস বিশ্বাস করতেন, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে এই ধরনের ভূমিব্যবস্থা যদি কৃষিবিপ্লবের সহায়ক হয় তাহলে বাংলাদেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা কৃষিবিপ্লবের জন্য গ্রহণ করা উচিত। তিনি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন, মুঘল যুগেও ভারতে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল; তাই কোম্পানির এখন উচিত ব্যক্তিগত মালিকানা মেনে নিয়ে জমিদারদের সঙ্গে চুক্তি করা। ফ্রান্সিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল বিষয়গুলি ছিল—(ক) জমিদারদের জমির একমাত্র মালিক বলে ঘোষণা করে চিরকালের জন্য তাদের উপর সরকারি খাজনা সীমাবদ্ধ করে দেওয়া। (খ) রায়তদের বলে ঘোষণা করে চিরকালের জন্য তাদের উপর সরকারি খাজনা সীমাবদ্ধ করে দেওয়া। (গ) রায়তদের অধিকার ও স্বার্থ জমিদারদের উপর ছেড়ে দেওয়া। (ঘ) বাংলার জমিদার শ্রেণী ইংল্যান্ডের ভূস্বামীদের ন্যায় উন্নতিকামী হয়ে উঠবে সে ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা রাখা (মুনতাসীর মামুন—*চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী সমাজ,* ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ৪০-৪১)। 'Court of Directors' অবশ্য ফ্রান্সিসের পরিকল্পনা এবং হেস্টিংসের ইজারাদারী ব্যবস্থা উভয়ই বাতিল করে দিয়ে জমিদারদের সঙ্গে এক বছরের জন্য বন্দোবস্ত নীতি গ্রহণ করে। ১৭৮৪ খ্রিঃ পিটের ভারত আইনে অবশ্য রাজস্ব বিষয়ে চিরস্থায়ী আইন প্রণয়নের কথা বলা হয়। ১৭৮৬ খ্রিঃ Court of Directors-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করতে কর্নওয়ালিস ভারতে পৌঁছালে শোর ও কর্নওয়ালিসের মধ্যে দেখা দেয় বিতর্ক। সে সময় শোর ছিলেন বাংলার রাজস্ব বিষয়ে বিশারদ ব্যক্তি। কর্নওয়ালিস তাঁকে রাজস্ব উপদেষ্টা নিয়োগ করেছিলেন। নীতি প্রণয়নে যে শোরের উপর কর্নওয়ালিস ছিলেন সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এখন সে ব্যক্তিটি প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করে জেমস গ্রান্ট; বাংলার রাজস্ব বিষয়ে তাঁরও ছিল যথেষ্ট অভিজ্ঞতা। এই বিতর্ক চলেছিল তিনটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে—(১) জমির প্রকৃত মালিক কে? কার সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হবে? (২) রাজস্বের পরিমাণ কত হবে? (৩) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কি যুক্তিযুক্ত হবে? এই বিতর্ক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে—

৪২.৭.২ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে গ্রান্ট, শোর ও কর্নওয়ালিসের মধ্যে বিতর্ক

গ্রান্ট	শোর	কর্নওয়ালিস
(ক) মুঘল আমলে রাষ্ট্রই ছিল জমির মালিক। জমিদার কেবল রাজস্ব সংগ্রহ করত। তার বিনিময়ে জমিদার পেত পারিশ্রমিক। সরকার ইচ্ছা করলে জমিদার ও প্রজা ইচ্ছামতো ব্যক্তির সঙ্গে জমি বন্দোবস্ত করতে পারে।	(ক) জমিদারই ছিল জমির প্রকৃত মালিক, কিন্তু সরকারকে রাজস্ব প্রদানে তারা বাধ্য। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও রাজস্ব আদায়ের দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা যেহেতু জমিদারদের রয়েছে, সুতরাং রাজস্ব সংক্রান্ত বন্দোবস্ত তাদের সঙ্গেই করা উচিত।	(ক) বাংলার কৃষি উন্নয়নের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কোম্পানির বাণিজ্যিক স্বার্থ। কৃষির উন্নয়নের জন্য দেশীয় জমিদারদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। দীর্ঘকাল ধরে জমিদাররাই জমি ভোগ করায় মালিকে পরিণত হয়েছে। সরকারের নির্ভরযোগ্য সমর্থক পরিণত করতে হলে রাজস্ব বন্দোবস্ত জমিদারদের সঙ্গেই করতে হবে।
(খ) মুঘল আমলে মীরকাশিমের সময় রাজস্ব সর্বোচ্চ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৭৬৫ খ্রিঃ কোম্পানি দেওয়ানী গ্রহণের সময় যে রাজস্ব ছিল সেটিকে ধরেই রাজস্বের হার চিরস্থায়ী করা যেতে পারে।	(খ) মুঘল আমলে ঘোষিত রাজস্ব অপেক্ষা প্রকৃত আদায়ের হার ছিল বেশি। সুতরাং রাজস্ব আদায়ের জন্য তথ্য ও তদন্তের আরো প্রয়োজন। আপাতত ১৭৮৭ খ্রিঃ আদায়ীকৃত রাজস্বকে হার হিসাবে ধরা যেতে পারে। তথ্য জোগাড়ের পর সিদ্ধান্ত নিতে হবে প্রকৃত রাজস্ব কত হবে।	(খ) বিগত ২৫ বছর ধরে রাজস্ব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ যখন সম্পূর্ণ হয়নি, তখন আর অপেক্ষা করা যায় না। ১৭৮৯ খ্রিঃ আদায়ী রাজস্বকে ভিত্তি বর্ষ হিসাবে ধরে সেটিকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা যেতে পারে।
(গ) রাজস্বের হার চিরস্থায়ী হলেও জমিদারদের সঙ্গে এই মুহূর্তে চিরস্থায়ী করা ঠিক হবে কিনা ভাবতে হবে।	(গ) জমিদারদের সঙ্গে একটা দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত করলে ভবিষ্যতে রাজস্ব বৃদ্ধির সুযোগ থাকবে না। আপাতত দশ বছরের জন্য চুক্তি করে জমি জরিপ ও তথ্যাদি সংগ্রহ চলতে পারে। পরে চিরস্থায়ীর কথা ভাবা যাবে।	(গ) কোম্পানির স্বার্থরক্ষায় তিনি দায়বদ্ধ, তাই সত্বর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কার্যকরী করতে তিনি আগ্রহী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না করায় দেশের অগ্রগতি পিছিয়ে যাচ্ছে। জমিদার চিরস্থায়ী স্বল্প মনোযোগী হবে। অন্যদিকে কোম্পানির রাজস্ব আদায়ে আসবে স্থিতিশীলতা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশ্নে শোর, গ্রান্ট ও কর্নওয়ালিসের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য ছিল না। বিতর্ক দেখা দেয় চুক্তি কাদের সঙ্গে হবে এবং কখন করা উচিত এটি নিয়ে। এই অবস্থায় কর্নওয়ালিস ১৭৮৯ খ্রিঃ বাংলা ও বিহারে চালু করেন দশসালা বন্দোবস্ত, ১৭৯০ খ্রিঃ উড়িষ্যাতেও সেটি কার্যকরী হয়। কর্নওয়ালিস, শোর গ্রান্টকে জানান যে, কোম্পানির কর্তৃপক্ষ অনুমতি না পাওয়া অবধি দশসালা বন্দোবস্তই চালু থাকবে। ইতিমধ্যে গ্রান্ট, শোর প্রমুখের সুপারিশ ও কর্নওয়ালিসের বক্তব্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় 'Court of Directors'-এর কাছে। কোর্ট বিষয়টি নানা দিক থেকে পর্যালোচনা করার পর কর্নওয়ালিসের প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে চিঠিতে লেখে, 'আমরা মনে করি নানা সমস্যার অবতারণা করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে পিছিয়ে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে দেশের সুখ-সমৃদ্ধিকে পিছিয়ে দেওয়া। সুতরাং আমরা আদেশ করছি, ইতিমধ্যে যদি নূতন কোন বাধার সৃষ্টি না হয় তবে অনতিবিলম্বে জমিদারদের সঙ্গে দশবর্ষীয় যে বন্দোবস্ত হয়েছে সেটি চিরস্থায়ী বলে ঘোষণা করা হউক' *(General Letters to the Court of Direcors,* Revenue Dept. Vol.-VI. Letter dt. 15.12.1787)। এই চিঠি প্রাপ্তির দু'মাসের মধ্যে কর্নওয়ালিস দশসালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বলে ঘোষণা করেন।

৪২.৮ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব

আধুনিক ভারতীয় ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মূলত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনকারী একটি ঘটনা। এরিক স্টোক্স (Eric Stokes) লিখেছেন, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত শুধুমাত্র বাংলাদেশের ভূমিক্ষেত্রে একটি রাজস্ব সংগ্রহমুখী ব্যবস্থাই ছিল না, সর্বাধিক রাজস্ব সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতকে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাবের সুস্পষ্ট চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় এই ব্যবস্থার মধ্যে।' (Eric Stokes—*The Peasant and the Raj : Studies in Agrarian, Society and the Pleasant Rebellion in Colonial India.* Cambridge, 1978)। ব্রিটিশ সরকারের উচ্চহারে রাজস্ব সংগ্রহের তাগিদে বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টার প্রভাব নানাভাবে পরিস্ফুট হয়।

৪২.৮.১ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাব

ভারতে ইংরেজ শাসনের আবির্ভাব এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধন করে। কার্ল মার্ক্সের মতে, ইংল্যান্ড ভারতীয় সমাজের অপরিবর্তিত কাঠামোকে ভেঙে দিয়েছিল নির্মমভাবে। সেটি সম্ভব হয়েছি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে প্রচলিত ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যারা প্রথমে জমিদারে রূপান্তরিত হয় তাদের সামাজিক অবস্থান ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু ক্রমে এই পুরাতন জমিদারগণ রাজস্ব প্রদানে ব্যর্থ হলে তাদের জমিদারী নিলামে ওঠে। সেগুলি কিনে নেয় মহাজন, ব্যবসায়ী ও বেনিয়ার দল। এতদিন সমাজের চোখে যারা ছিল ফাটকাবাজ ও দালাল, তারাই জমিদারী নিলামে কিনে নিয়ে সামাজিক মর্যাদালাভের সুযোগ গ্রহণ করে। মোটকথা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তনের সঙ্গে বাংলার পল্লী এলাকায় জমিদারী ও রায়ত এই দুই শ্রেণীর বিকাশ ঘটে, ক্রমে অবশ্য এদের মধ্যবর্তী মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর উত্থান ঘটেছিল যাদের

ছিল আর্থিক সামর্থ্য অনুসারে গ্রামে বা শহরে বসবাস। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অপর একটি কুফল ছিল মহাজন শ্রেণীর উদ্ভব। অশিক্ষিত দরিদ্র রায়ত ও অলস অভিজাতদের উপগর সুযোগ বুঝে যারা শিকারী নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ত। অভাবগ্রস্ত দরিদ্র কৃষক যখন খাদ্য, ফসলের বীজ ও গবাদি পশু কেনার জন্য অর্থের সন্ধানে মহাজনদের বাড়িতে উপস্থিত হত, ঠিক তখনই অভিজাতরা (তথাকথিত) হাজির হত সামাজিক মর্যাদার প্রদর্শনের জন্য অযাচিত খরচে অর্থ ধার করতে। এই সুযোগে মহাজনরা ঐতিহ্যবাহী সাইলকের মতো উভয়কে শোষণ করত। সুতরাং নূতন রাজস্ব কাঠামোর সঙ্গে পরিবর্তন ঘটেছিল সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের।

নূতন ভূমিব্যবস্থার ফলে নগদে রাজস্ব প্রদানের ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয় যা কৃষি উৎপাদনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। পূর্বে কৃষিজাত দ্রব্য সাধারণত গ্রামের প্রয়োজনেই উৎপন্ন হত। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষিদ্রব্য বাজারের পণ্যে পরিণত হয়। শিল্পবিপ্লবজনিত কারণে আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদাকে লক্ষ্য রেখে যেমন নূতন ধরনের কৃষি উৎপাদন শুরু হয়, দেখা দেয় কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ। কৃষিদ্রব্য কেনার জন্য গ্রামে 'কড়িয়া' নামে এক শ্রেণী কাজ করতে শুরু করে। এইভাবে ভারতে কৃষিক্ষেত্রে ধনতন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল ধীরে ধীরে, প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক স্মারকগুলোও তার সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছিল।

৪২.৮.২ জমিদার শ্রেণীর উপর প্রভাব

ইংল্যান্ডে জমিদারী ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করার ফলে জমিদাররা জমিকে উৎপাদনশীল পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে দেখতে শুরু করে। শিল্পবিপ্লবের ফলে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য জমিতে পুঁজির পরিমাণ বাড়াতে উৎসাহী হয়ে ওঠে। এটি দেখে ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থকরা প্রচার শুরু করে যে বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব আনলে কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব আসবে। এই বিষয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন ফ্রান্সিস, শোর ও কর্নওয়ালিস। কিন্তু ১৭৯৩ খ্রিঃ পর কার্যত দেখা গেল জমিদাররা জমিকে পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করেনি। এর জন্য প্রয়োজন ছিল দেশে এমন এক আর্থিক পরিবেশ সৃষ্টি করা, যাতে মনে হয় কৃষিতে বিনিয়োগ করলে মুনাফার হার বেশি হচ্ছে। ইংরেজ শাসকরা সেটি তৈরি করতে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে জমি থেকে আয়ের বড় অংশ জমিদাররা বিনিয়োগ করেছিল অনুৎপাদনশীল ক্ষেত্রে (বিলাসিতায়)। কৃষি উন্নয়নে জমিদারদের অনীহা শাসককুলকে নিরাশ করে। এই শিক্ষা নিয়ে ভারতের অন্যান্য স্থানে চালু করা হয় মহলওয়ারী ও রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত।

৪২.৮.৩ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব

অর্থনীতির সাথে সমাজের রাজনৈতিক অবস্থার যে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে সেটি সর্বজনবিদিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একটি অর্থনৈতিক পদক্ষেপ হলেও রাজনীতির ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া হয় মারাত্মক। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগের ৫০ বছর ছিল সংঘ ও সমিতি গঠনের যুগ। ভারতের সে সময়ের রাজনীতি ছিল এই সংঘগুলির প্রাধান্য। যেমন 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন' যার অধিকাংশ সদস্য জমিদার শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় জনসাধারণের প্রয়োজনে এদের বিশেষ ভূমিকা ছিল না। এই সংঘ তার কার্যকলাপকে কলিকাতার বাইরে

প্রসার ঘটাতে যেমন সক্ষম হয়নি তেমনি রক্ষা করে চলেছিল কেবল জমিদারদের স্বার্থ। জমিরদাররা বিভিন্ন সংঘ বা সমিতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে ভারতীয় রাজনীতিতে ধর্ম গোষ্ঠীস্বার্থ বর্ণ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে বিভেদের সৃষ্টি করে (Anil Seal—*The Emergence of Indian Nationalism,* London, 1968, p. 200-229) ১৮৮৫ খ্রিঃ জাতীয় কংগ্রেস গড়া হয়, যেটি সঠিক অর্থে ছিল রাজনৈতিক সংগঠন ; কিন্তু সেখানে জমিদারদের প্রাধান্য থাকায় শ্রেণী ধর্ম ও বর্ণের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। বস্তুতপক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে যে জমিদার শ্রেণী গড়ে উঠেছিল পরবর্তীকালে রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে তাদের শক্তি ও প্রতিপত্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়। ঊনবিংশ শতকে রাজনীতিতে যেহেতু জমিদার গোষ্ঠীর প্রাধান্য ছিল সেহেতু বাংলার রাজনীতি তখন ছিল আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি। ব্রিটিশদের তুষ্ট করে যতটা নিজেদের দাবিদাওয়া আদায় করা যায়। নরহরি কবিরাজের ভাষায় 'অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসন্তোষ, ব্রিটিশের বিচারবুদ্ধির উপর অদ্ভুত ভরসা ও উপর্যুপরি পরাজয়ের পর অবসাদ—এই ছিল সেসময়ের (ঊনবিংশ শতক) রাজনীতির আসল কথা (প্রবন্ধ : নরহরি কবিরাজ— *বাঙালী রাজনীতির গোড়ার কথা,* পরিচয়, ১৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা পৃ. ৩৪৫-৪৬)। নূতন জমিদার শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে নূতন মধ্যবিত্তদের স্বার্থ এক না থাকায় ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে এদের হাত থেকে নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার লড়াইয়ে নেমেছিল মধ্যবিত্তরা।

৪২.৯ সারাংশ

বিখ্যাত ইংরেজ অধ্যাপক সীলি (Seeley) কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বক্তৃতামালায় বক্তব্য ছিল ইংরেজরা আকস্মিকভাবে ও বিনা অভিপ্রায়ে ভারতে রাজস্ব স্থাপন করেছিল। কিন্তু নানা তথ্যাদি সে কথা প্রমাণ করছে না। ১৬৮৭ খ্রিঃ মাদ্রাজ ও ১৬৮৯ খ্রিঃ বোম্বাই কর্তৃপক্ষকে বিলাত থেকে (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অফিসাররা) যে নির্দেশ পাঠিয়েছিল তাতে 'চিরকালের জন্য ভারতবর্ষে এক বিপুল, সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত ইংরেজ শাসনের প্রয়োজনে রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা এবং রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ে আগ্রহী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল (হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—ভারতবর্ষের ইতিহাস (মুঘল ও ব্রিটিশ যুগ), কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ২৭০-২৭১)। একথা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে ইংরেজরা তাদের ঔপনিবেশিক স্বার্থে বাংলায় প্রভুত্ব বিস্তারে অগ্রসর হয়। ১৭৫৭ খ্রিঃ পলাশীর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করে। এযুগ বিশ্বাসঘাতকতার জয় নয়, এটি ছিল আসলে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধ পুঁজিবাদীদের জয়। ১৭৬৪ খ্রিঃ মীরকাশিমের পরাজয় এবং ১৭৬৫ খ্রিঃ দেওয়ানী লাভের মধ্য দিয়ে কোম্পানি বাকি দুটি ধাপ অতিক্রম করে আর্থিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ চরিতার্থ করার যন্ত্রগুলিকে করায়ত্ত করে। কোম্পানির বাংলার অর্থনীতিকে সাজিয়ে নেয় নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থে, ঔপনিবেশিক স্বার্থে, রাজনৈতিক স্বার্থে। ফলে বাংলার তথা ভারতের চিরাচরিত গ্রামীণ সমাজের শ্রেণীবিন্যাসে, অর্থনীতিতে ও সংস্কৃতিতে পরিবর্তনের সূচনা হয়। দেওয়ানী লাভের পর কোম্পানি ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাকে সাজাতে থাকে ঔপনিবেশিক স্বার্থের অনুসারী হিসাবে। এই প্রক্রিয়া চূড়ান্ত রূপ পায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে। শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডের নিরবচ্ছিন্ন পুঁজি যোগানের প্রয়োজন যেমন তেমনি প্রয়োজন ছিল

বাজারের। ইংরেজরা ভারতবর্ষকে এইদুটি ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেছিল। আধুনিক কিছু গবেষক মনে করেন, ভারতের সামাজিক ও আর্থিক কাঠামোকে ইংরেজরা সাজিয়ে নিতে চেষ্টা করে ঔপনিবেশিক স্বার্থের অনুকূলে। ব্রিটিশ সরকার চিরস্থায়ী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জন্ম দেয় উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর। এই নব্য জমিদার 'বাবুশ্রেণী' নিজেদের নিয়োজিত করেছিল শ্রেণীস্বার্থে ব্রিটিশের চাটুকারে। ইংরেজরা নিজেদেরদ স্বার্থে টিকিয়ে রাখল ক্ষয়িষ্ণু আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে। এই আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-পুঁজিবাদী শ্রেণী ধ্যানধারণায় পুষ্ট একটি সামন্ত-বুর্জোয়া সংস্কৃতির জন্ম হল বাংলা প্রদেশে যেটি 'বাবু কালচার' নামে পরিচিত।

৪২.১০ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতীয় গ্রামসমাজের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটেছিল?

২। দেওয়ানী লাভের পূর্বে বাংলা মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থার কাঠামোটি কেমন ছিল?

৩। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পটভূমি বিশ্লেষণ কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে জমির মালিক কে ছিল? ঔপনিবেশিক যুগে জমির মালিকানায় কী পরিবর্তন ঘটে?

২। মুর্শিদকুলি খানে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার উপর আলোকপাত কর।

৩। ইংরেজরা কেন সর্বোচ্চ রাজস্ব সংগ্রহের নীতি গ্রহণ করে?

৪। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল?

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। ভূমিরাজস্ব বিষয়ে কী কী প্রশ্নকে কেন্দ্র করে শোর ও কর্নওয়ালিসের মধ্যে বিতর্ক দেখা দেয়?

২। কৃষিদ্রব্যের বাণিজ্যিকীকরণ বলতে কী বোঝ?

৩। নূতন ইজারাদারী ব্যবস্থা কী?

৪। প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থা কেমন ছিল?

৪২.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। Desai, A. R.—Social Background of Indian Nationalism, Bombay, 1976 (Reprint).

২। Haque, M. Ajijul—The Man Behind the Plough, Dacca, 1980.

৩। Habib, Irfan—The Agrarian System of Maghal India, Bombay, 1963.

৪। Sinha, N. K.—The Economic History of Bengal (From Plasey to Permanent Settlement) Vol.-II Calcutta, 1968.

৫। Stein, Burton (Ed.)—The Making of Agrarian Policy of British India, 1770-1900, New York. 1992.

৬। Kumar, Dharma (Ed.)—The Cambridge Economic History of India, Vol.-II (1757-1970. Delhi, 1984

৭। Singh, Yogendra—Modernization of Indian Tradition, Jaipur, 1986.

৮। চট্টোপাধ্যায়, গৌতম : ইতিহাস অনুসন্ধান, ১১ ও ১৩।

৯। দত্ত, রমেশচন্দ্র : ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস ১৭৫৭-১৮৩৭, কলিকাতা, ১৩৭৯।

১০। রায়, অনিরুদ্ধ : মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৯৬।

১১। ভট্টাচার্য, সব্যসাচী : ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি, কলিকাতা, ১৩৯৬।

১২। মামুন, মুনতাজীর (সম্পাঃ) : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী সমাজ, ঢাকা, ১৯৭৫।

একক ৪৩ ❐ ঔপনিবেশিক অভিঘাত : নতুন প্রশাসনিক কাঠামো : আইন-বিচার ব্যবস্থা—দণ্ডবিধি—শিক্ষাব্যবস্থা

গঠন

৪৩.০ উদ্দেশ্য

৪৩.১ প্রস্তাবনা

৪৩.২ রেগুলেটিং অ্যাক্ট

৪৩.৩ পিটের ভারত-আইন, ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ

৪৩.৪ প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা

৪৩.৪.১ বাংলা : প্রথম পর্ব (১৭৬৫-১৭৯৩)

৪৩.৫ রাজস্ব সংস্কার

৪৩.৬ প্রশাসনিক সংস্কার

৪৩.৭ বিচারব্যবস্থা

৪৩.৮ শিক্ষা-সংক্রান্ত নীতি

৪৩.৯ সারাংশ

৪৩.১০ অনুশীলনী

৪৩.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৪৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- ঔপনিবেশিক অভিঘাতের ফলে নতুন প্রশাসনিক কাঠামো কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল।
- রেগুলেটিং অ্যাক্ট কীভাবে কোম্পানির শাসনের উপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ এনেছিল।
- পিটের ভারত-আইন এই নিয়ন্ত্রণকে কীভাবে সুদৃঢ় করেছিল।
- রাজস্ব ব্যবস্থা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা এবং শিক্ষাব্যবস্থায় কী কী সংস্কারসাধন করা হয়েছিল।

৪৩.১ প্রস্তাবনা

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি বা রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করার পর (১৭৬৫ খ্রিঃ) ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামনে একটা বড় সমস্যা দেখা দিল। প্রশ্ন হল একটি বেসরকারি বাণিজ্যিক সংস্থা

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের তত্ত্বাবধান ছাড়া কীভাবে এতবড় একটি ভূখণ্ডের প্রশাসন চালাবে? ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিজস্ব সংবিধান প্রাচ্য দেশীয় একটি সাম্রাজ্য পরিচালনার পক্ষে কতটাই বা উপযোগী? পার্লামেন্টের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যেই এ-ব্যাপারে নানা তর্ক-বিতর্ক ছিল। শে, পর্যন্ত পার্লামেন্ট ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে রেগুলেটিং অ্যাক্ট (Regulating Act) পাশ করে এইসব প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা করে। রেগুলেটিং অ্যাক্টের মাধ্যমে কোম্পানির উপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হল। কোম্পানির গঠনতন্ত্রও এর ফলে পরিবর্তিত হল।

৪৩.২ রেগুলেটিং অ্যাক্ট

এই আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কোম্পানির অংশীদারদের সম্পত্তি বিষয়ক অধিকার ক্ষুণ্ণ করল। কোম্পানির চব্বিশজন ডিরেক্টর, যাঁরা প্রতিবছরই নির্বাচিত হতেন, এখন থেকে চার বছরের জন্য নির্বাচিত হলেন। এঁদের এক-চতুর্থাংশ প্রতিবছর অবসর নেবেন স্থির হল। এই আইনে আরও স্থির হল যে ভারত থেকে রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র ট্রেজারীর কাছে পেশ করতে হবে। সামরিক এবং বেসামরিক বিষয়ে সমস্ত চিঠিপত্র ও তথ্য সেক্রেটারি অব স্টেট-এর কাছে পেশ করতে হবে। সুতরাং এইভাবে এই প্রথম কোম্পানির কাজকর্মের উপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হল।

কোম্পানির ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারেও এই আইন কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছিল। বাংলার প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া হল একজন গভর্নর জেনারেল এবং চারজন সদস্যের এক কাউন্সিলের উপর। কাউন্সিলে সংখ্যাধিক্যের ভোটে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে স্থির হল। কোনো ব্যাপারে কাউন্সিলে দু'পক্ষের সমান সমান ভোট হলে সেক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট একটি অতিরিক্ত ভোট (casting vote) দিয়ে তার মীমাংসা করবেন বলে বলা হল। এই আইন অনুসারে প্রথম গভর্নর-জেনারেল হলেন ওয়ারেন হেস্টিংস এবং চারজন কাউন্সিলার হলেন ক্ল্যাভারিং (Clavering), মনসন (Monson), বারওয়েল (Barwell) এবং ফিলিপ ফ্রান্সিস (Philip Francis)। স্থির হল এঁদের উত্তরসূরীরা কোম্পানির দ্বারা নিযুক্ত হবেন।

রেগুলেটিং অ্যাক্টে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির জন্যও একজন গভর্নর ও কাউন্সিলের ব্যবস্থা হয়েছিল। সাধারণ প্রশাসনিক ব্যাপারে এই দুই প্রেসিডেন্সি কলকাতা প্রেসিডেন্সির থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল; কিন্তু স্থির হল যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তিস্থাপনের ব্যাপারে এই দুই প্রেসিডেন্সি বাংলার গভর্নর-জেনারেল এবং কাউন্সিলের অধীনে থাকবে। তাছাড়া, এই আইনে একটি সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠার কথাও বলা হল। একজন প্রধান বিচারপতি এবং তিনজন সাধার বিচারপতিকে নিয়ে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল সুপ্রীম কোর্ট। স্যার ইলিজা ইম্পে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হলেন।

রেগুলেটিং অ্যাক্ট ত্রুটিযুক্ত ছিল না। বস্তুত সুপ্রীম কোর্টের এলাকা, বাংলার সরকারের সঙ্গে এই কোর্টের সম্পর্ক কিংবা গভর্নর-জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের প্রকৃত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের আইনে কোনো সুস্পষ্ট বিধান ছিল না। বস্তুত রেগুলেটিং অ্যাক্টের প্রধান অংশ ছিল দু'টি—একটি কোম্পানির গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আর অন্যটি ছিল ভারতের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে। এই আইন কোম্পানির গঠনতন্ত্র পরিবর্তন

করতে চেয়েছিল প্রধানত ডিরেক্টরদের কার্যকালের মেয়াদের নিরাপত্তা দিতে আর কোম্পানির আভ্যন্তরীণ ও বিদেশনীতির সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিচালনব্যবস্থা উৎসাহিত করতে। কিন্তু ডিরেক্টর সভা আর ভারতে ইংরেজ শাসকদের গোষ্ঠীবিরোধে সে-উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তাছাড়া মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির উপর কলকাতা প্রেসিডেন্সির কর্তৃত্ব এই আইনে সুনির্দিষ্ট না থাকায় এই দুই প্রেসিডেন্সি কার্যত স্বাতন্ত্র্য নিয়েই শাসনকার্য চালাতে থাকে। এর ফলে শুধুমাত্র প্রশাসনিক জটিলতাই বাড়েনি, যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপনের ব্যাপারেও নানা পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত ডিরেক্টর সভাকে অস্বস্তিতে ফেলেছিল। উপরন্তু, গভর্নর-জেনারেলের প্রশাসনিক ক্ষমতা তাঁর কাউন্সিল ও সুপ্রীম কোর্টের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় শাসনকার্যে অনেক সময় অবাঞ্ছিত অসুবিধের সৃষ্টি হয়। বিচারকার্যেও নানা জটিলতা বাড়ে, কেননা সুপ্রীম কোর্ট বিচার পরিচালনা করত ইংল্যান্ডের আইন মোতাবেক; অন্যদিকে সদর দেওয়ানি ও সদর নিজামত আদালত বিচার করত গভর্নর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিল রচিত ভারতীয় দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন অনুসারে। সুতরাং এককথায় বলা যেতে পারে, রেগুলেটিং অ্যাক্টের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ কিন্তু এর পরিবেশনা ছিল ত্রুটিপূর্ণ। তা সত্ত্বেও, এই আইন একেবারে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এমন কথা বলা যায় না। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে রেগুলেটিং অ্যাক্ট ছিল প্রথম লিখিত সংবিধান। বলা যেতে পারে, কোম্পানির হাত থেকে পার্লামেন্টে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে প্রক্রিয়া ঔপনিবেশিক ভারতে লক্ষ্য করা যায় এখানেই তার সূচনা হয়েছিল।

৪৩.৩ পিটের ভারত আইন, ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ

রেগুলেটিং অ্যাক্ট কার্যকর ছিল ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ, পর্যন্ত, এগারো বছর। এই সময়কালের মধ্যে এই আইনের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোম্পানির ভারতীয় প্রশাসনের নানা দিক থেকে ব্যর্থতা পার্লামেন্টকে বিব্রত করে। ইতিমধ্যে আমেরিকার ঔপনিবেশগুলির সঙ্গে ইংল্যান্ডের যুদ্ধ ব্রিটিশ অর্থনীতির উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছিল। আর্থিক অনটনে উদ্বিগ্ন ব্রিটিশ সরকার ভাবতে শুরু করে কীভাবে ভারতবর্ষ থেকে রাজস্ব আমদানি করে এই আর্থিক সঙ্কটের নিরসন করা যায়। ১৭৮৩ খ্রিঃ নাগাদ কোম্পানি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে অর্থ-সাহায্যের আবেদন জানালে কোম্পানির গঠনতন্ত্র সম্পর্কে পার্লামেন্টের হস্তক্ষেপ অনিবার্য হয়ে ওঠে, কেননা বার্ক প্রমুখ অনেকে দাবি জানালেন যে, কোম্পানির গঠনতন্ত্রের সংস্কার ব্যতীত অর্থ বরাদ্দ করা উচিত হবে না। প্রধানত কোম্পানির উপর ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব আরও স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যেই রাজা তৃতীয় জর্জের হস্তক্ষেপে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী পিট পার্লামেন্টে একটি বিল নিয়ে এলেন এবং ঐ বছরই 'পিটের ভারত আইন' নামে তা পাশ হল।

পিটের ভারত-আইন অনুসারে ছ'জন কমিশনারের উপর ভারতবর্ষের প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করা হল। এঁরা হলেন, একজন রাষ্ট্রসচিব (Secretary of State), ব্রিটিশ অর্থসচিব (Chancellor of the Exchequer) এবং ইংল্যান্ডের রাজার মনোনীত চারজন প্রিভি কাউন্সিলার (Privy Councillors)। এদের নিয়ে গঠিত হল বোর্ড অব কন্ট্রোল (Board of Control)। বোর্ড অব কন্ট্রোলের হাতে অর্পিত হল কোম্পানির সামরিক

ও অ-সামরিক দায়-দায়িত্ব। কোম্পানির যাবতীয় কাগজপত্র পরীক্ষা করার অধিকার ছিল এঁদের। বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিষয় ভিন্ন যাবতীয় চিঠিপত্র বোর্ড অব কন্ট্রোলের অনুমতিসাপেক্ষ ছিল। অংশীদার-সভার (Court of Proprietors) ক্ষমতা রীতিমতো হ্রাস করা হল। কারণ বোর্ড অব ডিরেক্টর-এর কোনো সিদ্ধান্ত বোর্ড অব কন্ট্রোলের কমিশনাররা অনুমোদন করলে তা অংশীদার-সভা বাতিল বা রদ করতে পারত না।

পিটের ভারত-আইন ভারতীয় প্রশাসনে কিছু পরিবর্তন নিয়ে এল। গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা তিনজনে কমিয়ে আনা হল। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির উপর গভর্নর-জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের কর্তৃত্ব সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হল। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে একটি সংশোধনীর মাধ্যমে ক্ষেত্রবিশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলারদের অভিমতের বিরুদ্ধে গভর্নর-জেনারেলকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হল। পিটের ভারত-আইনে বলা হল, রাজ্য জয় ও সাম্রাজ্য বিস্তার ইংল্যান্ডের জাতীয় মর্যাদা ও নীতি বহির্ভূত।

পিটের ভারত-আইন সমকালীন ভারতীয় পরিস্থিতির উপযোগী হয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটিশ জাতীয় নীতির অন্যতম হাতিয়ারে পরিণত হল। ভারতবর্ষ ব্রিটেনের যাবতীয় শাসকশ্রেণীর অন্যতম স্বর্ণমৃগয়ার ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হল। কোম্পানিও সন্তুষ্ট হল, কেননা তার ভারতবর্ষীয় ও চীনদেশীয় বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার রক্ষিত হয়েছিল। কোম্পানির ডিরেক্টররাও খুশি হল, কারণ তাদের হাতে ভারতে ব্রিটিশ অফিসারদের নিয়োগ ও পদচ্যুতির ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

পিটের ভারত-আইন এদেশে একটি সাধারণ প্রশাসন কাঠামো প্রবর্তন করেছিল যা ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মূলগতভাবে অক্ষুণ্ণ ছিল। তবে এই সময়কালের মধ্যে বিভিন্ন প্রশাসনিক পরিবর্তন আনা হয়েছিল আর তার ফল হয়েছিল এই যে কোম্পানির ক্ষমতা ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ক্রমাগত সংকুচিত হয়ে আসছিল। সংক্ষেপে সেইসব প্রশাসনিক পরিবর্তনগুলি আলোচনা করা যেতে পারে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ-আইনে (Charter Act of 1793) মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির উপর গভর্নর-জেনারেলের কর্তৃত্ব আরও সুদৃঢ় হল। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে সনদ-আইনে (Charter Act of 1813) চীনদেশে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকার বহাল রইল ঠিকই, কিন্তু ভারতীয় বাণিজ্য এখন থেকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হল। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ-আইনে (Charter Act of 1833) চীনদেশের সঙ্গেও কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার রদ করা হল। কোম্পানি কার্যত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে এখন থেকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। ভারতের প্রশাসনিক কাজকর্ম বোর্ড-অব-কন্ট্রোলের কঠোর তত্ত্বাবধানে কোম্পানির মাধ্যমেই পরিচালতি হতে লাগল। তবে এই আইনে ভারতীয় শাসনতন্ত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হল। বাংলার গভর্নর এখন থেকে সমগ্র ভারতের গভর্নর-জেনারেল ও বাংলার গভর্নর বলে পরিচিত হলেন। গভর্নর-জেনারেল কাউন্সিলে একজন আইন-সদস্য (Law member) নিযুক্ত করা হল। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের আইন-প্রণয়ন ও প্রশাসনিক ক্ষমতার পৃথকীকরণের সূচনা হল। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ-আইনে (Charter Act of 1853) আরও পরিবর্তন আনা হল। ডিরেক্টরদের সংখ্যা কমিয়ে করা হল আঠারো। এদের মধ্যে তিনজনকে (পরে ছ'জনকে) নিযুক্ত

করবেন ব্রিটেনের রাজা। বোর্ড-অব-কন্ট্রোলের প্রেসিডেন্টের বেতন রাষ্ট্রসচিবের সমতুল্য করা হল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কাউন্সিলারদের নিয়োগ এখন থেকে রাজার অনুমোদনসাপেক্ষ হল।

মোটকথা, পার্লামেন্টের বিভিন্ন সনদ-আইনের মাধ্যমে ভারতে কোম্পানির প্রশাসনকে পুরোপুরি ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হল। আবার একথাও স্বীকার করা হল যে দৈনন্দিন শাসনকার্য ছ'হাজার মাইল দূর থেকে প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করার ব্রিটেনের রাজার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া হল সপার্ষদ গভর্নর-জেনারেলের হাতে (Governor-General-in-Council)। গভর্নর-জেনারেলই, যিনি যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কাউন্সিলের সিদ্ধান্তকে নাকচ করতে পারতেন, ব্রিটিশ সরকারের তত্ত্বাবধানে প্রকৃত সর্বেসর্বা হয়ে উঠলেন।

৪৩.৪ প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা

৪৩.৪.১ বাংলা : প্রথম পর্ব (১৭৬৫-১৭৯৩)

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে যদিও কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি বা রাজস্ব আদায়ের অধিকার দেওয়া হয়েছিল, রাজস্ব আদায়ের প্রকৃত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল দু'জন নায়েব-দেওয়ানের হাতে—রেজা খাঁকে বাংলায় আর সিতাব রায়কে বিহারে। যা রাজস্ব আদায় হত তার থেকে কোম্পানি ভারত সম্রাটকে দিত ২৬ লক্ষ টাকা আর ৩২ লক্ষ টাকা দিত বাংলার নবাবকে প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব পালন করার জন্য। বাকি অর্থ কোম্পানি নিত নিজস্ব ব্যয়-নির্বাহের জন্য। এটিই ছিল ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈত-শাসন।

কী কোম্পানি, কী দেশীয় জনসাধারণ উভয়ের পক্ষেই দ্বৈত-শাসনের ফল হয়েছিল মারাত্মক। এই ব্যবস্থায় নায়েব-দেওয়ানরা অবশ্য অবৈধভাবে প্রভূত ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছিল। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থার ত্রুটি সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত ছিলেন। তাই ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে তারা হেস্টিংসকে বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠালেন এই অব্যবস্থা দূর করার জন্য। হেস্টিংস দ্বৈত-শাসনের অবসান ঘটালেন এবং দেওয়ানি শাসন পরিচালনার ভার কোম্পানির হাতে ন্যস্ত করলেন। নায়েব-দেওয়ানের পদও বিলুপ্ত করা হল; বাংলার নায়েব রেজা খাঁ ও পাটনার নায়েব সিতাব রায়কে পদচ্যুত করা হল। সরকারি কোষাগার কলকাতায় স্থানান্তরিত হল। নবাবের বাৎসরিক ভাতা ৩২ লক্ষ টাকা থেকে ১৬ লক্ষ টাকায় হ্রাস করা হল। হেস্টিংস মীরজাফরের বিধবা পত্নী মুনী বেগমকে নবাবের অভিভাবক আর মহারাজা নন্দকুমারের পুত্র রাজা গুরুদাসকে নবাবের দেওয়ান পদে নিযুক্ত করলেন। এইসব ব্যবস্থার ফলে প্রশাসনের যাবতীয় ক্ষমতা ও দায়দায়িত্ব কোম্পানির হাতেই বর্তাল। আর মুর্শিদাবাদের পরিবর্তে কলকাতা হয়ে উঠল কোম্পানির-প্রশাসনের প্রকৃত কেন্দ্রস্থল।

প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব হাতে নিয়ে হেস্টিংস একটি প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করলেন। কাজটি সহজ ছিল না, কেননা কোম্পানির প্রশাসন যন্ত্র এ-যাবৎ শুধুমাত্র বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই নির্মিত হয়েছিল। এখন তাকে ভিন্ন উদ্দেশ্যে পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন হল। কোম্পানির কর্মচারীদের মনোবলও তেমন ছিল না। এদেশে পাবলিক সার্ভিসের ট্রাডিশনও গড়ে ওঠেনি। এদেশীয় ভাষা, আচার, ব্যবহার জনসংযোগের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বভাবতই বাংলায় ব্রিটিশ সরকারকে রীতিমতো অসুবিধেজনক পরিস্থিতির মধ্যে এই প্রশাসনিক

দায়দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই কুড়ি বছর সময়কালে হেস্টিংস এবং কর্নওয়ালিস নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে একটি ইন্দো-ব্রিটিশ শাসন-কাঠামো বাংলায় প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন। এই শাসন-কাঠামোর মুখ্য দুটি দিক হল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও বিচার পদ্ধতি। প্রশাসনের এই মুখ্য দুটি বিষয় কীভাবে এই দুই গভর্নর-জেনারেলের আমলে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হল তা সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

৪৩.৫ রাজস্ব সংস্কার

কোম্পানির রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল ভূমিরাজস্ব। আমরা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছি কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল দু'জন নায়েব-দেওয়ানের উপর। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংস নায়েব-দেওয়ান পদের বিলুপ্তি ঘটিয়ে কিছু পরিদর্শক (Supervisor) নিয়োগ করেছিলেন। পরিদর্শকদের উপর দায়িত্ব ছিল প্রচলিত রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার। পরিদর্শকরা তাদের কাজে ব্যর্থ হলে রাজস্ব প্রশাসনব্যবস্থা রাজস্ব বোর্ডের (Board of Revenue) হাতে দেওয়া হয়। জমির খাজনা আদায়ের জন্য পাঁচ বছরের ব্যবস্থায় নিলাম ডাকা হয়। একজন কালেক্টর এবং একজন ভারতীয় দেওয়ানের মাধ্যমে প্রতি জেলায় রাজস্ব প্রশাসনের তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা হয়।

এই ব্যবস্থার ফলাফল হয়েছিল নানা দিক থেকে ভয়াবহ। অসাধু ফাটকাবাজরা জমিদারি পাবার আশায় চড়া নিলামে জমিদারি কিনে নেয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় পুরানো জমিদারদের হটিয়ে দেয়। কিন্তু প্রতিশ্রুতিমতো রাজস্ব আদায়ে তারা ব্যর্থ হয়। এইসব ভুঁইফোড় জমিদারদের জমিতে কোনো স্থায়ী স্বার্থ ছিল না; তাই নির্দিষ্ট মেয়াদকালের মধ্যে তারা রায়তদের অপরিসীম শোষণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও তাদের খাজনা বকেয়া পড়ে যায়; কালেক্টররা এদের অনাদায়ী খাজনার দায়ে গ্রেপ্তার করে। এইভাবে জমিদার, ফাটকাবাজ, রায়ত সকলেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কোম্পানিও আর্থিক দুর্গতিতে পড়ে। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে কিছু পরিবর্তনের চেষ্টা করা হল। রাজস্ব বোর্ডের দু'জন সদস্য ও কোম্পানির তিনজন ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের নিয়ে কলকাতায় একটি রাজস্ব কমিটি (Committee of Revenue) গঠন করা হল। ইউরোপীয় কালেক্টরের পদ তুলে দেওয়া হল এবং প্রতি জেলায় রাজস্ব প্রশাসনের যাবতীয় দায়দায়িত্ব একজন করে ভারতীয় দেওয়ানের হাতে ন্যস্ত হল। ছ'টি প্রাদেশিক কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা হল আর বিশেষ কমিশনারের মাধ্যমে এই ব্যবস্থাটি মাঝেমধ্যে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হল।

এইসব পরিবর্তনের ফলে অবস্থার যে খুব উন্নতি হল তা নয়। তাই এই ব্যবস্থায় পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হলে আবার বাৎসরিক মেয়াদে জমির বন্দোবস্ত দেওয়া হল। পুরানো জমিদাররা যাতে নিলামে জমির ইজারা পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলিকে বিশেষ নজর দিতে বলা হল। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে আবার একটি নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হল। এই ব্যবস্থায় রাজস্ব প্রশাসনের পুরো ব্যাপারটি কলকাতায়

কেন্দ্রীভূত করা হল। একটি নতুন রাজস্ব বোর্ড স্থাপন করা হল। প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলি তুলে দেওয়া হল আর প্রত্যেক জেলায় কালেক্টর নিয়োগ করা হল ঠিকই, তবে তাদের ক্ষমতা হ্রাস করা হল।

এই ব্যবস্থা অতি-কেন্দ্রীকরণের সমস্ত কুফল নিয়ে ভেঙে পড়ল। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আরও একটি কার্যকরী ও বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। জেলাগুলিকে এখন থেকে রাজস্ব প্রশাসনের একেকটি একক হিসেবে গণ্য করা হল। কালেক্টরদের দায়িত্ব দেওয়া হল অনেক বেশি; রাজস্ব আদায়ের যাবতীয় জেলাস্তরের দায়িত্ব এখন কালেক্টরদের উপরই বর্তাল। প্রথমে সারা বাংলাদেশকে ৩৫টি জেলায় বিভক্ত করা হয়েছিল কিন্তু ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এর সংখ্যা কমিয়ে করা হল ২৩টি। রাজস্ব-কমিটি পুনর্গঠিত হয়ে রাজস্ব বোর্ড নামে পরিচিত হল। এর সভাপতি হলেন কাউন্সিলেরই একজন সদস্য। বোর্ডের কাজকর্মের পরিধি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে দেওয়া হল। প্রধান সেরেস্তাদার নামে একজন নতুন অফিসারের উপর রাজস্ব-সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হল। এ-কাজটি আগে কানুনগোর নিজস্ব ব্যাপার ছিল।

বাৎসরিক জমির বন্দোবস্ত ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল। এটি ছিল নিতান্তই সাময়িক ব্যবস্থা। জমিতে জমিদারদের আরও স্থায়ী বন্দোবস্ত দেবার কথা বিবেচনা করা হচ্ছিল। কিন্তু জমির মালিকানা বা স্বত্ব নিয়ে পরস্পরবিরোধী নানা মতামত ও তর্কবিতর্ক চলছিল বলে জমিতে স্থায়ী স্বত্বদানের বিষয়টি কার্যকরী হতে দেরি হচ্ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে যে জমির চিরস্থায়ী স্বত্বদানের ব্যাপারটি আছে তা কোম্পানির বিভিন্ন অফিসাররা ইতিমধ্যেই প্রচার করে আসছিলেন। এদের মধ্যে আমরা আলেকজান্ডার ডাও (Alexander Dow), হেনরি পাত্তুলো (Henry Pattullo) কিংবা ফিলিপ ফ্রান্সিস-এর (Philip Francis) নাম করতে পারি। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে পিটের ভারত-আইনেও এই ধারণাটি অস্পষ্ট আকারে ছিল। এরপর ১৭৯৮-৯০ খ্রিস্টাব্দে কর্নওয়ালিস যখন দশসালা বন্দোবস্ত করলেন তখন তাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেরই প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে।

বিষয়টি সম্পর্কে নানা তর্ক-বিতর্ক শেষপর্যন্ত গ্রান্ট-শোর কেন্দ্রীভূত হল। কর্নওয়ালিস প্রচলিত রাজস্বের পরিমাণ, বিভিন্ন অঞ্চলের জমির মূল্য ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য জন শোরকে (John Shore) দায়িত্ব দেন। শোর টোডরমলের আমল থেকে মীরকাশিমের আমল পর্যন্ত বাংলার রাজস্ব বন্দোবস্তের নানা দিক পর্যালোচনা করে ঘোষণা করেন যে জমিদারই প্রকৃত জমির মালিক, বংশানুক্রমিক তারা তাদের ভূসম্পত্তির উপর মালিকানা বজায় রেখেছে, তাই সরকার তাদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। সুতরাং পূর্বতন জমিদারদের সঙ্গেই জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা উচিত। অন্যদিকে জেমস গ্রান্ট (James Grant) ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে, মুঘল আমলে মুঘল সরকারই ছিলেন জমির প্রকৃত মালিক; জমিদারদের তাঁরা কেবল জমির খাজনা আদায়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

নানা তর্ক-বিতর্কের পর শেষ পর্যন্ত ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করলেন। এই ব্যবস্থার দুটি প্রদান বৈশিষ্ট্য ছিল : প্রথমত, জমিদার ও রাজস্ব আদায়কারীরা ভূস্বামী (landlord) বলে পরিগণিত হলেন। সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে রাজস্ব আদায় করার অধিকার তো

তাঁরা পেলেনই, উপরন্তু নিজের নিজের জমিদারি এলাকায় সমগ্র জমির মালিক বলে তাঁরা আইনসঙ্গত স্বীকৃতি পেলেন। এই মালিকানা-স্বত্ব বংশানুক্রমিক বলে স্বীকৃতি পেল; জমি হস্তান্তর করার অধিকারও জমিদাররা পেল। অন্যদিকে কৃষকরা নিছক রায়তে পরিণত হল; জমির উপর দীর্ঘকালের সাবেকি অধিকার থেকে রায়তরা বঞ্চিত হল। গোচারণ ক্ষেত্র, খাল-বিলে মৎস্য চাষ কিংবা আবাদী জমির উপর তাদের সাবেককালের অধিকারও চলে গেল। তারা পুরোপুরি জমিদারদের দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। দ্বিতীয়ত, জমিদাররা প্রজাদের কাছ থেকে যে খাজনা আদায় করত তার $^{১০}/_{১১}$ অংশ ব্রিটিশ সরকারকে দিতে হত আর অবশিষ্ট $^{১}/_{১১}$ অংশ জমিদার নিজের কাছে রাখত। খাজনাদানের এই বিধিব্যবস্থা বরাবরের জন্য স্থির হয়েছিল। জমিদার যদি তার আয়তন বাড়াতে পারত, কিংবা কৃষির উন্নয়ন ঘটাতে পারত, কিংবা প্রজাদের কাছ থেকে নির্ধারিত খাজনার থেকেও বেশি আদায় করতে পারত তাহলে সেটি হত তার নিজের আয়। রাষ্ট্র আর নির্দিষ্ট খাজনার অতিরিক্ত দাবি করতে পারত না। তবে রাষ্ট্রের কোষাগারে জমিদারকে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যেই খাজনা জমা দিতে হত। অন্যথায় জমিদারের জমিদারি বাজেয়াপ্ত হয়ে যেত।

প্রথমের দিকে জমিদারদের দেয় রাজস্ব নির্ধারিত হয়েছিল খুবই চড়া হারে। কোম্পানির অফিসারদের লক্ষ্যই ছিল কীভাবে সবচেয়ে বেশি খাজনা আদায় করা যায়। ১৭৬৫-৬৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ সময়কালের মধ্যে খাজনার দাবি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। জন শোর হিসেব করে দেখিয়েছিলেন যে বাংলার কৃষি উৎপাদন যদি ১০০ ধরা হয় তাহলে সরকারের দাবি ছিল ৪৫। জমিদারদের পাওনা হত ১৫ আর বাকি ৪০ পেত প্রকৃত কৃষক। অত্যন্ত চড়া হারে ভূমিরাজস্ব নির্ধারিত হওয়ার ফলে ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দ-এর মধ্যে বাংলার অর্ধেক জমিদারিই বিক্রি হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে সরকারি আমলারা বুঝতে পেরেছিলেন যে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের আগে বাংলা ও বিহারের জমিদাররা অধিকাংশ জমির ক্ষেত্রেই জমির স্বত্বাধিকার ভোগ করতেন না। তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার তাদের জমিতে স্থায়ী স্বত্বদান করলেন কেন তার কয়েকটি ব্যাখ্যা আছে। একটি ব্যাখ্যায় মেনে নেওয়া হয় যে ব্যাপারটি ভুল বোঝাবুঝি থেকেই ঘটেছিল। ইংল্যান্ডে ঐ সময় ভূমিব্যবস্থার কেন্দ্রে ছিল জমিদার আর ব্রিটিশ আমলারা ভারতীয় জমিদারদের ব্রিটিশ জমিদারদেরই সংস্করণ ভেবেছিল। কিন্তু অন্তত একটি ব্যাপারে ভারতীয় ও ব্রিটিশ জমিদারদের মধ্যে প্রবল পার্থক্য ছিল। ব্রিটেনের জমিদার শুধুমাত্র রায়তের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নেই জমির মালিক ছিল না, রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নেও জমির প্রকৃত মালিক ছিল। কিন্তু বাংলা জমিদার সে-অর্থে শুধুমাত্র রায়তের কাছেই জমিদার; রাষ্ট্রের কাছে সেও ছিল প্রজামাত্র। বস্তুত কোম্পানির কাছে বাংলার জমিদার বড় রায়তে পরিণত হয়েছিল। ব্রিটেনের জমিদার রাষ্ট্রকে তার আয়ের স্বল্পাংশ দিত ট্যাক্স হিসেবে। পক্ষান্তরে বাংলার জমিদার রাষ্ট্রকে দিত তার আয়ের $^{১০}/_{১১}$ অংশ। তাকে জমির মালিক মনে করা হলেও, জমিদারকে জমি থেকে উৎখাত করা যেত যদি সে তার বাৎসরিক দেয় খাজনা যথাসময়ে সরকারকে জমা দিতে ব্যর্থ হত।

আবার বেশকিছু ঐতিহাসিক বাংলার জমিদারদের জমির মালিকানা দেওয়ার পিছনে গভীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্য লক্ষ্য করেছেন। এখানে প্রধানত, তিনটি বিষয় ক্রিয়াশীল ছিল। প্রথমটি বিশুদ্ধ রাষ্ট্রকৌশল থেকে উৎসারিত হয়েছিল। কোম্পানি এদেশে রাজনৈতিক মিত্রগোষ্ঠী অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিল। ব্রিটিশ সরকারি কর্মচারীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে যেহেতু তাঁরা এদেশে বিদেশী তাই এদেশে অবিসংবাদিত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলে স্থানীয় প্রভাবশালী গোষ্ঠীর সক্রিয় সমর্থন ও সাহায্য প্রয়োজন। আঠারো শতকের শেষের দিকে বেশ কয়েকটি গণবিক্ষোভ কোম্পানিকে এ-জাতীয় ভাবনায় প্রণোদিত করেছিল। তাই কোম্পানি একটি সুবিধাভোগী ও সম্পদশালী গোষ্ঠী তৈরি করেছিল জমিদারশ্রেণীর মধ্যে দিয়ে, যারা নিজেদের সুযোগসুবিধা ও ভূমিজ স্বার্থ সুরক্ষার জন্য ব্রিটিশকে এদেশে সুস্থির প্রতিষ্ঠায় রাখতে উৎসাহী হয়েছিল। দ্বিতীয়ত বিষয়টি ছিল অর্থনৈতিক এবং সম্ভবত আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত কোম্পানির কোনো সুস্থির আয়ের উৎস ছিল না যার উপর নির্ভর করে তারা এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে পুরোপুরি উদ্যোগী হতে পারে। কোম্পানিকে সবসময়ই আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে থাকতে হত কেননা বাংলার ভূমিরাজস্বের অনেকটাই ব্যয় হয়ে যেত যুদ্ধবিগ্রহে, বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর প্রশাসন বাবদে কিংবা রপ্তানিযোগ্য পণ্য খরিদ করতে। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কোম্পানির আয়ে একটি স্থিরতা এল। উপরন্তু কোম্পানি তার আয়ও এই সুবাদে বাড়িয়ে নিতে পেরেছিল, কেননা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ভূমিরাজস্বের দাবি আগের থেকে অনেক বেশিই নির্ধারিত হয়েছিল। গুটিকয়েক জমিদারের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় পদ্ধতি লক্ষ লক্ষ রায়তের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের চেয়ে সহজতর ও কম ব্যয়সাপেক্ষ হয়েছিল। তৃতীয়ত, আশা করা গিয়েছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ভূমিরাজস্ব যেহেতু বরাবরের জন্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল এবং অদূর ভবিষ্যতে যেহেতু ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না, তাই জমিদাররা চাষ-আবাদ আরও বৃদ্ধি করতে উৎসাহী হয়েছিল, কেননা জমিদার জমি সম্প্রসারণের মাধ্যমে আয় বাড়ালেও সে বর্ধিত আয়ে কোম্পানির হক ছিল না।

চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্ত পরবর্তীকালে উড়িষ্যা, মাদ্রাজের উত্তরাঞ্চলের জেলায় এবং বারাণসীতে সম্প্রসারিত হয়েছিল। মধ্যভারতের কয়েকটি অঞ্চলে এবং অযোধ্যাতে ব্রিটিশ সরকার কিছুদিনের জন্য একটি ভূমিব্যবস্থার প্রচলন করেছিল যাতে জমিদারদের জমির মালিকানা দেওয়া হল কিন্তু ভূমিরাজস্বের পরিমাণ কিছুদিন অন্তর পরিবর্তন করা হত।

দক্ষিণভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত হলে ভূমিব্যবস্থার নতুন সমস্যা দেখা দিল। ব্রিটিশ সরকারি কর্মচারীরা লক্ষ্য করেছিলেন যে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে বিশাল ভূসম্পত্তির অধিকারী কোনো জমিদার নেই যাদের সঙ্গে ভূমিরাজস্বের বন্দোবস্ত করা যায়। তাই রীড (Reed) এবং মুনরো (Munro) প্রমুখ মাদ্রাজের সরকারি কর্মচারীরা প্রস্তাব দিলেন যে জমির প্রকৃত কৃষকের সঙ্গে রাজস্ব বন্দোবস্ত স্থির করা হোক। তারা আরও বললেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কোম্পানিই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কেননা, কোম্পানি জমিদারদের উপর রাজস্বের দাবি বৃদ্ধি করতে পারছে না, যদিও জমিদাররা নিজেদের আয় ভূমিসংস্কার ও ভূমি সম্প্রসারণের

মাধ্যমে অনেক বাড়িয়ে নিয়েছিল। আরও বড় কথা, কৃষকদের জমিদারদের মেজাজ-মর্জির উপর পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং এখন রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের কথা বলা হল যে ব্যবস্থায় রায়তকেই জমির মালিক বলে মানা হল যদি সে তার জমির খাজনা ঠিকসময়ে জমা দিতে পারে। রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের প্রবক্তারা দাবি করলেন যে এটি এদেশের সাবেকি ব্যবস্থারই পুনঃপ্রচলন। শেষ পর্যন্ত, মাদ্রাজ ও বম্বে প্রেসিডেন্সির কিছু অঞ্চলে উনিশ শতকের প্রথমের দিকে রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত চালু করা হল। এটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়, বিশ-তিরিশ বছর অন্তর রায়তদের সঙ্গে নতুন শর্তে এটি পুনর্নবীকরণ করা হত। স্বভাবতই নতুন চুক্তিতে রাজস্বের হার বৃদ্ধি পেত।

রায়তওয়ারী বন্দোবস্ততে প্রকৃতপক্ষে জমিতে রায়তের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হল না। রায়তরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল ছোট ছোট জমিদারের পরিবর্তে এখন একটি সুবৃহৎ জমিদার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর সেই সার্বভৌম জমিদারটির নাম হল রাষ্ট্র। তারা এখন নিতান্তই সরকারের চাষি; খাজনা দিতে না পারলে তাদের জমি বিক্রি করে দেওয়া হবে। অধিকাংশ অঞ্চলেই ভূমিরাজস্ব যথেষ্ট উচ্চহারে ধার্য হয়েছিল। মাদ্রাজে সরকার জমির উৎপাদনের ৪৫ থেকে ৫০ শতাংশ নিয়ে নিত রাজস্ব হিসেবে। রাজস্ব বৃদ্ধির অধিকার সরকারের ছিল; বন্যা বা খরায় শস্যহানি হলেও রাজস্ব রেহাই ছিল না।

জমিদারি ব্যবস্থারই এক পরিবর্তিত রূপ প্রবর্তন করা হয়েছিল গাঙ্গেয় ভারতে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, মধ্যভারতের কিছু অঞ্চলে এবং পাঞ্জাবে যা মহলওয়ারী বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। এই ধরনের ব্যবস্থায় ভূমিরাজস্ব স্থির হয়েছিল একেকটি গ্রাম বা মহলকে একক ধরে স্থানীয় জমিদার বা পরিবার প্রধানদের সঙ্গে যারা সমষ্টিগতভাবে গ্রামের বা মহলের জমিদার বলে পরিচিত হত। মহলওয়ারী ব্যবস্থাতেও ভূমিরাজস্ব কয়েক বছর অন্তর পরিবর্তিত হত।

কী জমিদারী, কী মহলওয়ারী, কী রায়তওয়ারী সব ব্যবস্থাই এদেশের চিরাচরিত ব্যবস্থার চেয়ে একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। ব্রিটিশ এদেশের এধরনের নতুন মালিকানা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল যাতে প্রকৃত কৃষকের কোনো সুফল বা উপকার হত না। এখন সারা দেশেই বিক্রয়যোগ্য, বন্ধকযোগ্য এমনকি হস্তান্তরযোগ্য পণ্য হিসেবে প্রতিপন্ন করা হল। এর পিছনে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সরকারের রাজস্বকে সুরক্ষিত করা। জমি বিক্রয়যোগ্য কিংবা হস্তান্তরযোগ্য না হলে যে কৃষক বা জমিদারের খাজনা দেওয়ার ক্ষমতা নেই তার কাছ থেকে সরকার খাজনা আদায় করতে পারত না। এখন অসচ্ছল চাষি তার জমির একাংশ বন্ধক বা বিক্রি করে খাজনা মেটাতে পারত। আর তা যদি সে না করতে তাহলে সরকার তার জমি নিলাম করে দিয়ে খাজনা উসুল করে নিত। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার আরও একটি কারণ ছিল; ব্রিটিশ সরকার বিশ্বাস করত যে জমিতে স্থায়ী স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে জমির মালিক জমির উন্নতিতে সচেষ্ট হবে।

ইংরেজরা এদেশে এই নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে এক বিরাট পরিবর্তন এনে ফেলেছিল। এদেশের গ্রামজীবনে যে এযাবৎ একধরনের অনড়তা বা প্রবহমান পরিবর্তনহীনতা ছিল তা নতুন ভূমিব্যবস্থায় ভেঙে পড়ল। গ্রামীণ সংগঠন ও গ্রামজীবন এখন থেকে এক বৃহত্তর পরিবর্তনের অংশীদার হয়ে উঠল।

৪৩.৬ প্রশাসনিক সংস্কার

শুরুতে কোম্পানি এদেশের প্রশাসনিক কাজকর্ম ভারতীয় কর্মচারীদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছিল; প্রয়োজনীয় তদারকি ছাড়া প্রত্যক্ষ প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করার তেমন গরজ ছিল না। কিন্তু ইংরেজরা বুঝতে পেরেছিল এভাবে তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। ফলত প্রশাসনের কিছু কিছু ব্যাপার নিজের হাতে তুলে নেয়। ওয়ারেন হেস্টিংস ও কর্নওয়ালিসের আমলে প্রশাসনের উপরের দিকের পদগুলি পুনর্গঠিত করা হয় স্বদেশের শাসনকাঠামো অনুযায়ী। কিন্তু যতই ব্রিটিশ শক্তি নতুন নতুন অঞ্চলে বিস্তৃত হতে লাগল, নতুন নতুন সমস্যাও তৈরি হল। স্বভাবতই সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্যটি স্থির রেখে শাসনব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর দরকার হল।

অধ্যাপক বিপানচন্দ্র মনে করেন ভারতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার তিনটি প্রধান স্তম্ভ ছিল : সিভিল সার্ভিস, সেনাদল এবং পুলিশ। ব্রিটিশ প্রশাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, কেননা শান্তি-শৃঙ্খলা স্থায়ী না হলে ব্যবসা-বাণিজ্য নিরুপদ্রবে করা যাবে না। এদেশে ব্রিটিশরা ছিল বিদেশী; সুতরাং ভারতবাসীর পূর্ণ সমর্থন লাভ করা তাদের বিবেচনায় সুদূরপরাহত ছিল। স্বভাবতই জনবাদী প্রশাসকের ভূমিকার পরিবর্তে ব্রিটিশ এদেশে শক্তিশালী শাসকের ভূমিকার কথা ভাবছিল। বস্তুত কর্ণওয়ালিস সিভিল সার্ভিসের প্রবর্তন করেছিলেন এই লক্ষ্য সামনে রেখে। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন ভারতে আসেন, তাঁর প্রধান লক্ষ্যই ছিল প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করা। কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন কোম্পানির কর্মচারীদের যথোপযুক্ত বেতন না দিলে এ-কাজটি সম্ভব নয়। তাই প্রথমেই তিনি কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা নিষিদ্ধ করলেন। কোনোরকম উৎকোচ বা উপহার গ্রহণের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নিলেন। একই সঙ্গে তিনি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা করলেন। যেমন জেলার কালেক্টরদের মাসিক বেতন নির্ধারিত হল ১৫০০ টাকা; এর উপর জেলার আদায়ীকৃত রাজস্বের এক শতাংশ কমিশনের ব্যবস্থা হল। বস্তুত কোম্পানির সিভিল সার্ভিসের বেতন এইসময় সারা বিশ্বে ছিল সর্বোচ্চ।

লর্ড ওয়েলেসলি কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা করলেন ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে এদেশে তরুণ সিভিল সার্ভেন্টদের প্রশিক্ষণের জন্য। কোম্পানির ডিরেক্টররা অবশ্য এ-কাজটি অনুমোদন করেননি। শেষপর্যন্ত ইংল্যান্ডে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে একই উদ্দেশ্যে হেইলেবেরি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনে স্থির হল সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ হবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে। তবে কর্নওয়ালিসের আমল থেকে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য ছিল যে ভারতীয়দের পুরোপুরি বর্জন। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল বছরে ৫০০ পাউন্ড বা তদূর্ধ্ব বেতনের পদগুলি সাহেবদের জন্যই সংরক্ষিত থাকবে। এই সিদ্ধান্তের পিছনে কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, ব্রিটিশ সরকার বিশ্বাস করত ব্রিটিশ ধ্যানধারণা ও রীতি-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় প্রশাসন ব্রিটিশ আমলাদের মাধ্যমেই সবচেয়ে ভালো চালানো যাবে। দ্বিতীয়ত, ভারতীয়দের সততার উপর ব্রিটিশদের আস্থা ছিল না। কর্নওয়ালিস বিশ্বাস করতেন,

'হিন্দুস্তানের প্রতিটি মানুষই হল দুর্নীতিগ্রস্ত।' কর্নওয়ালিস ভুলে গিয়েছিলেন, এদেশে ব্রিটিশ আমলাদের ক্ষেত্রেও কথাটি সমান সত্যি। তিনি ব্রিটিশ আমলাদের বেতন বৃদ্ধি করে এই রোগটি নিরাময়ের চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু ভারতীয় কর্মচারীদের ক্ষেত্রে একই ব্যবস্থা গ্রহণে তাঁর প্রবল অনীহা ছিল।

আসলে, সরকারি উচ্চপদ থেকে ভারতীয়দের অপসারণ ব্রিটিশরা ইচ্ছাকৃতভাবেই করেছিল। সিভিল সার্ভিসের উদ্দেশ্যই ছিল এদেশে ব্রিটিশ শাসনকে স্থায়ী ও সুস্থির করা। আর এ-কাজটি ভারতীয় কর্মচারীদের দিয়ে যে হবে না তা ব্রিটিশরা ভালো করেই বুঝেছিল। তাছাড়া, ইংল্যান্ডের প্রভাবশালী বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মানুষরাও চায়নি যে সিভিল সার্ভিসের মতো লোভনীয় পদগুলিতে ভারতীয়দের গ্রহণ করা হোক। এই মর্যাদাসম্পন্ন পদগুলি পেতে তারা নিজেদের মধ্যেই রীতিমতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করেছিল। আর অপেক্ষাকৃত নিচের পদগুলিতে যেখানে সম্মান, মর্যাদা ও বেতন তুলনামূলকভাবে কম, সেখানে ভারতীয়দের বিপুল পরিমাণে নিয়োগ করা হয়েছিল।

ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনের দ্বিতীয় স্তম্ভ ছিল সেনাদল। সেনাদলের মাধ্যমে ব্রিটিশ এদেশে চারটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সম্পন্ন করেছিল। (ক) ভারতীয় রাজন্যবর্গকে পরাহত করতে সেনাদলের ভূমিকা ছিল অপরিসীম, (খ) বৈদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাত থেকে সেনাদল ভারতীয় সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেছিল, (গ) আভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ-আন্দোলন থেকে সাম্রাজ্যকে বাঁচিয়েছিল, (ঘ) ভারতীয় সেনাদলের মাধ্যমেই ব্রিটিশ তাদের এশীয় ও আফ্রিকার সাম্রাজ্য রক্ষা ও সম্প্রসারণ সম্ভব করেছিল।

কোম্পানির সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যই ছিল ভারতীয়। আধুনিক উত্তরপ্রদেশ ও বিহার থেকে বহু ভারতীয় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে, মহাবিদ্রোহের সময়ে, ভারতীয় সেনাদলে সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩,১১,৪০০; এর মধ্যে ২,৬৫,৯০০ জন সেনা ছিল ভারতীয়। সেনাবাহিনীর অফিসাররা ছিলেন অবশ্য পুরোপুরি ব্রিটিশ, বিশেষত কর্নওয়ালিসের আমলে। ভারতীয় সিপাইদের বেতন ছিল কম, পদোন্নতির সুযোগ ছিল আরও কম। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সেনাদলে মাত্র তিনজন ভারতীয় সেনার মাসিক বেতন ছিল ৩০০ টাকা আর ভারতীয়দের ক্ষেত্রে পদোন্নতির সুযোগ ছিল সুবেদার পদ পর্যন্ত। ভারতীয়রা ব্রিটিশ সেনাদলে সুযোগ পেয়েছিল কেননা ব্রিটিশ সেনা নিয়োগ করাটা ব্যয়বহুল বিবেচিত হয়েছিল। তাছাড়া বিপুল সংখ্যায় ব্রিটিশ সেনা মেলাও সহজ ছিল না, কেননা ব্রিটেনের জনসংখ্যা ছিল বিরাট ভারতীয় সেনাদলের প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম। তবে কিছু ব্রিটিশকে সাধারণ সেনাপদে নিয়োগ করা হয়েছিল যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয় সিপাইদের নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। এত কমসংখ্যক ব্রিটিশ সেনার নেতৃত্বে বিপুল ভারতীয় সিপাইরা যে এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারেই সহযোগী হয়েছিল তা দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রথমত, ঐ সময় আধুনিক জাতীয়তাবাদ বলতে যা বোঝায় তা এদেশে ছিল না। বিহারের একজন সিপাই ভাবতে পারত না যে সে পাঞ্জাবি বা মারাঠীদের দমন করতে কোম্পানিকে সাহায্য করছে বা সে এভাবে ভারত-বিরোধী কাজ করছে। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় সিপাইদের রাজশক্তির কাছে আনুগত্যের একটি পরম্পরাগত ঐতিহ্য ছিল। যার নুন খেয়েছি, তার গুণ গাইব—এই ছিল তাদের সনাতন বিশ্বাস। কোম্পানি তাদের বেতন দিত নিয়মিত। সুতরাং কোম্পানিকে সেবা করা ছিল তাদের ধর্ম।

ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনের তৃতীয় স্তম্ভ ছিল পুলিশবাহিনী। ভারতে পুলিশী ব্যবস্থা গড়ে তোলার কৃতিত্ব হল কর্নওয়ালিসের। তিনি জমিদারদের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন; পরিবর্তে শান্তিরক্ষার ভার পড়ল স্থায়ী পুলিশবাহিনীর উপর। ভারতীয় প্রাচীন থানা-ব্যবস্থাই তিনি আধুনিকীকরণ করলেন। প্রত্যেক থানায় তিনি ভারতীয় দারোগার উপর শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার দিলেন। আরও পরে, জেলা পুলিশ আধিকারিকের (District Superintendent of Police) পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল যার উপর জেলা পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল। পুলিশ বিভাগের যাবতীয় উচ্চপদেও ভারতীয়দের নিয়োগ-সম্ভাবনা ছিল না। গ্রামের শান্তিরক্ষার ভার ছিল চৌকিদারের উপর যাদের বেতন বাবদ ব্যয় বহন করত সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসী। পুলিশী ব্যবস্থায় নানা অপরাধের ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছিল; বিশেষত গ্রামীণ ডাকাতির সংখ্যা কমে গিয়েছিল। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-দমনেও পুলিশ যথেষ্ট তৎপরতা দেখাত।

৪৩.৭ বিচারব্যবস্থা

ব্রিটিশরা এদেশে আধুনিক বিচারব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস বিচারব্যবস্থার গোড়াপত্তন করলেও প্রকৃত বিচার-কাঠামো গড়ে উঠেছিল কর্নওয়ালিসের আমলে। প্রতিটি জেলাতে স্থাপিত হয়েছিল দেওয়ানি আদালত। দেওয়ানি আদালতের সর্বোচ্চ বিচারক হলেন জেলা-জজ। কর্নওয়ালিস এইভাবে সিভিল জজ ও কালেক্টরের পদ দুটিকে পৃথক করে গড়ে তুললেন। জেলা কোর্ট থেকে প্রথমে চারটি প্রাদেশিক আপীল আদালতে আবেদন করা যেত। মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হতে পারত সদর দেওয়ানি আদালতে। জেলা-আদালতের নিচে ছিল বিচারক পরিচালিত রেজিস্ট্রারের আদালত এবং ভারতীয় বিচারক পরিচালিত মুন্সেফ ও আমীনের আদালত।

ফৌজদারি মামলার বিচারের জন্য কর্নওয়ালিস বাংলা প্রেসিডেন্সিকে চারটি ভাগে ভাগ করে প্রত্যেকটিতে ভ্রাম্যমান আদালত (Court of Circuit) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বিচারালয়গুলিতে বিচারের ভার ছিল ইংরেজ সিভিল সার্ভেন্টদের উপর। সার্কিট কোর্টের নিচে ছিল ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেট পরিচালিত অনেকগুলি বিচারালয় যেখানে ছোটখাটো মামলার বিচার হত। সার্কিট কোর্ট থেকে সদর নিজামত আদালতে আপিল করা যেত। ফৌজদারি আদালতে মোটের উপর মুসলিম ফৌজদারি আইন বলবৎ করা হত। আর দেওয়ানি আদালতগুলিতে দেশ-অঞ্চলের প্রচলিত প্রথা ও আচারকে মান্যতা দেওয়া হত।

প্রাদেশিক আপিল ও সার্কিট কোর্টগুলি ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক তুলে দেন। এইসব আদালতের কাজগুলি প্রথমে কমিশন ও পরে জেলা-জজ ও জেলা কালেক্টরদের উপর ন্যস্ত করা হয়। বেন্টিঙ্ক বিচারকদের পদমর্যাদা ও পদোন্নতি ঘটান। তাঁর আমলে ভারতীয় বিচারকরা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সাব-অর্ডিনেট জজ (Subordinate Judge) ও প্রধান সদর আমিনের পদ লাভ করতে পারত। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা, বম্বে ও মাদ্রাজে হাই কোর্ট (High Court) স্থাপিত হল আর সদর দেওয়ানি ও সদর নিজামত আদালত তুলে দেওয়া হল।

দেশীয় আইন, প্রথা ও রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে ব্রিটিশ আমলের আইন গড়ে উঠলেও ব্রিটিশরা এদেশে শরিয়ত ও শাস্ত্রের বিধান ছাড়াও নতুন আইন রচনা করেছিল। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনে

স-পারিষদ গভর্নর-জেনারেলকে আইনে প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। ঐ বছরেই সরকার লর্ড মেকলের (Lord Macauley) সভাপতিত্বে একটি আইন কমিশন (Law Commission) স্থাপন করেছিল প্রচলিত ভারতীয় আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য। এই কমিশনের প্রচেষ্টাতেই বিখ্যাত ভারতীয় দণ্ডবিধি (Indian Penal Code) রচিত হয়েছিল।

তত্ত্বগতভাবে, ইংরেজরা এদেশে আইনের অনুশাসন (The Rule of Law) প্রতিষ্ঠা করেছিল। আইনের অনুশাসনের অর্থ হল প্রশাসন আইন মোতাবেক কাজ করবে। প্রজাবর্গের অধিকার, বিশেষ সুবিধা এবং নাগরিক কর্তব্য সবই সুস্পষ্ট আইনের নির্দেশে নির্ধারিত হবে, শাসকের খেয়ালখুশিমতো নয়। কিন্তু বাস্তবিক প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এর অন্যথা হত প্রায়শই। কেননা, সরকারি আমরা আর পুলিশ কার্যক্ষেত্রে অনেকটা স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা ভোগ করত। আইনের চোখে সমানাধিকার (Equality before Law) ছিল এমনই একটি ধারণা। জাতি, ধর্ম, শ্রেণী নির্বিশেষে আইন সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযুক্ত হবে—এইটিই ছিল এই ধারণার মূলকথা, কিন্তু কার্যত তা হয়নি। ইউরোপীয় বিচারকের কাছে ইউরোপীয় অপরাধী লঘু দণ্ডাদেশ পেত; পক্ষান্তরে একই অপরাধে ভারতীয়দের শাস্তি হত বেশি। বহু ইংরেজ কর্মচারী, সামরিক অফিসার, বাগিচা মালিক এবং ব্যবসায়ী ভারতীয়দের সঙ্গে অবর্ণনীয় দুর্ব্যবহার করত; কিন্তু নিপীড়িত ভারতীয়রা সুবিচার প্রার্থনা করলে ইওরোপীয় বিচারক দুর্বিনীত ইংরেজ অপরাধীকে প্রায়ই লঘুদণ্ড দিয়ে ছেড়ে দিত। উপরন্তু, সুবিচার পাওয়া এখন রীতিমতো ব্যয়সাধ্য হয়ে উঠল, কেননা আদালতের ফি, উকিলের ফি কিংবা সাক্ষীর জন্য খরচ-খরচা রীতিমতো ব্যয়বহুল ছিল। আদালত গড়ে উঠেছিল গ্রাম থেকে বহু দূরে, শহরে। মামলা চলত জটিল, ব্যয়বহুল দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়ায়। ফলে গরিব লোকের পক্ষে সুবিচার পাওয়া দুরূহ ছিল।

৪৩.৮ শিক্ষাসংক্রান্ত নীতি

এদেশে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারে ব্রিটিশদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। এ-কথার অর্থ অবশ্য এই নয় যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে সরকারই একমাত্র ভূমিকা নিয়েছিল। খ্রিস্টীয় মিশনারি এবং বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয়ও এ-ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এ-দেশে প্রথম দিকে ভারতীয়দের শিক্ষা-বিস্তারের ব্যাপারে তেমন উদ্যোগ দেখায়নি, কেননা কোম্পানির উদ্দেশ্য ছিল এদেশে লাভজনক ব্যবসা-বাণিজ্য করা। অবশ্য দু'একটি বিশিষ্ট ব্যতিক্রম যে ছিল না, এমন নয়। যেমন, ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস মুসলিম আইন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পঠন-পাঠনের জন্য কলকাতা-মাদ্রাজা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে যোনাথান ডানকান (Jonathan Duncan) বারাণসীতে একটি সংস্কৃত কলেজ গড়ে তুলেছিলেন প্রধানত হিন্দু আইন ও দর্শন বিষয়ে পঠন-পাঠনের জন্য। সুতরাং এই দু'টি প্রতিষ্ঠানেরই মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনকে সাহায্য করার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষিত ভারতীয় নিয়মিত সরবরাহ করা।

মিশনারীরা খুব শীঘ্রই এ-দেশে ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকারকে চাপ দিতে থাকে। মানবতাবাদী জ্ঞানদীপ্ত ভারতীয় বিদ্বৎজনরা বিশ্বাস করতে যে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক

দুরবস্থা দূর করার মুখ্য উপায় হল আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা অধিগত করা। অন্যদিকে খ্রিস্ট-মিশনারীরা এ-দেশে শিক্ষাবিস্তারের উৎসাহ দেখিয়েছিল প্রধানত এই কারণে যে আধুনিক শিক্ষা দেশীয় লোকেদের মনে নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে অশ্রদ্ধা এনে দেবে এবং থারা খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হবে। সুতরাং শিক্ষাবিস্তারে সরকারের প্রথম উৎসাহ দেখা গেল ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনে যেখানে এদেশে আধুনিক বিজ্ঞাননিষ্ঠ শিক্ষাবিস্তারে সরকারি প্রয়াসকে নীতিগতভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হল। আইনে কোম্পানিকে বছরে একলক্ষ টাকা ব্যয় করতে নির্দেশ দেওয়া হল। তবুও ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত এই সামান্য অর্থও কোম্পানি শিক্ষাখাতে ব্যয় করতে পারেনি।

এর পিছনে অবশ্য একটি গুরুতর কারণ ছিল। বেশ কয়েক বছর ধরে এই বরাদ্দ অর্থ কী জাতীয় শিক্ষাবিস্তারে ব্যয়িত হবে সে বিষয়ে ঐক্যমত হচ্ছিল না। একদল মানুষ চাইছিলেন যে বরাদ্দ অর্থ শুধুমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারেই খরচ করা হোক; অন্যদিকে আর একটি দল পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পাশাপাশি দেশীয় শিক্ষা প্রসারের উপরে বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছিলেন। এমনকি যাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষার উপর জোর দিচ্ছিলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের মাধ্যম হবে কী ভাষা, সে-নিয়েও তাঁরা বিতর্কে মেতেছিলেন। একদল চাইলেন মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার; অন্যদল ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম করতে চাইছিলেন। এছাড়া আরও নানারকমের জটিলতা ছিল। অনেকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষা এবং অধ্যয়নের বিষয় হিসেবে ইংরেজির পার্থক্য নিরূপণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তেমনি, এদেশে দেশীয় মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা এবং দেশীয় সংস্কৃতির অধ্যয়ন-অনুশীলনমূলক শিক্ষার মধ্যেও যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝি ছিল।

যাইহোক, প্রাচ্যপন্থী ও পাশ্চাত্যপন্থীদের শিক্ষা-সংক্রান্ত এই বিরোধ ও মতদ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নিষ্পত্তি হল। সরকার এইসময় স্থির করলেন যে বরাদ্দ অর্থ এরপর থেকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পঠন-পাঠনেই ব্যয়িত হবে এবং শিক্ষার মাধ্যম হবে ইংরেজি। গভর্নর-জেনারেল বেন্টিকের কাউন্সিলের আইন-সদস্য লর্ড মেকলে (Lord Macaulay) যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে সম্ভব নয়, কেননা কোনো ভারতীয় ভাষাই আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা পরিবেশনের উপযোগী উন্নত হয়ে ওঠেনি। উপরন্তু প্রাচ্য শিক্ষা ইওরোপীয় শিক্ষার চেয়ে নিকৃষ্টতর, একথা সত্যি যে মেকলের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে প্রাচ্যদেশীয় জ্ঞান-সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞানতাই প্রকাশ পাচ্ছিল; কিন্তু এ-কথাও সত্যি যে এই সময় ইওরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশেষত ব্যবহারিক বিজ্ঞান, যথেষ্ট উন্নত ছিল।

এই কারণেই শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যেও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের প্রতি তীব্র আকুলতা ছিল। রামমোহন রায়ের মনে হয়েছিল আধুনিক পশ্চিমী বিজ্ঞান ও গণতান্ত্রিক ভাবধারার মধ্যে অধঃপতিত ভারতের উন্নয়নের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে। সাবেকি শিক্ষা ভারতবাসীর মনে এনেছে বহু কুসংস্কার ও কর্মবিমুখতা। স্বভাবতই রামমোহন প্রমুখ অনেকেই এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য সরকারকে চাপ দিচ্ছিলেন। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার তাই এদেশের স্কুল-কলেজে ইংরেজিকেই শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা করলেন। প্রচুর প্রাথমিক স্কুল খোলার চেয়ে বেশ কয়েকটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল-কলেজ খোলার জন্যই সরকার উৎসাহ

দেখালেন। সরকারের এই নীতি পরবর্তীকালে সমালোচিত হয়েছিল। আসলে নীতিগতভাবেই এই সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনো ত্রুটি ছিল না। কিন্তু এর ফলে গণশিক্ষা অবহেলিত হয়েছিল। সরকার ইংরেজি মাধ্যম স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষার উপর জোর দিলে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছান যেত। কিন্তু সরকার তা করতে চায়নি মূলত অর্থনৈতিক কারণে। গণমুখী শিক্ষা প্রচলনের জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন ছিল ব্যয়কুণ্ঠ ঔপনিবেশিক সরকার তা সরবরাহ করতে প্রস্তুত ছিল না। পরিবর্তে সরকার যে সিদ্ধান্ত নিলেন তাকে 'downward filtration theory' বলা হয়। বলা হল, পাশ্চাত্য শিক্ষা সমাজের উপরতলার মুষ্টিমেয় মানুষের কাছে পৌঁছালে তা ধীরে ধীরে পরিশ্রুত হতে হতে সমাজের নিচের তলার মানুষদের কাছে পৌঁছাবে। এই নীতির বাস্তবায়নের জন্য সরকার উচ্চশ্রেণীর মানুষদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য স্কুল-কলেজ গড়ে তুললেন।

সরকারের এই শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য সফল হয়নি। পাশ্চাত্য শিক্ষা গণমধ্যে সঞ্চারিত হয়নি। তবে পশ্চিমী শিক্ষা গ্রামে-গঞ্জে না পৌঁছালেও, পশ্চিমী ভাব-আদর্শ সুদূর প্রসারিত হয়েছিল। স্কুল-কলেজের মাধ্যমে না হলেও, রাজনৈতিক দল, সংবাদপত্র, ইস্তেহার, সাহিত্য ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষিত ভারতীয়রা গ্রামে ও শহরে গণতান্ত্রিক আদর্শ, জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা ইত্যাদি ভাবাদর্শ ছড়িয়ে দিয়েছিল, যা ব্রিটিশের ঘোষিত শিক্ষানীতির অভিপ্রেত ছিল না।

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের বোর্ড অব্ কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উড (Charles Wood) এ-দেশে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে একটি নির্দেশনামা পাঠান। এই নির্দেশনামায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার জন্য একটি পরিকল্পনার সুপারিশ ছিল। এই সুপারিশক্রমে শিক্ষা সরকারের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে পরিগণিত হল। 'Downward Filtration theory' কাগজে-কলমে পরিত্যক্ত হল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হলেন ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দু'জন গ্রাজুয়েটের একজন।

প্রকৃতপক্ষে, এদেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার থেকে এমন সদিচ্ছা ব্রিটিশ সরকারের ছিল না। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছিল স্বল্পব্যয়ে প্রশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় কেরানি সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য। শিক্ষাবিস্তারের আর একটি উদ্দেশ্য হল এদেশে ব্রিটিশ পণ্যের বাজার বিস্তৃত করা। রাজনৈতিক দিক থেকে ব্রিটিশরা আর একটি উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় ভারত-বিজেতা ব্রিটিশদের অবিমিশ্র প্রশংসা ছিল। ভারতীয়দের ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুরক্ত করে তুলতে পাশ্চাত্য শিক্ষাকেই তারা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিল।

ব্রিটিশ শিক্ষানীতির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল গণমুখী শিক্ষাবিস্তারের প্রতি সচেতন অবহেলা। এর ফল হয়েছিল এই যে এদেশে ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে সাক্ষর লোকের সংখ্যা যা ছিল তা একশ বছর পর ১৯২১ খ্রিস্টাব্দেও বিশেষ একটা হেরফের হয়নি। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে এদেশে ৯৪ শতাংশ ভারতীয় নিরক্ষর ছিল; আর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল ৯২ শতাংশ। দেশীয় ভাষার পরিবর্তে ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম করার ফলে শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়নি। উপরন্তু শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের মধ্যে একট বড় রকমের ভাষাগত

ও সংস্কৃতিগত ব্যবধান রচিত হয়েছিল। তাছাড়া স্কুল-কলেজে শিক্ষার জন্য ছাত্রদের বেতন দিতে হত বলে পাশ্চাত্য শিক্ষা রীতিমতো ব্যয়সাধ্য ছিল। ফলত পাশ্চাত্য শিক্ষা ধনী শহরবাসীদেরই একচেটিয়া হয়ে যায়। যে সনাতন শিক্ষাব্যবস্থাকে ব্রিটিশ সরকার ধ্বংস করে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটাতে উদ্যোগী হয়েছিল, শতাধিককাল ধরেও সে বিনষ্ট কাঠামোর উপযুক্ত পরিবর্ত সরকার এদেশে তৈরি করতে পারেনি। আরও একটি বড় রকমের সাফল্য ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থায় রয়ে যায়। নারীশিক্ষা প্রথম দিকে পুরোপুরি উপেক্ষিত হয়েছিল। এজন্য কোন সরকারি অর্থবরাদ্দও ছিল না। রক্ষণশীল ভারতীয়দের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হবে—এমনতর আশংকা নারীশিক্ষায় সরকারি অনীহার কারণ হতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ হল নারীশিক্ষা বিস্তারের দ্বারা ঔপনিবেশিক সরকারের কোন আশু প্রয়োজন সিদ্ধ হবার সম্ভাবনা ছিল না। কেননা শিক্ষিত নারীদের সেযুগে সরকারি কেরাণী হিসেবে নিয়োগের সাংস্কৃতিক অসুবিধা ছিল। এর ফল হয়েছিল এই যে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দেও মাত্র ২ শতাংশ ভারতীয় নারী লিখতে-পড়তে পারত। কোম্পানির প্রশাসন এদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকেও অবহেলা করেছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সারা দেশে মাত্র তিনটি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে। আর একটিই মাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, রুরকিতে। আর এই সবকিছুর মূলে প্রধান প্রতিবন্ধকতা ছিল অর্থ। শিক্ষাখাতে ব্রিটিশ সরকার অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত ছিল না। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে সরকার এদেশের রাজস্ব আদায় করেছিল ৪৭ কোটি টাকা, আর তা থেকে শিক্ষাখাতে খরচ করেছিল মাত্র এক কোটি।

৪৩.৯ সারাংশ

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের পর কোম্পানির প্রশাসনের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং এ্যাক্ট পাশ করে। কোম্পানির হাত থেকে পার্লামেন্টে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে প্রক্রিয়া ঔপনিবেশিক ভারতে লক্ষ্য করা যায় এখানেই তার সূচনা হয়েছিল। রেগুলেটিং এ্যাক্টের ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হওয়ায় ১৭৮৪ সালে রাজা তৃতীয় জর্জের হস্তক্ষেপে প্রধানমন্ত্রী পিট একটি বিল পার্লামেন্টে নিয়ে এলেন এবং সেটি 'পিটের ভারত আইন' নামে পাশ হল। এই আইন সমকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপযোগী হয়েছিল। এটি একটি সাধারণ প্রশাসনিক কাঠামো প্রবর্তন করেছিল যা ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত মোটামুটি অক্ষুণ্ণ ছিল।

ভারতস্থিত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যাপারে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যখন থেকে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে তখনই ভারতবর্ষে শাসনতন্ত্রের উদ্ভব হয়। কোম্পানি শাসিত ভারতবর্ষে দ্বৈত-শাসন প্রবর্তিত হয়েছিল যার কুফল বাংলার রাজনীতি ও অর্থনীতিতে মারাত্মকভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে পলাশির যুদ্ধের পর থেকে কোম্পানির কর্মচারীদের অত্যাচার, অর্থলোলুপতা এবং কোম্পানির আভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ত্রুটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি ব্রিটিশ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে সে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে তার সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যাপারটি ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ উপলব্ধি করেন। ইতিমধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য

প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত এবং ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী তাই ভারতস্থিত কোম্পানির শাসকবর্গ এবং ব্রিটিশ রাষ্ট্র ও লন্ডনস্থিত শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে একটি সুনিয়ন্ত্রিত ও নির্দিষ্ট সম্পর্ক নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে ভারতস্থিত কোম্পানির সরকার সম্পর্কিত সাংবিধানিক সংস্কারগুলি একের পর এক গৃহীত হতে দেখা যায়। তৎকালীন বিবিধ সমস্যার সমাধানের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হস্তক্ষেপের প্রথম ফলশ্রুতি ছিল ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট যা ছিল ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের প্রথম লিখিত সংবিধান। এরপর ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত প্রতি দশ বছর অন্তর এবং ১৭৯৩ সালের পর থেকে ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত কুড়ি বছর অন্তর কোম্পানির সনদ মঞ্জুর করার প্রথা প্রচলিত হয়। প্রতিবারই কোম্পানির গঠন ও ভারতে কোম্পানির শাসন ব্যাপারে কিছু পরিবর্তন করে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তার নিয়ন্ত্রণ তথা ব্রিটিশ সরকারের প্রাধান্য বৃদ্ধি করে। এইভাবে দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন বিষয়ে আইন রচনা করে ভারতীয় সাম্রাজ্যের শাসন ও দায়িত্বভার ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তথা ইংল্যান্ডের রানির হস্তান্তরিত করার একটি ধারাবাহিক প্রয়াস ব্রিটিশ পার্লামেন্ট পরিচালিত করেছিল।

৪৩.১০ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১। ওয়ারেন হেস্টিংস ও লর্ড কর্নওয়ালিসের প্রশাসনিক ও বিচারবিভাগীয় সংস্কারগুলি আলোচনা করুন।

২। বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হল কেন? বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব কীরকম হয়েছিল?

৩। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষার অগ্রগতি পর্যালোচনা করুন।

৪। ব্রিটিশদের ভূমি-রাজস্ব নীতি কিভাবে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভূমি-সমাজব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছিল?

৫। ভারতে নতুন শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি কীসের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? তার বিশদ বিবরণ দিন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের রেগুলেটিং অ্যাক্টের মূল ধারাগুলি কী ছিল? এর কী কী ত্রুটি ছিল?

২। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার একটি বিবরণ দিন।

৩। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা কেন প্রবর্তিত হল? এর সীমাবদ্ধতা আলোচনা করুন।

৪। রায়তওয়ারী ও মহলওয়ারী ভূমিব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব বিবেচনা করুন।

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। পিটের ভারত-আইন কবে তৈরি হয়েছিল?

২। 'কর্নওয়ালিস কোড' বলতে কী বোঝেন?

৩। স্যার জন শোর কে ছিলেন?

৪। 'ভ্রাম্যমাণ কমিটি' বলতে কী বোঝায়?

৫। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' কে কবে প্রবর্তন করেছিলেন?

৬। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

৭। 'উড'-এর নির্দেশনামা' কী?

৮। 'এশিয়াটিক সোসাইটি' কে কবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

৪৩.০ গ্রন্থপঞ্জী

১। Pylee, M. V. : Constitutional History of India, Second Edition, 1995.

২। Aggarwal, R. C. : Constitutional Development of India and National Movement, Ninth Edition, 1994.

৩। Firminger, W. K. : Fifth Report from the Select Committee of the House of Commons, Calcutta, 1917.

৪। Guha, Ranajit : A Rule of Property for Bengal, 1962.

৫। Mukherjee, Nilmani : The Ryotwari System in Madras, 1962.

৬। Basu, Aparna : Growth of Education and Political Development in India.

৭। Grover, B. L. & Grover, S. : A New look at Modern India History, 1997.

একক ৪৪ ❐ পাশ্চাত্যকরণ ও ভারতীয় সমাজে তার প্রতিক্রিয়া : তিনটি ভিন্নমুখী উদ্যম ও প্রয়াস : সমন্বয়বাদ, রক্ষণশীল ঐতিহ্যপন্থা, চরমপন্থী প্রতীচ্যপন্থা

গঠন :

৪৪.০ উদ্দেশ্য

৪৪.১ প্রস্তাবনা

৪৪.২ সমন্বয়বাদ

৪৪.৩ রক্ষণশীল ঐতিহ্যপন্থা

৪৪.৪ চরমপন্থী প্রতীচ্যপন্থা

৪৪.৫ সারাংশ

৪৪.৬ অনুশীলনী

৪৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৪৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- পাশ্চাত্যকরণের ফলে বাংলা তথা ভারতীয় সমাজে তার কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?
- রাজা রামমোহন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জীবনচর্চা ও চর্যার মধ্যে কীভাবে সুখী সমন্বয় আনার চেষ্টা করেছিলেন?
- রাধাকান্তদেবের নেতৃত্বে হিন্দু রক্ষণশীল ঐতিহ্যপন্থা প্রগতিশীলতার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
- ডিরোজিওর প্রেরণায় কীভাবে চরমপন্থী প্রতীচ্যবাদের বিকাশ ঘটেছিল।

৪৪.১ প্রস্তাবনা

উনিশ শতকের ভারতের মনন ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। এর পিছনে ছিল পশ্চিমী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল একটি পরাজিত জাতির বেদনাবিদ্ধ চৈতন্য। আর এই দু'টি ব্যাপার সংযুক্ত হয়েই এক নতুন মনন ও মেজাজের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। ভারতের মতো বিশাল ভৌগোলিক আয়তনের একটি দেশ মুষ্টিমেয় বিদেশীর করতলগত হয়েছিল শুধুমাত্র আমাদের সামাজিক ও

সাংস্কৃতিক কাঠামোর দুর্বলতার কারণে, এই বেদনাবিধুর স্মৃতি দেশবাসীকে নিরন্তর পীড়া দিত। নব্যশিক্ষিত আধুনিক চিন্তাঋদ্ধ ভারতীয়রা এদেশের দুর্বলতা-সচলতার নানা চিহ্ন ধরে তার কারণ অনুসন্ধান শুরু করলেন। অনেকেই এই আত্মানুসন্ধান শেষে সিদ্ধান্ত করলেন যে পাশ্চাত্যের কাছ থেকে আমাদের গ্রহণীয় কিছু নেই; আমাদের অতীত ঐতিহ্যেই আছে উন্নয়নের হাতিয়ার; অতীতের পুনর্মূল্যায়নের মধ্যেই আছে আত্মসম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপায়। তারা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি বিরূপ রইলেন। বস্তুত বিদেশী শাসকের কাছে পরাধীন ভারতে এটি ছিল একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। এই দলকে আমরা রক্ষণশীল ঐতিহ্যপ্রিয় দল বলতে পারি। আর একটি গোষ্ঠী পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ আর বিজ্ঞানকে যথেচ্ছভাবে কাজে লাগিয়ে দাবি করেছিল আমূল সামাজিক সংস্কার। তাঁরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অন্যায় ও অযৌক্তিক ভারতীয় প্রথা ও প্রতিষ্ঠানগুলির উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল। এই গোষ্ঠীকে আমরা চরমপন্থী প্রতীচ্যপন্থী বলতে পারি। তৃতীয় আর একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় এই পাশ্চাত্যীকরণ পর্বে যে প্রবণতার মর্মবস্তু হল রক্ষণশীল ঐতিহ্যশীলতা আর চরমপন্থী প্রতীচ্যবাদের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো। এরা ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদে বিশ্বাসী।

তবে এই তিনটি প্রবণতার প্রবক্তাদের সুস্পষ্ট বিভিন্নতায় চিহ্নিত করা যায় না; কেননা এই তিনটি গোষ্ঠীর মধ্যেই আভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল। পশ্চিমী সভ্যতার অভিঘাতে এ-দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে 'নবজাগরণ' ঘটেছিল তা ঐতিহাসিক সত্য; কিন্তু এই জাগরণের তল ও তাপমাত্রায় নানা পরস্পরবিরোধী মাত্রা ছিল। রক্ষণশীল ঐতিহ্যপ্রিয় প্রবণতায় লক্ষ্য করা গেল অতীতের গৌরবগাথা। ভারতবর্ষের অতীত মহিমা লক্ষ্য করা হল হিন্দু গৌরবোজ্জ্বল অতীতের মধ্যে। ভারতবর্ষের সভ্যতা মানেই তাঁরা তুলে ধরলেন হিন্দু সংস্কৃতির গৌরবময় অতীতকে। অন্যদিকে চরমপন্থী প্রতীচ্যপন্থীরা ভারতীয় অতীতকে সমগ্রতায় পুজো করতে চাইলেন না। তাঁরা প্রমাণ করলেন হিন্দু ঐতিহ্যের অনেক কিছুই অন্যায়, অযৌক্তিক, সেকেলে। তাঁরা অনড়, বাধ্যতামূলক পুরোহিততন্ত্রকে আঘাত করলেন, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবিন্যাসকে বললেন অবৈজ্ঞানিক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রতীচ্যের প্রতি দেখালেন নিরঙ্কুশ পক্ষপাত। এই অন্ধ পক্ষপাতিত্ব থেকে জন্ম নিয়েছিল এক ধরনের জঙ্গী সংগ্রামের মেজাজ যা যুক্তিবাদকে সরাসরি অস্বীকার করেছিল। তৃতীয় পন্থার যাত্রীরা উদারনৈতিক আধুনিকতা আর রক্ষণশীল ঐতিহ্যপ্রিয়তার মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারা একদিকে যেমন হিন্দু ঐতিহ্যকে অস্বীকার করতে পারেননি, অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষ মানবাধিকারকেও বরণ করেছিলেন। পরস্পর-বিরোধী এই দুটি ধারণার সহাবস্থান ও বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির দ্বন্দ্ব, বস্তুত, ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিরই অনিবার্য পরিণাম।

৪৪.২ সমন্বয়বাদ

ভারতের এই চিন্তা ও চৈতন্যের প্রধান প্রাণপুরুষ রাজা রামমোহন রায়। ভারতবর্ষের অধঃপতিত আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নচিন্তা ছিল রামমোহনের জীবনসাধনা। জাতিভেদ প্রথা ও অন্ধ কুসংস্কারের গ্লানিক্লিষ্ট ভারতের সামাজিক বন্ধতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিলেন। সেকালে প্রচলিত ধর্ম ছিল কুসংস্কারে আবদ্ধ; অজ্ঞ ও ভণ্ড পুরোহিতরা সমাজ-কাঠামো ও সমাজব্যবস্থাকে নিজেদের সুবিধার্থে ব্যবহার করতে স্থিরসংকল্প ছিলেন। উচ্চবংশীয় হিন্দুরা ছিলেন স্বার্থান্বেষী ও সমাজের বৃহত্তর উন্নয়নের প্রতি বিমুখ।

প্রাচ্যের দার্শনিক উপলব্ধি ও সনাতন ধর্মের প্রতি রামমোহনের গভীর শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু একই সঙ্গে তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নয়নের একমাত্র উপায় হল পাশ্চাত্যের বিজ্ঞাননিষ্ঠ জীবনচর্যা। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ ছাড়া ভারতবাসীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এদেশের নরনারী সামাজিক সাম্য ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পাশ্চাত্যের জীবনধর্ম অপরিহার্য। তিনি পশ্চিমী বিজ্ঞান ও ধনতন্ত্রেরও গুণগ্রাহী ছিলেন।

রামমোহন চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জীবনচর্চা ও চর্যার মধ্যে সুখী সমন্বয়। তিনি বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তরুণ বয়সে বারাণসীতে তিনি সংস্কৃত ও হিন্দুশাস্ত্র পাঠ নিয়েছিলেন। পাটনায় অধ্যয়ন করেছিলেন কোরান ও আরবি-ফার্সি ভাষা ও সাহিত্য। জৈনধর্ম প্রমুখ ভারতের বিভিন্ন ধর্মমত ও বিশ্বাসে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। পরবর্তীকালে পশ্চিমী চিন্তা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি অধ্যয়ন করেন। মূল বাইবেল অধ্যয়ন করার জন্য তিনি গ্রিক ও হিব্রুভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ফার্সি ভাষায় রচনা করলেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'একেশ্বরবাদীদের প্রতি উপহার'। এই রচনায় তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন সব ধর্মেরই স্বাভাবিক প্রবণতা হল একেশ্বরবাদ। কিন্তু মানুষ চিরকালই নিজের নিজের বিশেষ ধর্মমত ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলির উপর জোর দিয়ে এসেছে আর সেইজন্যই ধর্মে ধর্মে বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে।

১৮১৪ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে তিনি কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে একদল তরুণ সংঘবদ্ধ হলেন, আর এইভাবে ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে গড়ে উঠল 'আত্মীয় সভা'। এরপর থেকেই তিনি সচেতনভাবে হিন্দুধর্মের সাম্প্রতিক বিকৃতিগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলেন। মূর্তিপূজা, জাতিভেদপ্রথা আর অর্থহীন নানা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করলেন তাঁর বিজ্ঞাননিষ্ঠ শানিত যুক্তি। পুরোহিতদের তিনি তীব্রভাষায় নিন্দা করলেন। কেননা তাঁর মতে, পুরোহিতরাই এইসব অন্ধ আচার-অনুষ্ঠানকে উৎসাহিত করেছে। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি বেদান্তের এবং প্রধান পাঁচটি উপনিষদের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করলেন এবং প্রমাণ করলেন যে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রেই একেশ্বরবাদের কথা বলা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মূর্তিপূজার অযৌক্তিকতাও প্রমাণ করলেন। তিনি বললেন, মূর্তিপূজা সমাজের বিন্যাসটি ধ্বংস করে দেয় এবং নৈতিক সংস্কারের পথে অন্তরায় হয়ে ওঠে। প্রোটেস্ট্যান্ট বিপ্লবের প্রাণপুরুষ মার্টিন লুথারের মতোই তিনি মনে করতেন, যে-কোনো ধর্মগ্রন্থেই ভুল থাকতে পারে; কিন্তু সেই ভুল বা বিচ্যুতি সংশোধন বা পরিত্যাগ করার অধিকার মানুষের সহজাত, বিশেষত, যদি তা সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের অন্তরায় হয়ে ওঠে।

রামমোহন তাঁর যুক্তিবাদী মননকে শুধুমাত্র হিন্দুধর্মের গ্লানি সংস্কারেই আবদ্ধ রাখেননি; তিনি খ্রিস্টান ধর্মেরও উদারনৈতিক পুনর্ব্যাখ্যা করলেন। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রকাশ করলেন 'যিশুর অনুশাসন' (Precepts of Jesus)। এই গ্রন্থে তিনি নিউ টেস্টামেন্টের (New Testament) নৈতিক অনুশাসন এবং দার্শনিক প্রত্যয়গুলিকে আলাদা করলেন; বললেন যে খ্রিস্টধর্মের নৈতিক বাণীগুলি অলৌকিক গল্পগাথার থেকে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ। খ্রিস্টধর্মের প্রচারকরা রামমোহনের এহেন অখ্রিস্টানসুলভ বক্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়। অতঃপর রামমোহন ১৮২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 'খ্রিস্টানদের প্রতি আবেদন' শীর্ষক তিনটি প্রবন্ধ রচনা করেন।

তিনি খ্রিস্ট ধর্মপ্রচারকদের প্রচারিত অন্ধবিশ্বাস ও রহস্যময়তা প্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন এইসব রচনায়। রামমোহন প্রকৃত খ্রিস্টীয় আদর্শের বিরোধী ছিলেন না। তিনি বরং খ্রিস্টধর্মের নৈতিক শিক্ষাগুলি হিন্দুধর্মের অন্তর্গত করতে চেয়েছিলেন।

হিন্দুধর্মের একেশ্বরবাদের ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে রামমোহন একটি বিশ্বজনীন ধর্ম গড়ে তুলতে চাইছিলেন। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'উপাসনার বিভিন্ন পদ্ধতি' (Different Modes of Worship) রচনায় তিনি বিভিন্ন ধর্মমতের প্রতি সহনশীলতা আদর্শের উপর জোর দেন। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'ব্রাহ্মসভা' নামে একটি একেশ্বরবাদী সংগঠন গড়ে তুললেন। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হল একটি নিয়মিত উপাসনাগৃহ। এই উপাসনাগৃহের দলিলেই 'ব্রাহ্মসমাজে'র নীতিগুলি সুনির্দিষ্ট হল। ব্রাহ্মসমাজের নীতিগুলির ভিত্তি হল যুক্তিবাদ, বৈদিক ও ঔপনিষদিক আদর্শ, মানবিক মর্যাদা, পৌত্তলিকতা বিরোধিতা এবং সতীদাহ ইত্যাদি সামাজিক কু-প্রথার বিরুদ্ধতা। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'সতীদাহ'-এর বিরুদ্ধে প্রথম জনমত গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রের নানা উদ্ধৃতির মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন যে এই হত্যাপ্রথার সমর্থন আমাদের সর্বোত্তম ধর্মশাস্ত্রে নেই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিধবাদের আত্মীয়স্বজনদের কাছে স্বাধীন বিচারশক্তি ও শুভবুদ্ধির উদ্বোধনের আহ্বান জানালেন। শেষপর্যন্ত লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে সতীদাহ প্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। গোঁড়া হিন্দুরা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এই আইন রদ করার জন্য আবেদন জানালেন। রামমোহনও এই আইনের সমর্থনে একটি ডেপুটেশনের ব্যবস্থা করলেন; বেন্টিঙ্কের আইন যাতে প্রত্যাহৃত না হয় সেজন্য পার্লামেন্টেও তিনি আবেদনপত্র পাঠালেন। সতীদাহপ্রথা বিরোধী আন্দোলনের সাথে সাথে তিনি নারীদের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্যও আন্দোলন শুরু করেন। বহুবিবাহ প্রথাকে তিনি নিন্দা করলেন কঠোর ভাষায়। নারীদের সম্পত্তি ও উত্তরাধিকারের সপক্ষেও তিনি জোরাল বক্তব্য রেখেছিলেন।

ভারতে আধুনিক ধ্যানধারণা প্রসারের উপায় হিসেবে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষাকেই অন্যতম হাতিয়ার বলে গণ্য করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন প্রাচ্যের প্রজ্ঞার সঙ্গে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ। তাই একদিকে যেমন নিজে অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল চালাতেন, তেমনি অন্যদিকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বেদান্ত মহাবিদ্যালয়। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ডেভিড হেয়ার প্রমুখ অনেকে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করলে রামমোহন সক্রিয়ভাবে সাহায্য করলেন। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড আমহার্স্টকে লেখা একটি চিঠিতে রামমোহন আবেদন করেছিলেন ধ্রুপদী প্রাচ্যবিদ্যার পরিবর্তে কার্যকরী পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যই সরকারের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রবর্তনাও হয়েছিল রামমোহনের হাতে। বিভিন্ন অনুবাদ, ভূমিকা ও গবেষণামূলক নিবন্ধে রামমোহন এনেছিলেন প্রকাশভঙ্গীর অভিনব বলিষ্ঠতা, প্রমাণ করেছিলেন গুরুগম্ভীর বিষয় প্রকাশেও বাংলাভাষা রীতিমতো পারঙ্গম।

রামমোহনের মধ্যেই জাতীয় চৈতন্য উন্মেষের প্রথম উদ্‌ভাসটি পরিলক্ষিত হয়। স্বাধীন ও তেজস্বী ভারতের ভবিষ্যৎ রূপকল্প তিনি যেন চোখের সামনে দেখতে পেতেন। তিনি দেশবাসীকে সতর্ক করেছিলেন মূর্তিপূজার অশুভ প্রভাবের বিরুদ্ধে; তাঁর কণ্ঠে প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছিল জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে, কেননা, তাঁর বিচারে জাতিভেদ প্রথাই হল আমাদের অনৈক্যের মূল কারণ। তিনি ছিলেন ব্যক্তি-স্বাধীনতার পূজারী; সংবাদপত্রের

অবাধ মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার সপক্ষে তিনি সুপ্রীম কোর্টে পাঠিয়েছিলেন একটি স্মারকলিপি। জুরি আইনের (Jury Act) বৈষম্যের বিরুদ্ধেও তিনি সরব হয়েছিলেন। কোম্পানির বাণিজ্যিক অধিকারের অবলুপ্তি এবং রপ্তানির উপর বিপুল শুল্কের অবসানও তিনি দাবি করেছিলেন। এদেশে রাজস্ব ও বিচারব্যবস্থা এবং রায়তদের দুরবস্থার কথা পেশ করেন তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে। জমিদারী অপশাসনের বিরুদ্ধেও তিনি সরব ছিলেন; কৃষকদের জন্য সুস্থির কর নির্ধারণ দাবি করেন।

রামমোহনের আন্তর্জাতিক যোগাযোগের পরিধিটি ছিল সুবিপুল। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রগতিশীল আন্দোলন সম্পর্কে ছিল তাঁর প্রগাঢ় ঔৎসুক্য। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে নেপল্‌স্‌-এর বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার সংবাদে তিনি এতই ব্যথিত হন যে পূর্বনির্ধারিত যাবতীয় কর্মসূচি তিনি বাতিল করে দেন। আবার ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে স্পেন-অধিকৃত আমেরিকার বিপ্লবের সংবাদে তিনি এতই উৎফুল্ল হন যে ঐ বিপ্লবের সম্মানে তিনি একটি গণভোজের ব্যবস্থা করলেন। আয়ার্লান্ডের দুর্দশাপীড়িত কৃষকদের সমর্থনে তিনি ইংরেজ জমিদারদের তীব্র নিন্দা করলেন; তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন পার্লামেন্ট যদি সংস্কার বিল (Reform Bill) পাশ না করে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবেন। বস্তুত সবদিক থেকেই রামমোহন ছিলেন আধুনিক ভারতবর্ষের প্রথম 'আধুনিক' মানুষ, যুক্তিবাদী, বিজ্ঞাননিষ্ঠ ও সংস্কারমুক্ত।

বাংলার রেনেসাঁস বা নবজাগরণে রামমোহন পথিকৃৎ হলেও তাঁর সহযাত্রীর অভাব ছিল না। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধাদের মধ্যে যেমন ছিলেন ভারতীয় তেমনি অ-ভারতীয় সহযোগীও ছিলেন। আমরা ডেভিড হেয়ার, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, চন্দ্রশেখর দেব ও তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রমুখ বিভিন্ন উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রগতিশীল মানুষদের নাম করতে পারি। আর এখানেই ছিল বাংলার এই নবজাগরণের সীমাবদ্ধতা, পনেরো শতকে ইওরোপীয় রেনেসাঁস যখন ইতালিতে শুরু হয় তার প্রধান চালিকাশক্তি ছিল বাণিজ্যিক বুর্জোয়া সম্প্রদায়; ভূমিস্বার্থের সঙ্গে এই বুর্জোয়াশ্রেণীর কোনো সংযোগ ছিল না। ইউরোপীয় বাণিজ্যিক বুর্জোয়ারা ছিল নিজের দেশে স্বাধীন ব্যবসায়ী। কিন্তু রামমোহন, দ্বারকানাথ সহ সেকালের বাঙালী রেনেসাঁস পুরুষদের ব্যবসায়ী স্বার্থ ছিল ইংরেজদের বাণিজ্যিক স্বার্থের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। তাঁরা ইংরেজদের মুৎসুদ্দী হিসেবেই নিজেদের ধনসম্পদ বৃদ্ধিতে উৎসাহিত এই বিবেচনায় যে তাঁদের সম্পদ বৃদ্ধি মানেই দেশের সম্পদ বৃদ্ধি। কিন্তু বাস্তবে যে প্রক্রিয়ায় তাঁরা তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করেছিলেন সে-প্রক্রিয়ার মধ্যে দেশীয় শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির অনিবার্য ধ্বংস নিহিত ছিল। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি রেনেসাঁস নেতাদের ধর্মপ্রভাব মুক্ত স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। কিন্তু বাংলার রেনেসাঁস পুরুষদের ক্ষেত্রে তেমন সচেতন প্রয়াস দেখা যায় না। উপরন্তু, তাঁদের অর্থনৈতিক জীবন যেহেতু ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গেই সংযুক্ত ছিল তাই তাঁদের লক্ষ্য ছিল কীভাবে ইংরেজ শাসনকে স্থায়ী ও সুস্থির করা যায়—এমন অভিযোগ করা হয়। বলা হয়, ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ তাঁরা কামনা করেননি; তাঁদের ইংরেজ সমালোচনা কতকগুলি ঔপনিবেশিক দুষ্কৃতির কাণ্ডকে সমালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরিশেষে, ইউরোপীয় রেনেসাঁস মানবতার সঙ্গে বাংলার মানবতাবাদী চিন্তা ও কর্মের সাদৃশ্য খোঁজা হয়। এই সাদৃশ্য ইতিহাসসম্মত নয়। কেননা, ইতালিতে মানবতাবাদী চৈতন্যের বিকাশের মধ্যে সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণুতা, বাণিজ্যিক বুর্জোয়াদের উদ্ভব ও ভূমিদাস স্বার্থের মধ্যে একটি

গভীর সংযোগের মধ্যেই সমাজের যাবতীয় মানুষের শোষণমুক্তির সংকল্প ছিল। রেনেসাঁস নায়করা একধরনের কল্পিত সাম্যবাদের তত্ত্ব উদ্ভাবন করে সমস্ত মানব-শোষণের অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এধরনের প্রস্তাব বাঙলার মানবতাবাদে ছিল না। বাঙলার মানবতাবাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাঙালী অভিজাত ও মধ্যশ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থকে সংহত করে তার পরিপূর্ণ বিকাশের উপযোগী যাবতীয় সামাজিক বাধা অপরসারণ করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সংস্কৃত কলেজে যখন সকল বর্ণের ছাত্রদের ভর্তির প্রশ্ন ওঠে তখন রক্ষণশীল হিন্দুরা তার তীব্র বিরোধিতা করে। বিদ্যাসাগরও প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও সংস্কৃত কলেজের দরজা সবার জন্য খুলে দিতে পারেননি; শেষমেশ তিনি শুধুমাত্র কায়স্থদের ভর্তির প্রস্তাব দিতে পেরেছিলেন।

৪৪.৩ রক্ষণশীল ঐতিহ্যপন্থা

ইংরেজ শাসনের ভিন্ন যে-একটি প্রতিক্রিয়া এদেশের সমাজে লক্ষ্য করা গিয়েছিল তাকে আমরা রক্ষণশীল ঐতিহ্যপন্থা বলে অভিহিত করেছি। রক্ষণশীল ঐতিহ্যপন্থীরা রামমোহনের সমাজ ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনকে নানাভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। আর বড়ো কথা, তারা রামমোহনকে প্রকাশ্য রাজপথে লাঞ্ছিত করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। রামমোহনের প্রগতিপন্থার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন শোভাবাজার রাজবাড়ির বংশধর নিষ্ঠাবান হিন্দু রাধাকান্ত দেব। রাধাকান্ত প্রাচ্য সাহিত্য ও দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি একটি সংস্কৃত জ্ঞানকোষ (encyclopaedia) সংকলন শুরু করেন। এতে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যায়। আরবি, ফার্সিতে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল; ইংরেজি সাহিত্যেও তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। হিন্দুদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে তিনি সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন। হিন্দু কলেজেও তাঁর প্রচুর দান ছিল। কলকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির (Calcutta School-Book Society) তিনি অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নারীশিক্ষার প্রসারেও তাঁর উৎসাহের শেষ ছিল না।

রাধাকান্ত দেবের এই আপাত প্রগতিশীলতার অন্তরালে ছিল পুরোদস্তুর প্রতিক্রিয়াশীলতা। সামাজিক রক্ষণশীলতার তিনি ছিলেন অন্ধ সমর্থক। যদিও তাঁর পরিবারে কেউ 'সতী' হয়েছিলেন কিনা জানা যায় না, তবুও সতীদাহ প্রথাকে প্রচলিত রাখতে তিনি গোড়াপন্থীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার বিরুদ্ধে যে রক্ষণশীল হিন্দুদের আবেদনপত্রটি রচিত হয়েছিল (১৮২৯ খ্রিঃ) তাতে রাধাকান্তের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে রাধাকান্তের নেতৃত্ব গঠিত হয়েছিল রক্ষণশীল হিন্দুদের ধর্মীয় সংগঠন 'ধর্মসভা'। 'ধর্মসভা'য় যোগ দিয়েছিলেন ধনী হিন্দু জমিদাররাও। কেননা সরকারের নতুন রাজস্বনীতি (Regulation III of 1828) তাদের মনঃপূত হয়নি; সরকার 'সতীদাহ' আইন করে বন্ধ করে দিলে 'ধর্মসভা'য় যোগ দিয়ে তাঁরা সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতার সুযোগ পেয়েছিল। 'সমাচার চন্দ্রিকা' ছিল এই সংগঠনের প্রধান মুখপত্র। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এর সম্পাদক এবং 'ধর্মসভা'র কর্মসচিব। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে 'ধর্মসভা' সিদ্ধান্ত নেয় যে যেসব হিন্দুরা সতীদাহ বন্ধে সহযোগিতা করবে 'ধর্মসভা' তাদের সামাজিক দিক থেকে বয়কট করবে। ব্রাহ্ম কেশব সেনের পিতামহ রামকমল সেন ছিলেন আর একজন

রক্ষণশীল ঐতিহ্যপন্থীদের নেতা। তবে তিনি রাধাকান্ত দেবের মতো বিভিন্ন পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

৪৪.৪ চরমপন্থী প্রতীচ্যপন্থা

এদেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার তৃতীয় যে প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল হিন্দুসমাজে তাকে আমরা চরমপন্থী প্রতীচ্যপন্থা বলতে পারি। রামমোহনের জীবৎকালেই এই প্রবণতার সূত্রপাত হয়েছিল। হিন্দু কলেজের বেশ কিছু তরুণ ছাত্রদের মধ্যেই এই চরমপন্থার বিকাশ ঘটেছিল; তা ক্রমে একটি অভিনব আন্দোলনের রূপ নেয় এবং 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলন নামে পরিচিত হয়। 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের মুখ্য প্রেরণাদাতা ছিলেন জনৈক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান—হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও।

ডিরোজিওকে বলা যেতে পারে বিস্ময়বালক। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছিল সাহিত্য ও দর্শনপ্রীতি, ফরাসি বিপ্লব আর ইংরেজ র‍্যাডিক্যাল মতবাদে বিশ্বাস। হিন্দু কলেজে তিনি যখন শিক্ষক নিযুক্ত হলেন তখন তাঁর 'কৈশোর' শেষ হয়নি। হিন্দু কলেজে তিনি এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, যুক্তিবাদ আর চিন্তার স্বাধীনতা ছাত্রদের দুর্বার আবেগে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তিনি ছাত্রদের শেখাতেন স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে। প্রচলিত রীতিনীতি সম্বন্ধে অবাধে প্রশ্ন তুলতে, বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর সদস্যরা এদেশের চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। গোটা হিন্দুসমাজকেই তারা নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে অস্থির করে তুলেছিল। হিন্দুসমাজে নিষিদ্ধ খাদ্য ও পানীয়ে তাদের ছিল প্রবল আসক্তি।

ডিরোজিও'র ছাত্ররা তাঁরই উৎসাহ ও প্রেরণায় গড়ে তোলে 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' নামে এক বিতর্ক সভা। তাঁরই সভাপতিত্বে এখানে চলত ঈশ্বরের পক্ষে-বিপক্ষে, মূর্তিপূজা ও পুরোহিততন্ত্রের ক্ষতিকর দিকগুলি নিয়ে সুদীর্ঘ তর্কবিতর্ক। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তারা চালু করে 'পার্থেনন' পত্রিকা যাতে স্ত্রীশিক্ষা, কুসংস্কারের সর্বনাশা প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা প্রকাশিত হত। তাদের কথাবার্তায়, রচনায় ও বিতর্কে লক্ষ করা যেত বেকন, লক, হিউম, পেইন অথবা বেন্থামের রচনা অধ্যয়নের গভীর চাপ। স্বভাবতই তাদের মনোভাবেব একটি র‍্যাডিক্যাল ধারা মাথা তুলতে শুরু করে।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীনপন্থীরা সচকিত হয়ে ওঠেন। ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদের সম্বন্ধে নানা গল্পগাছা ও গুজবও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন এবং ছাত্রদের মধ্যে হিন্দুদের ধারণাবিরোধী কাজকর্ম ও প্রচারের জন্য ডিরোজিওকে দায়ী করা হয়। ডিরোজিওকে ছাত্রদের শিক্ষাদানের পক্ষে অযোগ্য বলে ঘোষণা করে কলেজ কমিটিতে প্রস্তাব আনা হয়। শেষপর্যন্ত ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ ছাড়তে হয়েছিল; কিন্তু তরুণদের উপর তাঁর প্রভাব রয়েই গেল। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নব্যবঙ্গ-এর সদস্যরা প্রচলিত সমাজ ও ধর্মব্যবস্থার নিন্দা ও সমালোচনা করে প্রাচীনপন্থীদের উত্যক্ত করে তুললেন।

ডিরোজিওপন্থীদের সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনাও ছিল। পুলিশী দুর্নীতি ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কৃষকদের দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, দাসপ্রথার অবসান ও সমানাধিকারের প্রশ্নেও তাঁরা সরব ছিলেন। অন্যায় করের বোঝার বিরুদ্ধে তাঁরা যেমন প্রতিবাদ করেছেন, তেমনি বিধবা বিবাহকেও তাঁরা জানিয়েছেন নীতিগত সমর্থন। আইন প্রণয়নে ভারতীয়দের অনধিকার, যাবতীয় বড়ো ও মাঝারি চাকুরিতে শ্বেতাঙ্গদের একচেটিয়া নিয়োগ, বাণিজ্যে কোম্পানির একচেটিয়া কর্তৃত্ব, বিচার-ব্যবস্থায় ব্যয় ও বিলম্ব, দেশ থেকে ধননির্গমন—সমস্ত কিছুই তাদের নজরে পড়েছিল। জমিদারদের বিরুদ্ধে তারা প্রজাদের হয়ে নালিশ করেছেন, চেয়েছেন স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার, চেয়েছেন জাতিভেদ বিলোপ। দৃষ্টিভঙ্গির এইসব পরিবর্তন এনে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী অবশ্যই একটি আধুনিকতার বাতাবরণ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিলেন।

ডিরোজিওপন্থীরা বাংলার সমাজজীবনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তা শেষপর্যন্ত অন্তঃসারশূন্য ও ক্ষণস্থায়ী বলে প্রমাণ হল। নব্যবঙ্গের সদস্যরা নিজস্ব গোষ্ঠীর বাইরে কোনো অর্থপূর্ণ আন্দোলন তো গড়ে তুলতে পারেননি, উপরন্তু নিজেরাই শেষপর্যন্ত কোনো তাৎপর্যপূর্ণ চেহারা নিয়ে টিকে থাকতে পারেনি। ব্যক্তিগত অর্থ ও স্বার্থচিন্তায় তারা ক্রমশ জড়িয়ে পড়েছিলেন, কেননা তারা অধিকাংশই এসেছিলেন বাংলার মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। তারা প্রচলিত সামাজিক প্রথার বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু তা উচ্ছেদের জন্য কোনো বলিষ্ঠ বিদ্রোহ করতে পারেননি, বরং প্রথাগুলিকে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টাই তাদের কাছে বড় হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া হিন্দু ঐতিহ্য ও জীবনধারার প্রভাবে এদের প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছিল হিন্দু ধর্ম ও সমাজজীবনের বিরুদ্ধেই এদেশের মুসলমানরা এদের থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। আসলে, 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর সীমাবদ্ধতা এই গোষ্ঠীর নিজস্ব সীমাবদ্ধতা নয়, তা উদ্ভূত হয়েছিল আমাদের সামগ্রিক রেনেসাঁসের সীমাবদ্ধতা থেকেই। ভারতের ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও বৈদেশিক শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে পাশ্চাত্য ভাবধারা শেষপর্যন্ত বিমূর্তই থেকে গেল। বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করতে পারল না। কেননা, পরাধীন ভারতে ছিল না খোলা প্রতিযোগিতা, চুক্তির প্রাধান্য, সকল নাগরিকের প্রতি আইন ও বিচারের সমভাবে প্রয়োগ। ছিল না সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা। সুতরাং পরিপ্রেক্ষিতের অভাবে পশ্চিম থেকে ধার করে আনা ধারণা এদেশে অধরাই রয়ে গেল। ডিরোজিওপন্থীরা এদেশের বুদ্ধিরাজ্যে রয়ে গেল শেকড়হীন উদ্বাস্তু হিসেবে।

৪৪.৫ সারাংশ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে জনজাগরণের সূচনা হল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে গতানুগতিকতার পরিবর্তে স্থান পায় অনুসন্ধানী মনোভাব ও যুক্তিবাদ। উন্মোচিত হয় সমাজব্যবস্থার ত্রুটি ও অবক্ষয়। ভারতীয় চিন্তাবিদরা এইসব বিচ্যুতির গভীর পর্যালোচনা করে তা নিশ্চিহ্ন করতে সচেষ্ট হলেন। ভারতীয় তথা বাঙালীদের একটি বিরাট অংশ পশ্চিমী ধ্যানধারণার সঙ্গে বিরোধিতা করে চিরাচরিত ধারণা, সংস্থার প্রতি আস্থাবান রইলেন। অপর একটি অংশ সামাজিক পুনরুজ্জীবনের জন্য পশ্চিমী আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। এই দুই মেরুর মধ্যবর্তী শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাচ্য পাশ্চাত্যের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে সমন্বয়ে প্রয়াসী হলেন। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান যুক্তিবাদ ভারতবাসীর উপর গভীর প্রভাব

বিস্তার করেছিল কিন্তু কিছুসংখ্যক ভারতীয় পাশ্চাত্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশের সভ্যতার ও সংস্কৃতির উগ্র সমালোচক হয়ে উঠেছিলেন। এসত্ত্বেও পাশ্চাত্যকরণের ফলে যে নবজাগরণের ঢেউ এলে তাতে উন্মেষ হল রাজনৈতিক চেতনার, বিকশিত হল জাতীয়তাবাদ। তাই একথা অনস্বীকার্য যে, পাশ্চাত্যকরণ ও পশ্চিমী শিক্ষা বাংলার জনগণকে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন করে গেল।

৪৪.৬ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১। 'ব্রাহ্মসমাজ' আন্দোলনের সামাজিক তাৎপর্য কী ছিল? এই আন্দোলনের প্রতি সনাতন হিন্দু সমাজের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

২। আধুনিকীকরণের পথিকৃৎ রূপে রামমোহন রায়ের ভূমিকার সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করুন।

৩। উনিশ শতকের বাংলার সমাজচিন্তায় ডিরোজিওপন্থীরা কী ধরনের প্রভাব ফেলেছিলেন?

৪। উনিশ শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে 'নবজাগরণ' আখ্যা দেওয়া কতটা সঙ্গত?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। 'নব্যবঙ্গ' আন্দোলনকে কি আমূল পরিবর্তনপন্থী আন্দোলন বলা যায়?

২। বাংলার 'নবজাগরণের' আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের স্বরূপ কী ছিল?

৩। বাংলার 'নবজাগরণ' কোন্ কোন্ দিক থেকে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের থেকে ভিন্ন প্রকৃতির?

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। 'ব্রাহ্ম সভা'র প্রতিষ্ঠাতা কে?

২। 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের সূচনা কে করেছিলেন?

৩। 'ধর্মসভা' কী?

৪। সতীদাহ প্রথা কবে আইনত নিষিদ্ধ হয়?

৫। 'পার্থেনন' পত্রিকা কারা চালু করেছিল?

৪৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। Jones, Kenneth : *Socio-Religious Reform Movements in British India*, 1989.

২। Desai, A. R. : *Social background of Indian Nationalism.*

৩। Ahmed, A. F. Salahuddin : *Social Ideas and Social Change in Bengal, 1818-1835,* 1965.

৪। সরকার, সুশোভন : *বাংলার রেনেশাঁস,* ১৩৯৭।

৫। ত্রিপাঠী, অমলেশ : *ইতালীর রেনেশাঁস, বাঙালীর সংস্কৃতি,* ১৯৯৪।

একক ৪৫ ❐ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম পর্যায়ের প্রতিরোধ : বিক্ষুব্ধ রাজন্যবর্গ ও সিপাহীদের ভূমিকা

গঠন :

৪৫.০ উদ্দেশ্য

৪৫.১ প্রস্তাবনা

৪৫.২ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম পর্যায়ের প্রতিরোধ

৪৫.২.১ বিক্ষুব্ধ রাজন্যবর্গ

৪৫.২.২ ফৌজি বিদ্রোহ

৪৫.৩ সারাংশ

৪৫.৪ অনুশীলনী

৪৫.৫ গ্রন্থপঞ্জী

৪৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি কোম্পানির শাসনের প্রথম দিকে রাজন্যবর্গ এবং সিপাহীদের মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ধূমায়িত বিক্ষোভ সম্পর্কে জানতে পারবেন। এই বিক্ষোভ ভারতের কোন্ কোন্ অঞ্চলে দেখা দিয়েছিল সে সম্পর্কেও আপনার ধারণা স্পষ্ট হবে। সামগ্রিকভাবে এই একক থেকে আপনি দেখবেন, ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিষ্ঠা ভারতের পক্ষে হিতকারী তো হয়ই নি, বরং ভারতের জনসাধারণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এই শাসনকে মেনে নিতেও পারেনি।

৪৫.১ প্রস্তাবনা

সামগ্রিকভাবে এর আগের তিনটি পর্যায়ে আপনি অষ্টাদশ শতকে মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় এবং ঔপনিবেশিক অভিঘাতের প্রথম পর্বের ইতিহাসের কথা পড়েছেন। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙনের প্রক্রিয়াই হল ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান উপজীব্য। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে রয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ; বিশেষ করে, তৃতীয় পর্যায়ে আপনি ঔপনিবেশিক শাসনের নানা দিক সম্পর্কে জেনেছেন। এই পর্যায়ে পাবেন সেই শাসনের বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিবাদের গৌরবগাথা।

আঞ্চলিক বিক্ষোভ, কৃষক বিদ্রোহ এবং উপজাতিদের মধ্যে অসন্তোষের যে আগুন জ্বলেছিল ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে সেটিকে আমরা দাবানলে রূপান্তরিত হতে দেখি।

৪৫.২ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম পর্যায়ের প্রতিরোধ

১৭০৭ সালে ঔরংজেবের মৃত্যুর পর বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঐক্য অটুট রাখা তার পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর মারাঠারা কিছুকালের জন্য ভারতবর্ষের অন্যতম রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে দেখা দেয়। কিন্তু মারাঠা সর্দারদের অন্তর্দ্বন্দ্বও প্রকট হয়। বিভিন্ন মারাঠা সর্দার নিজের নিজের ক্ষমতা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে কেন্দ্রীয় শক্তির অভাবে বিভিন্ন আঞ্চলিক রাজ্য বিকাশ লাভ করে। উদাহরণত, বাংলা, অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ ও মহীশূরের নাম করা যায়। অন্যদিকে, ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্রমশ নিজেদের শক্তি সংহত করে। ক্রমে কোম্পানি ভারতের অধীশ্বর হয়ে ওঠে।

৪৫.২.১ বিক্ষুব্ধ রাজন্যবর্গ

ভারতে কোম্পানির ক্ষমতা বিস্তার সাম্রাজ্যবাদী লেখকরা অতীতে যেরকম অনায়াসে ঘটেছিল বলে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে তা, ঠিক নয়। যেসব রাজ্য দখল করে কোম্পানির শক্তি প্রসারিত হয়েছিল, সেখানকার ক্ষমতাচ্যুত শাসকবর্গ ও সেনাবাহিনী বিদ্রোহের ধ্বজা বারবার তুলে ধরে। বাংলাদেশের উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করার পরেও ইংরেজরা দীর্ঘকাল নিষ্কণ্টক ক্ষমতা ভোগ করতে পারেনি। ১৭৫৯-'৬১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দ্বিতীয় শাহ আলম তিনবার পূর্বভারত আক্রমণ করেন। স্থানীয় বিক্ষুব্ধ ভূস্বামীরা তাঁকে সাহায্য করেন। মেদিনীপুর, মানভূম, বিষ্ণুপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলের জমিদারদের ১৭৯০ সালের আগে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি।

ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে চৈৎ সিংহের ঘটনা সুবিদিত। দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতবর্ষে কোম্পানির যুদ্ধের ব্যয় মেটাতে হেস্টিংস তার উপর বারবার অন্যায়ভাবে বাড়তি অর্থ আদায়ের জন্য জুলুম করেন এবং শেষপর্যন্ত তাকে গ্রেফতারে উদ্যত হন। রামনগরের একদল প্রজা এই চাপ রুখতে কোম্পানির ফৌজকে আক্রমণ করেন। হেস্টিংস চুনার দুর্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। সুযোগ বুঝে চৈৎ সিংহ হৃত রাজ্য উদ্ধারের জন্য আবার সক্রিয় হন। কিন্তু কোম্পানির সৈনদের কাছে শেষে হার মানেন। ১৭৯৯ সালে অযোধ্যার নবাব উজির আলি ফের কোম্পানির আদেশ অমান্য করেন। কিন্তু তার বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল।

ব্রিটিশ সেনাবাহিনী উড়িষ্যা অধিকারের চেষ্টা করলে ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে খুর্দার রাজার দেওয়ান জয়ী রাজগুরু ব্রিটিশদের বিরোধিতা করেন। শেষ অবধি অবশ্য ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর কাছে তাঁকে হার মানতে হয়। উড়িষ্যার মোট রাজস্বের এক-দশমাংশ ব্রিটিশদের দিয়ে রাজা মুকুন্দদেব তাঁর হারানো রাজ্য ইংরেজদের কাছ থেকে ফিরে পান।

দক্ষিণ ভারতের সামন্তপ্রভুরা পলিগার নামে পরিচিত। ১৭৯৯ সালে তাদের নেতৃত্বে বিশাল একটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। বর্তমান কালের একজন ঐতিহাসিক (K. K. Rajayan) একে "ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম" আখ্যা দিয়েছেন। আর্কটের নবাব ক্রমাগত তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করায় তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ১৭৮৩ সালে ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামে তাদের নেতৃত্ব দেয় পাঞ্জালাং কুরিচি নামক স্থানের নেতা কাট্টাবোম্মা নায়ক। ১৭৯৯ সালে তাঁর মৃত্যুর পর নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন শিবগঙ্গা রাজ্যের প্রধান অমাত্য মারাডু পাণ্ডিয়ান। তাঁর অন্যতম সহকারী ছিলেন ডিণ্ডিগুলের গোপাল নায়ক। ১৮০০ সালে বর্তমান কর্ণাটক রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত শিমোগা নামক স্থানে এক ভাগ্যান্বেষী ধুণ্ডিয়া ওয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে তিনি প্রাণ দেন। ১৮০১ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাঞ্জোর, মাদুরাই প্রভৃতি অঞ্চলের অধিকাংশই বিদ্রোহীদের দখলে ছিল। কোম্পানির সৈন্যরা কাবেরী নদী পার হতে পারেনি। তাঞ্জোর এবং পাদুকোট্টাইর রাজবংশ এই বিদ্রোহ দমনে ইংরেজদের সাহায্য করে। শিবগঙ্গা রাজ্যের সিংহাসনের অন্য এক দাবিদার উপস্থিত হয়। শেষপর্যন্ত ১৮০১ সালের ১লা অক্টোবর দক্ষিণভারতের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এই বিদ্রোহ দমন করা ইংরেজদের পক্ষে সম্ভব হয়। মারাডু পাণ্ডিয়ান এবং তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত কিছু অনুগামী ইংরেজদের হাতে প্রাণ দেন। নেতার দেহ যেখানে কবরস্থ হয় তার কাছে তাঁর অনুগামীরা একটি মন্দির নির্মাণ করে। বিদ্রোহ দমনে ইংরেজরা একজন বিশ্বাসঘাতকের সাহায্য নিয়েছিল।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের ওপর ইংরেজদের ক্রমবর্ধমান আর্থিক চাপ সহ্য করতে না পেরে ১৮০৮ সালের শেষদিকে সে রাজ্যের দেওয়ান ভেলু তাম্পি পদত্যাগ করেন। এরপর তিনি সেখানকার ইংরেজ দূতাবাস আক্রমণ করেন। প্রতিবেশী কোচিন রাজ্যের দেওয়ান তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে ১৮০৯ সালে ভেলু তাম্পি দুবার যুদ্ধ করেন। শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করে তাঁকে আত্মহত্যা করতে হয় (২০শে মার্চ, ১৮০৯)। শূলবিদ্ধ অবস্থায় তাঁর শবদেহ ত্রিবান্দ্রামের পথে পথে প্রদর্শিত হয়। স্বয়ং গভর্নর জেনারেল এই অমানবিকতাকে ধিক্কার না জানিয়ে পারেননি।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিশাখাপত্তনম দখল করার পর সেখানকার জমিদার ভিজিয়েরাম রাউজ হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। কাশীপুরম নামক ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল বিশাখাপত্তনমের প্রতিবেশী। সেখানকার শাসক ইংরেজদের কর্তৃত্ব রোধের চেষ্টা করেন। মাদ্রাজে তখন শাসনকর্তা ছিলেন স্যার চার্লস ওকলি। তিনি বিদ্রোহীদের অধিকাংশের প্রতি আপসমূলক মনোভাব গ্রহণ করেন। এর ফলে সংগ্রাম আর বিস্তারলাভ করেনি। বিদ্রোহীদের অনেকেই সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছিল। বিশাখাপত্তনমের নিহত প্রধান ভিজয়রামের পুত্র নারায়ণ রাউজ এর ব্যতিক্রম ছিলেন। ইংরেজরা তাঁকে তাঁর রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেও তাঁর রাজ্যের সীমানা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সঙ্কুচিত হয়। বিশাখাপত্তনমের থেকে ইংরেজরা চড়া হারে রাজস্ব আদায় করতে থাকে। এই বর্ধিত রাজস্বহার দেবার ক্ষমতা রাজ্যের ছিল না। ১৮২৭ সালে সেখানে আবার বিদ্রোহ হয়। এবারে নেতৃত্ব দেন বীরভদ্র রাউজ। তাঁর ভরণপোষণের জন্য যে অর্থ ইংরেজরা

বরাদ্দ করেছিল তার চেয়ে বেশি অর্থ তিনি দাবী করেন। বিদ্রোহ ছবছর স্থায়ী হয়েছিল। বিশাখাপত্তনমের অন্তর্গত পালকোণ্ডা নামক স্থানেও ১৮৩১-৩২ সালে বিদ্রোহ ঘটে গিয়েছিল।

কিট্টুর (বর্তমান কর্ণাটক রাজ্যের বেলগাঁও জেলায় অবস্থিত) ১৮২৪ সালে রানি চেন্নাম্মা-র নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। শিবলিঙ্গা সর্জা সেই স্থান শাসন করতেন। ১৮২৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তার বিমাতা চেন্নাম্মা দত্তক পুত্র গ্রহণ করে তার নামে রাজ্য শাসন করতে শুরু করেন। ধারওয়ার অঞ্চলের রাজস্ব সংগ্রাহক ম্যাকারে এই ব্যবস্থায় আপত্তি জানিয়ে বলেন দত্তক পুত্র হিসাবে যাকে নেওয়া হয়েছে সেই শিবলিঙ্গাগাপ্পা রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেননি। বোম্বাইয়ের ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে তিনি তাঁর অভিযোগ জানান এবং কিট্টুরের বিরুদ্ধে তিনি সামরিক বাহিনী প্রেরণ করেন। যুদ্ধে তাঁর প্রাণ যায়; তারপর দক্ষিণভারতের ইংরেজ কমিশনার চ্যাপলিন ১৮২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রচুর সৈন্য সমেত কিট্টুর আক্রমণ করেন। রানি চেন্নাম্মা তাদের হাতে বন্দি হন। কিট্টুর বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত হয়। বন্দি থাকাকালে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে রানি মারা যান। শিবলিঙ্গাপ্পার পক্ষ অবলম্বন করেন সাঙ্গোল্লি রায়ান্ন। কিট্টুর বাহিনীতে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। সুরাপুর (বর্তমান গুলবর্গা জেলাভুক্ত) অঞ্চলের শাসকের সহায়তা তিনি প্রার্থনা করেন। বিশ্বাসঘাতকরা তাঁকে ইংরেজদের হাতে ধরিয়ে দেয়। (১৮২৯) ভবিষ্যৎ গোলযোগের পথ বন্ধ করতে ইংরেজরা শিবলিঙ্গাপ্পাকে বন্দি করে। এর পরেও অবশ্য ১৮৩৩ এবং ১৮৩৬ সালে কিট্টুর অঞ্চলে বিদ্রোহ হয়েছিল, তবে দুবারই ইংরেজরা তা দমন করতে সক্ষম হয়।

১৮৩৪ সালে ইংরেজরা কুর্গ দখল করে। এই ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ১৮৩৫ সালে স্বামী অপরম্পরা নামে এক ধর্মগুরু (জঙ্গম) বিদ্রোহ করেন। ইংরেজদের হাতে তিনি ধরা পড়েন। কল্যাণস্বামী নামে অপর এক ব্যক্তি কুর্গের যুবরাজ হিসাবে নিজের পরিচয় দিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে যান। তাকেও ইংরেজরা গ্রেপ্তার করে। কিন্তু তার আদর্শকে সামনে রেখে আরও দু'বছর কুর্গ এবং সংলগ্ন কানাড়া উপকূলে বিদ্রোহের শিখা জ্বলতে থাকে। বিদ্রোহীরা একসময় এতটাই শক্তি সঞ্চয় করেছিল যে, দক্ষিণ কানাড়ার কালেক্টর কিছুকালের জন্য স্থানত্যাগে বাধ্য হন।

গুজরাটে ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় নবনগরের রাজা বাধাদানের চেষ্টা করেন (১৮১৫)। কচ্ছের রাজা রাও দ্বিতীয় ভারমল তাঁকে সমর্থন জানান। ১৮১৯ সালে তিনি পদচ্যুত হন। সাওন্তওয়াড়ির রাজা রামদূর্গাবাঈ তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ-বিরোধী কার্যকলাপের দায়ে অভিযুক্ত হন। ১৮৩৯ সালে তাঁর অনুগত অভিজাতবর্গ গোয়া থেকে ইংরেজদের ওপর প্রবল আক্রমণ চালায়। সে আক্রমণ ব্যর্থ হ'লে পাঁচ বছর পর সাওন্তওয়াড়ির যুবরাজ আন্না সাহেব এবং সে এলাকার অন্যতম সামন্তপ্রভু ফন্দ সাবন্ত আরও ব্যাপক প্রতিরোধ সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। সাওন্তওয়াড়ি ইংরেজদের অধিকারে আসে। ফন্দ সাবন্ত বংশের বিভিন্ন শাখার সম্ভাব্য উত্তরসূরীদের ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত গোয়ায় ইংরেজরা আটক রাখে। মহাবিদ্রোহের সময় সেখান থেকে পালিয়ে এসে ১৮৫৯ সালে তারা আবার বিদ্রোহ করে, কিন্তু এবারও তারা ব্যর্থ হয়।

উত্তরভারতের ভরতপুর দুর্গ দীর্ঘকাল দুর্ভেদ্য ছিল। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সময় ১৮০৫ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে ইংরেজরা চারবার চেষ্টা করেও দুর্গ দখল করতে পারেনি। প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের সূচনায় ব্রহ্মদেশে কোম্পানির সৈন্যবাহিনীর প্রাথমিক নাকাল হওয়ার খবর এদেশে পৌঁছলে ভরতপুরের জাঠ নেতা দুর্জন শাল বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আলোয়ার, জয়পুর, যোধপুর এবং কোরাউলি রাজ্যের সৈন্য তাঁকে সাহায্য করতে আসে। তৎসত্ত্বেও এবার কিন্তু ভরতপুর দুর্গ দখল ইংরেজদের পক্ষে সম্ভব হয়। হাটরাস দুর্গের সেনাধ্যক্ষ দয়ানায়ক ছিলেন আলিগড়ের অন্যতম শক্তিশালী তালুকদার। ইংরেজদের বিরুদ্ধে ১৮১৭ সালে তিনি অস্ত্রধারণ করেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর তিনি পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। উনিশ শতকের শুরুতে গোপাল সিংহ নামে জনৈক আঞ্চলিক সর্দার বুন্দেলখণ্ডে কোম্পানির হস্তক্ষেপে বাধা দেন। ইংরেজরা তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়।

৪৫.২.২ ফৌজি বিদ্রোহ

ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত ভারতীয় সিপাহীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৭৬৪ সালে মীরকাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে আমরা তাদের বিদ্রোহাত্মক মনোভাবের কথা প্রথম শুনি। সেনাপতি মেজর হেকটর মানরো বিক্ষোভের দাবি প্রধানত যেসব সিপাহীরা পেশ করেছিল তাদের কামানের মুখে উড়িয়ে দেন। অধিকাংশ সিপাই ছিল হিন্দু। মুসলমানরা তখনও কোম্পানির শাসন মেনে নিতে পারেনি। হিন্দু সিপাইদের মনে নানারকম সংস্কার কাজ করত। সমুদ্রযাত্রায় তাদের বিশেষ আপত্তি ছিল। কেবল জাহাজে শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য কিংবা নিজেদের পরিবার থেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে নয়, সমুদ্রযাত্রা করলে সমাজ তাদের একঘরে করত। নিয়োগের শর্তানুযায়ী সমুদ্রযাত্রার কোনওরকম বাধ্যবাধকতা সিপাইদের না থাকলেও কার্যকালে যথাযথ নির্দেশ পালন না করলে সৈন্যদের বরখাস্ত করা হত। শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে প্রধান অভিযুক্তদের সাধারণত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হত। সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে সিপাইদের সংস্কার ছিল এত বদ্ধমূল যে, ১৭৮২-'৮৪ সালের মধ্যে এতে সম্মত না হওয়ার কারণে পাঁচটি রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়া হয়। একই কারণে ১৭৯৫ সালে সিপাইদের অপর একটি কোম্পানি ভেঙে দেওয়া হয়।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কোম্পানির সিপাহীদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ ঘটে ভেলোর এবং ব্যারাকপুরে। ১৮০৬ সালের জানুয়ারী মাসে মাদ্রাজে কোম্পানির সিপাহীদের উষ্ণীষের ওপর চামড়া এবং সুতোয় বোনা কাপড় যুক্ত হয়। চামড়ার ব্যবহারে হিন্দু এবং মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহীরা ক্ষুব্ধ বোধ করে। হিন্দুদের কাছে গোরুর চামড়া নিষিদ্ধ বস্তু। অনুরূপভাবে মুসলমানদের কাছে শূকরের চামড়া অব্যবহার্য। উষ্ণীষের ওপর যুক্ত চামড়া কোন্ প্রকৃতির জানা না থাকায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহীদের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কোম্পানি তাদের ধর্মচ্যুত করার চেষ্টা করছে বলে গুজব রটে। উপরন্তু, হিন্দুদের তিলক চিহ্ন ধারণ নিষিদ্ধ হয়। মুসলমানদের মধ্যে গোঁফ রাখার চল ছিল। ক্ষেত্রবিশেষে তা কামিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই নির্দেশ সম্বলিত প্রথম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ভেলোরের সিপাহীরা তা মেনে নিতে অস্বীকার করে। তাদের শাস্তি দেওয়ার ফলে জুন মাসে শাস্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন করে ইন্ধন যোগায় আবার তাতে টিপু সুলতানের বংশধররা। ১৭৯৯ সালে শ্রীরঙ্গপত্তনের পতনের পর এদের ভেলোরে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। সিপাহীদের অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে তারা বিভিন্ন দিক থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি

দেয়। বিদ্রোহ পরিচালনার দায়িত্ব কেবল তারা গ্রহণ করেনি। তা সাফল্যমণ্ডিত হলে সিপাহীদের বেতন বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতিও দেয়।

ভেলোরে সিপাহীরা ১৮০৬ সালের ৯ জুলাই মাসের রাত্রি দুটোয় ইউরোপীয়দের আবাসনের ওপর গোলাবর্ষণ করে; টিপু সুলতানের নিশান তারা উড়িয়ে দেয়। নারী ও শিশুদের ওপর তারা কোনো অত্যাচার করেনি। টিপুর বংশধররা কার্যক্ষেত্রে ভীরু প্রমাণিত হয়। আর্কট থেকে ইংরেজ সামরিক সাহায্য যখন ভেলোরে এসে পৌঁছয় তখন দেখা যায় সেখানকার ভারতীয় সিপাহীরা মূল লক্ষ্য ভুলে ইংরেজদের সম্পত্তি লুণ্ঠনে ব্যস্ত। কোনওরূপ বাধা দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বিদ্রোহ দমনের পরে টিপুর পুত্রদের ভেলোর থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়।

কোনও দূর দেশে সামরিক অভিযানের সময় কোম্পানির সিপাহীরা স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ অবস্থার তুলনায় দ্বিগুণ হারে বাট্টা বা উপরি অর্থ লাভ করত। ১৮২৪ সালে ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে কোম্পানির প্রথম যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে ব্যারাকপুরের ৪৭ নম্বর নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি এই বর্ধিত বাট্টা না পাওয়ায় শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানে রাজি হয়নি। তারা আরও ক্ষুব্ধ হয়েছিল রসদ বহনকারী ষাঁড়গুলির অত্যধিক মূল্য ধার্য হওয়ায়। ১৮২৪ সালে ৩০শে অক্টোবরের কুচকাওয়াজে তারা তাদের অস্ত্র ছাড়াই অংশগ্রহণ করে। তাদের অস্ত্রগুলি আনতে বললে তারা নির্দেশ অমান্য করে। অন্যরা তাদের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করে। সেনাধ্যক্ষ স্যার এডোয়ার্ড পাজেট কলকাতা থেকে ছুটে আসেন।

নিয়মিত সৈন্যদের বিকল্প হিসাবে অন্যদের নিয়োগ করে লুকিয়ে রাখা হল। বিদ্রোহ চলতে থাকলে বদলীদের বলা হয় নিয়মিত সৈন্যদের ওপর গোলাবর্ষণ করতে। ৪৭ নম্বর রেজিমেন্টের সিপাহীরা যখন কুচকাওয়াজ করছে তখন তাদের প্যারেড চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। অন্যথা তাদের অস্ত্র নামিয়ে রাখার হুকুম ছিল। সিপাহীরা এর পরও বিদ্রোহ চালিয়ে গেলে পিছন থেকে তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়।

ব্যারাকপুরের সেনাবিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান করতে যে তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়েছিল, তারা তাদের সিদ্ধান্ত জানায় ১৮২৪ সালের ২৪শে নভেম্বর। সৈন্যদের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষোভের প্রতিবিধান না হওয়ায় তারা বিদ্রোহ করেছিল বলে কমিটি স্বীকার করে। বেঙ্গল আর্মি গঠিত হত প্রধানত অযোধ্যা, বিহার এবং বারানসীর লস্কর দিয়ে। বাংলাদেশের তথা সমগ্র পূর্ব-ভারতের আবহাওয়া তাদের পছন্দ হয়নি। ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত তাদের কোনওরূপ বেতন বৃদ্ধি ঘটেনি। মাসিক সাত টাকা ছিল তাদের উপার্জন। এই সামান্য অর্থ দিয়ে তাদের খাদ্য ও বাসস্থান, পরিবহণ এবং উর্দির ব্যয় মেটাতে হত। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে স্বীকার করা হয়েছিল, পৃথিবীতে আর কোথাও সৈন্যদের সাজসরঞ্জামের ব্যয় এত অল্প উপার্জনে মেটাতে হত না। শস্যমূল্য মণ পিছু সাড়ে তিন টাকার বেশি হলেও ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানির ডিরেক্টররা সিপাহীদের জন্য বাড়তি অর্থ বরাদ্দ করেনি। বিদ্রোহের সময় ৪৭ নম্বর রেজিমেন্টের অনেক সৈন্যরই রসদ বইবার জন্য পিঠের ঝোলা ছিল না। যদি বা ছিল, অনেকের ক্ষেত্রে তা আবার শতচ্ছিন্ন আকার ধারণ করে।

ব্যারাকপুরের ফৌজী অসন্তোষের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তদন্ত কমিটি আরও বলে, সেনাবাহিনীতে উন্নতির প্রক্রিয়া ছিল বড় দীর্ঘসূত্র। ইউরোপীয় ফৌজী অফিসাররা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি বেতন

পেত। উপরন্তু তাদের জীবনে উন্নতি করার আরও অনেক পথ খোলা ছিল। সিপাহীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ধাপে ধাপে খারাপ হচ্ছিল। যে-কোনও বিদ্রোহের সময়ে দেখা যেত। সৈন্যবাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসাররা অপেক্ষাকৃত নবাগত। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পুরনো অফিসাররা সৈন্যবাহিনীর কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র রুজি-রোজগারের সন্ধানে ব্যস্ত।

ব্যারাকপুরের এই ফৌজী বিদ্রোহের স্মৃতি সিপাহীরা দীর্ঘকাল অন্তরে বহন করেছিল। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় "ইংলিশম্যান" পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠিতে দেখা যায় যে, ব্যারাকপুরের সিপাহীরা ১৮২৪ সালের বিদ্রোহের সময়ে এক ব্রাহ্মণ নেতার ব্যবহৃত উপকরণ সযত্নে আগলে এসেছে। যে ঘটনার কথা তারা কখনও ভোলেনি। ব্যারাকপুরে বিদ্রোহের পরের বছর আসামের গ্রেনেডিয়ার কোম্পানি প্রতিকূল আবহাওয়ায় অভিযান করতে চায়নি। এই অপরাধে তাদের বরখাস্ত করা হয়; নেতারা চরম দণ্ডে দণ্ডিত হয়। ১৮৩৮ সালে সোলাপুরে ভারতীয় সৈন্যরা অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল। সেকেন্দ্রাবাদ, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থলের সৈন্যরা নিয়মিত বাট্টা না পাওয়ায় ১৮৪৮ সালে বিদ্রোহ করে।

১৮৩৮-৪২ সালে প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ চলার সময়ে হিন্দু ও মুসলিম সিপাহীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। হিন্দুদের ভয় ছিল দূরদেশে মুসলমানদের হাতের রান্না খেলে জাত যাবে। অন্যদিকে মুসলমানরা স্বধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যুদ্ধ করতে চায়নি। পর্যাপ্ত রসদের অভাবেও সৈন্যরা ক্ষুব্ধ বোধ করে। ভেড়ার চামড়ায় তৈরি জাকেট পরে লড়াই করতে হওয়ার ফলে হিন্দুদের মনে জাত যাওয়ার ভয় দেখা দিয়েছিল; মুসলমানদের মধ্যেও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়।

সিন্ধু প্রদেশে অবস্থিত ১৮৪৪ সালে প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের সময় চৌষট্টি নম্বর রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করে। সিন্ধু দেশ ইতিমধ্যে ইংরেজরা জয় করার ফলে সেখানকার সিপাহীরা বহির্দেশ আক্রমণের সময় বরাদ্দ বাড়তি ভাতার সুযোগ পায়নি। এর বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করে। এই অপরাধে তাদের নেতাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। রেজিমেন্ট অফিসার ফৌজীদের কাছে অবস্থার পরিবর্তন গুছিয়ে বলেননি বলে বরখাস্ত হন। মাদ্রাজের সিপাহীদের সিন্ধুদেশের বিরুদ্ধে অভিযান করতে বলা হলে তারাও একইভাবে প্রতিবাদে সামিল হয়েছিল। সেনাবাহিনীর আরও দুটি রেজিমেন্টকে এই কারণে ভেঙে দেওয়া হয়।

বেতন সংকোচনের কারণে ১৮৪৩ সালে ছয় নম্বর মাদ্রাজ ঘোড়সওয়ার বাহিনীতে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। তাদের জব্বলপুরে আনা হয়েছিল, সেখানে অল্পদিন কাটাতে হবে বলে। বাস্তবে কিন্তু সেখানে তাদের অপেক্ষাকৃত কম বেতনে স্থায়ী ছাউনি গড়তে বলা হয়। ১৮৪৯ সালে ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষ স্যার চার্লস নেপিয়ার হঠাৎ দেখেন পাঞ্জাবে চব্বিশটি রেজিমেন্ট বিদ্রোহের সুযোগ খুঁজছে। ১৮৫০ সালে ১লা ফেব্রুয়ারি গোবিন্দগড়ে সেনাবিদ্রোহ হয়। ঘটনার পর নোপিয়ার সেনাদের ভাতা বাড়াতে চান। কিন্তু বড়লাট লর্ড ডালহৌসী প্রয়োজনীয় অনুমতি দেননি। ক্ষুব্ধ নোপিয়ার পদত্যাগ করেন। এই ঘটনার সাত বছর পর ফৌজী অসন্তোষ ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের আকার ধারণ করে।

৪৫.৩ সারাংশ

ঔরংজেবের মৃত্যুর পর বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর মারাঠারা কিছুদিন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তবে তাদের মধ্যে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকট হয়। কেন্দ্রীয় শক্তির অভাবে বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তি আত্মপ্রকাশ করে; যথা বাংলা, অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর প্রভৃতি। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও শক্তি সঞ্চয় করে।

ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা প্রসারের বিরুদ্ধে ক্ষমতাচ্যুত রাজন্যবর্গ প্রায়শই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। বাংলার ১৭৯০ সালের আগে স্থানীয় ভূস্বামীদের ইংরেজরা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। উত্তরভারতে চৈৎসিংহের বিদ্রোহ সুবিদিত। উড়িষ্যার খুর্দার রাজা ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। দক্ষিণভারতের সামন্তপ্রভুরা (পালিগার) ১৭৯৯ সালে বিদ্রোহ করে। শেষপর্যন্ত ১৮০১ সালে ইংরেজরা এই বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হয়। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের উপর ইংরেজদের ক্রমবর্ধমান আর্থিক চাপ সহ্য করতে না পেরে ১৮১৮ সালে সেখানকার রাজা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ১৮০৯ সালে যে বিদ্রোহ দমন করা হয়। বিশাখাপত্তনমের জমিদার ও প্রতিবেশী কাশীপুরমের শাসক ইংরেজ আগ্রাসন প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। ইংরেজরা আপসমূলক ব্যবস্থা নেওয়ায় বিদ্রোহ প্রসারলাভ করতে পারেনি, তবে ১৮২৭ সালে সেখানে আবার বিদ্রোহ হয় এবং তা ছয় বছর স্থায়ী হয়েছিল। ১৮২৪, ১৮৩৩ এবং ১৮৩৬ সালে কিট্টুরের শাসনকর্তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ১৮৩৫ সালে কুর্গের রাজা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ইংরেজরা তা দমন করলেও আরও দুবছর কুর্গ এবং সংলগ্ন কানাড়া উপকূলে বিদ্রোহের শিখা জ্বলতে থাকে। ১৮১৫ সালে গুজরাটে ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় নবনগরের রাজা বাধাদানের চেষ্টা করেন। কচ্ছের রাজা তাঁকে সমর্থন জানান। ১৮৩৯ সালে সাওন্তওয়াড়ির রাজার অনুগত অভিজাতবর্গ গোয়া থেকে ইংরেজদের উপর প্রবল আক্রমণ চালায়। ১৮৪৯ সালে সেখানে আবার বিদ্রোহ হয়। উত্তরভারতে ভরতপুরের জাঠ নেতা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। জয়পুর, যোধপুর প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা তাঁকে সাহায্য করেন। আলিগড়ের তালুকদারও ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। উনিশ শতকের শুরুতে গোপাল সিংহ নামে বুন্দেলখণ্ডের আঞ্চলিক সর্দার কোম্পানির হস্তক্ষেপে বাধা দেন। ইংরেজরা তার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়।

ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত ভারতীয় সিপাহীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তা সত্ত্বেও ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহের ঘটনা কম ঘটেনি। ১৭৬৪ সালে মীরকাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় আমরা তাদের বিদ্রোহাত্মক মনোভাবের কথা প্রথম শুনি। সে সময় অধিকাংশ সিপাহী ছিল হিন্দু। মুসলমানরা কোম্পানির শাসন মেনে নিতে পারেনি। হিন্দু সিপাহীদের মধ্যে সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে প্রবল আপত্তি ছিল। এর বিরুদ্ধে সিপাহীদের সংস্কার এত বদ্ধমূল ছিল যে, ১৭৮২-৮৪ সালের মধ্যে এ কারণে পাঁচটি রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়া হয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কোম্পানির সিপাহীদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ ঘটে ভেলোর এবং ব্যারাকপুরে। ব্যারাকপুরের সেনাবিদ্রোহের কারণ ছিল দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে বঞ্চনার শিকার হওয়া; যথা, কম বেতন, নিষিদ্ধ প্রাণীর চামড়ার পোষাক ব্যবহারে বাধ্য হওয়া, কম খাদ্য, উন্নতির দীর্ঘসূত্রিতা প্রভৃতি। ১৮৩৮ সালে সোলাপুরে ভারতীয় সৈন্যরা অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল।

সেকেন্দ্রাবাদ, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানের সৈন্যরা নিয়মমতো বাট্টা না পাওয়ায় ১৮৪৮ সালে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৮৩৮-৪২ সালে প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ চলার সময়ে হিন্দু ও মুসলিম সিপাহীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সিন্ধুপ্রদেশে ১৮৪৪ সালে ৬৪নং রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করে। বেতন সংকোচনের কারণে ১৮৪৩ সালে ৬নং মাদ্রাজ ঘোড়সওয়ার বাহিনীতে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। ১৮৪৯ সালে পাঞ্জাবে ২৪টি রেজিমেন্ট বিদ্রোহের সুযোগ খোঁজে। ১৮৫০ সালে গোবিন্দগড়ে সেনাবিদ্রোহ হয়। এই ঘটনার সাতবছর পর ফৌজী অসন্তোষ মহাবিদ্রোহের আকার ধারণ করে।

৪৫.৪ অনুশীলনী

১। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে প্রতিরোধ আন্দোলন কী রূপ নেয়? বিশ্লেষণ করুন।

২। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যবাহিনীতে ভারতীয় সৈন্যরা কেন বিদ্রোহ করেছিল? দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করুন।

৩। **টীকা লিখুন :**

(ক) ১৭৯৯ থেকে ১৮০১ সালের পলিগার বিদ্রোহ।

(খ) রানি চেন্নাম্মা।

(গ) ভেলোরে সিপাহী বিদ্রোহ (১৮০৬)।

(ঘ) বিশাখাপত্তনমের ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রাম।

(ঙ) ব্যারাকপুরের ফৌজি বিদ্রোহ (১৮২৪)।

৪। **শূন্যস্থান পূরণ করুন :**

(ক) ১৮০৪ সালে ইংরাজদের বিরুদ্ধে উড়িষ্যায় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন ————।

(খ) ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান ———— ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন ———— সালে।

(গ) ১৮০৬ সালে দক্ষিণভারতের ———— সৈন্য বিদ্রোহ হয়।

৪৫.৫ গ্রন্থপঞ্জী

1. সুপ্রকাশ রায় : ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস।
2. S. B. Chaudhuri : Civil Disturbances during British Rule in India.
3. Nikhiles Guha : "Resistance to British Rule—The Early Phase" in N. R. Ray, ed. *Hundred Years of Freedom Struggle,* 1847-1947.

একক ৪৬ ❐ কৃষক বিদ্রোহ, গণ-অভ্যুত্থান ও উপজাতিদের মধ্যে অসন্তোষ

গঠন :

৪৬.০ উদ্দেশ্য

৪৬.১ প্রস্তাবনা

৪৬.২ কৃষক বিদ্রোহ

৪৬.৩ সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ

৪৬.৩.১ দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে বিদ্রোহ

৪৬.৩.২ নায়েক বিদ্রোহ

৪৬.৪ উপজাতি বিদ্রোহ

৪৬.৪.১ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ধলভূম

৪৬.৪.২ ময়মনসিংহ

৪৬.৪.৩ পশ্চিমভারত

৪৬.৪.৪ ছোটনাগপুর

৪৬.৪.৫ উত্তর-পূর্ব ভারত

৪৬.৫ ইসলামী পুনরুজ্জীবন আন্দোলন

৪৬.৫.১ কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহের গুরুত্ব

৪৬.৬ সারাংশ

৪৬.৭ অনুশীলনী

৪৬.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৪৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস।
- সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের ঘটনা।
- উপজাতিদের দ্বারা ইংরেজ শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।
- ইসলামী পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের কথা।

৪৬.১ প্রস্তাবনা

এই এককটিতে আগের এককের যুক্তিকে আরও প্রসারিত করে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপকতর অসন্তোষকে তুলে ধরা হয়েছে। ঔপনিবেশিক শোষণের প্রক্রিয়া থেকে ভারতীয় জনসাধারণের কোনও অংশই রেহাই পায়নি। কৃষক, উপজাতি ও অন্যান্য অনেকেই তাই এই শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। বর্তমান একক এই প্রতিরোধের ইতিহাসকে তুলে ধরেছে।

৪৬.২ কৃষক বিদ্রোহ

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক কৃষি-বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। এইসব বিদ্রোহের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে হলে কেবলমাত্র এদেশে কোম্পানির শাসনের গুণাগুণ বিশ্লেষণ করলেই চলবে না, মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ পর্যায়ের বহুসংখ্যক কৃষি-বিদ্রোহের ইতিহাস স্মরণ করতে হবে। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে কৃষি-সঙ্কট ও কৃষি-বিদ্রোহ ছিল বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। এই সমস্ত বিদ্রোহে স্থানীয় ভূস্বামীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বহু জায়গায় কৃষি-বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিল তারা। সাম্রাজ্যের ক্রমবর্ধমান আর্থিক চাপের বোঝা মেটাতে কৃষকদের কাছ থেকে কর নিংড়ে নেওয়া হত। ফলে, জমি ছেড়ে কৃষকরা হয় পালিয়ে যেত নয় পরিস্থিতির চাপে পড়ে মরিয়া হয়ে রুখে দাঁড়াত। প্রযুক্তিগত উন্নতির অভাবে মুঘল যুগে চাষকার্যে পূর্বের তুলনায় অগ্রগতি সাধিত হয়নি। ক্ষেতের উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়নি। উপরন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙনের পর্বে রাজনৈতিক নৈরাজ্যের প্রাদুর্ভাবে এদেশে কৃষিব্যবস্থা আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই পরিস্থিতিতে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে। রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের সমস্যা প্রথম থেকে কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পূর্বভারতে কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রথম যেসব বিদ্রোহ সংঘটিত হয় তার মূলে ছিল কোম্পানির প্রশাসনিক রদবদল। উদাহরণস্বরূপ সন্দীপ (১৭৬০), রংপুর (১৭৮০), বীরভূম (১৭৮৮-৯০) এবং খুর্দা (১৮১৭) অঞ্চলের বিদ্রোহগুলি উল্লেখ করা যায়। গোকুল ঘোষাল নামে এক নুন ব্যবসায়ীকে সন্দীপ দ্বীপ জরিপ করে খাজনার হার নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সুযোগ বুঝে এলাকার প্রাচীন ভূস্বামী পরিবারের কিছু অংশ দখল করে তিনি সেখানে নুনের একচেটিয়া কারবার চালু করার চেষ্টা করেন। বিদ্রোহের ফলে তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষমতা খর্ব হয়। ইদ্রাকপুর এবং রংপুরে সাময়িক খাজনা আদায়ের দায়িত্ব পেয়ে দেবী সিংহ সে স্থানে অনেক ছোট ও বড় জমিদারকে উৎখাত করে কৃষকদের খাজনার হার অত্যন্ত বাড়িয়ে দেন। বিদ্রোহের পর ক্ষমতাচ্যুত করে তাঁর কিছু অন্যায়ের প্রতিকার করা হয়। বীরভূমের বিদ্রোহ ছিল সেখানকার রাজস্ব সংগ্রাহক কিটিংয়ের খাজনা বৃদ্ধির (১৭৮৬-৮৭) বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরিণামে সমগ্র বাংলার কৃষিব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেও বীরভূম অঞ্চলে বহিরাগত কৃষি-শ্রমিকদের সহজ শর্তে আকৃষ্ট করে সেখানকার কৃষক এবং গ্রামপ্রধানরা ক্ষতির পরিমাণ অনেকটা কম করতে পেরেছিল। ১৭৮৬ সালে বীরভূমের কালেকটার কর্নেল কীটিঙের খাজনা বৃদ্ধির প্রতিবাদে সেখানকার

কৃষকরা রাষ্ট্রকে কোনওরূপ কর দিতে অস্বীকার করে। বীরভূম রাজের কর্মচ্যুত সেনারা ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তাদের সমর্থন জানায়। এই বিদ্রোহও সফল হয়নি।

খুর্দার রাজার দেওয়ান জগবন্ধুকে প্রতারিত করে কোম্পানি তার জমি বিক্রি করে। প্রতিবেশী অন্যান্য জমিদারের ভূসম্পত্তিও নিলামে তোলার ব্যবস্থা করে। ক্ষুব্ধ হয়ে তারা জগবন্ধুকে সমর্থন জানায়। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে উড়িষ্যার জনগণের আর্থিক দুর্দশার সীমা ছিল না। নুনের দাম হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় বিনিময় মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত কড়ির মূল্য হ্রাস পায়। উপরন্তু, শস্যবাণিজ্যে মন্দা দেখা দেওয়ায় উড়িষ্যার প্রজারা আর্থিকভাবে আরও বিপন্ন বোধ করে। কয়েক জায়গায় আবাসিক কৃষকদের জমির খাজনা সেইসঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে। উড়িষ্যার পাইক বিদ্রোহ দমন করতে সরকার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

৪৬.৩ সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ

আঠারো শতকের শেষদিকে বাংলা ও বিহারে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার গ্রামসমাজ শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ" উপন্যাসে পাঠক সে দৃশ্যের সঙ্গে পরিচিত হন। কৃষকদের দুর্দশা লাঘবের কোনওরূপ চিন্তা না করে কোম্পানির সরকার কড়ায়গণ্ডায় খাজনা আদায়ে বদ্ধপরিকর ছিল। এই অবস্থায় উত্তরবঙ্গে বিক্ষুব্ধ কৃষকদের নেতৃত্ব দেন ভবানী পাঠক ও মজনু শাহ। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন চেরাগ আলি ও দেবী চৌধুরানী। সন্ন্যাসী বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীদের মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। (১) শোষিত কৃষক সমাজ, (২) মুঘল সৈন্যবাহিনী ভেঙে দেওয়ার পর বেকার সৈনিক এবং (৩) সন্ন্যাসী ও ফকিরদের বিভিন্ন সম্প্রদায়, যারা বছরের অধিকাংশ সময় কৃষিকাজে নিযুক্ত ছিল। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতিবছর বর্ষাকাল শুরু হওয়া পর্যন্ত তারা উত্তর ও পূর্ববঙ্গের বিস্তৃত এলাকা ছারখার করে। ইংরেজ সূত্র থেকে জানা যায়, সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহীদের সংখ্যা একসময় প্রায় ৫০,০০০ দাঁড়ায়। তীর্থযাত্রীদের ওপর কর আরোপ এবং কোম্পানির অপশাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মনে যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল তা তারা কাজে লাগায়, বিদ্রোহীদের সঙ্গে সংঘর্ষে সরকারি বাহিনী বারবার পর্যুদস্ত হয়। ১৭৮৭ সালে ভবানী পাঠক যুদ্ধে প্রাণ দেন। এরপরে মজনু শাহের মৃত্যু হয়। ক্রমে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ দুর্বল হয়ে পড়ে।

৪৬.৩.১ দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে বিদ্রোহ

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে কৃষক বিদ্রোহের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণভারতে সমাজের প্রভাবশালী অংশকে পাশে পেতে তাদের মধ্যে ইনাম বিতরণ করেন স্যার টমাস মানরো। তিনি তখন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গভর্নর (১৮২০-২৭)। এই কারণে সেখানে মোটামুটি শান্তি বজায় ছিল। মালাবার উপকূলে জমির অধিকার নিয়ে প্রভাবশালী নায়ার এবং নাম্বুদ্রিগোষ্ঠীর সঙ্গে মোপলাদের বহুসংখ্যক সংঘর্ষের কথা আমরা পড়ি। ১৮০২ সালে উন্নি মুথ মুপ্পান নামে জনৈক মোপলা নেতা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁর এক ভাইকে কোম্পানি সরকার ১৭৯৯ সালে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল। বিদ্রোহের আর এক নেতা আতান

গুরুক্কালকে রাজস্ব তছরূপের অভিযোগে কোম্পানি সরকার কারাগারে নিক্ষিপ্ত করেছিল। সেখান থেকে পালিয়ে তিনি বিদ্রোহী পক্ষে যোগ দেন। মোপলারা ছিল দরিদ্র ধীবর কিংবা কৃষিকাজে নিযুক্ত সামান্য উপায়ের কৃষকমাত্র। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে মালাবার উপকূল যখন মহীশূর রাজ্যের শাসনাধীন ছিল, টিপু সুলতান জমিতে তাদের প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। ইংরেজ শাসন কায়েম হবার পর তারা সেই সুযোগ হারায়। মোপলা বিদ্রোহকে কিন্তু ঐতিহাসিকরা ইসলামিক মৌলবাদী শক্তির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখাতে চাইলেও প্রকৃতপক্ষে তার মূল নিহিত ছিল বাস্তবের আর্থ-সামাজিক কাঠামোয়।

৪৬.৩.২ নায়েক বিদ্রোহ

প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত কতকগুলি বিশেষ সম্প্রদায় সরকারের কাছ থেকে নিষ্কর জমি লাভ করত। ইংরেজ সরকার সেগুলির বিলুপ্তি ঘোষণা করায় স্থানে স্থানে বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল। উদাহরণত, ১৮০৬-১৬ সালের মধ্যে মেদিনীপুরের নায়েক বিদ্রোহের উল্লেখ করা যেতে পারে। নায়েক সম্প্রদায়ের নিষ্কর জমি কেড়ে নিয়ে কোম্পানির সরকার তাদের কাছে খাজনা দাবী করে। বিদ্রোহীদের সমূলে ধ্বংস করা হয়। মারাঠা রাজ্যে দুর্গ প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত গাডকারি সম্প্রদায় ১৮৪৪ সালে বিদ্রোহ করে সাতারায় ভূমিব্যবস্থা নতুন করে নির্ধারণ করা কালে কোম্পানি তাদের নিষ্কর জমির দখল নেয়। গাডকারি সম্প্রদায় এই ঘটনার প্রচণ্ড বিরোধিতা করে। ১৮৫২ সালে খান্দেশ অঞ্চলের কৃষকেরা বলপূর্বক জমি জরিপের কাজে বাধা দিয়েছিল। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার আগে মহারাষ্ট্রের পুলিশের নিম্নপদে নিযুক্ত পার্বত্য রামোশি সম্প্রদায়কে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ অবশ্য প্রচুর পরিমাণে জমি দান করে সন্তুষ্ট রেখেছিল।

৪৬.৪ উপজাতি বিদ্রোহ

কোম্পানির সরকারের বিরুদ্ধে উপজাতি বিদ্রোহ স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে। এর মূলে ছিল উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় একদিকে ব্রিটিশ রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং অন্যদিকে উন্নততর ও অধিক প্রভাবশালী বহিরাগত গোষ্ঠীর মানুষের হস্তক্ষেপ। উপজাতি সমাজ এ পর্যন্ত বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করছিল। তাদের জীবনযাত্রার নিজস্ব ধরন ছিল। ইংরেজ শাসন এদেশে প্রসারলাভ করার ফলে ক্রমশ উপজাতি সমাজের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয়। এর একটি প্রাথমিক নিদর্শন চট্টগ্রামের চাকমা বিদ্রোহের ক্ষেত্রে দেখা যায়। ১৭৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম অধিকারের পর সেখানকার তুলোর ওপর খাজনা আদায়ের দায়িত্ব দালালদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা অধিক অর্থ তারা আদায় করে। ১৭৭৬ এবং ১৭৮২ সালে চাকমা সম্প্রদায়ের বাধাদানের ফলস্বরূপ ১৭৮৯ সালে সরকার এই প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয় যে, তুলা উৎপাদনকারী এলাকা থেকে গ্রামপ্রধানরা নির্ধারিত অর্থ প্রদান করলে তুলো কর আর আরোপ করা হবে না।

৪৬.৪.১ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ধলভূম

মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও ধলভূম অঞ্চলকে সেকালে জঙ্গলমহল বলা হত। ১৭৬৮ সালে ধলভূমের রাজা জগন্নাথ সিং বর্ধিত হারে কোম্পানির খাজনা দিতে অস্বীকার করেন। স্থানীয় সমস্ত জমিদার ও প্রজাবৃন্দ

তাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহে একজোট হয়। প্রায় পাঁচ হাজার চুয়াড় বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে। মেদিনীপুরের স্থানীয় রাজাদের পাইকরা চুয়াড় নামে পরিচিত ছিল। কোম্পানির বাহিনীকে তারা প্রথমে পরাজিত করে। জগন্নাথ তাঁর জমিদারী পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। ১৭৭১, ১৭৮৩-৮৪ এবং ১৭৮৯-৯০ সালে চুয়াড়রা ফের বিদ্রোহী হয়। তবে, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাদের ১৭৯৮-৯৯ সালের বিদ্রোহ। মেদিনীপুরের কালেক্টরের লেখা ২৫শে মে, ১৭৯৮ সালের একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে, দীর্ঘদিন ধরে যারা জমি ভোগদখল করছিল, কোম্পানি সরকার তাদের ওপর বাড়তি করের বোঝা চাপিয়ে দেয় এবং অকারণে কোনওরূপ অপরাধ না করা সত্ত্বেও তাদের জমি কেড়ে নেয়। আবেদন-নিবেদনের পথে এই সমস্যার সুরাহা না হওয়ায় চুয়াড়রা শেষপর্যন্ত বিদ্রোহে সামিল হয়। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন দুর্জন সিং। কোম্পানি সরকার তাঁকে তাঁর জমি থেকে উৎখাত করেছিল। একদিকে দমন-পীড়ন এবং অন্যদিকে বিদ্রোহীদের মধ্যে প্রচুর অর্থ ছড়িয়ে সরকার এই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়।

৪৬.৪.২ ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ জেলার শেরপুর জমিদারী তখন বিভিন্ন অংশীদার নিয়ে গঠিত। এর একটি আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ছিল। একদিকে পরস্পরের বিরোধিতা করে শক্তি ক্ষয় করে, অন্যদিকে সরকারের খাজনার পরিমাণ তারা কম করে দেখায়। আবার সেই কৃষকদের কাছ থেকে তারা অবৈধ বহু অর্থ আদায় করত জমিদারীর খরচ বা আবওয়াব হিসেবে। প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ চলাকালে (১৮২৪-২৬) সরকার সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন মেটাতে সেখানকার জমিদারদের উপর নানাপ্রকার চাপ সৃষ্টি করে। সৈন্যবাহিনীর চলাচলের উদ্দেশ্যে দ্রুত সড়ক ও নৌকা নির্মাণের জন্য কারিগরের প্রয়োজন হয়। জমিদাররা সরকারের দাবি পূরণ করতে প্রজাদের ওপর বলপ্রয়োগ করে। কারবাড়ীর জমিদার মহেন্দ্র নারায়ণ ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে পার্বত্যবাসী গারো এবং হাজংদের শেরপুরের স্থানীয় বাজারে আসার পথ বন্ধ করে দেন। শেরপুরের উপত্যকা অঞ্চলের মুসলমান কৃষকদের সঙ্গে এইসব পার্বত্যবাসীরা জোট বাঁধে। নতুন একধরনের ধর্মবিশ্বাস এই সময়ে গারো ও হাজংদের মধ্যে প্রচারিত হয়। করিমশাহ নামে এক মুসলমান ফকির ও তাঁর পুত্র টিপু এবং তাঁর অনুগামীরা পাগলপন্থী নামে ধর্মীয় সংগঠনে অভিহিত হয়। ১৮২৫ সালের শুরুতে পাগলপন্থী আন্দোলনের সূত্রপাত। প্রচলিত রীতিনীতি থেকে তাদের জীবনযাত্রা এত ভিন্ন ছিল যে, তাদের 'পাগল' বল হত। গুরুর আশীর্বাদে পাগলপন্থীরা নিজেদের অলৌকিক শক্তির অধিকারী এবং অপরাজেয় জ্ঞান করত। সরকারের পতন আসন্ন ভেবে তারা বিদ্রোহী হয়। সরকার তাদের অচিরেই দমন করতে পারলেও ১৮৩৩ সালে বিদ্রোহের আগুন তাদের মধ্যে আবার প্রজ্জ্বলিত হয়। আগের মতো নেতারা এবার দৈবশক্তির ওপর নির্ভর ছিল না। সরকারি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, গারো পাহাড় সংলগ্ন আসামের কোনও কোনও অঞ্চল থেকে পাগলপন্থীরা বেশ কিছুটা সমর্থন লাভ করেছিল। সরকার-বিরোধী প্রায় তিন হাজার পাগলপন্থী সামিল হয়েছিল কিন্তু এবারও অল্পদিনের মধ্যেই সরকারি বাহিনীর কাছে তারা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

৪৬.৪.৩ পশ্চিম ভারত

১৮১৭-১৮ সালে তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের প্রাক্কালে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ অমাত্য ত্রিম্বকজী ডাঙ্‌লে আদিবাসী ভীলদের মনে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টি করেন। ১৮২৫

সালে রামোসী সম্প্রদায় কোম্পানির কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ ১৮২৯ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। প্রায় একই সময়ে ভীল বিদ্রোহ ঘটে। ভীলরা প্রধানত খান্দেশ অঞ্চলে বসবাস করত। ১৮১৮ সালে এই অঞ্চল ইংরেজরা অধিকার করার পর ভীলরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ১৮২৭ সালে কর্নেল আউটরাম ভীল বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হয়েছিলেন। বিক্ষিপ্তভাবে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত ভীলরা তবু লড়াই চালিয়েছিল।

পশ্চিমঘাট ও কচ্ছের সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারী কোল উপজাতি সম্প্রদায় মারাঠা শাসনকালে দুর্গ রক্ষার কাজে নিযুক্ত হত। কোম্পানি এই অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করার পর ১৮২৮ সালে রামোসীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তারা বিদ্রোহের পথ গ্রহণ করে। সরকার এই বিদ্রোহ সাময়িকভাবে দমন করতে সক্ষম হলেও এক দশক পরে কোলরা নতুন করে বিদ্রোহের পথ ধরে; ফের পরাস্ত হলেও ১৮৪০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত কোলরা সরকারের সঙ্গে অসম লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। শেষপর্যন্ত অবশ্য তাদের হার স্বীকার করতে হয়।

৪৬.৪.৪ ছোটনাগপুর

ছোটনাগপুর অঞ্চলের একালের ইতিহাস বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানকার কোল উপজাতিরা হো, মুন্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। ইংরেজ আমলে পার্শ্ববর্তী এলাকার রাজা ও জমিদাররা কোল সম্প্রদায়ের বাসভূমি বা কোলহাম অঞ্চলের ওপরে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন। ১৮২০ সালে পোড়াহাটের রাজা ইংরেজদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন। পোড়াহাট একটি করদ রাজ্য হিসেবে পরিগণিত হয়। সেখানকার রাজার ওপর যে বিপুল করভার আরোপিত হয় তা মেটাতে তিনি হো-কোলদের অঞ্চলের ওপর কর্তৃত্ব দাবি করেন। কোম্পানি তার এই ইচ্ছা পূরণ করে, রাজকর্মচারীরা জোর করে হো-কোলদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে গিয়ে বিদ্রোহের সম্মুখীন হয় (১৮২০)। রাজা ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। চাঁইবাসার কাছে কোলবাহিনী ইংরেজদের হাতে পরাজয় বরণ করে। বনের আড়াল থেকে কোলরা আরও কিছুকাল যুদ্ধ চালিয়ে যায়, কিন্তু শেষপর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ১৮৩১ সালে কোলরা আবার বিদ্রোহী হয়েছিল। ১৮৬৩ সালে ইংরেজ শাসকরা কোলহাম অঞ্চলের শাসনভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করে।

উনিশ শতকে সাঁওতাল বিদ্রোহ বারবার ঘটেছিল। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পর সাঁওতাল পরগনা জমিদারী এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয়। সাঁওতালদের কাছ থেকে বর্ধিত হারে জমির খাজনা আদায় করা হয়। পূর্বের বাসস্থান থেকে উৎখাত হয়ে তারা দমনে কোহ (বর্তমান রাজমহল পাহাড়তলি) এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এই অঞ্চল ছিল তখনকার ভাগলপুর, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত। সাঁওতালরা আশা করেছিল নতুনভাবে এখানে তাদের পক্ষে জীবন গড়ে তোলা সম্ভব হবে। কিন্তু জমিদার, মহাজন, সরকারি আমলা এবং ব্যাপারীদের শোষণের হাত এখানেও বিস্তৃত হয়। ১৮১১, ১৮২০, ১৮৩১ এবং ১৮৫৫-৫৬ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহের দামামা বেজে ওঠে।

এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব নামে চার ভাইয়ের নেতৃত্বে ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ। ঐ বছর ৩০শে জুন ভগ্নাডিহিতে এক বিশাল জনসমাবেশে ৪০০ সাঁওতাল গ্রাম থেকে দশ হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত হয়। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল স্থানীয় কামার, কুমোর, তেলী, গোয়ালা, বাগদি, হাড়ি, ডোম, চামার প্রভৃতি নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষরা। মুসলমান মোমিনরাও বিদ্রোহীদের সাহায্য করে। বিদ্রোহীদের রোষের প্রথম শিকার হন দীঘি থানার দারোগা অত্যাচারী মহেশ দত্ত। সাঁওতালদের কঠিন প্রতিরোধের সামনে শুরুতে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী পর্যুদস্ত হয়। পরে তারা নৃশংসভাবে এই বিদ্রোহ দমন করে। ভাগলপুরের কাছে সম্মুখ সমরে চাঁদ ও ভৈরব প্রাণ দেন। সিধু ও কানুকে একজন বিশ্বাসঘাতক ধরিয়ে দিলে তাদের চরম দণ্ড বিধান করা হয়। বিদ্রোহীরা পরে ঐ বিশ্বাসঘাতকের প্রাণনাশ করে। সাঁওতাল বিদ্রোহের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, সংবাদ আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে বিদ্রোহীরা শালগাছের ডাল পাঠানোর যে উপায় উদ্ভাবন করে তাতে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পূর্বে অনুরূপ লক্ষ্যে চাপাটি ব্যবহারের কথা মনে পড়ে। দ্বিতীয়ত, বিদ্রোহীরা বিশ্বাস করত ঈশ্বরের আশীর্বাদ তাদের ওপর রয়েছে। পৃথিবী পাপে আচ্ছন্ন এবং তা থেকে মুক্তিবিধানের জন্য সিধু-কানুর আবির্ভাব ঘটেছে এমন ধারণাও সাঁওতালদের মনে বদ্ধমূল ছিল। তৃতীয়ত, সাঁওতাল বিদ্রোহ শুরুতে জমিদার মহাজন-ব্যবসাদারদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হলেও পরে তার গতিমুখ সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। ১৮৫৫-৫৬ সালের পর সাঁওতালরা সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ পরিহার করলেও শতাব্দীর শেষপর্যন্ত সাঁওতালরাজ গড়ার স্বপ্ন সাঁওতালরা উনিশ শতকের শেষপর্যন্ত ত্যাগ করেনি। ১৮৬১-৬৫, ১৮৭১-৭২, ১৮৭৪-৭৫ এবং ১৮৮১-৮২ সালে এই উদ্দেশ্যে তাদের আন্দোলন পরিচালিত হয়।

৪৬.৪.৫ উত্তর-পূর্ব ভারত

উত্তর-পূর্ব ভারতে বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে কোম্পানির সংঘাত ঘটে। ব্রহ্মপুত্র এবং মুর্মা নদীর মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্মুক্ত করার প্রচেষ্টায় কোম্পানির পরিদর্শকরা ১৮২৯ সালে খাসি জনগোষ্ঠীর রোষের শিকার হয়। ইংরেজরা তাদের দমন করে। পরবর্তী দু দশকে সিংপো, নাগা প্রভৃতি আসামের উপজাতি গোষ্ঠীর ওপর কোম্পানির কর্তৃত্ব বিস্তৃত হয়।

৪৬.৫ ইসলামী পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন

পুনরুজ্জীবন আন্দোলনগুলির প্রতি এরপর আমাদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আরবদেশে মহম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব (১৭০৩-৯২) যে ধর্মসংস্কার আন্দোলন প্রবর্তন করেন ভারতবর্ষের বুকেও তা ছড়িয়ে পড়ে। ১৮২২-২৩ সালে রায়বেরিলির সৈয়দ আহমদ (১৭৮৬-১৮৩১) মক্কা ও মদিনা ভ্রমণকালে তাঁর সংস্পর্শে আসেন। ভারতে তিনি ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রবক্তা। ইসলাম ধর্মকে যাবতীয় বিচ্যুতি থেকে মুক্ত করে কোরানের মূল বাণীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য। ওয়াহাবিরা তরিকা-ই-মোহাম্মদীয়া নামে ধর্মসংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। সৈয়দ আহমদ প্রথমে শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। উপর্যুপরি কয়েকটি যুদ্ধে শিখদের পরাস্ত করে তিনি ১৮২৭ সালে "ইমাম" মর্যাদায় ভূষিত হন। তাঁর নামে খুৎবা পাঠ করা হয়। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে

বালাকোটের যুদ্ধে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য বিলায়েত আলি ও ইমায়েৎ আলি যথাক্রমে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৪৭ সালে ইংরেজরা পাঞ্জাব অধিকার করার পর ওয়াহাবিরা এই স্থান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কিছু কিছু ওয়াহাবি নেতা যুক্ত ছিলেন। ১৮৭১ সাল পর্যন্ত ওয়াহাবিদের ইংরেজবিরোধিতার ছেদ পড়েনি। কোম্পানির সৈন্যবাহিনীতে তারা এই প্রথম সচেতনভাবে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষের বীজ বপন করে।

ওয়াহাবি আন্দোলনের একটি ধারা বাংলায় তিতুমীরের বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। ২৪ পরগনা জেলার চাঁদপুর গ্রামে তিতুমীর জন্মেছিলেন ১৭৮২ সালে। হজ করতে গিয়ে ১৮২২ সালে তিনি মক্কায় সৈয়দ আহমদের সঙ্গে পরিচিত হন ও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হন। গ্রামে ফিরে এসে তিনি যে সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন তা' ক্রমশ হিন্দু জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। পুড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হন। অন্যান্য জমিদাররা তাঁকে সমর্থন জানান। নারকেলবেড়িয়া গ্রামে তিতুমীর তাঁর ঘাঁটি গড়ে তোলেন। এখানে একটি বাঁশের কেল্লা নির্মিত হয়েছিল। তিতুমীরের সেনাপতি ছিলেন শেখ গোলাম মামুম। ১৮১৩ সালে উনিশে নভেম্বর তিতুমীর ও তাঁর কয়েকজন অনুগামী যুদ্ধে মারা যান। অন্য কয়েকজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ইংরেজ সরকারের সশস্ত্র হস্তক্ষেপে তিতুমীরের বিদ্রোহ ধ্বংস হয়।

উনিশ শতকের বাংলাদেশে ফরাজী আন্দোলন দীর্ঘদিন চলেছিল। "ফরায়েজ" একটি আরবী শব্দ (বহুবচনে "ফরজ")। ফরায়েজী শব্দের অর্থ হল ইসলাম নির্দিষ্ট "বাধ্যতামূলক কর্তব্য"। এই আন্দোলনের প্রথম পথনির্দেশক হাজি শরিয়তুল্লা (১৭৮১-১৮৪০)। ফরিদপুর অঞ্চলে তাঁর প্রভাব বিস্তারলাভ করে। হাজি শরিয়তউল্লা (১৭৮১-১৮৪০) ফরিদপুরের বিস্তৃত অঞ্চলের জনসাধারণকে এই আন্দোলনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। এই কারণে এটিকে সংস্কার আন্দোলন বলা হয়।

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী হিন্দু জমিদাররা প্রজাসাধারণের কাছ থেকে বিভিন্ন পূজা-পার্বণের জন্য চাঁদা আদায় করতেন। কিন্তু হাজি শরিয়তউল্লা হিন্দু জমিদারদের পূজা-পার্বণে চাঁদা দেওয়া নিষিদ্ধ করেন। এই কারণেই তাঁর আন্দোলন জমিদার-বিরোধী চরিত্র গ্রহণ করে।

হাজি শরিয়তউল্লার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মোহসেনউদ্দীন দুদু মিয়াঁ (১৮৪৯-৬২) এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এই আন্দোলনের তিনটি ধারা লক্ষ্যণীয় : (১) জমিদার-নীলকরদের অন্যায় জুলুম প্রতিরোধ করা, (২) হিন্দু সমাজের অনুকরণে মুসলিমদের ভেতর সামাজিক বৈষম্য দূর করা, (৩) যেহেতু সমগ্র পৃথিবীর মালিক আল্লাহ, সেহেতু জমির ওপর চাষীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এই দাবিগুলো আদায় করতে গিয়ে ফরায়েজীদের বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়তে হয়েছিল। দুদু মিয়াঁ একটি সুশৃঙ্খল সংগঠনিক কাঠামো নির্মাণ করেন—"যা ফরায়েজী খেলাফৎ" নামে পরিচিত। সমগ্র পূর্ববঙ্গকে তিনি কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করে প্রতিটি অঞ্চলের দায়িত্ব একজন প্রতিনিধি বা খলিফার হাতে ন্যস্ত করেন। সরকারি আদালত বর্জন করে ফরায়েজীরা নিজেদের বিরোধ পঞ্চায়েত মাধ্যমে মিটিয়ে নিতেন। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ফরায়েজী আন্দোলন আরও ব্যাপকতা লাভ করে। দুদু মিয়াঁ সব মানুষকে সমান জ্ঞান করতেন। তাঁর নেতৃত্বে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় জমিদার ও ইউরোপীয় নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষকরা জোট বাঁধে।

১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে মিত্রতার সমর্থকদের সংখ্যা ছিল ৮০,০০০ জন। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ দুদু মিয়াঁর নির্দেশে ফরাজীরা পাঁচ বার ডানলপের নীলকুঠি আক্রমণ করে, জিনিসপত্র লুঠ করে ও নীলকুঠি পুড়িয়ে দেয়। ডানলপের গোমস্তা কালীপ্রসাদকে হত্যা করে। দুদু মিয়াঁ ও তার ৬৩ জন অনুগামীদের বন্দি করে বিচার করা হয়। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে তাদের শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু কলকাতার উচ্চ আদালতে আপীল করে অভিযুক্তরা মুক্তিলাভ করে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় দুদু মিয়াঁ কারারুদ্ধ ছিলেন। তাঁর পুত্র নোয়া মিয়াঁ ১৮৮০-এর দশকের শুরু পর্যন্ত ফরায়েজী বিপ্লব পরিচালনা করেন।

৪৬.৫.১ কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহের গুরুত্ব

কোম্পানির ভারত শাসনের একশো বছরের ইতিহাসে পূর্বোক্ত কৃষক এবং উপজাতি বিদ্রোহ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই বিদ্রোহগুলি বিভিন্ন আঞ্চলিক কারণে উদ্ভূত হলেও দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিতে এগুলি সামগ্রিকভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে, এইসব বিদ্রোহগুলি ছিল "প্রাথমিক প্রতিরোধ" (Primary resistance) ; কারণ এগুলির চরিত্র ছিল অতীতাশ্রয়ী। এতদ্‌সত্ত্বেও প্রথম পর্যায়ের এই বিদ্রোহগুলি নানা কারণে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এদেশের অধিকাংশ লোক তখন কৃষিকাজে নিযুক্ত ছিল। কোম্পানির শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেতে শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে মরিয়া হয়ে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তারা অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিল—হিংসাত্মক আগ্রাসনের উদ্দেশ্যে নয়, দুঃসহ অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। বিদ্রোহ কেবল অর্থনৈতিক কারণে হয়নি। তার স্বরূপ বুঝতে গেলে আন্দোলনকারীদের মানসিকতার হদিস পাওয়া অবশ্য প্রয়োজন। সমাজে নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর পৃথক কোনও মানসিকতা আছে কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক চলে। কিন্তু একথাও সত্য এই যে, কৃষক-উপজাতি বিদ্রোহের মাধ্যমে কল্পান্তর ঘটানোর চেষ্টা আমরা লক্ষ্য করি—যেমন, সাঁওতাল বা পাগলপন্থী আন্দোলনে ওয়াহাবি-ফরায়েজী আন্দোলনে ধর্মের ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহের সাফল্যলাভের কোনোই সম্ভাবনা ছিল না। প্রাথমিক স্তরের হাতিয়ার নিয়ে তারা মারাত্মক আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ব্রিটিশ বাহিনীর মোকাবিলা করে। বিদ্রোহীদের সীমিত রাজনৈতিক ধ্যানধারণা ছিল তাদের সাফল্যের অন্যতম অন্তরায়। জমিদার ও নীলকরদের প্রত্যক্ষ শোষণের শিকার হয়ে তারা তাদের প্রধান শত্রুরূপে চিহ্নিত করে। এদের পিছনে যে বিরাট ইংরেজ শক্তি সে সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তবে, ব্যর্থ হলেও ইংরেজ-বিরোধিতার যে ধারা উপজাতি ও কৃষক বিদ্রোহ রেখে যায় তা পরবর্তীকালের বিপ্লবী ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করেছিল, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রথম একশো বছরের কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহের ঐতিহাসিক গুরুত্ব তাই অনস্বীকার্য।

৪৬.৬ সারাংশ

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ক্রমাগত কৃষি-বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ পর্যায়ে কৃষিসঙ্কট ও কৃষি-বিদ্রোহ ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের

অন্যতম কারণ। উপরন্তু, মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙনের পর্বে রাজনৈতিক নৈরাজ্যের প্রাদুর্ভাবে এদেশে কৃষিব্যবস্থা আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শাসনভার গ্রহণ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের সমস্যার দিকে নজর দেয়। পূর্বভারতে কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রথম যেসব বিদ্রোহ সংগঠিত হয় তার মূলে ছিল প্রশাসনিক রদবদল। উদাহরণস্বরূপ, সন্দীপ, রংপুর, বীরভূম এবং খুর্দার বিদ্রোহের উল্লেখ করা যায়। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে উত্তর এবং পূর্ব বাংলায় ও বিহারে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর "আনন্দমঠ" গ্রন্থে তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। কোম্পানির অপশাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মনে যে ক্ষোভ ছিল বিদ্রোহীরা তা কাজে লাগায়।

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে কৃষক বিদ্রোহের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৮০২ সালে মালাবার উপকূলে মোপলা বিদ্রোহ ঘটে। মোপলারা ছিল দরিদ্র ধীবর কিংবা কৃষিকাজে নিযুক্ত কৃষক। মোপলা বিদ্রোহ মূলত ছিল আর্থসামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের বহিঃপ্রকাশ। ১৮০৬-১৬ সালের মধ্যে মেদিনীপুরে নায়েক বিদ্রোহ হয়। মারাঠা রাজ্যে গাডকারি সম্প্রদায় ১৮৪৪ সালে বিদ্রোহ করে। ১৮৪২ সালে খান্দেশ অঞ্চলের কৃষকরা বলপূর্বক জমি জরিপের কাজে বাধা দিয়েছিল।

উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় একদিকে ব্রিটিশ রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং অন্যদিকে উন্নততর ও অধিক প্রভাবশালী বহিরাগত গোষ্ঠীর মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে উপজাতি সমাজে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। ১৭৭৬ এবং ১৭৮২ সালে চাকমা সম্প্রদায় তুলোর উপর কর আরোপে বাধা দেয়। ১৭৬৮, ১৭৭১, ১৭৮৩-৮৪ এবং ১৭৮৯-৯০ সালে চুয়াড় বিদ্রোহ হয়। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, ১৭৯৮-৯৯ সালের বিদ্রোহ। ময়মনসিংহ ১৮২৫ সালে পাগলপন্থী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। পশ্চিমভারতে ১৮২৫ সালে রামোসী সম্প্রদায় কোম্পানির কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ ১৮২৯ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। একই সময়ে ভীল বিদ্রোহ ঘটে। পশ্চিমঘাট ও কচ্ছের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী কোল উপজাতি ১৮২৮ সালে রামোসীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বিদ্রোহের পথ গ্রহণ করে।

ছোটনাগপুর অঞ্চলের কোলরা ইংরেজ ও স্থানীয় রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১৮২০ এবং ১৮৩১ সালে বিদ্রোহ করে। উনিশ শতকে বারবার সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘটেছিল। জমিদার, মহাজন, সরকারি আমলা এবং ব্যাপারীদের শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেতে ১৮১১, ১৮২০, ১৮৩১ এবং ১৮৪৫-৫৬ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহের দামামা বেজে ওঠে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ১৮৫৫-৫৬ সালের বিদ্রোহ। এরপরও ১৮৬১-৬৫, ১৮৭১-৭২, ১৮৭৪-৭৫ এবং ১৮৮১-৮২ সালেও আন্দোলন অব্যাহত ছিল। উত্তর-পূর্ব ভারতেও বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে কোম্পানির সংঘাত ঘটে।

আরবদেশে মুহম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রবক্তা। ভারতে রায়বেরিলির সৈয়দ আহমদ ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রবক্তা। ইসলাম ধর্মকে যাবতীয় বিচ্যুতি থেকে মুক্ত করে কোরানের মূল বাণীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছিল এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কিছু ওয়াহাবি নেতা যুক্ত ছিলেন। ১৮১৭ সাল পর্যন্ত ওয়াহাবিদের ইংরেজ-বিরোধিতায় ছেদ পড়েনি। ওয়াহাবি আন্দোলনের একটি ধারা বাংলায় তিতুমীরের বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। উনিশ শতকের বাংলায় ফরাজী আন্দোলনের

পথনির্দেশক হাজি শরিয়তুল্লা। এই আন্দোলনের চরিত্র ছিল জমিদার-বিরোধী। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই আন্দোলন আরও ব্যাপকতা লাভ করে।

কোম্পানির ভারত শাসনের একশো বছরের ইতিহাসে কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই বিদ্রোহগুলি বিভিন্ন আঞ্চলিক কারণে উদ্ভূত হলেও দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিতে এগুলি সামগ্রিকভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

৪৬.৭ অনুশীলনী

১। ১৭৫৭-১৮৫৭ পর্যায়ে ভারতে কৃষক বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করুন।

২। কোম্পানির আমলে ভারতবর্ষে উপজাতি বিদ্রোহ বিষয়ে নিবন্ধ রচনা করুন।

৩। ভারতে উনিশ শতকে মৌলবাদী আন্দোলনের লক্ষ্য বর্ণনা করুন। আপনি কি এরূপ কিছু আন্দোলনের বর্ণনা দিতে পারেন?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ বলতে কী বোঝেন?

২। টীকা লিখুন : (ক) চুয়াড় বিদ্রোহ, (খ) সাঁওতাল বিদ্রোহ, (গ) পাগলপন্থী আন্দোলন, (ঘ) তিতুমীর, (ঙ) শরিয়তুল্লা ও দুদু মিয়াঁ।

৪৬.৮ গ্রন্থপঞ্জী

1. সুপ্রকাশ রায় : ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস।
2. বিনয়ভূষণ চৌধুরী : "ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক আন্দোলন (১৮২৪-১৯০০)", গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ইতিহাস অনুসন্ধান।

একক ৪৭ ❐ আঞ্চলিক নেতৃত্বের নগরকেন্দ্রিক রাজনীতি : বাংলা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ

গঠন :

৪৭.০ উদ্দেশ্য

৪৭.১ প্রস্তাবনা

৪৭.২ ল্যান্ডহেল্ডার্স সোসাইটি

৪৭.৩ ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটির তাৎপর্য

৪৭.৩.১ ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন

৪৭.৩.২ বম্বে এ্যাসোসিয়েশন

৪৭.৩.৩ মাদ্রাজ নেটিভ এ্যাসোসিয়েশন

৪৭.৩.৪ তিনটি এ্যাসোসিয়েশনের সাদৃশ্য ও পার্থক্য

৪৭.৪ ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটির প্রভাব

৪৭.৫ মূল্যায়ন

৪৭.৬ অনুশীলনী

৪৭.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৪৭.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ও কাজকর্ম।
- কলকাতা, বম্বে ও মাদ্রাজে সমাজ ও রাজনীতিতে তাদের ভূমিকা এবং
- এই এ্যাসোসিয়েশনগুলির মূল্যায়নও করতে পারবেন।

৪৭.১ প্রস্তাবনা

ইংরেজ শাসনব্যবস্থা ভারতীয় জনজীবনে যে গভীর পরিবর্তন এনেছিল একথা স্বীকার করতেই হয়। আঠারো শতক থেকেই প্রশাসন, বিচার, কৃষি, বাণিজ্য, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অসংখ্য পরিবর্তনের প্রভাব পড়তে থাকে এদেশের মানুষের ওপর। এর ফলে, কিছুকালের মধ্যেই ভারতীয় সমাজে জন্মায় একাধিক নতুন গোষ্ঠী, যাদের চিন্তাধারা কার্যকলাপ স্বতন্ত্র ধরনের। প্রাচীন সমাজের প্রচলিত সম্পর্কগুলোর ভাঙন আরম্ভ হয়; স্বভাবতই

আত্মোপলব্ধি ও আত্মোন্নতির তাগিদে এবং নতুন জীবনযাত্রার বুনিয়াদ শক্ত করার জন্য গড়ে তোলা প্রয়োজন হয় নতুন ধরনের সংগঠনের। এগুলি ঐতিহাসিকদের কাছে associations নামে পরিচিত। উনিশ শতকের গোড়াতেই একাধিক ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন জন্মায়। একই সাথে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার মোকাবিলা করার জন্য ও বিদেশী শাসকের কাছে অধিকার আদায়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় কয়েকটি রাজনৈতিক সংগঠন। এইভাবে আধুনিক ভারতীয়দের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূচনা হল। সন্দেহ নেই, এতে সামিল হয়েছিল সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক মানুষ—বস্তুত, অভিজাতরাই এই সংগঠনগুলির প্রতিষ্ঠাতা। তবে ঐ সময়কার পরিস্থিতিতে কেবল শিক্ষিত, সচ্ছল ও রাজনৈতিক সচেতনতাপ্রাপ্ত মানুষই যে এই অগ্রণী ভূমিকা নেবে এটাই স্বাভাবিক। নতুন প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা সম্পর্কে অসন্তোষ ও পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা এদের সঙ্ঘবদ্ধ করে। আবার এরাই প্রথম প্রয়াসী হয় আঞ্চলিকতা বর্জন করে প্রাদেশিক স্তরে ও পরে উপমহাদেশের অন্যান্য স্থানের সমধর্মী মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার ও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার। অর্থাৎ, উনিশ শতকের প্রথম দিকেই সূচনা হয় সেই প্রক্রিয়ার, যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে ১৮৮৫তে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার মধ্যে। এই কারণে, এই সময়কার রাজনৈতিক সংগঠনগুলির গুরুত্ব স্বীকার করেছেন ঐতিহাসিকেরা। অধ্যাপক অনিল শীলের ভাষায় : "Associations brought nineteenth century India across the threshold of modern politics.....In India the earliest associations were limited by language and interest, and they drew support from students, or professional men, or landlords, or merchants in a limited geographical area. But the unities imposed by British rule allowed more ambitious organisations to extend beyond that. These were the provincial associations which began to search for ways and means of working together in India as a whole, a trend which culminated in the Indian National Congress."

৪৭.২ ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটি

ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটির (Landholders' Society) পূর্ব পরিচয় জমিনদার্স এ্যাসোসিয়েশন (Zamindars' Association)। ঐতিহাসিকরা একে ভারতের প্রথম আধুনিক রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত করেন। সংগঠনের নামই বুঝিয়ে দেয় কারা, কাদের স্বার্থে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। বস্তুত, বাংলা সরকারের নিষ্কর জমি অধিগ্রহণের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ ও লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রদের গুজব—এই দুই ছিল এই সংস্থার জন্মের তাৎক্ষণিক কারণ। বাংলার জমিদারেরা সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা ও এই অন্যায্য হস্তক্ষেপের মোকাবিলা করার জন্য সংঘবদ্ধ হওয়ার আশু প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলে ১৯শে মার্চ ১৮৩৭-এ ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন ও ভবানীচরণ মিত্রের মতো বড় জমিদারেরা। অধ্যাপক সুন্দরলিঙ্গামের ভাষায় : "Stirred into action by the local government's decision to resume rent free lands, which was further aggravated by rumours about the abolition of the Permanant Settlement of 1793, these

zamindars recognised the importance of banding together.....in the hope their gain in the countryside could be protected from what they believed to be arbitary government action."

প্রথম থেকেই এই সংস্থাকে শুধু বাংলার নয়, ভারতের সকল জমিদারের জন্য উন্মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জমিদারদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন, আলোচনা-আপোষের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যেকার বিবাদ মেটানো, দূরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী জমিদারদের আইনী সাহায্য যোগানো, জমিদারদের পক্ষে ক্ষতিকর যাবতীয় নিয়মের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক পদ্ধতি অনুসারে সরকারের কাছে প্রতিবাদ করা ইত্যাদি ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটির ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল বলে অধ্যাপক মেহরোত্রা দেখিয়েছেন। প্রতিষ্ঠার পর অন্তত দু'বছর এই সংগঠনের যথেষ্ট তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। তিন নম্বর ক্লাইভঘাট স্ট্রীটে স্থাপিত হয় কার্যালয়। মফস্বলের সাথে যোগাযোগ রাখার নিয়মিত চেষ্টা চলে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছাপা হয় সংগঠনের যাবতীয় কার্যাবলীর বিবরণ। জনৈক জন ক্রফার্ডকে (John Crawford) লন্ডনে এজেন্ট নিযুক্ত করা হয়। ১৮৩৯-এ লন্ডনে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (British India Society) প্রতিষ্ঠা হলে তার সাথে যোগাযোগ করা হয় এবং পরে ঐ সংস্থার কর্ণধার জর্জ টমাসনকে (George Thompson) এজেন্ট নিযুক্ত করা হয়।

উল্লেখযোগ্য হল এই যে, মূলত জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটি সমাজের অন্যান্যদের অভাব-অভিযোগের প্রতিও দৃষ্টি দেয়। অধ্যাপক মেহরোত্রার মতে : "The Landholders' Society was essentially and by its creeds an organisation of zamindars. Most of the representations which it made to the government.....were on questions affecting the interests of the zamindars. But the Society did not function as a narrowly selfish interest group. Not only did it not claim any exclusive privilege for its constituents, it took up several questions which concerned the welfare of the public at large....." অর্থাৎ, জমিদারেরা নিজেদের জন্য বাড়তি সুবিধা শুধু যে চায়নি তা নয়, তারা এমন অনেক দাবি জানায়, যা গ্রাহ্য হলে সমাজের অন্যান্যদেরই লাভ হত। বিচারালয়ে বাংলা ভাষার ব্যবহারের সপক্ষে, স্ট্যাম্পকর কমানোর দাবীতে, ফৌজদারী মামলার সাক্ষীদের আর্থিক অনুদানের দাবিতে ও মরিশাসে কুলি রপ্তানি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই সংস্থা বিভিন্ন সময় সোচ্চার হয়েছিল বলে তিনি দেখিয়েছেন। অধ্যাপক মেহরোত্রার মতে, সমাজের আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত, উদার মনোভাবাপন্ন শিরোমণিদের এই আচরণ অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাছাড়া, তাদের বিরুদ্ধে সংকীর্ণতার যে অভিযোগ একসময় ওঠে সম্ভবত তা ভুল প্রমাণ করারও একটা তাগিদ জমিদারদের ছিল।

তবে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রতিষ্ঠার দু'তিন বছর পর থেকেই ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটির উৎসাহ ও উদ্যমে ভাঁটা পড়ে এবং ১৮৪৪ সাল অবধি এই সংস্থা কোনওমতে অস্তিত্ব বজায় রাখে মাত্র। আসলে সরকার দ্বারা নিষ্কর জমি অধিগ্রহণ বহুদূর বন্ধ হলে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রদ হবে না বলে

সরকার আশ্বাস দিলে, এইসময় আরেকটি অপেক্ষাকৃত বেশি তৎপর সংগঠনের (Bengal British India Society, 1843) জন্ম হলে এবং ১৮৪০-র দশকে সামাজিক ও ধর্মীয় প্রশ্নগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলে ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটির অস্তিত্ব নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে বলে অধ্যাপক মেহরোত্রার অভিমত। তাছাড়া, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, সমাজের অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অনগ্রসরতা, অধিকাংশ ধনবান জমিদারদের অনীহা, ভারতের পরিবর্তে ইংল্যান্ডে জনমত গড়ে তোলার অহেতুক অত্যধিক প্রচেষ্টা, সদস্যদের ব্যক্তিগত বিবাদ ইত্যাদিকেও এই সংস্থার জনপ্রিয়তার হ্রাস ও নিষ্ক্রিয়তার সম্ভাব্য কারণ হিসাবে ধরা যেতে পারে।

৪৭.৩ ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটির তাৎপর্য

ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটি উল্লেখযোগ্য ও তাৎক্ষণিক সাফল্য অর্জন করেনি, বলাবাহুল্য। তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় জমিদারদের এই প্রথম প্রয়াস প্রশংসার দাবি রাখে অন্তত এই কারণে যে, এই সংগঠন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও সাংবিধানিক আন্দোলন পদ্ধতির একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। বিশিষ্ট সমসাময়িক রাজেন্দ্রলাল মিত্রর মন্তব্য : "It gave to the people the first lesson in the art of fighting constitutionally for their rights and taught them how to manfully assert their claims and give expression to otheir opinions"। তাছাড়া, এই সংস্থার বহু সদস্য ব্যক্তিগতভাবে প্রধানত মধ্যবিত্তদের দ্বারা গঠিত বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির সাথে যোগাযোগ রাখে ও সংগঠনকে সাহায্য করে যায়।

ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটির পত্তন বুঝিয়ে দেয় যে, ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে প্রাচীন সমাজের জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মীয় সম্পর্কের চেয়ে নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ ভারতীয়দের কাছে বেশি না হলেও অন্তত সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং স্বার্থরক্ষার খাতিরে তাদের কাছে জরুরি হয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধভাবে সক্রিয় হওয়া। এটাই আরেকবার প্রমাণ হয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ। ১৮৫৩ সালে ব্রিটিশ রাষ্ট্রপ্রদত্ত ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতে ও এশিয়ায় বাণিজ্য করাও বিশেষাধিকার সনদের (Charter) নবীকরণের বছর। এই ধরনের নবীকরণের আগে ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে ভারতীয় পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতে হত। অতএব, সচেতন ও অভিজ্ঞ ভারতীয়রা রাজদরবারে তাদের অভাব-অভিযোগ জাগানোরও এটা উপযুক্ত সময় বলে মনে করল। প্রতিষ্ঠা হল তিন প্রেসিডেন্সিতে তিনটি নতুন সংগঠন : কলকাতায় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন (British Indian Association, ২৯শে অক্টোবর ১৮৫১), মাদ্রাজ-এ মাদ্রাজ নেটিভ এ্যাসোসিয়েশন (Madras Native Association, ১৩ই জুলাই ১৮৫২) ও বোম্বাই-এ বম্বে এ্যাসোসিয়েশন (Bombay Association, ২৬শে আগস্ট ১৮৫২)। পরবর্তী প্রায় দু'দশক এই তিন সংগঠনই ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। অধ্যাপক অনিল শীলের ভাষায় : "Since the company's charter was due to expire in 1853, this was the obvious time for parliament to take stock of Indian developments. So it was equally the obvious time for Indians to float new political ventures whose petitions to West-minister might influence the legislature in making up their minds. Hence the discussions over the renewal of the

charter gave birth to the three associations which were to dominate the politics of Bengal, Bombay and Madras for the next quarter of a century." লক্ষ্যণীয় যে, প্রধানত জমিদারদের দ্বারা গঠিত হলেও এই সংগঠনগুলির সদস্য হয় সমাজের অন্যান্যরাও এবং যে আবেদনপত্রগুলি পার্লামেন্টে পেশ হয় তাতে স্থান পায় সকল শ্রেণীর মানুষের অভিযোগ।

৪৭.৩.১ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন

ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হন রাজা রাধাকান্ত দেব এবং সম্পাদক, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। জমিদারদের সাথে যোগ দেন রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মতো কলকাতার খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীরা। প্রশাসন ব্যবস্থার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে জনজীবনের উন্নতি ঘটানো এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা হল ("to promote the improvement and efficiency of the British Indian Government by every legitimate means in its power, and thereby.....ameliorate the condition of the native inhabitants of the subject country")।

১৮৫২-তে পার্লামেন্টের কাছে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের পাঠানো প্রতিবেদনের (petition) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন অধ্যাপক মেহরোত্রা। প্রথমেই ইংরেজ জাতি ও শাসনের প্রতি গভীর আস্থা ও আনুগত্য জ্ঞাপন করা হয়। আর তার সাথে বলা হয় যে, ভারতে কোম্পানির প্রশাসন নীতি ও ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। পরিস্থিতির উন্নতির জন্য কয়েকটি প্রস্তাবও রাখা হয়। প্রধান কয়েকটি দাবি ছিল দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার (dual government) অবসান, কার্যনির্বাহী (executive) ও আইন বিভাগের (legislature) পৃথকীকরণ, প্রশাসনে ভারতীয়দের নিয়োগ, ধর্মীয় ক্ষেত্রে ইংরেজ সরকারের ভূমিকা হ্রাস, যোগাযোগ ও সেচব্যবস্থার মতো জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয়বৃদ্ধি, ভারতীয়দের জন্য সিভিল সার্ভিসের উন্মুক্তকরণ, কোম্পানির লবণ ও আফিমের একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার এবং আবগারী ও স্ট্যাম্প করের বিলুপ্তি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়বৃদ্ধি।

৪৭.৩.২ বম্বে এ্যাসোসিয়েশন

একইভাবে বম্বে এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাপর্বে সামিল হয়েছিল ঐ অঞ্চলের নানা গোষ্ঠী : হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, পোর্তুগীজ ও পার্শীরা; ধনবানদের সাথে যোগ দেয় স্থানীয় এলফিনস্টোন কলেজের প্রাক্তন ছাত্রমণ্ডলী। সদস্যদের চাঁদা ধার্য হল বার্ষিক পঁচিশ টাকা। স্যর জামশেদজী জিজিভাইকে (Sir Jamshedji Jeejeebhoy) প্রদান করা হয় সাম্মানিক সভাপতি পদটি; সভাপতি নির্বাচিত হলেন জগন্নাথ শঙ্করশেঠ (Jagannath Shankarseth) এবং যুগ্ম-সম্পাদক হন ভাউ দাজি (Bhau Daji) ও বিনায়করাও জগন্নাথজী (Vinayakrao Jagannathji)। সংস্থার ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় সকল মানুষের অভাব-অভিযোগগুলি জানা ও দেশের উন্নতির জন্য প্রশাসনের কাছে নিয়মিত প্রস্তাব পেশ করা ("to ascertain the wants of Natives of India living under the Government of this Presidency and represent from time to time, to the authorities, measures calculated to advance the welfare and improvement of the country") স্থির হয় সংগঠনের প্রথম কাজ হবে পার্লামেন্টে চার্টারনবীকরণ নিয়ে আলোচনার সময় প্রতিবেদন পাঠানো।

বোম্বাই'র প্রতিবেদনটি পার্লামেন্টে পেশ হয় নভেম্বর ১৮৫২'এ। কলকাতাবাসীর মতো বোম্বাই'র নাগরিকরাও ইংরেজ ব্যবস্থার প্রতি তাদের সবিশেষ আস্থা ও আনুগত্য প্রকাশ করে এবং দ্বৈতশাসনের অবসান, প্রাদেশিক প্রশাসনের স্বাধীনতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, কোম্পানির শাসনব্যয় হ্রাস, প্রশাসনের আংশিক ভারতীয়করণ, অভ্যন্তরীণ পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং শিক্ষাব্যবস্থার বিস্তার ছিল বম্বে এ্যাসোসিয়েশনের কয়েকটি দাবি।

৪৭.৩.৩ মাদ্রাজ নেটিভ এ্যাসোসিয়েশন

এই সময় মাদ্রাজবাসী প্রথমে কলকাতার সাথে যোগাযোগ রেখে রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালালেও এই সম্পর্ক কোনও কারণে ছিন্ন হয় কিছুকালের মধ্যে। অতঃপর বিশিষ্ট দুই নাগরিক গজুলু লক্ষ্মীনারাসু চেট্টি, (Gazulu Lakshinarasu Chetty) ও সোমসুন্দরম চেট্টিয়ারের (P. Somsundaram Chettiar) নেতৃত্বে ও উদ্যোগে মাদ্রাজ নেটিভ এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিবেদন পার্লামেন্টে পৌঁছয় ১৮৫২'র শেষদিকে।

অধ্যাপক মেহরোত্রা দেখিয়েছেন যে, এই প্রতিবেদনের সুর অন্য দুটির চেয়ে যথেষ্ট চড়া। কলকাতা ও বোম্বাইবাসীর মতো নেতারা ইংরেজের প্রতি আস্থা ও আনুগত্য জ্ঞাপনের প্রয়োজনবোধ করেননি, বরং প্রথম থেকেই সোচ্চার হয়েছেন স্থানীয় প্রশাসনের কঠোর সমালোচনায়। রাজস্বের অত্যধিক হার, রাজস্ব সংগ্রহের কড়াকড়ি, ব্যয়বহুল বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা, সরকারি জনকল্যাণমূলক কাজ ও শিক্ষাব্যবস্থার অপ্রতুলতা, ধর্মীয় ক্ষেত্রে সরকারে অহেতুক হস্তক্ষেপ ইত্যাদি ছিল সমালোচনার বিষয়বস্তু। দাবি করা হয়, বিকল্প ভূমি রাজস্বব্যবস্থার, বাণিজ্যিক ও পেশাগত এবং লবণ করের বিলুপ্তি, প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি।

৪৭.৩.৪ তিনটি এ্যাসোসিয়েশনের দাবির সাদৃশ্য ও পার্থক্য

কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রতিবেদন তিনটি পৃথকভাবে পার্লামেন্টে পৌঁছলেও লক্ষ্যণীয় যে, একই ধরনের দাবি তিনটিতেই স্থান পায়। এটা অস্বাভাবিক নয় যেহেতু ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছিল উপমহাদেশব্যাপী অভিন্ন এক শাসনব্যবস্থার। প্রাদেশিক প্রশাসন দুটির স্বতন্ত্রতা সত্ত্বেও তাদের নীতি ও চরিত্র একই। অতএব, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের অভাব-অভিযোগও এক ধরনের। দ্বৈত শাসনব্যবস্থা ব্যক্তিগত অধিকার হরণকারী আইনব্যবস্থা, ব্যয়বহুল প্রশাসনব্যবস্থা, প্রশাসনে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের সুযোগের অভাব, অনুন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, শোষণমূলক ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, ত্রুটিপূর্ণ পুলিশ ও বিচারবিভাগ ইত্যাদি অনেক কিছুর ক্ষতিকর প্রভাব ভারতে সর্বত্র মানুষের ওপর সমানভাবে পড়ে। ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির কারণে গড়ে ওঠা কয়েকটি গোষ্ঠীর সহমর্মী ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত রাজনৈতিক সংগঠনগুলির অভিযোগপত্র অতএব অনিবার্যভাবে এক ধরনের হয়। অধ্যাপক মেহরোত্রার মন্তব্য : "Little surprise, therefore, that their petitions in 1852 complained of the same things and in almost the same manner."

তবে তিনটি অঞ্চলের পরিস্থিতিগত পার্থক্যের কারণে প্রতিবেদনগুলিতে কিছু হেরফেরও লক্ষ্য করা যায়। যেখানে বাঙালীরা ভারতের সর্বোচ্চ শাসনভার সংস্কার দাবি করে, সেখানে বোম্বাই ও মাদ্রাজবাসী বেশি করে দাবি করে প্রাদেশিক সরকার দুটির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা। কলকাতা ও মাদ্রাজের হিন্দুরা সোচ্চার

হয় ধর্মীয় ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে, অথচ নানা ধর্মাবলম্বী মানুষের দ্বারা গঠিত বম্বে এ্যাসোসিয়েশন এ বিষয়ে নীরব থাকে। কলকাতা ও মাদ্রাজের নজর যতদূর পড়ে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ত্রুটির ওপর ততদূর বোম্বাই-এর নয়। অধ্যাপক মেহরোত্রা এমনও মন্তব্য করেছেন যে, তিনটি প্রেসিডেন্সির রাজনৈতিক সচেতনতার স্তরভেদ এবং মুখ্য প্রতিবেদনকারী চরিত্র, ব্যক্তিগত উচ্চাশা ও তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে আবেদনপত্রগুলিতে : "The able and ambitious petition of the British Indian Association reflected the advanced political consciousness of Calcutta. The short and sober petition from Bombay bare testimony to the practicalness of the local population while the length and bitterness of the Madras petition were due as much to its intrepid draftsmen—Lakshminarasu Chetty and Harley—as to the genuineness of its many complaints."

বলা বাহুল্য, ১৮৫৩-তে ভারতীয়দের কোনও দাবিই মানেনি ব্রিটিশ সরকার। বস্তুত, ১৭৭৩ থেকে আরম্ভ করে ১৮৫৩ অবধি রচিত বিভিন্ন পার্লামেন্টারী আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল (শাসকের দৃষ্টিকোণ থেকে) ভারতের শাসন ও শোষণের উপায় নির্ধারণ করা, ভারতীয়দের অধিকার দান নয়। তাই ১৮৫৩-তে যথারীতি আইনসভাগুলোয় ভারতীয়দের কোনও স্থান হল না, ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় কোনও পরিবর্তন এল না, সিভিল সার্ভিস সংরক্ষিত থাকল ইংরেজদের জন্য, জনকল্যাণমূলক কাজের বিস্তারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হল না, অর্থাৎ সব মিলিয়ে প্রশাসনকে জনমুখী করে তোলার কোনও ইচ্ছাই দেখা গেল না। ইংলান্ডে ও ভারতে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় স্যার চার্লস উডের ইন্ডিয়া বিলের (Sir Charles Wood's India Bill) সমালোচনা ও এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভারত থেকে পাঠানো একাধিক প্রতিবাদপত্র পার্লামেন্ট সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করল। অন্যদিকে, একথাও ভুললে চলবে না যে, কোম্পানির চার্টারের নবীকরণ ভারতীয়দের জন্য যে সুযোগের জন্ম দেয় তার যথাযথ ব্যবহারও তারা এই সময় করতে পারেনি। প্রয়োজন ছিল দেশব্যাপী সংঘবদ্ধ প্রয়াসের, অথচ সদিচ্ছা ও কিছুদূর তৎপরতা দেখানো ছাড়া ভারতীয়রা আর বিশেষ কিছুই করেনি। কলকাতা ও বোম্বাই-এর মধ্যে এই সময় যোগাযোগ হলেও মাদ্রাজের বিচ্ছিন্নতা চোখে পড়ে বিশেষভাবে। পৃথকভাবে পৌঁছানো প্রতিবেদনগুলি পার্লামেন্টের কাছে সেই গুরুত্ব পেল না, যা হয়তো সম্মিলিতভাবে পাঠানো একটি প্রতিবেদন পেত। ১৮৫৩'য় ভারতীয়দের ব্যর্থতার এটা একটা সম্ভাব্য কারণ বলে অধ্যাপক মেহরোত্রার অভিমত : "The first major effort in India to achieve inter-provincial co-operation in political agitation had failed Perhaps it was premature. But a long time was to elapse before it was made again."

৪৭.৪ ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটির প্রভাব

১৮৭০-র দশক অবধি জমিদারদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই তিনটি সংগঠন ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থেকে যায়। এই সময়ের মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তার ও পরিবর্তন ঘটে যায়, এবং স্বভাবতই ভারতীয় সমাজের শিরোমণিরা এই পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার সুযোগ হারাতে চায় না। তবে, ১৮৪৩'র আগে আগে তাদের মধ্যে যে ধরনের সক্রিয়তা দেখা গিয়েছিল পরে তা আর

দেখতে পাওয়া যায় না। এমন নয় যে তারা কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, তবে উত্তরোত্তর তারা গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। ১৮৬০'র শেষভাগে এই তিনটি সংগঠনের মৃতপ্রায় দশা হলে, তাদের স্থান নেয় এক নতুন শ্রেণী ও প্রজন্মের নেতৃত্ব।

রাজনীতিতে প্রথমেই পিছিয়ে পড়ে দক্ষিণ ভারতের অভিজাতরা। ১৮৫৪ থেকে ১৮৬০ অবধি মাদ্রাজ নেটিভ এ্যাসোসিয়েশন যথেষ্ট সক্রিয় থাকে। অধ্যাপক মেহরোত্রা দেখিয়েছেন যে, তার প্রধান কারণ এই যে, মাদ্রাজ সরকারের বিরুদ্ধে রাজস্ব সংগ্রহ সংক্রান্ত অত্যাচারের যে অভিযোগ এই সংগঠন করে তা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গুরুত্ব পায় এবং এই অভিযোগের বৈধতা নিরূপণের জন্য ভারতে পাঠানো ইংরেজ কর্মচারীর মোকাবিলা করতে হয় সংগঠনকে। অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে মাদ্রাজ নেটিভ এ্যাসোসিয়েশনের উৎসাহ দ্বিগুণ হয়, যদিও এই ঘটনার ফলে স্থানীয় সরকারের কাছে দ্রুত অপ্রিয়ও হয়ে পড়ে। দক্ষিণ ভারতে খ্রিস্টান মিশনারীদের ধর্মান্তকরণের কার্যক্রমের বিরোধিতা করা এরপর এই সংগঠনের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায় বলে অধ্যাপক নীল দেখিয়েছেন। ১৮৬৮-তে লক্ষ্মীনারসু চেট্টির মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর সংগঠনও কার্যত বিলুপ্ত হয়। অন্য দুটি প্রেসিডেন্সির সাথে মাদ্রাজের পার্থক্য তখনই স্পষ্ট হয়ে যায়। সমাজের ধনবানদের মধ্যে চেট্টির স্থান নেওয়ার যেমন কোনও উপযুক্ত ব্যক্তির আবির্ভাব হয় না, তেমনই মাদ্রাজের শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাও যোগাতে পারে না বিকল্প নেতৃত্ব। ১৮৬০ ও ১৮৭০-র শেষে এখানে শিক্ষার কিছুদূর বিস্তার হলেও, শিক্ষকতা, ওকালতি ও সাংবাদিকতার মতো স্বাধীন বৃত্তিগুলি বিশেষ লাভজনক হয়ে উঠতে পারে না সুযোগের অভাবে। অধিকাংশ শিক্ষিতরা যায় সরকারি চাকরীতে। অতএব, রাজনৈতিক সচেতনতা ও সক্রিয়তার নিতান্তই অভাব দেখা গেল। এই সময় এখানে অসংখ্য নতুন সাংস্কৃতিক সংগঠনের জন্ম হয়, যেগুলির সাথে রাজনীতির সামান্যই সম্পর্ক ছিল।

১৮৫৭'র বিদ্রোহের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে পশ্চিম ভারতের রাজনীতির ওপর। অধ্যাপক নীল ও অধ্যাপক মেহরোত্রা দেখিয়েছেন যে, এই সময় বোম্বাই-এর একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ ওঠায় তারা ব্যস্ত থাকে প্রধানত নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে। এর পরে পরে মার্কিন গৃহযুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় তুলোর চাহিদা বাড়লে এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না ব্যবসায়ীরা। যেহেতু এদের অনেকেই ছিল বম্বে এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য, সেহেতু ব্যবসাক্ষেত্রে এদের ব্যস্ততা একটা অতিরিক্ত কারণ সংগঠনের নিষ্ক্রিয়তার। আবার ১৮৬৫ নাগাদ তুলোর চাহিদা আকস্মিকভাবে কমে গেলে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় সংগঠনের বহু সদস্য। ইতিমধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বও আরম্ভ হয়ে গেছিল সংগঠনের মধ্যে। দুই প্রজন্মের নেতৃত্বের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য চরমে পৌঁছয় ১৮৫৯'র লাইসেন্স বিলকে (License Bill) কেন্দ্র করে। বিভিন্ন স্বাধীন বৃত্তি ও ব্যবসার ওপর বোম্বাই পৌরসভার প্রস্তাবিত কর আরোপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধরন নিয়ে সদস্যদের মধ্যে চরম মতপার্থক্য দেখা দেয়। ভাউ দাজির মতো করিৎকর্মা ব্যক্তির নেতৃত্বে কমবয়সী সদস্যরা একযোগে এ্যাসোসিয়েশনের সভা ত্যাগ করে। এরপর প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে দুটি পৃথক প্রতিবেদন পৌঁছয় সরকারের কাছে। এই বিভাজনের পরে সংগঠনের নিষ্ক্রিয়তা বাড়ে এবং ১৮৬৫-তে সভাপতি জগন্নাথ

শঙ্করশেঠের মৃত্যুর পর তা আরও প্রকট হয়। বছর দুই পরে সংগঠনের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা তেমন সফল হতে পারে না প্রধানত দুটো কারণে : কমবয়সী সদস্যদের দ্বারা একটি বিরোধী সংগঠনের প্রতিষ্ঠা ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন (Western Indian Association, 1873) এবং পুনা সর্বজনিক সভার (Poona Sarvajanik Sabha, প্রথমে ১৮৭৬-এ ও আবার ১৮৭০-এ) প্রতিষ্ঠা। বম্বে এ্যাসোসিয়েশনের অবক্ষয় এবং বিরোধী দুটি সংগঠনের জন্ম বস্তুত পশ্চিম ভারতীয় সমাজে গভীর পরিবর্তনের আভাস দেয়। প্রথম সংগঠনটির কর্মকর্তারা ছিলেন বর্ষীয়ান, ধনবান ও আপনাপন পেশায় সফল ও ব্যস্ত। রাজনীতি যে ধরনের মনোযোগ ও সময় দাবি করে তা তাদের পক্ষে দেওয়া সহজ ছিল না। আর ঠিক এটাই তাদের কাছে উত্তরোত্তর বেশি করে দাবি করছিল অপেক্ষাকৃত কমবয়সী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা। আসলে এই সময় এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল। প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব ইংরেজ ব্যবস্থার প্রতি যথেষ্ট আস্থাবান ছিল অথচ অন্য দল চাইছিল এর বিরুদ্ধে ব্যাপক ও তীব্রতর আন্দোলন। অপরিচিত ও অনিশ্চিত পথে যখন প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব পা বাড়াতে দ্বিধা করল, তখনই পৃথক হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল এখানকার শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা।

পূর্বভারতের সমাজেও একই ধরনের পালাবদল লক্ষ্য করা যায়। ১৮৫৭'র পর দ্রুতগতিতে বিস্তার ঘটতে থাকে প্রশাসন ব্যবস্থার, যার সাথে তাল মেলায় শিক্ষার প্রসার। বাঙ্গালী সমাজে শিক্ষিতদের সংখ্যা, প্রতিপত্তি ও সম্মান বাড়তে থাকে এর ফলে। অর্থাৎ, তৈরি হয় এদের নেতৃত্বে এক নতুন ধরনের সর্বভারতীয় রাজনীতির ভিত্তিভূমি। এটা ঠিক যে, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের অভিজাত, প্রতিষ্ঠাতারা সমাজে অন্যান্যদেরও স্বাগত জানায় এবং তাদের দাবিকেও বরাবর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। অধ্যাপক শীল দেখিয়েছেন যে, ১৮৫৩-র পরেও এই সংগঠন আইনসভা ও সিভিল সার্ভিসের পরিবর্তন দাবি করে যায় নিয়মিতভাবে। ১৮৫৪-তে কলকাতা পৌরসভা বিলের সমালোচনা করে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিস্তার দাবি করে, ১৮৫৫-তে লবণের একচেটিয়া কারবারের বিলুপ্তি চায়, নীলবিদ্রোহের কারণ নির্ধারণের জন্য দাবী জানায় কমিশনের এবং ১৮৬৯-এ ভারতীয় বিবাহবিষয়ক বিলের বিরোধিতা করে। কিন্তু, সমাজের শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের নতুন চাহিদার সাথে সাথে তাল মিলিয়ে চলা কিছুদিনের মধ্যেই অসম্ভব হয়ে উঠল। মধ্যবিত্তদের সংখ্যা ও সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে তাদের নিজেদের মধ্যে প্রদেশব্যাপী যোগাযোগ বাড়ছিল এবং তাদের মধ্যে বাড়ছিল উপযুক্ত এক সংগঠনের দাবিও। প্রথমে তারা ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের দিকেই তাকায় পথনির্দেশের জন্য; অথচ জমিদারদের মধ্যে সংগঠনকে জনপ্রিয় করে তোলার বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় না। ১৮৫০'র দশকের শেষদিকে সংগঠনের সদস্যসংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে (বাৎসরিক ৫০ টাকা চাঁদার হার মধ্যবিত্তকে আকর্ষণ করবে না এটাও ঠিক) এবং সংগঠনের অস্তিত্ব বজায় রাখার দায়িত্ব বর্তায় নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, দিগম্বর মিত্র, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামনাথ ঠাকুরের মত কয়েকজন প্রৌঢ়ের ওপর। এঁদের রক্ষণশীলতাও প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছিল ইতিমধ্যে। ১৮৫০'র দশক থেকে বৃদ্ধি পাওয়া কৃষক অসন্তোষ সরকারকে বাধ্য করে এদের প্রতি দৃষ্টি দিতে। এর ফলে জমিদারদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের শ্রেণীচরিত্র পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে যখন সংগঠনের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায় জমিদারী স্বার্থরক্ষার আন্দোলন করা। অতএব, এদের কাছ থেকে সরে যাওয়া ছাড়া মধ্যবিত্তদের আর কোনও উপায় থাকে না। প্রতিষ্ঠিত

হয় ১৮৭৫'র ইন্ডিয়ান লীগ (Indian League) ও ১৮৭৬-এ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন (Indian Association)। অধ্যাপক শীলের ভাষায় : "The glaring self-interest of the British Indian Association helped to bring a number of rival associations into being in Calcutta."

৪৭.৫ মূল্যায়ন

আধুনিক ভারতীয় রাজনীতির পথিকৃতের সম্মান দিতে হয় জমিদারদের। ১৮৩০'র দশকের শেষ দিক থেকে আরম্ভ করে ১৮৭০'র দশকের প্রথম দিক অবধি দেশবাসীকে তারাই দেয় নেতৃত্ব। ১৮৭০'র দশকে মধ্যবিত্তদের নিজস্ব সংগঠনের প্রতিষ্ঠা হলে অবশেষে অভিজাতরা গুরুত্ব হারায়। আধুনিক ভারতীয় রাজনীতিতে এই ধরনের পালাবদল একাধিকবার দেখা গেছে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বিস্তারের সাথে সাথে ভারতীয় জাতিগঠনের প্রক্রিয়াটিও তাল মিলিয়ে চলে। উনিশ শতকের গোড়াতেই উপমহাদেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের মধ্য দিয়ে ইংরেজ এখানে রাজনৈতিক ঐক্য এনে দেয়। কিন্তু জাতিগঠন বলতে যদি উত্তরোত্তর বেশিসংখ্যক দেশবাসীর মধ্যে আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি বোঝায় তাহলে মানতেই হয় এই দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের পরেও চলতে থাকে। বিশেষ এক পরিস্থিতিতে ভারতীয় জমিদারেরা সমাজের কাছে গুরুত্ব পেয়েছিল। অথচ কিছুকাল পরে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারায় জমিদারেরা নেতৃত্বভার তুলে দিতে বাধ্য হয় মধ্যবিত্তদের হাতে। পরিস্থিতির পরিবর্তন কিন্তু বজায় থাকে এবং পরবর্তীকালের ইতিহাস আলোচনা করলে স্পষ্ট হয় যে, একই ব্যর্থতার দরুন মধ্যবিত্তদের মধ্যেও ঘটে পালাবদল। মধ্যবিত্তদের মধ্যে প্রথম প্রজন্মের নেতৃত্ব রক্ষণশীলতা ও অত্যধিক সাবধানতার দোষে দোষী সাব্যস্ত হলে তার জায়গা নেয় অপর একটি অপেক্ষাকৃত উদারপন্থী দল। তার মানে এই নয় যে, প্রথমদিকের রাজনৈতিক প্রয়াসগুলিকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ মানতে হবে। তাৎক্ষণিক সাফল্য অর্জনই একমাত্র সাফল্য নয়। প্রাথমিক প্রয়াস প্রায়শই চমকপ্রদ সাফল্যলাভ করতে ব্যর্থ হয়। তবে এর তাৎপর্য বিচার করতে হলে সমসাময়িক পরিস্থিতির প্রতিবন্ধকতার কথা চিন্তা করতে হয় আর চিন্তা করতে হয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পথিকৃতরা কী শিক্ষা রেখে যায়। এইভাবে চিন্তা করলে ভারতীয় জমিদারদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের তাৎপর্য বোঝা যায়। না মেনে উপায় নেই যে, তাদের দাবিগুলি ছিল নেহাৎই সাদামাটা গোছের, তাদের শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক আন্দোলন পদ্ধতি সমসাময়িক অনেকেরই চিত্ত আকর্ষণ করেনি এবং তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতাও ছিল যথেষ্ট। তবে ঐ সময়কার পরিস্থিতিতে ঐ ধরনের সংগঠনের নিছক অস্তিত্বই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল বলে ঐতিহাসিকেরা মেনেছেন। আসলে, আধুনিক ভারতে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল জমিদারদের এই সংগঠনগুলির মধ্যে দিয়ে। তাই তাদের রাজনৈতিক সক্রিয়তা পরবর্তীকালের ভারতীয় রাজনীতির ভিত্তি হতে পারে। অধ্যাপক শীলের ভাষায় : "Transcending the ties of family, caste, religion and locality and surviving their random beginnings, these associations were the first overt sign of a social and political revolution in the sub-continent."

৪৭.৬ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১। ১৯ শতকে ভারতীয় অভিজাতদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন ও তার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে ১৯ শতকের জমিদারী সংগঠনগুলির তাৎপর্য আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

১। ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটির কার্যাবলীর গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২। ১৯ শতকের ভারতীয় জমিদারী সংগঠনগুলির অবসানের কারণ কী?

৩। ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েসনের প্রতিষ্ঠার কারণ, কার্যাবলী ও গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৪। ভারতের প্রথম আধুনিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নাম কী ও কবে তার জন্ম হয়?

৫। ১৮৫৩-য় ভারতে যে তিনটি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা হয় সেগুলির নাম কি?

৬। ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটির প্রতিষ্ঠার তাৎক্ষণিক কারণ কী?

৭। ১৮৫৩'য় ভারতীয়রা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে কী দাবি জানায়?

৪৭.৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. S. R. Mehrotra : *The Emergence of the Indian National Congress.* Delhi, 1971.
2. A. Seal : *The Emergence of Indian Nationalism, Competition and Collaboration in later Nineteenth Century.* Cambridge, 1968.
3. R. Suntharalingam : *Indian Nationalism. A Historical Analysis*. Delhi, 1983.

একক ৪৮ ❐ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ : প্রেক্ষাপট এবং ইতিহাসচর্চার ধারা

গঠন :

৪৮.০ উদ্দেশ্য

৪৮.১ প্রস্তাবনা

৪৮.২ সিপাহী বিদ্রোহ

৪৮.৩ সিপাহী বিদ্রোহের তাৎপর্য

৪৮.৪ মূল্যায়ন

৪৮.৫ অনুশীলনী

৪৮.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৪৮.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- সিপাহী বিদ্রোহের কারণ
- সিপাহী বিদ্রোহের তাৎপর্য
- সিপাহী বিদ্রোহ কি নিছকই বিদ্রোহ নাকি প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল।

৪৮.১ প্রস্তাবনা

ভারতীয় মননে ১৮৫৭র বিদ্রোহ 'মহাবিদ্রোহ' নামে স্থান পেয়েছে। জীবনকে তুচ্ছ করে অগণিত পরিচয়হীন মানুষের শক্তিশালী ইংরেজ কোম্পানির বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে সামিল হওয়ার স্মৃতি আজও ভারতবাসীকে নাড়া দেয়। আত্মত্যাগ, বীরত্ব, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চিরকালই সম্ভ্রম আদায় করেছে। তাই ১৮৫৭র বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে দেশবাসীর এই শ্রদ্ধাভাব অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া, উপমহাদেশব্যাপী অভূতপূর্ব এই উথালপাথালের দ্বিতীয় কোনও নজিরও ভারতের পরবর্তীকালের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে ঐ বছরের ঘটনাবলী ঐতিহাসিকদেরও অনেক ভাবিয়েছে ও এখনও ভাবায়। এটা জানা কথা যে, অতীত আলোচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকেরা আবেগ বর্জন করাটাই পছন্দ করেন। তাই তাদের মতামত সর্বসাধারণের স্মৃতির সাথে সবসময় খাপ খায় না—১৮৫৭র বিদ্রোহের ঐতিহাসিক আলোচনাও এটা দেখিয়ে দেয়। আবার এটাও ঠিক যে, পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে অতীতের যথাযথ পুনর্গঠন সবসময় সম্ভব হয় না। তবে এই বিদ্রোহের সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাব সম্ভবত নেই—উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বিভিন্ন সময় Narrative of Events

(সংক্ষেপে) নামাঙ্কিত বিদ্রোহের জেলাওয়ারি সরকারি বিবরণ বেরিয়েছিল। তবে, যদিও বা তথ্যনির্ভর বাস্তবসম্মত ইতিহাস লেখা গেল, একই ঘটনার একাধিক ব্যাখ্যা অনেক সময় তৈরি হয় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। ১৮৫৭'র বিদ্রোহের ক্ষেত্রেও এটা হয়েছে, অথচ ঠিক এই কারণেই এর আলোচনা প্রাণবন্ত ও কৌতুহলোদ্দীপক হয়ে উঠেছে।

৪৮.২ সিপাহী বিদ্রোহ

১১ই মে ১৮৫৭র প্রত্যুষে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনস্থ একদল ভারতীয় সৈন্য (sepoy বা সিপাহী/সিপাই নামে যারা আমাদের কাছে পরিচিত) মীরাট থেকে যমুনা পেরিয়ে দিল্লি শহরে হাজির হয়ে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহর কাছে আর্জি জানায় কোম্পানির বিরুদ্ধে তাদের লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিতে। কোম্পানির পেনশনভোগী এই বৃদ্ধ নিমরাজী হতেই সেপাইরা তাঁকে শাহেনশাহ-এ-হিন্দুস্থান ঘোষণা করল। এইভাবে মহাবিদ্রোহের আনুষ্ঠানিক সূচনা হল।

ইংরেজ প্রভুর বিরুদ্ধে এদেশীয় সৈন্যদের এটাই প্রথম বিদ্রোহ (mutiny) নয়। ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন যে, নানা কারণে সিপাইদের মধ্যে অনেক আগে থাকতেই অসন্তোষ বাড়ছিল। এটা ঠিক যে, কোম্পানির সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিলে ভারতীয় সৈন্যদের জীবনে আর্থিক সুরাহা হয় এবং সমাজে সম্মানও বাড়ে কিন্তু এই অভিজ্ঞতা। সততই সুখকর ছিল না। একজন পদাতিক সৈন্য পেত মাত্র সাত টাকা মাসিক বেতন ও একজন সওয়ার বা অশ্বারোহী সৈন্য পেত মাসিক সাতাশ টাকা যা থেকে পোশাক-আশাক, নিজের খাবার, ঘোড়ার দানাপানির জন্য খরচ করার পর তার হাতে থাকত মাত্র কয়েক টাকা। পঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশ অধিকারের পর আবার অতিরিক্ত ভাতা গেল কমে। তাছাড়া, ইংরেজ সৈন্যদের তুলনায় পদোন্নতির সুযোগ-সুবিধা ছিল নিতান্তই কম। সবচেয়ে বড় কথা, ঊর্ধ্বতন ইংরেজদের জাতিবিদ্বেষী মনোভাব ও আচরণ সিপাইকে মনে করিয়ে দিত প্রতি পদক্ষেপে যে, সে হীন। এটা সমসাময়িক ইংরেজ লেখকেরাও মেনেছেন, যেমন T. R. Holmes বলেছেন : "Though he might give the signs of a military genius of Hyder, he knew he could never attain the pay of an English subaltern and that the rank which he might attain after 30 years of faithful service, would not protect him from the insolent dictation of an ensign fresh from England." অন্যদিকে, ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিস্তার ও সৈন্যবাহিনীর সম্প্রসারণের সাথে সাথে 'কালাপানি' পেরোনোর বাধ্যবাধকতা, বিদেশবিভুঁইয়ে অখাদ্য-কুখাদ্য ভক্ষণ, ক্যান্টনমেন্টে নানা জাত ও অঞ্চলের মানুষের সাথে মেলামেশার অসুবিধা ইত্যাদি কারণে এই বাহিনীর মেরুদণ্ডস্বরূপ রাজপুত ও ভূমিহার ব্রাহ্মণ সিপাইদের মধ্যে জাত খোয়ানোর আশঙ্কা বাড়ছিল। ক্যান্টনমেন্টগুলোতে ইউরোপীয় মিশনারীদের অবাধ যাতায়াত আবার ইতিমধ্যে এই গুজবও ছড়িয়েছিল যে, ইংরেজরা ভারতীয়দের খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে চায়। কোম্পানির বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ করে মাদ্রাজি সৈন্যরা ১৮০৬এ; তারপর কোম্পানির প্রধান সৈন্যদল বেঙ্গল আর্মি (Bengal Army) একাধিকবার—১৮১৪তে জাভায়,

১৮৩৪এ গোয়ালিয়রে, ১৮৩৯ থেকে ১৮৪২র মধ্যে আফগানিস্তানে এবং বর্মায় ১৮২৮ ও ১৮৫২তে বিদ্রোহ করে।

এই যখন পরিস্থিতি, তখন কোম্পানির দ্বারা প্রবর্তিত নতুন এনফিল্ড রাইফেলের (Enfield Rifle) কার্তুজ ভারতীয়দের দিশেহারা করে দিয়ে মহাবিদ্রোহের তাৎক্ষণিক কারণ যোগালো। অধ্যাপক সুগত বোস ও অধ্যাপক আয়েষা জালালের ভাষায় : "The sepoys in the company's army were already suffering from a deep sense of social and economic unease when certain greased cartridges for the new Lee Enfield rifle supplied the immediate fuel to spark off reslt." সিপাইদের মধ্যে এই ধারণা তৈরি হল যে, নতুন কার্তুজের গায়ে লাগানো চর্বি আসলে গোরু ও শুয়োরের এবং তা ব্যবহার করতে বাধ্য করে ইংরেজরা তাদের ধর্মনাশের চেষ্টায় আছে। মীরাটিদের আগেই ১৮৫৭'র মার্চ মাসে বহরমপুরের ১৯তম দেশীয় পদাতিক বাহিনীর (19th Native Infantry) সৈন্যরা এই কার্তুজ ব্যবহার করতে গররাজী হলে তাদের নিরস্ত্র করে শাস্তি দেওয়া হয়। এরই ফলে ৩৪তম নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির মঙ্গল পান্ডে ঊর্ধ্বতন এক ইংরেজ অফিসারের ওপর গুলি চালালে তার ফাঁসি হয় ও তার সঙ্গীদের নিরস্ত্র করা হয়। ওউধ রেজিমেন্টের একই হাল হল। সাথীদের এই অসম্মানই ১০ই মে রাত্রিতে মীরাটের ১১তম নেটিভ ক্যাভলরির সিপাইদের বিদ্রোহ করার মতো চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করে।

১৮৫৭'র মে মাসের এই বিদ্রোহ তাহলে বহুদিনের অবমাননা ভোগ ও পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। তবে, আগের ঘটনাগুলির সাথে এর পার্থক্য হল এই যে, এর ছোঁয়াচে দ্রুত গোটা উপমহাদেশ জুড়ে দেখা দিল ব্যাপক হাঙ্গামা যাতে সামিল হল কোম্পানির প্রায় আড়াই লক্ষ ভারতীয় সৈন্যের অর্ধেক। বাংলা প্রেসিডেন্সির প্রায় প্রতিটা ক্যান্টনমেন্ট ও বোম্বাই'র বেশ কয়েকটা এই বিদ্রোহে যোগ দেয়। কেবলমাত্র মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিকে শান্ত থাকতে দেখা যায়।

সিপাইদের সাথে সমাজের অন্যান্যরাও যোগ দিলে সিপাই বিদ্রোহ (sepoy mutiny) পরিণত হল এক ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানে (civil rebellion)। বিদ্রোহ সবচেয়ে ব্যাপক আকার ধারণ করে ইংরেজ দ্বারা সর্বশেষ অধিকৃত প্রদেশ অযোধ্যায়। এখানে নবাবের নামে তালুকদারদের (যাদের মধ্যে প্রায় একুশ হাজার জমিদারী হারিয়েছিল নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায়) সাথে যোগ দেয় চাষী ও কারিগর। উন্মত্ত জনতা আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে ইংরেজ হত্যা করে ও লুঠতরাজ-ভাঙচুর চালায়। লক্ষ্ণৌতে বেগম হজরত মহল বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দেন। তাঁর পুত্র বিরজিস কাদিরকে নবাব ঘোষণা করে বিদ্রোহীরা নতুন শাসনব্যবস্থা চালু করল। বেরিলীতে মানুষ বরখাস্ত হওয়া রোহিলা শাসকদের এক উত্তরসূরী খান বাহাদুরকে নেতা মানে। ইংরেজদের পেনশনভোগী খান বাহাদুর প্রথমদিকে উৎসাহী না হলেও—এমনকি স্থানীয় ইংরেজ প্রশাসকের কাছে আসন্ন বিদ্রোহের খবর পৌঁছে দিলেও—তা অগ্রাহ্য হওয়ায় পরে মহা উৎসাহে বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেন। বিহারে জগদীশপুরের সত্তর বছর বয়সি জমিদার কুঁয়র সিং সিপাইদের সাথে যোগ দেন। কোম্পানির জমি অধিগ্রহণ নীতির কারণে নিঃস্ব হওয়া এই জমিদারদেরও প্রথমে বিদ্রোহ করার কোনও পরিকল্পনা ছিল না। কানপুরে বিদ্রোহীদের নেতা হলেন সর্বশেষ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজি রাওয়ের দত্তকপুত্র নানা সাহেব। বড়লাট ডালহৌসীর একই স্বত্ববিলোপ নীতির আরে শিকার ঝাঁসীর রানি লক্ষ্মীবাঈ মহাবিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নেত্রী। সপুত্রক

এই রানিকে ইংরেজরা দত্তক নিতে বাধা দিলে ১৮৫৩'য় রাজ্য হারিয়ে তিনি তাদের প্রধান শত্রুতে পরিণত হলেন।

প্রতিটা অঞ্চলেই জনসাধারণকে দেখা যায় সিপাই ও বিদ্রোহী নেতাদের সাথে সামিল হতে। সাধারণ মানুষ রাজন্যবর্গ ও অভিজাতদের তুলনায় ইংরেজ শাসনের বেশি বই কম শিকার হয়নি। নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার দরুন করভার বৃদ্ধি, করসংগ্রহের কড়াকড়ি, নিষ্কর জমি অধিগ্রহণ ইত্যাদি চাষীকে দারুণ অসুবিধায় ফেলে। ক্রমশ মহাজন ও জমিদারের ঋণের জালে জড়িয়ে যাওয়া, নিজজমি থেকে উৎখাত হওয়া, ভাগচাষী বা মজুরে পরিণত হওয়া—উত্তরোত্তর এই হয়ে দাঁড়ায় চাষীর হাল। এটাই কারণ কেন ১৮৫৭'র বিদ্রোহী সিপাইরা ঐতিহাসিকদের কাছে 'উর্দ্দীধারী চাষী' ('peasant in uniform') আখ্যা পেয়েছে। আসলে কর্মক্ষেত্রে নানা অসুবিধার সাথে সাথে পরিবারের অর্থনৈতিক দুর্দশাও সিপাইকে বিপর্যস্ত করে। কারিগরদেরও অবস্থার অবনতি হয় ইংরেজ আমলে। দেশীয় শাসকেরা গদিচ্যুত হলে তারা একের পর এক পৃষ্ঠপোষক হারাতে থাকে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে কোম্পানি তাদের কাছ থেকে কম দামে জিনিস কিনে আর বিলিতি পণ্যের আমদানি বাড়িয়ে কারিগরদের দারুণ অসুবিধায় ফেলে। কষ্ট সহ্য করেও ভারতীয় কারিগরেরা আপনাপন পেশায় কোনওমতে টিকে থাকার চেষ্টা করে কিংবা অহেতুক ভিড় বাড়ায় কৃষিক্ষেত্রে।

তীব্র উত্তেজনাপরিপূর্ণ, জনসমর্থনপুষ্ট ও ব্যাপকাকার এই মহাবিদ্রোহ—যা একসময় ইংরেজদের মনে ভয় ধরায় যে, পলাশীর যুদ্ধজয়ের ঠিক একশ বছর পরে তাদের রাজত্বের অবসান আসন্ন—তাও একদিন শেষ হল। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ইংরেজ সামরিকবাহিনীর সাথে সিপাইদের শেষ অবধি পেরে ওঠা স্বভাবতই সম্ভব হয়নি। অস্ত্রশস্ত্রের অভাব, যোগাযোগের অভাব, কার্যকরী নেতৃত্বের অনুপস্থিতি এবং ভারতীয় সমাজেরই কয়েকটি শ্রেণীর কাছ থেকে সমর্থন না আসায় সিপাইরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। উত্তর ও মধ্য ভারত এবং পশ্চিমভারতের একটি অংশ ছাড়া উপমহাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলই বিদ্রোহে যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকে। কোম্পানির সৈন্যবাহিনীর অর্ধেক সিপাই বিদ্রোহে সামিল হয়নি মনে রাখতে হবে। অভিজাত নেতারা কয়েকবার পরিস্থিতি ও সুযোগ অনুযায়ী দল বদলায়। বাংলার ও বোম্বাই'র আধুনিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা এই বিদ্রোহকে মধ্যযুগীয় প্রতিক্রিয়া মনে করে শঙ্কিত বোধ করে। তাছাড়া বাংলায় ইংরেজ সৈন্যদের উপস্থিতিও একটা কারণ কেন এখানে বিদ্রোহ অভ্যুত্থানে পরিণত হতে পারেনি। মারাঠাদের বিদ্রোহে হায়দ্রাবাদের নিজাম সামিল না হওয়াটাই শ্রেয় মনে করেন। শিখ জমিদারদের বিরোধিতার কারণে পাঞ্জাবে বিদ্রোহ ব্যাপক হতে পারেনি। ইংরেজ আমলে সুবিধাপ্রাপ্ত ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও দূরে সরে থাকে। তা সত্ত্বেও ১৮৫৭'র গণ-অভ্যুত্থান প্রায় এক বছর অবধি চলে; এমনকি ১৮৫৭'র জুলাই মাসে বড়লাট ক্যানিং'র বিদ্রোহ শেষের ঘোষণার পরেও কিছুদিন অবধি সিপাই ও সাধারণ মানুষ হাল ছাড়ে না। উল্লেখযোগ্য যে, এই বিদ্রোহ দমন করতে কোম্পানিকে প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা খরচ করতে হয়েছিল।

৪৮.৩ সিপাহী বিদ্রোহের তাৎপর্য

১৯৫৭'র অভ্যুত্থানের ঘটনাবলী ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে জানা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু ততোধিক কঠিন এই বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। এই কাজই ঐতিহাসিকদের ব্যস্ত রেখেছে আর প্রায় দেড়শো বছর পরেও এ সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে মতৈক্য হয়নি। এই বিদ্রোহ কি নিছকই এক সিপাহী বিদ্রোহ

নাকি প্রকৃতই এক গণবিদ্রোহ? এই গণবিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ আখ্যা দেওয়া চলে কি? এটা ঘৃণ্য ফিরিঙ্গীদের বিরুদ্ধে এক ধর্মীয় জেহাদ নাকি এক ধর্মনিরপেক্ষ সংগ্রাম? ইংরেজ উপনিবেশ রাজবিরোধী এক অভ্যুত্থান নাকি স্রেফ এদেশীয়দের মধ্যে বোঝাপড়ার এক অধ্যায়? ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জমিদারদের সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া নাকি সমাজের নিচের তলার মানুষের আপন সংগ্রাম? এমন একাধিক প্রশ্ন ঐতিহাসিকদের ভাবিয়েছে এবং আপনাপন বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে তাঁরা চেষ্টা করেছেন তথ্য বিশ্লেষণ করে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে।

১৮৫৭'র পরে পরে এমনকি আরও বেশ কিছুকাল পরে অবধি সরকারি প্রতিবেদন ও সমসাময়িকদের স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থকে নির্ভর করে ইংরেজ ঐতিহাসিকরা যে ইতিহাস লেখেন তাতে 'সিপাই বিদ্রোহের' ধারণাটাই গুরুত্ব পায়। তাছাড়া, শাসকের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা এই জাতীয় বই'এ—যেমন চার্লস বলের 'দি হিস্ট্রি অফ দি ইন্ডিয়ান মিউটিনি', জন কে'র 'হিস্ট্রি অফ দি ইন্ডিয়ান মিউটিনি অফ এইটিন ফিফটি সেভেন-ফিফটি এইট' ও কর্নেল ম্যালেসনের 'দি ইন্ডিয়ান মিউটিনি অফ এইটিন ফিফটি সেভেন' (Charles Ball, *The History of the Indian Mutiny,* 1858-59; John Kaye, *History of the Indian Mutiny of 1857-58,* 1857-98; Col. Malleson, *The Indian Mutiny of 1857,* 1912)—ভারতীয় সৈন্যদের আচরণকে আইনশৃঙ্খলাজনিত সমস্যা ও ভারতে ইংরেজ শাসনের ইতিহাসের এক শিক্ষামূলক অধ্যায় হিসাবেই দেখা হয়। এই মতানুযায়ী কোম্পানির কয়েকটি ভুলের মাসুলস্বরূপ এই বিদ্রোহ ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতিকে সাময়িকভাবে ব্যাহত করে মাত্র। এই সময়ই জন্মায় 'ষড়যন্ত্রতত্ত্ব' ('conspiracy theory'), যে তত্ত্ব অনুযায়ী এই বিদ্রোহের সংগঠক ক্ষমতাচ্যুত ভারতীয় অভিজাতরা।

বিশ শতকের প্রথম দিকে এক সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিদ্রোহের ব্যাখ্যা করলেন ভি. ডি. সভরকর (V. D. Savarkar, *The Volcano on the First War of Indian Independence,* 1909)। এই লেখকের মতে, ধর্মরক্ষা ও স্বরাজ হাসিল করার উদ্দেশ্যেই ভারতীয়রা নানা সাহেব ও মৌলবী অজিমুল্লাহর মতো মানুষের নেতৃত্বে ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা এই বই'এ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার চেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠল ভারতবাসীর মুক্তিলাভের প্রচেষ্টা। অতএব 'চক্রান্তকারীরাও' পরিণত হল দেশবাসীর 'নায়কে' ('heroes')।

১৯৫৭'য় প্রকাশিত হল অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সেনের 'এইটিন ফিফটি সেভেন' (*Eighteen Fifty Seven*) ও অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'দি সিপয় মিউটিনি অ্যান্ড দি রিভোল্ট অফ এইটিন ফিফটি সেভেন' (*The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857*), এবং ১৯৬১তে তারাচাঁদের 'হিস্ট্রি অফ দি ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া' (*The History of the Freedom Movement in India*)। ঈষৎ পার্থক্য সত্ত্বেও এই তিন লেখকের মূল বক্তব্য এক। সংক্ষেপে এই বিদ্রোহকে স্বাধীনতার যুদ্ধ আখ্যা দেওয়া যায় না; সিপাইদের সাথে যোগ দেওয়া গুণ্ডা-বদমাশ সহ সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক প্রশাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ার সুযোগ নিয়ে আপনাপন স্বার্থ হাসিল করা; বিদ্রোহীদের

জয় হলে মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হত। অধ্যাপক সেনের মতে, বিদ্রোহীদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার (যা একটি আধুনিক আদর্শ) কোনও ধারণাই ছিল না : "The patriots of Oudh fought for their king and country but thy were not champions of freedom, for they had no conception of individual liberty. On the contrary, they would, if they could, revive the old order and perpetuate everything it stood for....." অধ্যাপক মজুমদার মন্তব্য করেন যে, ১৮৫৭'র বিদ্রোহের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয়নি বরং তা মৃতপ্রায় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মরণকামড় মাত্র : "The miseries and bloodshed of 1857-58 were not the birth-pangs of a freedom movement in India, but the dying growns of an absolute aristocracy and centrifugal feudalism of the mediaeval age." বলাবাহুল্য, জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র, গণতন্ত্র, সাংবিধানিক আন্দোলন পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে পশ্চিমী আদলে গড়ে ওঠা আধুনিক ভারতীয় ধারণাগুলির সাথে ১৮৫৭'র বিদ্রোহীদের ধ্যানধারণা ও কার্যকলাপ খাপ খায় না বলেই এই ধরনের ইতিহাস রচনায় তারা হয়ে পড়ে মধ্যযুগীয় ও পশ্চাতমুখী। সম্প্রতি এক ঐতিহাসিক এমনই মন্তব্য করেছেন : "The Indian writings on 1857 were produced within the wider framework of nationalist discourse which, while granting the people their ability to fight for freedom, was equally eager to dismiss all actions that did not fit into the linear progression of nationalist politics."

অথচ একই বছরে প্রকাশিত অধ্যাপক শশীভূষণ চৌধুরীর 'সিভিল রেবেলিয়ন ইন দি ইন্ডিয়ান মিউটিনিজ'র (*Civil Rebellion in the Indian Mutinies, 1857-58*) বক্তব্য অন্য ধরনের। যেখানে তাঁর সমসাময়িকেরা জোর দেন শহরাঞ্চলে সিপাইদের ওপর, সেখানে তিনি সবিস্তারে আলোচনা করলেন বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সাধারণ মানুষের কার্যকলাপের। তা করতে গিয়ে অধ্যাপক চৌধুরী পৌঁছলেন বিপরীত এক সিদ্ধান্তে; তাঁর মতে, ইংরেজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে সিপাইদের অসন্তোষের সঙ্গে অভিজাতদের অভিযোগ ও জনসাধারণের দুরবস্থাকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে, কারণ এইসব মিলেমিশে গিয়েই ঘটিয়েছিল ১৮৫৭'র অভূতপূর্ব উপমহাদেশব্যাপী গণ-অভ্যুত্থান। আর তা যদি হয়, তাহলে এই বিদ্রোহকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে একজাতীয় সংগ্রাম হিসাবে ভাবতে বাধা কোথায়? অধ্যাপক চৌধুরীর ভাষায় : "The grievances under which the population laboured, the hatred of the British amongst the higher classes, the restiveness of the agrarian classes as manifested in the disturbances of the earlier period, and not any single cause, singly considered—must be regarded as the true source of revolt." সমসাময়িক এক মার্কিন ঐতিহাসিকেরও একই মত।

১৮৫৭'র বিদ্রোহের ইতিহাস রচনায় নতুন দিকনির্দেশ করলেন ইংরেজ ঐতিহাসিক এরিক স্টোকাস 'দি পেজন্ট অ্যান্ড দি রাজ' (*The peasant and the Raj, Studies in Agrarian Society and peasant Revolt in colonial India*) গ্রন্থে। এই বিদ্রোহকে তিনি ইংরেজ দ্বারা ভারতজয় পরবর্তীকালের অনিবার্য লক্ষণ ('Post-pacification revolt') বলে দাবি করলেন। তাঁর মতে, বিদেশী শাসনের প্রতিষ্ঠা পর্বে প্রাচীন সমাজের প্রতিরোধ ('primary resistance') ও পরবর্তীকালের অপেক্ষাকৃত আধুনিক সাংবিধানিক আন্দোলনের ('secondary resistance') এটা মধ্যবর্তী এক পর্ব। অধ্যাপক স্টোকসের মতে, প্রাচীন ব্যবস্থার অবসান ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের স্থাপনার সংযোগকালে যখন নতুন ব্যবস্থার প্রভাব পড়তে আরম্ভ করে

তখন তার বিরুদ্ধে এই ধরনের ব্যাপক প্রক্রিয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে, এই মতানুযায়ী শাসকবিরোধী এই বিদ্রোহে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সামিল হয় বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাগতিক স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্য নিয়েই; কেবল বিদেশী শাসকের প্রতি সর্বজনীন বিদ্বেষ ধর্মীয় অনুশাসনের রূপে তাদের এককাট্টা করে। তাঁর ভাষায় : "[The] formal power superstructure having been wholly or partially dismantled at pacification, colonial rule engages society more directly and evokes in consequence a more widespread reaction should a revolutionary conjuncture occur. But the reaction will be a really of heterogeneous elements, reflecting compartmentalism and uneven development, and held together loosely by anti-foreign sentiment expressed in the form of religious ideology." অধ্যাপক স্টোকস বলেন যে, নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত জমিদারেরাই এক সময় বিদ্রোহী নায়কে পরিণত হয়েছিল—অর্থাৎ, ক্ষুদ্র জাগতিক স্বার্থ রক্ষা করতেই তারা এই সময় তৎপর হয়েছিল। তাই যে জমিদারদের স্বার্থে ঘা লাগেনি এবং যারা লাভবান হয়েছিল তারা বিদ্রোহ তো করেইনি বরং সমর্থন যোগায় বিদেশী শাসককে। অধ্যাপক স্টোকস তাহলে অধ্যাপক চৌধুরীর মতো গণ-অভ্যুত্থানকে (civil rebellion) গুরুত্ব দিলেও বিদ্রোহীদের মধ্যে মহৎ উদ্দেশ্য খুঁজে পান না। বরং তাঁর মতে, বিভিন্ন এলাকার মানুষ অন্ধের মতো তাদের প্রভুদের রণক্ষেত্রে অনুসরণ করে। ("played little part in the fight or atmost followed the behests of its caste superiors")।

একই বিশ্লেষণী ধারায় লেখা—অর্থাৎ ইংরেজ আমলের নতুন আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বিদ্রোহের কারণ খোঁজা ও এইভাবে বিদ্রোহের প্রকৃতি বোঝা—'অবধ ইন রিভোল্ট'র লেখক অধ্যাপক রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত কিন্তু অন্য ধরনের। তাঁর মতে, বিভিন্নভাবে হলেও অযোধ্যার তালুকদারেরা ও তাদের চাষী-প্রজারা উভয়ই ইংরেজ ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার শিকার হয়। আর যেহেতু প্রাচীন ব্যবস্থার ভাঙন উভয়ের জন্য সর্বনাশ ডেকেছিল সেহেতু তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল শ্রেণীবিরোধ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে ইংরেজ শত্রুর ('common enemy') মোকাবিলা করা। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় : "In fact the imposition of British rule and the subsequent policies caused an upheaval in the rural world. The Raj assaulted the traditional view of social norms and obligations, the realm of mutual interdependence between the raja and the peasant that constituted the moral economy. In the revolt of 1857, in the uprising of the entire agrarian population, this moral eco, the world of paternalism and beneficience, reasserted itself. Together the talukdar and peasant resisted intervention in their cherished world."

১৮৫৭'র বিদ্রোহের ইতিহাস লেখার ইতিহাস (historiography) আরেকবার মোড় ঘুরলো অধ্যাপক গৌতম ভদ্র'র প্রবন্ধ 'ফোর রেবেলস অফ এইটিন ফিফটি সেভেন'এ ('Four Rebels of Eighteen fifty seven')। 'নিম্নবর্গীয়' (subaltern) দৃষ্টিভঙ্গীর এই ঐতিহাসিক দাবি করলেন যে, এযাবৎকাল এই বিদ্রোহের যাবতীয় রচনা এলিটিয় (elitist) দৃষ্টিভঙ্গীপুষ্ট। তাঁর মতে, যেভাবেই এই ঘটনার চরিত্রায়ণ (characterisation) হোক না কেন তা একপেশে হতে বাধ্য কারণ তা থেকে বাদ পড়েছে সাধারণ মানুষের ভূমিকার যথাযথ

মূল্যায়ন। তাঁর ভাষায় : "There is a curious complicity between all the principal modes of historiography which have engaged so in the study of the rebellion of 1857.....In all these representations what has been missed out is the ordinary rebel, *his* role and *his* perception of alien rule and contemporary crises." তিনি ১৮৫৭'র বিদ্রোহের চারটি অনামী-নামী চরিত্র—জাঠ চাষী শাহ মল, ক্ষুদ্র জমিদার দেবী সিং, আদিবাসী কোল যুবক গোনু ও মৌলবী আহমদুল্লাহ খান—উপস্থিত করে দেখান যে, বিদ্রোহের মুহূর্তে স্বকীয় চেতনাসম্পন্ন সাধারণ মানুষও নিজ নিজ জগতে কতদূর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে সমাজের ওপরতলার মানুষের প্রভাব ও নির্দেশনা ছাড়াই : ".....such leaders far from being incidental, [were] indeed an integral part of popular insurgency. They asserted themselves through the act of insurgency and took the initiative hitherto denied to them by the dominant classes; and in doing so they put their stamp on the course of the rebellion....." এই মতানুযায়ী তাহলে সাধারণ মানুষের নিজ ভূমিকাকে বাদ দিয়ে ১৮৫৭'র বিদ্রোহের কোনও বর্ণনাই সম্পূর্ণ হয় না; আর জনসাধারণ কেবল নেতাদের অনুসরণ করেনি, অগণিত ক্ষেত্রে তারা নিজেরাই হয়ে উঠেছিল নেতা।

একইভাবে অধ্যাপক তাপ্তী রায় দেখিয়েছেন, বুন্দেলখণ্ডে স্থানীয় সিপাইরা, রাজারা, ঠাকুরেরা ও জনসাধারণ ১৮৫৭'য় নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও ধ্যানধারণা অনুযায়ী এবং আপনাপন পদ্ধতিতে সচেতনভাবে ঔপনিবেশিক ইমারৎ ভেঙে বিকল্প ব্যবস্থা স্থাপনে সচেষ্ট হয়। যেহেতু জোর পড়েছে বিভিন্ন স্তরের বিদ্রোহীদের বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপের ওপর সেহেতু বর্ণনা হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য। সম্প্রতি একাধিক প্রবন্ধে (যেমন, 'The Sepoy Mutinies Revisited') অধ্যাপক রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায় একইভাবে সিপাইদের কার্যকলাপের 'ইতিবাচক' বৈশিষ্ট্যের ওপর দৃষ্টিপাত করেছেন। ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ'র 'পেজেন্ট ইনসারজেন্সী ইন কলোনিয়ন ইন্ডিয়া' (*Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India,* New Delhi, 1983) ও সাধারণভাবে নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচিন্তা ও শৈলীর দ্বারা প্রভাবিত এই ঐতিহাসিক সিপাইদের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন সাংগঠিক শক্তি, সচেতনতা যা তাদের সাহায্য করে শত্রুমিত্রের মধ্যে পার্থক্য করতে ও সহজাত দৃঢ়তা যার বলে ঘৃণ্য ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রতি তারা কঠিন আঘাত হেনেছে। ইংরেজ আমলে অভ্যস্ত জীবনযাত্রার অবক্ষয় ও সঙ্কট চাষীদের মতো সৈন্যদেরও যোগায় সাহস।

৪৮.৪ মূল্যায়ন

১৮৫৭'র মহাবিদ্রোহ তাহলে ভারতীয় ইতিহাসের এক জটিল অধ্যায়, যার ওপর কোনও একটি 'লেবেল' (label) আরোপ করার অর্থ সরলীকরণ। 'জাতীয়' অভ্যুত্থান বলতে আজ আমরা যা বুঝি তা হয়তো এই বিদ্রোহ ছিল না কারণ উপমহাদেশে তখনও এই অর্থে ভারতীয় জাতিগঠন হয়নি। তবে এটাও ঠিক যে, বিদ্রোহীদের মধ্যে স্বদেশ-চেতনা ও স্বদেশভক্তির অভাব ছিল না কারণ তা না থাকলে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটানোর জন্য সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ এই অভ্যুত্থানে সামিল হত না। অধ্যাপক সুগত বোস ও অধ্যাপক

আয়েষা জালালের মন্তব্য : "The 1857 revolt was infused with an incohate sense of patriotism, if not nationalism, to the extent that it had a shared objective of putting an end of colonial rule." বস্তুত, যে কারণেই বিভিন্ন শ্রেণী এই বিদ্রোহে যোগ দিক না কেন, সকলেরই উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল ফিরিঙ্গীদের দেশছাড়া করানো। দ্বিতীয়ত, এই বিদ্রোহ কি ভারতীয় সমাজের একাংশের ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক ধর্মীয় জেহাদ? প্রশ্নটা তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এই লেবেল আরোপ করে অনেক সময় এর গুরুত্ব হ্রাসের চেষ্টা হয়েছে। এই মতের প্রথম ও প্রধান প্রবক্তা সমসাময়িক ইংরেজ কর্মচারীরা। তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, ১৮৫৭'র অভ্যুত্থান আসলে বিক্ষুব্ধ মুসলমান অভিজাতদের ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়। লক্ষ্যণীয় যে, উনিশ শতকের শেষদিকে সৈয়দ আহমেদ খাঁ'র মতো আধুনিক মুসলমানেরা এই মতের বিরোধিতা করে ইংরেজ প্রশাসনের কাছে আনুগত্য প্রমাণের চেষ্টা করলেও ১৯৪৭'র পরে আই. এইচ. ক্যুরেশী ও সৈয়দ মৈনুল হকের মতো একাধিক মুসলমান বুদ্ধিজীবী এই বিদ্রোহকে পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা প্রমাণ করতে গিয়ে আরেকবার মুসলমান বিদ্রোহীদের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়ে বসেন। কোনও সন্দেহ নেই ১৮৫৭'র বিদ্রোহে ধর্মের এক বিশেষ স্থান ছিল, ধর্ম পেয়েছিল একটা বিশেষ মাত্রা। এটা ঠিক যে, অসংখ্য মুসলমান অভিজাত, গাজি, জমিদার প্রভৃতি বিদ্রোহ করতে গিয়ে ধর্মের দোহাই পাড়ে। আবার এটাও ঠিক যে, নিজেদের সমাজের মধ্যে থেকেই এর বিরোধিতা আসে : আযোধ্যায় শিয়া শাসকের প্রত্যাবর্তন সুন্নিদের পছন্দসই হয়নি, আবার, সাফল্য অনিশ্চিত জেনেও অনেকে জেহাদ ঘোষণা করতেই চায়নি। মোটের ওপর আধুনিক ঐতিহাসিকেরা ১৮৫৭'র বিদ্রোহীদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সংহতি মেনে নিয়েছেন; একাধিক ঘোষণাপত্রে (proclamation) হিন্দু ও মুসলমান, দুই গোষ্ঠীর মানুষকেই ধর্মের নামে বিদ্রোহে ঐক্যবদ্ধভাবে সামিল হতে আহ্বান করা হয়। সম্প্রতি অধ্যাপক রজতকান্ত রায় প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, ঘোষণাপত্রে 'হিন্দুস্তানের হিন্দু ও মুসলমান' শব্দাবলীর মধ্যে দিয়ে বিদ্রোহীরা নিজেদের সংহতি শুধু নয় অভূতপূর্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ স্থাপন করতে চায়। তাঁর ভাষায় : ".....the term 'the Hindus and Musalmans of Hindustan'.....was not used in the loose sence of common parlance, indicating the two major communities of the subcontinent, but was on the contrary a sort of constructed political term.....". তৃতীয়ত, সাম্প্রতিক সব ঐতিহাসিকই মেনে নিয়েছেন যে, কৃষি অসন্তোষ ও কৃষক বিদ্রোহ ১৮৫৭'র অন্যতম প্রধান দিক। এই দিকটা উপেক্ষা করে সমসাময়িক ইংরেজ কর্মচারী ও লেখকেরা নিজেদের মনোবল বাড়াবার অহেতুক চেষ্টা করে মাত্র। অধ্যাপক সেন ও অধ্যাপক মজুমদার এই সিদ্ধান্তে আসতে গিয়ে কৃষক বিদ্রোহ-সংক্রান্ত তথ্যগুলোই এড়িয়ে গেছেন মনে রাখতে হবে। তবে কৃষি-অভ্যুত্থানে একাধিক স্তর ছিল এটাও অস্বীকার করা যায় না। তালুকদার, জমিদার, স্বত্ত্বাধিকারী চাষী, ভাগচাষী, আদিবাসী সকলেই এই বিদ্রোহে সামিল হয়, তবে বিভিন্ন কারণে। অধ্যাপক স্টোকসের সিদ্ধান্ত-জনসাধারণ সমাজের শিরোমণিদের অনুসরণ করে মাত্র-কিছুদূর যেমন ঠিক, অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের অযোধ্যার কৃষি-সমাজের সংহতির বিবরণ, আবার তেমনই ঠিক অধ্যাপক ভদ্র ও অধ্যাপক রায়ের দাবি যে, সমাজের নিচের তলার মানুষ প্রায়শই বিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম চালিয়ে চায়।

বিদ্রোহের অভূতপূর্ব ব্যাপ্তি ও তীব্রতা, অসংখ্যা জটিলতা, অসাধারণ বীরত্ব ও আত্মত্যাগ, প্রচণ্ড হিংসা ও উত্তেজনা, সবশেষে ব্যর্থতা ও হতাশা—সব মিলিয়ে ১৮৫৭'র ঘটনাবলী আজও আমাদের নজর কাড়ে। তাই অধ্যাপক স্টোকসকে অনুসরণ করে বলা যেতে পারে যে, এই বিদ্রোহ আজও এদেশের মানুষের মনে দৃঢ়মূল হয়ে থেকে গেছে : "To India 1857 bequeathed a more living and enduring presence."

৪৮.৫ অনুশীলনী

বিশদ উত্তরের প্রশ্ন :

১। ১৮৫৭'র বিদ্রোহকে 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ' গণ্য করা যায় কী?

২। ১৮৫৭'র বিদ্রোহ সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মতামত আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

১। ১৮৫৭'র বিদ্রোহের কারণগুলি কী?

২। ১৮৫৭'র বিদ্রোহের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে লিখুন।

৩। ১৮৫৭'র সিপাই বিদ্রোহ কবে আরম্ভ হয়?

৪। ১৮৫৭'র বিদ্রোহের কয়েকজন নেতার নাম করুন।

৫। স্বত্ববিলোপ নীতির প্রবর্তক কে?

৬। ১৮৫৭'র বিদ্রোহকে 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ' কে প্রথম বলেন?

৭। ১৮৫৭'র বিদ্রোহের 'নিম্নবর্গীয়' দৃষ্টিভঙ্গীর ঐতিহাসিকদের নাম করুন।

৪৮.৬ গ্রন্থপঞ্জী

1. Sugata Bose and Ayesha Jalal, *Modern South Asia History, Culture, Political Economy,* Delhi, 1999.
2. Gautam Bhadra 'Four Rebels of Eighteen-Fifty-Seven' in Ranajit Guha and Gayatri Chakraborty Spivok (eds.), *Selected Subaltern Studies.* New York and Oxford, 1988.
3. Rudrangshu Mukherjee, *Awadh in Revolt. A Study of Popular Resistance.* Delhi, 1984.
4. Eric Stokes, *The Peasant and the Raj : Studies in Agrarian Society and Peasant Rebellion in Colonial India.* London, 1978.